স্বাস্থ্য, চিরযৌবন ও দীর্ঘজীবন তত্ত্ব পুস্তকের দ্বিতীয় পর্য্যায়।

আহার

(তত্ত্ব, শাস্ত্র, বিজ্ঞান, শিল্প, বিভ্রাট ও বিলাস)

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।

রায় সাহেব শ্রী বিজ্ঞান চন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

(ভূতপূর্ব্ব সহকারী ট্র্যাফিক ম্যানেজার, ই, বি, রেলওয়ে,
এফ্, আর্, এইচ্, এস্, লণ্ডন)

প্রকাশক—শ্রী বিমান চন্দ্র ঘোষ।
৬৭/১ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড—কলিকাতা।

ইং ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৪২, বাং ১৮ই মাঘ, সন ১৩৪৮।

সর্ব্বস্বত্ব স্বায়ত্তীকৃত]

[মূল্য ২৲ টাকা

প্রিণ্টার—

শ্রীযুক্ত অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মণ্ডল প্রেসে মুদ্রিত

২৩, ডিক্সন লেন—কলিকাতা।

বিষয় সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
অবতরণিকা	১
প্রথম অধ্যায়—ক্ষুধার মাহাত্ম্য	৮
দ্বিতীয় অধ্যায়—আহার তত্ত্ব, সাধারণ মন্তব্য	১২
তৃতীয় অধ্যায়—আহার বিজ্ঞান—বিভিন্ন উপাদান	২১
চতুর্থ অধ্যায়— ঐ ভিটামিন বা খাদ্য প্রাণ	৩৯
পঞ্চম অধ্যায় —রস বিজ্ঞান	৫৫
ষষ্ঠ অধ্যায়—অম্ল ও ক্ষার তত্ত্ব	৭৭
সপ্তম অধ্যায়—আহার-শিল্প-রন্ধন	৮২
অষ্টম অধ্যায়—মিতাহার ও হিতাহার	১২৬
নবম অধ্যায়—আহারের সাধারণ বিধি	১৩৮
দশম অধ্যায়—আহারের বিশেষ বিধি (চর্ব্বণ বিজ্ঞান)	১৫০
একাদশ অধ্যায়—নিরামিষ আহার (দুগ্ধ ও দুগ্ধ জাত দ্রব্য)	১৬৬
দ্বাদশ অধ্যায়— ঐ (ফল)	২১৩
ত্রয়োদশ অধ্যায়— ঐ (খাদ্য শস্য)	২৭৫
চতুর্দ্দশ অধ্যায়— ঐ (তরি তরকারি)	২৯৪
পঞ্চদশ অধ্যায়—আমিষাহার (মৎস্য)	৩৪৪
ষোড়শ অধ্যায়— ঐ (মাংস)	৩৫৮
সপ্তদশ অধ্যায়—আহার বিভ্রাট (অহিত আহার)	৩৭৭
অষ্টাদশ অধ্যায়— ঐ (অমিত আহার)	৩৮৭
ঊনবিংশ অধ্যায়—বাঙ্গালীর আহার বিভ্রাট	৩৯২
বিংশ অধ্যায়—আহার বিলাস	৪০৪
পরিশিষ্ট (ক)—ভোজের আহার্য্য দ্রব্যাদির পরিমাণ তালিকা	
„ (খ)— ঐ মিষ্টান্ন প্রকরণ	
„ (গ)—আধুনিক প্রীতি-ভোজের মেনু	
„ (ঘ)—গ্রন্থ বিবরণী	

নিবেদন।

স্বাস্থ্য, দীর্ঘ জীবন ও চিরযৌবন তত্ত্ব পুস্তকের প্রথম পর্য্যায়ে সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে :—

পরমায়ুতত্ত্ব, জীবনীশক্তি, বংশপ্রভাব, পরমায়ুক্ষয়, সংসর্গদোষ, পাণ, চা প্রভৃতি বিলাসদ্রব্য, বিবিধ প্রকার নেশা, মুদ্রাদোষ, শুক্রপাত, বাসগৃহ, বেশপরিচ্ছদ, শ্রম ও ব্যায়াম, সহজ প্রাণায়াম বা দীর্ঘশ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়া, নিদ্রা, বিশ্রাম, সংসর্গ, স্বাস্থ্যবিধি ও নিষেধ ইত্যাদি।

মূল্য ২ মাত্র। কতকগুলি সমালোচনা এই পুস্তকের শেষ ভাগে দেওয়া হইয়াছে।

আহার

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিরযৌবন তত্ত্ব পুস্তকের দ্বিতীয় পর্য্যায়।)

অবতরণিকা :

আহার দ্বারা বল, বর্ণ, পুষ্টি, তুষ্টি ও স্বাস্থ্য লাভ হয়, কিন্তু উহা যতদূর সম্ভব, দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে বিধিমত সেবন করা প্রয়োজন নচেৎ অনিষ্ট হয়। অনেক স্থলে, আহার দেহের আকৃতি ও প্রকৃতির উপরও অল্প বিস্তর প্রভাব বিস্তার করে। শাস্ত্রে ত্রিবিধ আহারের উল্লেখ আছে, যথা—সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

"সাত্বিক আহার সেবনে লোক সাত্বিক প্রকৃতির হয়, উহারা নিরামিষাশী, জীবহিংসা করে না। এই শ্রেণীর লোকের আকৃতি ও প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণে তাহাদের স্বাস্থ্যের বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। মাংসাদিভোজী রাজসিক প্রকৃতির লোক সাধারণতঃ যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। তামসিক প্রকৃতির লোক নিন্দিত আহার গ্রহণ করে। আবার যাহারা উক্ত দুই বা তিন প্রকার আহার গ্রহণ করে, তাহারা মিশ্র প্রকৃতির এবং যে গুণের বা দোষের আধিক্য জন্মে তাহার দ্বারা প্রভাবিত হয়।"

প্রায় সকল ক্ষেত্রেই উদর যাবতীয় রোগের জননী বা জন্মভূমি। আহার বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব এবং অতিলোভ প্রসূত ঔদরিকতা বা রসনার লাম্পট্য স্বাস্থ্যের শোচনীয় দুর্দ্দশা সূচিত করে;

ফলে অনেকে কঠিন রোগে দীর্ঘকাল ভুগিয়া অকালে ভবলীলা সাঙ্গ করিতে বাধ্য হয়। ইহা প্রকৃতির কঠোর শাস্তি।

পাগল হরনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, "কৃষ্ণই সাপ হ'য়ে কামড়ান আবার রোজা হ'য়ে বিষ ঝাড়েন; তিনিই ব্যাধি, তিনিই বৈদ্য, তিনিই ঔষধ; আবার তিনিই পাতা, ধাতা, সংহারকর্ত্তা, বিধাতা।" ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য যেমন তিনটি যোগ, যথা, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান প্রয়োজন, সুস্থদেহ লাভার্থে আহারাদি বিষয়েও ঐ তিনটি যোগ বিশেষ আবশ্যক। এক হইতে অন্য দুইটি ক্রমে বিকসিত হয়। যথা, প্রথমে আহার বিষয়ক জ্ঞান, উহা হইতে ভক্তি এবং ভক্তি হইতে কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি আর একটির দ্যোতনা বা দ্যোতক।

যাহারা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবান (বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক যুবকগণ), তাহারা, আহারাদি বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ, পাঠ বা অনুশীলন করিতে তিক্ত বোধ করে—পালন করা ত দূরের কথা। যতদিন না রোগ দেহে জাঁকিয়া বসে, ততদিন তারা ঐ বিষয়ে মনোযোগ দিতে বিমুখ হয় অথবা অল্প অনাচারের দোষ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীভূত হয় না বলিয়া "শরীরের নাম মহাশয় যা সহাবে তাই সয়" এই ভ্রান্ত প্রবাদ বাক্যটি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে এবং নৈরাশ্যবাদের (Pessimism) পরিবর্ত্তে আনন্দবাদ (Optimism) জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করে। কেহ কেহ কবি ডি, এল্, রায়ের বিখ্যাত গান "হেঁসে নাও দুদিন বইত নয়, কি জানি কখন সন্ধ্যা হয়" কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া "খেয়ে নাও দুদিন বইত নয়" ইত্যাদি গাহিয়া যৌবন সায়রে দেহ-তরী ভাসাইয়া দেয়; কিন্তু উহাতে সামান্য ত্রুটী হইলেও যে তাহা ক্রমে বাড়িয়া একদিন অনাচার সলিলে নিমজ্জিত হইবে তাহা সময় থাকিতে উপলব্ধি করে না।

বয়স্কদের মধ্যে যাহাদের দেহে ভাঙ্গন ধরিয়াছে তাহাদের অনেকে স্বাস্থ্য ও আহার বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করিতে এবং ঐ সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনিতে ভালবাসে কিন্তু উহাতে সাময়িক উত্তেজিত হয় মাত্র। কারণ তাহারা তাহাদের আহারাদির চিরাচরিত রক্ষণশীল অভ্যাস বা প্রথা ত্যাগ করিয়া নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হয়। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন, "যারা কু-অভ্যাসের দাস তারা বদ্ধজীব। যেমন উট কাঁটা ঘাস খেতে খেতে মুখ দিয়ে দরদর ক'রে রক্ত পড়লেও কাঁটা ঘাস খেতে ছাড়ে না।"

প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের মধ্যে আবার কেহ কেহ (তাহাদের সংখ্যা বড় কম নয়) বিশ্বাস করে, সকলই দৈব বা পূর্ব্বজন্মকৃত অদৃষ্টের ফল এবং প্রত্যেকের পরমায়ু পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অতএব মানুষের ইহজীবনের কর্ম্ম বা অকর্ম্ম এবং তাহার ফল বিধাতার বিধানে হইতেছে। ইহারা প্রায়ই আহারাদি বিষয়ে বাদ বিচার বড় একটা করে না এবং প্রকৃতিগত সদসৎ বিচারশক্তিমূলক পুরুষকার নিরর্থক বা অকেজো মনে করিয়া আজু গোস্বামীর গান "এই সংসার রসের কুটি, ওরে খাই দাই আর মজা লুটি" গাহিয়া গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়া যায়। স্বেচ্ছাকৃত অত্যাচার জনিত অপরাধ স্খালনের উক্ত অদ্ভুত কৈফিয়ৎ বা আচরণ আত্মপ্রবঞ্চনা বই আর কিছুই নয়।

আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা আহারাদি বিষয়ে প্রায়ই উদাসীন, কারণ তারা সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বসিদ্ধিদাতা অর্থের (Almighty Dollar) যজন, পূজন বা ভজন পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করে এবং ঐ দেবতার পদে নিজ স্বাস্থ্য অকাতরে বলিদান দেয়। ইহারাও সাধারণতঃ "শেষের সেই দিনের কথা" মনন বা স্মরণ করে না।

একজনের অর্থাৎ ব্যক্তিগত আহারাদির দোষ তাহার পরিবারবর্গের এবং ক্রমে সংক্রামক রোগের ন্যায় সমষ্টিগত সমাজদেহে সংক্রমিত হইয়া দেশের ও দশের প্রভূত অনর্থ সৃজন করিতেছে এবং উহার মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। অতিলোভই সকল অনর্থের মূল এবং উহা সংবরণ করা সাধারণতঃ বড়ই কঠিন।

"Now then men are saturated and penetrated, as it were, with love of pleasure, it is not an easy task to attempt to pluck out from their bodies flesh-baited hook. The men have indulged their lawless appetites in the pleasure of luxury not for necessary food and from no necessity but only out of the merest wantonness, gluttony and display."

"যখন মানুষ ইন্দ্রিয় সুখ-অনুরাগে অনুসিক্ত বা অনুবিদ্ধিত হইয়া থাকে, তখন তাহাদের মুখ হইতে ঐ মাংসবিদ্ধ বঁড়শী বাহির করিবার চেষ্টা সহজসাধ্য নয়। মানুষ যে তাহার বে-আইনি বিলাস-সুখ-ক্ষুধাকে প্রশ্রয় দিয়াছে তাহা আবশ্যকীয় আহার গ্রহণ বা অন্য প্রয়োজনের জন্য নয়, কেবলমাত্র তার স্বেচ্ছাচার, উদারপরায়ণতা এবং বাহ্যাড়ম্বর জাহির করিবার জন্য।"

সমাজদেহে বহুকাল হইতে যে ময়লা সঞ্চিত হইয়াছে তাহা পরিষ্কার করা প্রভূত আয়াসসাধ্য। এই বিষয়ে রাজা প্রজা সকলেরই প্রাণবন্ত ঐকান্তিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। দুর্ব্বলের নিজ দেহরাজ্যের উপর প্রভুত্ব হারাইয়া শুধু স্বরাজের নিষ্ফল স্বপন দেখা, বিড়ম্বনা মাত্র।

পুরাকালে ইলিস নগরে অজিয়ান (Augean) স্বীয় গোশালায় তিন সহস্র গরু রাখিয়াছিলেন। ৩০ বৎসরের মধ্যে তাহা পরিষ্কৃত হয় নাই। হারকিউলিস উহার পরিষ্করণকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ঐ

গোশালার মধ্যে দুইটী নদী প্রবাহিত করাইয়া উক্ত আবর্জ্জনা বিদূরিত করিয়াছিলেন। এই জন্য ইংরাজীতে, কোন অধিক শ্রমসাধ্য ময়লা বা দোষ সাফ করা কাজকে 'অজিয়ানের গোয়াল সংমার্জ্জনা' বলিয়া উক্ত হয়। "To cleanse the Augean stables."

গীতায় উক্ত হইয়াছে পৃথিবীতে ধর্ম্মের গ্লানি হইলে ভগবান যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ হন। ধর্ম্মের গ্লানি সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক অবনতি বলিয়া ব্যাখ্যাত হয় কিন্তু উহার ব্যাপক অর্থে দেহধর্ম্মের অর্থাৎ স্বাস্থ্যের গ্লানিও বুঝায়। দৈহিক ও আত্মিক ধর্ম্ম একাত্মক, উহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্বন্ধ নিত্য বিদ্যমান। মহর্ষি চরক শরীর রক্ষাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-পালন বলিয়াছেন।

"শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্ম্ম সাধনম্।"

ভারতবর্ষে যে সকল অবতার জন্মিয়াছেন একজন ব্যতীত অন্য সকলেই প্রত্যক্ষ ভাবে লোকের আধ্যাত্মিক বিকার মোচনার্থে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অবশ্য উহা পরোক্ষ ভাবে মানব দেহধর্ম্মকেও কথঞ্চিৎ প্রভাবিত করিয়াছিল। একমাত্র শ্রী চৈতন্য দেব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মনের ও দেহের গ্লানি মোচন করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার প্রবর্ত্তিত ও আচরিত নব ধর্ম্মানুশীলন যথা নামগান বা নৃত্য ও সংকীর্ত্তন প্রভাবে একদিন নদে ডুবুডুবু এবং শান্তিপুর ভাসিয়া গিয়াছিল। তাঁহারই নির্দ্দেশিত অনাড়ম্বর নিরামিষ শুদ্ধ সাত্বিক আহারব্যবস্থা বৈষ্ণবদের ধর্ম্মে ও স্বাস্থ্যে যুগপৎ আশ্চর্য্য উন্নতি সাধন করিয়াছিল। কিন্তু তিনি যে দীপ ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে জ্বালিয়া গিয়াছেন, অবস্থার বিপর্য্যয়ে এখন নির্ব্বাণপ্রায় যাহা পুনরায় নূতন স্বাস্থ্য-অবতারের আবির্ভাব সম্ভাবিত করিতেছে।

ইতিমধ্যে চরক, হনিম্যান প্রমুখ বহু স্বাস্থ্য ও পুষ্টিতত্ত্ববিদ মনীষীগণ খণ্ড অবতার রূপে জন্মিয়া ভাবী পূর্ণঅবতারের সংস্কারকার্য্য আগাইয়া দিয়াছেন বা দিতেছেন। কিন্তু তাহাদের নব আলোক সম্পাত সত্ত্বেও আমাদের অনেকে এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরে রহিয়াছে। ৺মুকুন্দ দেব মুখোপাধ্যায় মহাপুরুষ ভাস্করানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনার ন্যায় মহাপুরুষ থাকিতে আমাদের এত দুর্গতি ও বিলাতবাসীগণের এত উন্নতি কেন ?" স্বামিজী বলিয়াছিলেন "তোমরা গীতা পড়, উহারা গীতা করে" (অর্থাৎ গীতার উপদেশ পালন করে)। কেবলং চাটুবাক্যেন ন তুষ্যতি পরাৎ নরঃ। যব্‌তক এয়সা রহেগা তব্‌তক্ এয়সাই রহোগে।" তিনি মাটীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অধঃপাতিত থাকার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

আমার দুর্ব্বল লেখনীর দ্বারা এই পুস্তকে আহারাদি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিবার ও ভাবিবার বিষয়, আমাদের মজ্জাগত নানা দোষ ও ত্রুটীর কথা যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি; সুস্থ থাকিবার নানা নীতি বা রীতি একত্র গ্রথিত করিয়াছি; অনেক প্রচলিত ভ্রান্ত বা অমূলক ধারণা বা কু-সংস্কার দূর করিবার জন্য কিছু কিছু অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছি। ভরসা করি যে উক্ত আপাততিক্ত কথাগুলি তিক্ত ঔষধের ন্যায় পরিণামে মিষ্ট বলিয়া অনুভূত হইবে।

আরো এই পুস্তকে বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক ও প্রাচীন মতে বিভিন্ন রোগে উহাদের উপকারিতার বিষয় বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে। তবে কোন কোন স্থলে শাস্ত্রকারগণের অতিশয়োক্তি দোষে যে সকল খাদ্য রোগ আরোগ্যকর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহা উপশমকর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আশা করি বিভিন্ন আহার্য্য দ্রব্যের বিভিন্ন রোগ উপশম বা আরোগ্যকারী গুণগুলি

মুষ্টিযোগ হিসাবে অনেক উপকারে আসিবে। কেহ কেহ বলেন উপযুক্ত দ্রব্য আহারে সকল রোগ আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু আন্ত্রিক বিকার, বিপজ্জনক প্রদাহ বা দীর্ঘস্থায়ী কঠিন ও জটিল রোগে উপযুক্ত পথ্যের সঙ্গে ঔষধ সেবন একেবারে বাদ দেওয়া যায় না।

যে সকল পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি যজ্জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ তাহা পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। আরো অনেক পুস্তকের নাম এই পুস্তকের প্রথম পর্য্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনেক বিষয় স্মৃতি হইতে লিখিয়াছি, গ্রন্থকারদের নাম মনে নাই। কাহারও কাহারও ভাব ও ভাষা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিয়াছি। স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ ডাঃ কার্ত্তিক চন্দ্র বসু মহাশয় একসময় লেখককে বলিয়াছিলেন যে স্বাস্থ্যসাহিত্য সাধারণের সম্পত্তি। এইজন্য ভরসা করি উক্ত দোষ মার্জ্জনীয়। প্রার্থনা করি যেন আমাদের দেশের সকলে স্বাস্থ্যশাস্ত্রের সত্য জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইয়া উহার সত্যালোকে অটুট-স্বাস্থ্যের অভ্রান্ত সন্ধান পায়।

৬৮।১।বি আনন্দপালিত রোড
কলিকাতা।

বিনীত—
শ্রীবিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।

প্রথম অধ্যায়।

ক্ষুধার মাহাত্ম্য।

আহারতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, প্রথমে কিছু ক্ষুধার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব। ক্ষুধা ভোগমূলক অভিব্যক্তি। উপবাস ত্যাগ বা নিবৃত্তিমূলক অনুষ্ঠান। ক্ষুধাই মানবের সকল প্রচেষ্টার মূল। উহা জঠরাগ্নির আহার-আহুতি লাভের আকুল আকুতি। নিদানে জঠরাগ্নি চার প্রকার বলা হইয়াছে। (১) মন্দাগ্নি (শ্লেষ্মা জাত), (২) বিষমাগ্নি (বাতাধিক্য জনিত), (৩) তীক্ষ্ণাগ্নি (পিত্তাধিক্য জনিত) এবং (৪) সমাগ্নি। সমাগ্নিই শ্রেষ্ঠ, কারণ উহা বাত, শ্লেষ্মা ও পিত্তের সমতা হইতে উৎপন্ন হয়। (১) ও (২) রোগ পরিচায়ক। তীক্ষ্ণাগ্নি সাধারণতঃ দোষজনক নয় তবে অনেক সময় উহা অজীর্ণ রোগীর দুষ্ট ক্ষুধার লক্ষণ। ক্ষুধারোধ করিলে বা ক্ষুধার সময় আহার গ্রহণ না করিলে ক্ষুধাকে মহা অপমান করা হয়। উহাতে অঙ্গবেদনা, বিনাশ্রমে শ্রমজ্ঞান, শ্রবণ ও দর্শন শক্তির হ্রাস, অকারণ তৃষ্ণাবোধ এবং হৃৎপ্রদেশে বেদনা বোধ হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

একটী উদ্ভট শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা কাব্য মনোহর। কাব্য অপেক্ষা সংগীত, কারণ সংগীতে পাষাণ গলে, জীবজন্তু মুগ্ধ হয়। আবার উহা অপেক্ষা সুন্দরী রমণী যাহা পাইলে মানবের দর্শনশাস্ত্র, কাব্য ও গীত সব ভেসে যায়। কিন্তু যখন ক্ষুধা পায় তখন ঐ সব কিছুই ভাল লাগে না। তখন 'অন্ন চিন্তা চমৎকারা।'

ক্ষুধা—অগ্নি, খাদ্য তার ইন্ধন বা আহুতি। ক্ষুধা তৃপ্ত হইলে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত ও বীর্য্যবান হয়। পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন "খাওয়া ও খাওয়ান তাঁরই সেবা। তিনিই সব জীবের মধ্যে অগ্নিরূপে আছেন, খাওয়ান মানে তাঁকে আহুতি দেওয়া।" এইজন্য পরকে খাওয়াইলে যে খায় এবং যে খাওয়ায় উভয়েরই যুগপৎ তৃপ্তি লাভ হয়।

ক্ষুধার এতই শক্তি যে উহা আহারকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। মার্কিন দেশে এক জাতীয় অতি বিরাটকায় পার্ব্বত্য সর্প আছে তাহারা চলচ্ছক্তিহীন, সর্ব্বদা আকাশের পানে হাঁ করিয়া মাটিতে পড়িয়া থাকে। তাহাদের ক্ষুধাশক্তি এতই প্রবল যে আকাশ হইতে পাখী আপনি আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের মুখবিবরে পড়ে।

ক্ষুধারাক্ষসী সংসারে সদাই বদন ব্যাদান করিয়া আছে। মুখে কিছু পড়িলে ক্ষণেকের তরে তার মুখ বন্ধ হয় আবার যে কে সেই। যখন মায়েদের ইলিশ মাছ খাইবার বাসনা বলবতী হয় তখন তাহা যদি পূর্ণ হয় তাহাদের কত আনন্দ তজ্জন্য তাহারা গৃহস্বামীর উপর কত সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু পুনরায় যখন তাহাদের উক্ত ক্ষুধার আবির্ভাব হয় তখন উহা না পাইলে কত অসন্তুষ্ট হয়, পূর্ব্বের কথা মনেই থাকে না। সেইরূপ গৃহস্থকে, নিজের ও পরিবারবর্গের নানা প্রকার ক্ষুধা পূরণ করিতে করিতে হায়রাণ হইতে হয়—যথা পরিচ্ছদ ও গহনার ক্ষুধা, বায়োস্কোপ বা থিয়েটার ক্ষুধা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। উক্ত ভব ক্ষুধাকে সেইজন্য সর্ব্বগ্রাসী বলা হয়।

মহাত্মা হজরৎ রসুল বলিয়াছেন—"তোমরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহকারে প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ কর, ইহা অপেক্ষা আর কোন কাজ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অধিক প্রিয় নাই।"

অনেক সময় ক্ষুধা রসনাকে বঞ্চনা করে। মানুষ সাধারণতঃ শ্রেয়ঃ অর্থাৎ চিরন্তন কল্যাণকর আহারের পরিবর্ত্তে প্রেয়ঃ অর্থাৎ আপাতপ্রিয় কিন্তু পরিণামে দুঃখজনক অখাদ্য বা কুখাদ্য গ্রহণে প্ররোচিত হয়। ইহা কতক ইচ্ছাকৃত আত্মাপরাধ, কতক অজ্ঞানমূলক অপরাধ।

"দুর্দ্দান্ত পশুদিগকে যেরূপ খাইতে না দিয়া বশীভূত বা আজ্ঞাধীন করা যায় সেইরূপ মানুষের দুর্দ্দান্ত লোভ বা প্রবৃত্তি যাহা পরিতৃপ্ত আহারে উত্তেজিত হয় তাহা দমন না করিলে উহার গোলাম হইয়া থাকিতে হয়।"

(সৌভাগ্য সোপান)

ক্ষুধা সহ্য করিলে মানসিক ক্রিয়াশক্তি সজাগ ও সবল হয়। ডাক্তার কিড্ বলিয়াছেন সার আইজাক্ নিউটন, নেপোলিয়ন এবং ওয়াশিংটন যখন কোন জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় নিযুক্ত হইতেন তখন অতি অল্পমাত্র আহার গ্রহণ করিতেন।

অত্যাহারে বা অমিতাহারে ক্ষুধার অপমান করা হয়, ফলে রোগ উৎপন্ন হয়। ক্ষুধা তাড়িতের ন্যায় উত্তম সেবক কিন্তু মন্দ মনিব (Good servant but bad master) সুতরাং উহাকে সংযত না করিলে উহার দ্বারা সংযত হইতে হইবে।

ভোগের ভিতর জীবন ও মরণ দুইটীই লুকাইয়া আছে। একটীকে সোনার কাটি আর একটীকে রূপার কাটি বলা যাইতে পারে। এক রাজকুমারীর গল্পে আছে যে সে একজন দৈত্য দ্বারা স্পর্শিত রূপার কাটির প্রভাবে মরিত আবার সোণার কাটির দ্বারা পুনর্জীবিত হইত। ক্ষুধাই সেই দৈত্য। ভোগ ক্ষুধার অভিব্যক্তি, ভোগের ভিতর সুখ ও দুঃখ, জীবন ও মরণ লুকাইয়া আছে।

ক্ষুধাই জীবনের সকল প্রচেষ্টার মূল। ক্ষুধার প্রভাবে জীবনের কর্ম্মশক্তি বা কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি জাগে। কর্ম্মই জীবন উহা সকল সৌভাগ্য সূচিত করে। কিন্তু অসংযত কর্ম্ম বা ভোগ, কি আহার সম্বন্ধে কি অন্য বিষয় বস্তু সম্বন্ধে, দুর্ভাগ্য সূচিত করে। যিনি সর্ব্ব বিষয়ে সংযমী তিনিই সুখী বা সৌভাগ্যশালী কারণ তিনিই ক্ষুধার প্রকৃত সম্মান করেন। জীবনে ভোগও চাই, ত্যাগও চাই। একটী যোগ আর একটী বিয়োগ, একটী ক্রিয়া আর একটী প্রতিক্রিয়া, একটী সুখ আর একটী দুঃখ। উহাদের সামঞ্জস্যে সুস্থ দীর্ঘ জীবন লাভ হইতে পারে। বিধাতা ভোগ ও ত্যাগ বা দমনশক্তি দুইটিই দিয়াছেন। সুতরাং আহারাদির সংযমই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। একমাত্র উহাই ভবক্ষুধা সংযত বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। অবস্থা বিশেষে কোন কোন সাধকের গুরু বা দেবতার অনুগ্রহে ক্ষুধার চির অবসান হইয়াছে শুনা যায়, নিম্নে একটী সত্য ঘটনা বিবৃত হইল।

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, বাঁকুড়া পত্রসায়ার থানার বিউর গ্রামনিবাসী উকীল শ্রীযুক্ত লম্বোদর দে মহাশয়ের বিধবা ভগিনী শ্রীমতী গিরিবালা দেবী ৫৭ বৎসর কাল অনাহারে আছেন। তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ৬৯ বৎসর। তিনি প্রত্যহ একটী তুলসী পত্র আহার করেন, জল পর্য্যন্ত তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয় না। অনাহারে থাকার জন্য তাঁহার শরীরের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। তিনি বেশ সুস্থ ও সবল এবং স্বহস্তে সাংসারিক বহু গৃহকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। বৰ্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার ঐ অনাহারে অবস্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন, ব্যাপারটি প্রকৃত সত্য। ১২ বৎসর বয়সে তিনি বিধবা হইয়াছিলেন। প্রত্যহ বহুলোক তাঁহাকে দেখিতে গিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আহার তত্ত্ব।

(সাধারণ মন্তব্য)

আহার পঞ্চভুতের রাসায়নিক পরিণাম, দেহও আহারের রাসায়নিক পরিণাম। খাদ্য বিশুদ্ধ ও বিধিমত গৃহীত এবং স্বাস্থ্যনীতি ও বিধিগুলি সম্যকভাবে পালিত হইলে বিশুদ্ধ রক্ত উৎপন্ন হইতে পারে। **"Blood is what food makes."** রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র এবং শুক্র হইতে ওজঃ উৎপন্ন হয়।

বর্ত্তমানকালে আমাদের স্বাস্থ্যের দৈন্য, পুষ্টিকর আহারের অভাব জন্য তত নয়, যত আহার বিষয়ে সত্য জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত ঘটে। নানা কারণে (যাহা পরে ব্যক্ত হইবে) যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার পরিপাক করিবার শক্তি এখন অনেকের নাই। দেহের পুষ্টি প্রধানতঃ পরিপাকশক্তি সাপেক্ষ—একথা অনেকেই ভুলিয়া যায়। আজকাল অজীর্ণ রোগীর সংখ্যা, বিশেষতঃ সহরে অত্যধিক। সুতরাং তাহাদের এখন সাদাসিদে তাজা সুলভ পুষ্টিকর আহার, পথ্য হিসাবে বিধিমত গ্রহণ এবং অন্য স্বাস্থ্যনীতি পালন করা বিশেষ প্রয়োজন।

অতি নগণ্য আহারে যে দেহ পুষ্ট ও সুস্থ থাকিতে পারে, তাহা আমাদের অনেকের ধারণা নাই। সুস্থ বিশালকায় জীবজন্তুগণের আহারের দিকে লক্ষ্য করিলে উহা সহজেই অনুমিত হইবে। বর্ত্তমান

যুগে আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত, কত বিভিন্ন প্রকার আহার গ্রহণ করি কিন্তু অজ্ঞ, অসভ্য, অবৈজ্ঞানিক গো-মহিষাদি ও পশুপক্ষী-গণ সৃষ্টির আদি যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত একই প্রকার সাদাসিদে আহার গ্রহণ করিতেছে।

"An ox is satisfied with pastures of an acre or two, one wood is sufficient for several elephants. Man alone supports himself by the pillage af whole earth and sea."

"একটি বৃষ এক বা দুই একর (প্রায় ৬ বিঘা) চারণ ভূমির তৃণ ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়; কতিপয় হস্তী একটি বনভূমিতে পর্য্যাপ্ত আহার পায়। কেবল মানব সারা পৃথিবী ও সাগর লুটিয়া আপনাকে পোষণ করে।"

অ্যালাস্কা দেশে অতি বিশাল মরুক্ষেত্রে বৎসরের অধিকাংশ কাল জমির উপর অনেক ফুট গভীর তুষার জমিয়া থাকে। তাপ, শূন্য ডিগ্রীর ৩০° নিম্নে। সেখানে অগণিত এক জাতীয় হরিণ (Caribou) দলে দলে বিচরণ করে। ইহারা অতি বিশালকায়; যখন তারা নূতন দেশের সন্ধানে একস্থান ছাড়িয়া অন্যস্থানে দল বাঁধিয়া যায়, তখন দিনের পর রাত, রাতের পর দিন বহুদিন ধরিয়া ঘণ্টায় ৮ মাইল পথ অবিচলিত গতিতে অতিবাহিত করে। যে এক প্রকার আহার পায়, তাহা সবুজ রঙের ছোট ছোট শেওলা, যাহা বরফের উপরিভাগের ফাঁকে ফাঁকে জন্মে এবং রবিকরে পুষ্ট ও সঞ্জীবিত হয়। একমাত্র ঐ সামান্য খাদ্য দ্বারা তারা পুষ্টি ও শক্তি লাভ করে।

চিলি দেশের পার্ব্বত্য প্রদেশে ঐ জাতীয় জন্তু কেবলমাত্র এক প্রকার পাতলা ঘাস ও শেওলা খাইয়া জীবনধারণ করে; তাহারাও বিশালকায়, তাহাদের শক্তি ও সামর্থ্য বিস্ময়জনক।

গরু, মহিষ, হস্তী প্রভৃতির বিশাল দেহ ও শক্তি একমাত্র ঘাসপাতা আহারের রাসায়নিক ক্রিয়াফল। কত অল্প পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিয়া দেহধারণ সম্ভব যাহা স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ পার্সি হল্ সাহেব বলিয়াছেন এবং নিম্নে উদ্ধৃত হইল তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"The actual essential part of our food could probably be measured in grains rather than pounds. Life, health and vigour can better be maintained by a small quantity of right fresh food carefully selected according to individual needs rather than on large amounts or mere bulk."

"আমাদের খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদানের পরিমাণ হয়ত পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে গ্রেণে মাপ করা যাইতে পারে। জীবন, স্বাস্থ্য ও বল অধিক পরিমাণ খাদ্য ভোজন অপেক্ষা স্বল্প পরিমাণ উপযুক্ত সদ্যোজাত সুনির্ব্বাচিত আহার্য্য দ্রব্য ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণে আরও উত্তমরূপে রক্ষিত হইতে পারে।"

আর একজন পাশ্চাত্য মনীষী লিখিয়াছেন :—

"Even a simple blade of grass contains all that the body of huge animals (the horse, the ox, the cow, the buffalo etc.) need for their growth, maintenance and capacity for heaviest labour. How much more nourishment there be in fruits, cereals etc.

Leguiminous foods—lentil, peas, beans—far surpass meat in nutritive value and are deprived of its injurious heating and disease producing elements. They contain plenty of albuminates, in general 10 to 15 times more nourishment than meat."

"এমন কি কেবল মাত্র এক তৃণ পত্রে যে সকল আহারীয় উপাদান আছে তাহা ভোজন করিয়া অশ্ব, বলদ, গাভী, মহিষাদি বিশালকায় জন্তুগণের বৃদ্ধি, পুষ্টি এবং পরিশ্রম করিবার শক্তি লাভ হয়।

ফল শস্যাদিতে কত অধিক পুষ্টিকারিতা শক্তি আছে! ডাল, কলাই, সিম ইত্যাদি শিম্বী জাতীয় শস্য, মাংস অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর এবং মাংসের ন্যায় অনিষ্ট ও তাপকারী এবং রোগজনক নয়। উপরোক্ত দ্রব্যগুলিতে যে অণ্ডলালা আছে তাহা সাধারণতঃ মাংস অপেক্ষা ১০ হইতে ১৫ গুণ অধিক।"

সেইরূপ কেবল মাত্র দুধ বা ফল পরিমিত পরিমাণে আহার করিলে জীবন ধারণ করা সম্ভব। ইহা অনেক পুষ্টিতত্ত্ববিদ পরীক্ষা ও বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন।

যদি কেবল দুধ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হয় তাহা হইলে একজন বয়স্কের উহা দিনে /২॥ সের প্রয়োজন হয়। ইহাতে মাত্র ৫ কাঁচ্চা আমিষাদি সার পদার্থ আছে। দুগ্ধ তত্ত্বাধ্যায়ে উহার বিভিন্ন উপাদানগুলি দেওয়া হইয়াছে। সেইরূপ যদি কেহ ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করে—যেরূপ অনেক যোগীঋষি করিয়াছে বা করিতেছে—তাহার উপরোক্ত উপাদানের পরিমাণ আরো অল্প। ইহা কল্পনার বিজৃম্ভণ নয়, প্রমাণিত সত্য। আমাদের বাটীতে এক সময় একজন সাধু মাসাধিক কাল কেবল মাত্র আম খাইয়া সুস্থ ও কর্ম্মঠ ছিলেন। অনেক দিন যাবত তিনি ফলাহারে অভ্যস্ত ছিলেন। উক্ত দৈনিক আহারের (আমের) পরিমাণ যদি ১ সের ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে উহাতে পর পৃষ্ঠায় লিখিত পরিমাণে বিভিন্ন জাতীয় উপাদানগুলি পাওয়া যায়:—

	শুষ্ককরা পরিমাণ	ওজন ছটাক	ওজন কাঁচ্চা
জল	৮৬.১	১৩	৩.১০
শ্বেতসার	১১.৮	১	৩.৫৫
প্রোটিন (আমিষ)	০.৬	০	০.৩৮
স্নেহ	০.১	০	০.০৭
লবণ	০.৩	০	০.১৯
কর্কশাংশ (ছিবড়ে)	১.১	০	০.৭১
	মোট ১০০	১৬ ছটাক বা ১ সের	

পুনশ্চ—"আধুনিক আহার ও পুষ্টিতত্ত্ববিদগণের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে সামান্য তৃণ বা উহার রূপান্তরিত খাদ্য গ্রহণে মানুষের দেহধারণ সম্ভবপর। তৃণে একমাত্র 'ডি' ভিটামিন ব্যতীত অন্য সব ভিটামিন ('এ', 'বি' ও 'সি') প্রচুর পরিমাণে আছে। এক সের শুষ্ক ফল বা শাকসব্জীতে যে পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ থাকে, তাহার ২৮ গুণ খাদ্যপ্রাণ ১ সের ঘাসে আছে। দীর্ঘ ৪ বৎসর নানা পরীক্ষার পর জর্জ ওকোলার, ডব্লিউ আর গ্রেহাম এবং সি, এফ্ স্নাবেল সম্প্রতি তৃণ হইতে খাদ্যোপযোগী এক প্রকার সাদা গুঁড়া প্রস্তুত করিয়াছেন; উহার গন্ধ মিষ্ট, খাইতে বিস্বাদ নয়। উক্ত বৈজ্ঞানিকগণ সারা শীতকাল ঐ ঘাসের পাউডার খাইয়া কাটাইয়াছেন, ফলে, তাহাদের শারীরিক অবস্থা ভাল বই মন্দ হয় নাই।"

আনন্দবাজার পত্রিকা শ্রাবণ ১৩৪৭ সন।

"সম্প্রতি মার্কিণ দেশে ঘাসের পাউড়ার ও ট্যাব্লেট্ (চাক্তি) প্রস্তুত করিবার জন্য কতকগুলি কারখানা নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার

দাম অতি সুলভ। যদি ইহা সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়, আধুনিক আহারের ব্যয় শতকরা ৭৫ ভাগ কমিবে, সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষের সময় আহারাভাব অনেকাংশে মিটিতে পারে বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

উক্ত দেশের আর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি (জে, আর, বি, ব্যান্‌সন্‌) ঘাসের ট্যাবলেট প্রধান আহারীয় রূপে ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহার উপস্থিত বয়স ৬৭ বৎসর। তিনি প্রতিদিন প্রত্যূষে দীর্ঘপথ দৌড়ান এবং দিনভোর সবল ও কার্য্যক্ষম থাকেন। তাঁহার সাপ্তাহিক আহারের ব্যয় মাত্র দুই শিলিং।

অমৃতবাজার পত্রিকা—২১শে জুলাই ১৯৪০।

অন্য একটী বিলাতী সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে জর্ম্মনীতে গৃহপালিত পশুদের কাঠের গুঁড়া হইতে প্রস্তুত এক প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে দেওয়া হয়। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ফরাসী সৈনিকগণকে উক্ত কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ান হইয়াছিল।

নিম্নোক্ত অপর একটী বিস্ময়কর বিবরণ শ্রীঅমৃতলাল সেন প্রণীত 'বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী' পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন, তিনি হিমালয় পরিভ্রমণ-কালে একদিন ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন হইয়া একটী বৃক্ষমূলে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। একটী উলঙ্গ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে কতকগুলি ছোট ছোট বীজ খাওয়াইয়া সুস্থ করেন, আর কতকগুলি, তাঁহার হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন, "বাচ্চা এহি দানা খালেও ভুখ পিয়াস কভি নেহি হোগা।" তিনি সেই পাহাড়ে যতদিন ছিলেন কেবল মাত্র দুই একটী ঐ বীজ প্রয়োজন মত খাইতেন।

অন্য এক সময়ে গোস্বামী প্রভু কতকগুলি সাধুর সহিত হিমালয়ের বহুস্থান অতিক্রম করিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সন্ধ্যার সময় একজন সাধুর আলয়ে উপনীত হন। সাধুটি অতিথি সেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে কচুপাতার ন্যায় কতকগুলি পাতা আনিয়া রুটির মত করিয়া সবগুলি সেঁকিয়া তাঁহাদিগকে আহার করিতে দিলেন। নবাগত ক্ষুধার্ত্ত অতিথিগণ তাহা ভোজন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। ইহা একটু লবণ দিয়া খাইলে আমাদের রুটির মত আস্বাদ পাওয়া যায়, ভোজনে কোন রকম অসুবিধা হয় না।

পরদিন ঐ হিমালয়বাসী সাধুটি জঙ্গল হইতে কয়েকটি বেলের ন্যায় ফল সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং উহা ধুনিতে দগ্ধ করিয়া ভিতরের শাঁস বাহির করিয়া অতিথি সেবা করিলেন। এই ফলের আস্বাদ, চিঁড়া দুধে ভিজাইয়া চিনি মিশাইলে যেমন স্বাদ পাওয়া যায় প্রায় তদ্রূপ। অপার করুণাময় বিধাতা নির্জ্জন কাননবাসী সাধুদের আহারের জন্য সুধু ফলমূল পাতা নয় দুগ্ধেরও সংস্থান রাখিয়াছেন। হিমালয় প্রদেশে চামরী গাভী বিচরণ করে। তাহাদের বৎসেরা যখন একটী বাঁট হইতে দুগ্ধ পান করে তখন অন্য বাঁট হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া কখন কখন নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত মধ্যে পতিত হয় এবং তুষারপাতে জমিয়া যায়। এই জমাট দুধ গরম জলে ফেলিলেই অতি উৎকৃষ্ট দুধে পরিণত হয়। সাধুগণ এই সকল জমাট দুধ সংগ্রহ করিয়া প্রয়োজনমত ব্যবহার করে।

গোস্বামী প্রভুর ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে একটী কামধেনু ছিল। সকলে তাহাকে রাণী বলিয়া ডাকিত। গাভীটি কখনও গর্ভধারণ করে নাই অথচ প্রয়োজনমত দোহন করিলে প্রতিবার অল্প দুগ্ধ প্রদান করিত। এরূপ একটী গাভী বৈদ্যনাথধামের বালানন্দ স্বামীর আশ্রমে আছে।

হিমালয় অভিযানে কত বিদেশী প্রাণ হারাইতেছে কত লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছে, যদি আমাদের দেশের উৎসাহী যুবকগণ পূর্ব্বোক্ত অমৃতোপম গাছের পাতা, ফল ও বীচির সন্ধান করিতে পারে—যাহার জন্য বেশী ব্যয় হইবে না—তাহা হইলে তাহারা ধন্য হইবে।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণগুলি হইতে স্থির বিশ্বাস হইবে যে অতি সামান্য বিশুদ্ধ খাদ্য বিধিমত সেবনে জীবন ধারণ করা সম্ভবপর। কথায় কথায় লোকে দুঃখ করে যে তাহারা যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার পায় না। কিন্তু সামান্য অতি সুলভ ও অতি পুষ্টিকর খাদ্য যথা ছোলা প্রভৃতির কথা মনে আনে না।

অবশ্য পূর্ব্বোক্ত নব-উদ্ভাবিত বা আবিষ্কৃত কৃত্রিম আহার্য্যগুলি কালক্রমে সুলভ হইলেও উহা অবস্থা বিশেষে (যথা দুর্ভিক্ষের সময়) মানুষের প্রচলিত প্রধান খাদ্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের অভ্যস্তখাদ্য বর্জ্জন কখনই সম্ভবপর নয়।

সেইজন্য এদেশে ও বিদেশে, প্রচলিত আহার্য্য দ্রব্যের গুণাগুণ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর উহাদের হিতকর বা অহিতকর প্রভাবাদি নানা পরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা স্থিরীকৃত করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং পাত্রভেদে কাহার কতটুকু পরিমাণ কি প্রকার খাদ্য, কি ভাবে প্রস্তুত ও কতবার দিনে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে নানা উপদেশ এবং পুষ্টি বিজ্ঞান সম্মত বহু নূতন বিধি বিজ্ঞাপিত হইতেছে।

অবশ্য অবস্থা ভেদে কোন বাঁধা ধরা হিসাব বা নিয়ম সকলের পক্ষে উপযোগী হওয়া সম্ভবপর নয়। এখনও আহার সম্বন্ধীয় অনেক সমস্যার নির্ভুল বা স্থির মীমাংসা হয় নাই সুতরাং পুষ্টি বিজ্ঞানের

গহন বনে পথহারা হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। তবে এই বিষয়ের জ্ঞান বা চর্চ্চার কোন উপকারিতা বা সার্থকতা নাই এরূপ বলা উদ্দেশ্য নয়।

যাহাতে ঐ বিষয়ে চিত্ত বিভ্রান্ত না হয় তাহা লক্ষ্য রাখিয়া এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অর্থ সঙ্গতি অনুসারে যতদূর সম্ভব, উক্ত বিজ্ঞাপিত নিয়ম বা বিধিগুলি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া পালন করিলে উপকার বই অপকার হইবে না। সেই জন্য যাহাতে ঐ সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের প্রকৃত জ্ঞান জন্মে, এই পুস্তকে বিভিন্ন তথ্য, মত ও পরীক্ষালব্ধ ফল এবং স্বাস্থ্যরথীগণের আদেশ উপদেশগুলি যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

আহার বিজ্ঞান।

আহারের বিভিন্ন জাতীয় উপাদান।

পুষ্টিতত্ত্ববিদ্‌গণ আহারের নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন :—

(১) শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয়। (Carbohydrates.)

(২) আমিষ জাতীয়। (Proteid.)

(৩) তৈল বা স্নেহ জাতীয়। (Fat)

(৪) লবণ জাতীয়। (Mineral salts.)

(৫) জল।

অধিকাংশ খাদ্যে উপরোক্ত পাঁচটি উপাদান অল্প বিস্তর আছে। কোন কোন খাদ্যে একটী একেবারে নাই যথা—মাছ ও মাংসে শ্বেতসার জাতীয় উপাদান নাই। যে খাদ্যে যে উপাদানের আধিক্য আছে তাহাকে সেই জাতীয় খাদ্য নামে অভিহিত করা হয়। উহাদের প্রত্যেকের প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা এবং পরিমাণ পরে বিবৃত হইয়াছে। পরিমাণের অঙ্কগুলি কুন্নুর খাদ্য গবেষণাগারের পরীক্ষালব্ধ ফল (স্বাস্থ্য বুলেটিন ২৩ নং)। অন্য কতিপয় ভারতীয় পরীক্ষকের অঙ্কের সহিত উহার কিছু গরমিল আছে কিন্তু কুন্নুরের পরীক্ষালব্ধ ফল প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

মানবদেহ ইমারতের সহিত তুলিত হইতে পারে। ইমারতের বিভিন্ন উপাদানগুলি যথা—ইট, চুণ, বালি, সুরকি, সিমেণ্ট, কাঠ, লোহা ইত্যাদির উপযুক্ত পরিমাণ, উহাদের উৎকর্ষ, মিলন ও সন্নিবেশ যত বিধিমত হয় তত উহার ভিত্তি ও গঠন দৃঢ় হয়। সেইরূপ মানব-দেহসৌধের ভিত্তি ও গঠন, উপযুক্ত বিভিন্ন জাতীয় আহারীয় উপাদান গুলির উপযুক্ত পরিমাণ বিধিমত সেবনে সুদৃঢ় হইতে পারে।

(১) শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় উপাদান।

ইহা অঙ্গার (Carbon), জলজান (Hydrogen) ও অম্লজান (Oxygen) এই তিনটি মৌলিক পদার্থের যৌগিক মিশ্রণে উৎপন্ন হয়। শ্বেতসার জাতীয় উপাদান দুই প্রকার যথা—চিনি, গুড় প্রভৃতি খাঁটি শর্করা এবং ভাত রুটি প্রভৃতি শ্বেতসারবহুল খাদ্য যাহা মুখের লালা ও পাকস্থলীর পাচক রসে গুণান্তরিত হইয়া মিষ্ট হয় অর্থাৎ শর্করাতে পরিণত হয়। উভয় শ্রেণীর কার্য্যকারিতা প্রায় একরূপ।

শ্বেতসার ও স্নেহজাতীয় উপাদান দেহে প্রধানতঃ উত্তাপ সৃজন এবং কর্ম্মশক্তি প্রদান করে। উহা দেহ-যন্ত্রের ক্রিয়া পরিচালন করিতে বিশেষ সহায়তা করে এবং আমিষ জাতীয় খাদ্যের অভাব কতকাংশে পূরণ করে অর্থাৎ মোট খাদ্যে প্রয়োজনের কিছু অল্প আমিষ বা প্রোটিন থাকিলেও উহার অভাব মোচন করিয়া দেহ সুস্থ রাখিতে সহায়তা করে।

শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাদ্যের অল্পতায় মাংসপেশী শিথিল ও ক্রিয়াহীন হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুর্ব্বল, অস্থি ভগ্নপ্রবণ হয় এবং দেহ শুখাইয়া যায়। আবার এই খাদ্য অধিক দিন অধিক মাত্রায় আহারে শরীরের মেদ ও ওজন অস্বাভাবিক ভাবে বর্দ্ধিত এবং হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হয়, উপরে

উঠিতে বা নীচে নামিতে অথবা সামান্য পরিশ্রমে হাঁপ ধরে কারণ দেহের বৃদ্ধির অনুপাতে হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধি হয় না, অধিক ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়। আবার যখন ঐ জাতীয় খাদ্য অধিক পরিপাক করিবার শক্তি থাকে না কিম্বা বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের মাত্রা কমান না হয় তখন দেহ হইতে দূষিত পদার্থ সম্যক নিষ্কাশিত হয় না—মূত্রের সহিত অধিক শর্করা নির্গত হয়; ফলে অজীর্ণ, বাত, বহুমূত্রাদি রোগ জন্মে।

যদিও শর্করা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তথাপি কেবলমাত্র চিনি, গুড় প্রভৃতি শর্করাবহুল খাদ্য সেবনে শ্বেতসারজাতীয় খাদ্যের অভাব পূর্ণ হইতে পারে না কারণ উক্ত দ্বিবিধ প্রকার খাদ্যের রাসায়নিক ক্রিয়ার পার্থক্য আছে। অধিক শর্করাবহুল খাদ্য সেবনে অম্ল উৎপন্ন হয়, যকৃতের ক্রিয়া বিশৃঙ্খল হয় এবং নানা রোগ জন্মে।

সেইরূপ কেবলমাত্র চাল গমাদি খাদ্য সেবনে উপযুক্ত পুষ্টিলাভ হয় না কারণ উহাতে আমিষ, লবণ, স্নেহ ও খাদ্যবীর্য্য (Vitamin) যথেষ্ঠ পরিমাণে থাকে না।

শ্বেতসার বিবিধ ব্যবহারিক শিল্প কার্য্যে ব্যবহৃত হয় যথা কাগজ, কাপড় ও সূতার কলপ ইত্যাদি। ভারতবর্ষ হইতে চাউল ফরাসীদেশে আমদানি হইয়া উহার রূপান্তরিত এক প্রকার প্রসাধন দ্রব্য (Powder de ritz) আমাদের দেশে আনীত হইতেছে। জর্ম্মন ও মার্কিণ দেশে আলুর শ্বেতসার হইতে মদ (alcohol), মোটরগাড়ীর পেট্রোল এবং উহার ও উড়োজাহাজের অবয়ব ইত্যাদি বহু পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে।

খাদ্যশস্য বীজে সর্ব্বাধিক পরিমাণ শ্বেতসার উপাদান থাকে। চালে শতকরা ৭৪ হইতে ৭৮, গমে ৭১, যবে ৬৯, ছোলাতে ৬০, মসুর

ডালে ৬০, মটর ও অড়হর ডালে ৫৭, সাগুতে ৮৮ এবং শুষ্ক পাণিফলে ৬৯।

শাকপাতার মধ্যে ছোলাশাকে ২৭। অন্যান্য শাকে ১০এর নীচে। তরকারীর মধ্যে তেঁতুলে সর্ব্বাধিক ৬৭, কাঁটাল বীচি ৩৮, মিষ্ট আলু ৩১, ওল ২৭, গোল আলু ২২, সয়াবিন ২১, বিলাতী কড়াইসুঁটি ও চিনাবাদাম ২০, রসুন ও মাখমসিম ১৭ ইত্যাদি।

অধিকাংশ রন্ধনমসলায় ঐ জাতীয় উপাদান ডাল ও শাক তরকারী অপেক্ষা অনেক অধিক। হিংয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ৬৮। কিন্তু মসলা অতি অল্প পরিমাণ সেবনযোগ্য বলিয়া উহা পরিমিত পরিমাণ সেবনে শ্বেতসার খাদ্যের অভাব মিটে না। ফলের মধ্যে কিসমিসে সর্ব্বাধিক ৭৭, খেজুর ৬৭, কলা ২৫, নোনা ২১, কাঁটাল ১৯, কৎবেল ১৯, বেদানা ও পিয়ারা ১৫, আম ও আনারস ১২, অন্যান্য ফল ১২ অপেক্ষা অল্প। কিসমিস, খেজুর, কলা বা আমে শ্বেতসার ও লবণজাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় উহাদের কোন একটী সেবনে দেহ সম্যক পুষ্ট হইতে পারে।

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যে উহা অল্প কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে আছে, মাছ ও মাংসে নাই। তৈল ও বাদাম জাতীয় খাদ্যের মধ্যে সরিষায় ২৪, তিল ২৫, বাদাম ১১, পেস্তা ১৬, আখরোট ১১। কিন্তু এইগুলি বেশী পরিমাণে পরিপাকযোগ্য নয়।

(২) আমিষ বা ছানা জাতীয় উপাদান।

(Protein)

ইহা প্রধানতঃ অঙ্গার, জলজান, অম্লজান ও যবক্ষারজান দ্বারা গঠিত। বিশ্লেষণে কখনও কখনও উহাতে সামান্য গন্ধক ও ফস্‌ফরাস পাওয়া

গিয়াছে। উহার প্রধান কার্য্য—দেহযন্ত্রাদির ক্ষয়পূরণ, বিভিন্ন রস উৎপাদন, মাংসপেশীর গঠন, পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন, কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্মপ্রবৃত্তি দান এবং দেহে উত্তাপ ও উত্তেজনা সৃজন। ইহা দেহের নূতন কোষ ও তন্তু উৎপাদন এবং পুরাতন তন্তুর জীর্ণ সংস্কার করিয়া উহাদিগকে নবীভূত করে। গুণে ও কার্য্যকারিতায় আমিষজাতীয় উপাদান সর্ব্বপ্রধান। অবস্থা বিশেষে কেবল এই জাতীয় আহার সেবনে দেহ রক্ষিত হইতে পারে। সাধারণতঃ, প্রাণীজ খাদ্য যথা দুধ, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদির আমিষ উপাদান কচি শাক পাতা ব্যতীত অন্য উদ্ভিজ্জ খাদ্যের ঐ উপাদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু দেহধারণার্থে উক্ত উভয় প্রকার খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা আছে, একথা অনেক পুষ্টিতত্ত্ববিদ স্বীকার করিয়াছেন।

খাদ্যের আমিষ উপাদান জীর্ণ করিতে খাদ্যপ্রাণ এ, বি ও সির সহায়তা বিশেষ আবশ্যক। এইজন্য অধিক প্রাণীজ খাদ্য গ্রহণ করিলে সমধিক পরিমাণ উক্ত ভিটামিনবহুল শাক আনাজ ভক্ষণ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

আমিষজাতীয় উপাদান সয়াবিনে সর্ব্বাধিক, শতকরা ৪৩। ইহার পর ডাল ২২ হইতে ২৮, খেঁসারি, মসুর ও ভাজা মুগের ডালে সর্ব্বাধিক। মাছ ২০—২২ (মাগুর, রুই, ও মিরগেলে সর্ব্বাধিক), মাংস ১৯—২৩ (মুরগী ও ছাগ মাংসে সর্ব্বাধিক)।

বাদাম ও তৈলশস্যের মধ্যে চিনাবাদামে সর্ব্বাধিক ২৭, বাদাম ২১ পেস্তা ২০, আখরোট ১৬, সরিষা ২২, তিল ১৮। মসলায় অল্প বিস্তর আছে। মেথিতে সর্ব্বাধিক ২৬, জীরা ১৯ ও শুষ্ক লঙ্কা ১৬। খাদ্যশস্যবীজের মধ্যে চাল ৮, গম ও যব ১২ (সুজি ১৫)। শাক পাতার মধ্যে কচি নিম পাতা ১২, ছোলা শাক ৮, লাল শাক ৫, পালম ২। তরকারীর

মধ্যে মাখমসিম ৮, কাঁটালবীচি ও কড়াইসুঁটি ৭। ফলের মধ্যে কৎবেল ৭, পটোল ৫, বরবটি ৪, তেঁতুল ও খেজুর ৩, অন্য ফলে অল্প।

দুধে অল্প কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে আছে। মহিষ দুগ্ধ ৪, গো দুগ্ধ ৩ হইতে ৩·৩৭, দধি ৩, নারী দুগ্ধ ১·০, ছাগী ৩·৭, গর্দ্দভী ১·৭৯। ছানা ২৪, উৎকৃষ্ট সন্দেশ ১৮, খোয়া ক্ষীর ১৫। চিনি, চর্ব্বি ও উদ্ভিজ্জ তেলে উহা নাই বলিলে চলে।

(৩) স্নেহ বা তৈল জাতীয় উপাদান।
(Fat)

ইহা ও শ্বেতসার জাতীয় উপাদান দেহে তাপ ও মেদ সৃজন করে এবং আমিষ জাতীয় উপাদানের অভাব কতকাংশে মোচন করে। এক ভাগ স্নেহজাতীয় উপাদান ২½ ভাগ শ্বেতসারজাতীয় উপাদানের সহিত তুলিত হয়।

স্নেহজাতীয় উপাদানের অল্পতায় সম্যক্ পুষ্টিসাধন হয় না, যান্ত্রিক ক্রিয়া বন্ধ হয়, দেহ রুগ্ন, শীর্ণ ও দুর্ব্বল হয়; বিশেষতঃ মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। সেইজন্য কেহ কেহ ইহাকে মস্তিষ্কখাদ্য বলেন। ইহা সেবনে কিঞ্চিৎ তাপ, মেদ, স্নায়ু বা কর্ম্মশক্তি বর্দ্ধিত হয়। অধিক সেবনে প্রয়োজনের অধিক মেদ বৃদ্ধি হয় এবং শরীর হইতে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়।

ইহা শ্বেতসারজাতীয় খাদ্যের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ সেবনে অধিক পাচক ও অন্যান্য রস বাহির হয়। এইজন্য যে সব খাদ্যে স্নেহজাতীয় উপাদান অল্প মাত্রায় থাকে যথা—ভাত, রুটি, মুড়ী ইত্যাদি, ইহাদের সহিত ঘৃত বা তেল সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় বা হওয়া উচিত। ঘৃত হীন অন্ন কদন্ন বলিয়া উক্ত হয়।

"Fat burns in carbohydrate flame."

চর্ব্বি শ্বেতসার অনলে দগ্ধ হয়।

আমাদের দেশের প্রচলিত খাদ্যশস্য বীজে স্নেহ উপাদান অল্প পরিমাণে থাকে। গমে ১·৫, যবে ১·৩, চালে শতকরা একের অনেক নিম্নে আছে। ডালে কিছু বেশী পরিমাণ থাকে—ছোলায় সর্ব্বাধিক ৫। সয়াবিন ব্যতীত অন্য সকল প্রকার শাকসব্জিতে অতি অল্প, শতকরা একের নীচে—কেবল কচি নিমপাতায় ৩, সয়াবিনে ২০। মসলার মধ্যে জায়ফল ৩৬, জৈত্রী ২৪, জোয়ান ১৮, ধনে ১৬, জীরা ১৫, লবঙ্গ ৯, মরিচ ৭, মৈথি, শুষ্ক লঙ্কা ও হলুদ ৬। কিন্তু এইগুলি অধিক পরিমাণে গ্রহণযোগ্য নয় সেইজন্য উহা খাদ্যের স্নেহজাতীয় উপাদানের অভাব মিটাইতে পারে না।

বাদাম ও তৈলজাতীয় খাদ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকে কিন্তু উপরোক্ত কারণে উহা অধিক পরিমাণে গৃহীত হইতে পারে না। আখরোট ৬৫, বাদাম ৫৯, পেস্তা ৫৪, তিল ৪৩, চিনেবাদাম ও সরিষা ৪০, নারিকেল শস্য ৪২;

অন্য ফলে খুব কম। এক প্রকার বিলাতী নাসপাতিতে (Pears Avacado or Butter fruit) ২৩, ইহা বিস্ময়কর!

প্রাণীজ আমিষ খাদ্যের মধ্যে ডিমে ও মাংসে ১৩, চর্ব্বিবহুল মেষ-মাংসে ৩৩। মাছের ভিতর রুই ৯·৫৬, ইলিস ৯·২৩, পারসে ৬·৩২, তপসে ও ভেটকি ৪।

দুগ্ধজাত খাদ্যের মধ্যে মাখম ৯০·৫, ঘোল (মাটা) ২৭·৫, ছানা ২৫, ক্ষীর ৩১, উৎকৃষ্ট সন্দেশ ১৯·৭৫, গরুর দুধ ৩·৬ মতান্তরে গড়ে ৪·২৮, ছাগলের দুধ ৩·৭ হইতে ৪·২, ভেড়ার দুধ ৫·৩০, মহিষ দুধ ৮·২।

(৪) খনিজ লবণ-ঘটিত উপাদান।

(Mineral Salts)

শরীর পোষণ ও রক্ষণার্থে বিবিধ খনিজ লবণ উপাদানের স্থান অতি উচ্চে। রাসায়নিক পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে সমগ্র মানব-দেহে গড়ে ৭ পাউণ্ড লবণ ঘটিত পদার্থ আছে। উক্ত ওজনের পঞ্চ-ষষ্ঠাংশ ভাগ একমাত্র অস্থিতে আছে। লবণ ঘটিত পদার্থগুলির কাজ, দেহে নানাবিধ তন্তু গঠন, তাহাদিগকে সুস্থ রাখা, বিভিন্ন পাচক রস উদ্রিক্ত করিয়া খাদ্য পরিপাক করিতে সহায়তা করা, রক্তের অম্লত্ব নিবারণ করিয়া উহা পরিষ্কৃত করা এবং উহার কিঞ্চিৎ ক্ষারত্ব সাধন করা।

সাধারণতঃ, অস্থির পরিপোষণের জন্য লাইম ফস্‌ফেট্ (চুণ ও ফসফরাস), মাংসপেশী গঠনের জন্য ম্যাগনেসিয়া ও পটাস, উপাস্থি গঠনের জন্য সোডা, মস্তিষ্কের জন্য ফসফরাস, কেশ, দন্ত, রক্ত ও নখের জন্য সিলিকা এবং রক্তের লোহিত কণিকা, চক্ষুর তারার এবং কেশের কাল উপাদান সৃজনের জন্য লৌহ প্রয়োজন হয়।

প্রসিদ্ধ পুষ্টিতত্ত্ববিদ সার ম্যাকক্যারিসন লিখিয়াছেন—

লবণঘটিত উপাদানগুলি পেশী, হস্তপদাদি প্রত্যঙ্গ ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলির ক্রিয়ায় সহায়তা করে। হৃৎপিণ্ডের প্রতি স্পন্দন, অঙ্গুলী প্রান্ত পর্য্যন্ত রক্ত সঞ্চালন এবং ফুসফুসে প্রতিপ্রেরণ ক্রিয়া উহার দ্বারা অনেকাংশে সংঘটিত হয় এবং মূত্রস্থলীর ক্রিয়াশীলতা, দেহ হইতে দূষিত পদার্থের নিষ্কাশন ক্রিয়া ও বিভিন্ন পাচকরসের উদ্রেক সম্যকরূপে সম্পন্ন হয়।

আমাদের প্রচলিত খাদ্য প্রস্তুত বা রন্ধন করিবার দোষে অনেক লবণঘটিত পদার্থের অপচয় হয় তাহা পূর্ব্বোক্ত কারণে স্বাস্থ্য-

দুর্দ্দশার অন্যতম মূল কারণ। ইহা অন্যত্র বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

লবণজাতীয় পদার্থের অল্পতায় বা অভাবে পরিপাক বিশৃঙ্খলতা, অস্থির কোমলতা, রক্তের অল্পতা, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুশক্তির পোষণে ব্যাঘাত ঘটে। লেস্‌লি ডেস্‌মণ্ড সাহেব ইংরাজী স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, যদি রক্তে লৌহ ও গন্ধকঘটিত লবণের অল্পতা হয়, অকালে কেশ পাকে। আর একজন স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ লিখিয়াছেন যে উপযুক্ত লবণঘটিত পদার্থের অভাবে বিশেষতঃ চুণ (Calcium), পটাস ও সোডা অভাবে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

কতকগুলি প্রচলিত সমপরিমাণ আহারীয় দ্রব্যের ছাই বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন লবণঘটিত পদার্থ শতকরা কত পরিমাণ পাওয়া গিয়াছে যাহা এবার্ড সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা পরপৃষ্ঠা লিখিত তালিকায় দেওয়া হইল। ইহাতে আইওডাইন যাহা কোন কোন খাদ্যে অতি অল্প পরিমাণে আছে তাহার পরীক্ষালব্ধ ফল দেওয়া হয় নাই। স্বাস্থ্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন ইহা চর্ব্বি ও চুণঘটিত লবণ শরীরে গৃহীত হইতে সহায়তা করে। এই লবণের অভাবে বহু রোগ জন্মে। ইহা লবণাক্ত জলের মৎস্য, বিশেষতঃ চিংড়ী, ইলিস, পারসে, ভেটকি, ট্যাংরা, সমুদ্রকূলবর্ত্তী বৃক্ষের ফল, তরকারীর মধ্যে কড়াইশুঁটি, শাক এবং কোন কোন ফলে আছে।

আমরা যে লবণ, রন্ধনের জন্য বা স্বতন্ত্রভাবে কোন কোন আহারীয় দ্রব্যের সহিত ব্যবহার করি, তাহা একটী যৌগিক পদার্থ, ইংরাজীতে উহাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড বলে। এই লবণের বিষয় রসবিজ্ঞান অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

	দুধ	মাংস	ময়দা	আলু	কড়াইশুঁটি
মোট ছাই	৫০·২	৪০·৮৭	৪·৭	৩৭·৮৯	২৬·৯২
পটাস	১২.০৪	১৬·৭৬	১·৬৯	২২·৭৬	১১·৪১
সোডা	৪·৭৩	১·৪৭	০·০৪	০·৯৯	০·২৬
ক্যালসিয়াম	১০·৬৬	১·১৫	০·১৩	০·৯৭	১·৩৬
ম্যাগনেসিয়া	১·৪৯	১·৩০	০·৩৯	১·৭৭	২·১৭
লৌহ	০·২৬	০·২৮	—	০·৪৫	০·১৬
ফসফরাস	১৩·৮৮	১৭·২৭	২·৪৫	১·৫৩	৯·৯৫
গন্ধক	০·১৫	০·৬৩	—	২·৪৫	০·৯৫
বালুকা	০·০২	০·৪৫	—	০·৮০	০·২৪
ক্লোরিণ	৬·৯৭	১·৫৬	—	১·১৭	০·৪২

	ক্যারট	পালম শাক	লেটুস	আপেল
মোট ছাই	৫৫·২৭	১৬৬·৮৯	১৮০·৮২	১৪·৬৮
পটাস	২০·২০	২৭·২৯	৬৭·৮৫	৫·৪১
সোডা	১১·৫৮	৫৮·১৬	১৩·৬০	৩·৭৬
ক্যালসিয়াম	৬·২০	১৯·৫৮	২৬·৪৭	০·৫৯
ম্যাগনেসিয়া	২·৪০	১০·৫১	১১·৭৬	১·২৬
লৌহ	০·৫৫	৫·৫২	৯·৩৯	০·২০
ফসফরাস	৭·০০	১৬·৮৯	১৬·৫৭	১·৯৬
গন্ধক	৩·৫৩	১১·৩২	৬ ৭৮	০·৮৮
বালুকা	১·৩০	৭·৪০	১৪·৬৮	০·৬২
ক্লোরিণ	২·৫১	১০·২২	১৩·৭২	—

কতিপয় বৈজ্ঞানিক উদ্ভিজ্জ ও মানবদেহের ভস্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন উহাতে পূর্ব্বোক্ত লবণগুলি ব্যতীত তামা, আইয়োডাইন, ফ্লুরিণ, ব্রোমিন, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যালিউমিনাম, লিথিয়াম, দস্তা, নিকেল, আর্সেনিক প্রভৃতি আছে—ইহাদের কোন কোনটী অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে বা লেশমাত্র আছে। মানবদেহে উদ্ভিজ্জখাদ্যের ভিতর দিয়া এতগুলি পদার্থের সমাবেশ বস্তুতঃ বিস্ময়কর। সবগুলি হয়তঃ সবার শরীরে নাই। খুব সম্ভবতঃ মৃত্তিকায় আর্সেনিকাদি পদার্থ ছিল বলিয়া তজ্জাত উদ্ভিজ্জ, তদ্ভোজী প্রাণী এবং উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীভোজী মানব দেহে ঐগুলি অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় প্রবিষ্ট হইয়া পরীক্ষায় প্রকাশিত হইয়াছে। যতদিন না উহাদের ক্রিয়াসিদ্ধ ফল বা উপকারিতা গবেষণায় স্থিরীকৃত হইতেছে ততদিন উহাদের বিষয়ে ভাবনা না করিলে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। কারণ বিষ অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় অনেক স্থলে অমৃতোপম ফল দান করে।

পুষ্টিবিজ্ঞান মতে প্রথমোক্ত সকল উপাদান গুলিই দেহ রক্ষার্থে প্রয়োজন কিন্তু উহাদের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া উপযুক্ত আহার নির্ব্বাচন করা কার্য্যতঃ অসম্ভব। সাধারণতঃ দেহে কোন একটী লবণজাতীয় উপাদানের খাঁকতি হইলে স্বভাবের প্রেরণায় উহা, যে উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ খাদ্যে আছে, তাহা ভোজন করিবার প্রবল স্পৃহা হয়। এইজন্য পক্ষীগণ ভূমিসংলগ্ন বিবিধ লবণঘটিত জল পান করে —পারাবত ঘরের বা পথের চুণ খুঁটিয়া খায়। গর্ভিণী রমণীর দগ্ধ মৃত্তিকা ও লবণাক্ত খাদ্য খাইবার প্রবল ইচ্ছা হয়।

সার ম্যাকক্যারিসন বলেন ঐ কারণে কোন কোন দেশের নরনারীগণ খাদ্যোপযোগী মৃত্তিকা বা লবণাক্ত মৃত্তিকা আহার করে এবং তাহাদের গৃহপালিত জন্তুদের উহা খাইতে দেয়। কাশ্মীর দেশে

তিনটী প্রসিদ্ধ অস্থিরোগআরোগ্যকর স্থানীয় ঔষধ বহুদিন যাবত প্রচলিত আছে। উহার একটার প্রধান উপাদান বারামূলা নগরের মৃত্তিকা। রাসায়নিক পরীক্ষায় উহাতে চূণ ও ফসফরাস মিশ্রিত লবণ (Calcium phosphate) শতকরা ১৬, লৌহ ও অক্সিজেন মিশ্রিত লবণ ১২ এবং অ্যালিউমিনাম ও বালুকা মিশ্রিত পদার্থ ৪১ পাওয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত কারণে আমাদের, মধ্যে মধ্যে, কোন একটী আহারীয় দ্রব্য বিশেষতঃ তরকারী খাইবার প্রবল ইচ্ছা হয় কিন্তু উহা দ্বারা অভাব পূরণ করা অসাধারণ ব্যবস্থা। যাহাতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনমত বিভিন্ন লবণজাতীয় খাদ্য নির্ব্বাচনে সম্যক সহায়তা হইতে পারে সেইজন্য উহাদের উপকারিতা বা কার্য্যকারিতার বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

ক্যালসিয়াম।

পরীক্ষায় প্রকাশিত হইয়াছে যে দুধ, কিসমিস, চিংড়ীমাছ, চুনোমাছ, অতি ক্ষুদ্র রুই ও মিরগেল মাছ, পুঁই, নটে, ডেঙ্গো শাক এবং অন্যান্য আহার্য্য উদ্ভিজ্জের কচি পাতায় ও নরম ডাঁটায় অধিক মাত্রায় সহজপাচ্য ক্যালসিয়াম আছে। ইহা সিম, ডাল ও ডিমে অধিক মাত্রায় আছে কিন্তু ঐগুলি তত সহজপাচ্য নয়। অন্য আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে রসুনে সর্ব্বাধিক, শতকরা ৩·০৩, তিলে ১·৪৫, জোয়ানে ১·৪২, কাঁকড়ায় ১·৩৭, জীরাতে ১·০৮। অপর খাদ্যে শেষোক্ত সংখ্যার অনেক নিম্নে আছে। মাছ মাংস বা তরকারী সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দিলে উহাতে উক্ত লবণের অপচয় ঘটে কিন্তু জল না ফেলিয়া ঝোল করিলে উহা রক্ষিত হয়। এইজন্য মার্কিণ-

দেশের একটী প্রদেশে যাহাতে লবণের সহিত কিছু চুণ মিশান হয়, তাহা আইনের দ্বারা বাধ্য করা হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে ডাঃ সিসিল ওয়েব জনশন একটী নূতন তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সহরবাসীগণ সাধারণতঃ অল্প রৌদ্রসেবন করিতে পায় বলিয়া, তাহাদের দেহে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ পল্লীবাসীদের অপেক্ষা অল্প থাকে এবং ঐরূপ অবস্থায় বংশবংশানুক্রমে তাহারা থাকিতে অভ্যস্ত হয় বলিয়া অন্য দোষের মধ্যে তাহাদের উচ্চতা ক্রমে কমিয়া আসে কারণ চূণ অস্থি গঠনের একটী অতি প্রয়োজনীয় উপাদান।

দেহে চূণ শতকরা দুই ভাগ আছে। ফসফরাস, লোহা ও চুণ এই তিনটী দেহের অন্যতম প্রধান কার্য্যকরী এবং উপকারী লবণ-জাতীয় উপাদান। চূণ ঘটিত আহার্য্যের প্রধান কাজ অস্থি ও দন্ত নির্ম্মাণ ও দৃঢ়ীকরণ, মাংসপেশী ও স্নায়বিক ক্রিয়ার পরিচালন এবং দেহে অপর লবণের এবং স্নেহ উপাদানের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ।

এই লবণের বিশেষত্ব—যখন খাদ্যে উহার অল্পতা ঘটে, তখন উহা অস্থি হইতে আবশ্যক মত গৃহীত হয়। ইহার অধিক অভাবে রিকেট (বালাস্থি গ্রহ), বিকলাঙ্গ প্রভৃতি দোষ বা রোগ উৎপন্ন হয়। ইহা হৃৎপিণ্ডের পেশী সঙ্কুচিত এবং তদ্দ্বারা উহার ক্রিয়া সম্যক পরিচালিত করে। এই যাদুকর পদার্থ বিনা হৃৎস্পন্দন ও হৃৎপিণ্ডের অন্য ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহার অভাবে উপরোক্ত দোষগুলি ব্যতীত শিশুদের দাঁত শীঘ্র বাহির হয় না এবং দেহ সর্দ্দিকাসিপ্রবণ হয়। দেহে রক্তপাত হইলে রক্তে চূণ থাকে বলিয়া উহা জমাট বাঁধে এবং সেইজন্য অধিক রক্তস্রাব সাধারণতঃ নিবারিত হয়।

আমাদের প্রচলিত খাদ্যের চূণের অভাব পান সেবনে কতকাংশে মিটে।

ফস্‌ফরাস।

ইহা পুষ্টি বিধান, অস্থি সংগঠন, রক্তের ক্ষারত্ব ও প্রস্রাবের অম্লত্ব রক্ষা এবং শর্করা ও স্নেহজাতীয় খাদ্যের পরিপোষণে সহায়তা করে। ইহার অভাবে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুশক্তি ক্ষয় এবং অস্থিপোষণের ব্যাঘাত হয়।

পুষ্টিতত্ত্ববিদ্ সার্ ম্যাকক্যারিসন লিখিয়াছেন, ফসফরাস প্রতি জীব কোষে আছে। উহা বিহনে জীবকোষের বহুলীকরণ বা সংখ্যাবৃদ্ধি (multiplication) এবং শরীরের সম্যক পরিপোষণ ক্রিয়া সংঘটিত হয় না। রক্তেরও উহা একটী অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান। সেইজন্য *ক্যালসিয়াম* বা চুণ ঘটিত এবং ফসফরাসবহুল আহার্য্য উপযুক্ত পরিমাণে দেহে গৃহীত হওয়া আবশ্যক। একের আধিক্যে বা অপরের অল্পতায় অস্থি ও দন্তের পরিপোষণের ব্যাঘাত হয়। সমগ্র মানবদেহে গড়ে প্রায় ২ পাউণ্ড ফসফরাস আছে, ইহা স্বতন্ত্রভাবে সেবনে ২০০ জনের মৃত্যু ঘটিতে পারে। বিষ অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় উপকার করে। এইজন্য জীবদেহে যাহাতে বিষক্রিয়া ঘটিতে না পারে প্রাকৃতিক বিধানে আহার্য উদ্ভিজ্জে উহা অতি অল্প মাত্রায় থাকে। উহা প্রধানতঃ ডাল আখরোট, পেস্তা, বাদাম, তিল, চীনাবাদাম, নারিকেল শস্য, তিল, মসিনা ধনে, ক্ষীর, ছানা, জিরা ও মাছে অন্য খাদ্য অপেক্ষা কিছু বেশী মাত্রায় আছে। পাঁউরুটির খামি বা যবের সিটিতে সর্ব্বাধিক ১'৪১, সরি ০'৭০, মাছ ০'৪১।

লৌহ।

ইহা রক্তের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। খাদ্যদ্রব্য ভস্মীকরণ (Oxidization) ক্রিয়ায় ইহা বিশেষ সহায়তা করে। ইহার অভাবে বা অল্পতায় দেহে রক্তাল্পতা ঘটে বা বর্ণ ফ্যাকাশে হয় এবং রক্তের অম্লজান গ্রহণ করিবার শক্তি কমে তজ্জন্য দেহ দুং

হয়। লৌহ ঘটিত খাদ্য সেবনে রক্তের লোহিত কণিকার বৃদ্ধি হয়। ইহা পুরুষের অপেক্ষা রমণীগণের এবং বর্দ্ধনশীল শিশুদের অধিক প্রয়োজন। যদি খাদ্যে ইহা কম হয় রক্তের বিকৃতি জন্মে এবং জীবন প্রদীপ উত্তমরূপে জ্বলে না।

ইহা প্রধানতঃ বাজরা, চাল, শুষ্ক সিঙ্গাড়া, গম, চিঁড়া, অড়হর ডাল, ছোলা, কচি ছোলা শাক, কচি পালং, পুদিনা, নটে, ডেঙ্গো ও ধনে শাক, বিলাতী ক্রেস বা হালিম শাক, লাল শাক, কচি নিমপাতা, সিম, তিল, পিঁয়াজকলি, হিং, সরিষা, মরিচ, ধনে, জোয়ান, মেথি, হলুদ, পোস্ত, ঘড়ার খেজুর, কাঁচা আঁব, কিসমিস, তেঁতুল, করমচা, কাঁকড়া, গুড় এবং পাঁউরুটির খামিতে (Dried yeast) অন্য খাদ্যাপেক্ষা অধিক আছে।

লৌহ, ফসফরাস ও চুণ প্রায় সকল প্রকার খাদ্যে কিছু না কিছু আছে। অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর লবণজাতীয় উপাদান যথা গন্ধক, সোডা, পটাশ, ম্যাগনেসিয়া ইত্যাদি স্বতন্ত্রভাবে বিবিধ রোগ নিবারণার্থ ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উহা কোন খাদ্যে কত পরিমাণে আছে, উহার দ্বারা কি উপকার বা দেহের কোন কার্য্য সম্পাদিত হয়, অভাবে কি দোষ বা রোগ হয় তাহা জানা নাই। তবে উহাদের প্রত্যেকটী কোন খাদ্যে আছে যাহা পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল তাহা জানা থাকিলে স্বতন্ত্র লবণঘটিত ঔষধ সেবন প্রয়োজন হইবে না অর্থাৎ যে রোগে উপরোক্ত যে লবণ স্বতন্ত্রভাবে ব্যবস্থিত হয় সে রোগে সেই লবণঘটিত খাদ্য সেবনে অধিক উপকার সম্ভবপর। যথা চর্ম্মরোগে গন্ধক ব্যবস্থিত হয়, উহার পরিবর্ত্তে গন্ধকবহুল খাদ্য সেবন বাঞ্ছনীয়।

অনেক পুষ্টিবিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতে কোন প্রকার লবণঘটিত পদার্থ কৃত্রিমভাবে স্বতন্ত্র সেবন সাধারণতঃ অনিষ্টকর। কারণ উহা দেহে

সম্যকভাবে শোষিত হয় না, বিভিন্ন যন্ত্রে কিছু না কিছু সঞ্চিত হইয়া রোগের সৃষ্টি করে।

এই জন্য উদ্ভিজ্জাদি খাদ্যদ্রব্যের মধ্য দিয়া একাধিক লবণঘটিত পদার্থ যৌগিকভাবে সেবনই সকল দিকে সুবিধাজনক। উহা দেহে সহজে শোষিত হয় এবং কোন অনিষ্ট ঘটে না।

গন্ধক।

মূলা, বাঁধাকপি, পিঁয়াজ, ডিম, টাটকা শুঁটি, কিসমিস ও পালং শাক।

ম্যাগনেসিয়া।

শুঁটিধারী উদ্ভিজ্জ, মূলা, পিঁয়াজ, ফুলকপি, লেটুস, আঙ্গুর, কিসমিস ও আলু। ইহা অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে মানব ও উদ্ভিদ দেহে থাকে।

পটাসিয়াম।

লেটুস, সিম, টাটকা শুঁটি, বিলাতীবেগুন ও আলুতে বেশী; মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ও গমে অল্প।

সোডিয়াম।

পালং শাক, মূলা, ক্যারট, লেটুস, আলু, বাঁধাকপি, ডুমুর, গম ও বিলাতী বেগুণে বেশী। বিস্কুটে সর্ব্বাধিক শতকরা ১০ ভাগ, ইহাতে সোডা স্বতন্ত্র ভাবে মিশান হয় সুতরাং উহা রোগের পথ্য হিসাবে ব্যবহার্য্য নচেৎ সুস্থ ব্যক্তি যদি উহা দীর্ঘকাল অধিক পরিমাণে আহার করে তাহা হইলে তাহার হজম শক্তি দুর্ব্বল হইতে পারে।

দস্তা।

পালং শাক, পিঁয়াজ, লেবুর রস, মূলা, ক্যারট, শস্যবীজ বিশেষতঃ শুঁটিধারী উদ্ভিজ্জবীজ ইত্যাদিতে অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে আছে।

ম্যাঙ্গানিজ।

পান, মানকচু ও পটোল। মানকচুতে সর্ব্বাধিক।

তাম্র।

তাল, পটোল, কাঁচকলা ও উচ্ছে, শেষোক্তুতে সব চেয়ে বেশী।

ক্লোরিণ।

ইহা রক্তের বিভিন্ন উপাদানগুলির সুস্থির সমাবেশ এবং পাকাশয়ের হাইড্রোক্লোরিণ নামক বিশিষ্ট পাচক রস সৃজনে সহায়তা করে।

কলা, সেলারি, খেজুর, পালং শাক, টোম্যাটো, আনারস, চিনাবাদাম এবং সবুজ পাতায় বা শাকে আছে।

আইয়োডিন।

ইহা চর্ব্বি ও চুণ ঘটিত লবণ (Calcium) শরীরে গৃহীত হইতে সহায়তা করে। যে যে খাদ্যে ইহা আছে এবং অভাবে কি দোষ জন্মে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আসেনিক, অ্যালিউমিনাম ও লিথিয়াম কোন কোন খাদ্যে আছে তাহা জানা যায় নাই।

সবগুলি লবণঘটিত উপাদান সব খাদ্যে নাই—অল্প বিস্তর বিভিন্ন খাদ্যে আছে। সুতরাং শরীররক্ষার্থে মিশ্রাহার প্রয়োজন। খাদ্যশস্যে মোট লবণজাতীয় উপাদান অতি অল্প, ভাতে শতকরা ০·৩, গম ও বার্লি, ১·৫। এইজন্য ঐ সকল খাদ্য বিশেষতঃ কলে ভাঙ্গা শস্যাদির সহিত অন্য লবণ-বহুল আহার্য্য সেবন নিত্য প্রয়োজন। অন্যান্য প্রচলিত খাদ্যের লবণ জাতীয় উপাদানের শতকরা মোট পরিমাণ নিম্নে উক্ত হইল।

ডালে গড়ে প্রায় ৩, অড়হর ডালে সর্ব্বাধিক ৩·৬। শাকের মধ্যে ছোলা শাকে সব চেয়ে বেশী ৩·৫, নিম পাতা ও লাল শাক ৩·৪,

পালং শাক ১·৫। তরকারীর মধ্যে ওল ১·৬, কাঁটাল বীচি ১·৫, সি
১·৪ ও ফুলকপি ১·৪।

ফলের মধ্যে তেঁতুল ২·৯, কিসমিস ২, কৎবেল ১·৯। তৈল ও বাদাম জাতীয় খাদ্যের মধ্যে তিল ৫·২, সরিষা ৪·২, পেস্তা ২·৮, বাদা ২·৯ ও চিনের বাদাম ১·৯। দুধে অতি অল্প কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে আছে। সন্দেশ, ছানা ও খোয়াক্ষিরে প্রচুর পরিমাণ আছে। অ আমিষ খাদ্যের মধ্যে কাঁকড়ায় সর্ব্বাধিক ৩·২। মাছের মধ্যে রুই মাছে সর্ব্বাধিক ১·৪২।

মসলার মধ্যে হিং ও জোয়ানে সর্ব্বাধিক ৭, শুষ্ক লঙ্কা ৬, জির ৫·৮, দালচিনি ৫·৪, লবঙ্গ ৫·২, মরিচ ৪, হলুদ ৩·৫, মেথি ৩।

শস্যাদি কাঁচা আহারীয় দ্রব্যের উপরিভাগ বা খোসায় লবণ ঘটিত উপাদান অধিক থাকে। এই জন্য তরকারীর খোসা ফেলিয়া রন্ধন করিলে উহার অনেক অপচয় হয়। ভাতের ফেন গালাইলে উক্ত পদার্থ অনেক বাহির হইয়া যায়, এ বিষয় অন্যত্র সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে।

জল ও বায়ু।

অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্যের ন্যায় শরীর পোষণ ও রক্ষণার্থ এই দুইটি উক্ত শ্রেণীভুক্ত। এই বিষয় এই পুস্তকের তৃতীয় পর্য্যায়ে পঞ্চমহাভূত তত্ত্বাধ্যায়ে সবিশেষ বর্ণিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

-:×:—

আহার বিজ্ঞান।

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত খাদ্যের বিভিন্ন জাতীয় উপাদানগুলি ব্যতীত আরও একজাতীয় বিশিষ্ট অপরিহার্য্য উপাদান আছে, যাহার অস্তিত্বে বা নাস্তিত্বে, স্বাস্থ্য অনুকূল বা প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হয়। উহাকে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ বলা হইয়া থাকে।

কিন্তু উহা যে ঠিক কি পদার্থ তাহা নিরূপিত হয় নাই। কেবল মাত্র ইহা জানা গিয়াছে যে, খাদ্যে এমন কয়েকপ্রকার বিশিষ্ট শক্তি বা বীর্য্য আছে যদ্দ্বারা পরিপোষণক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এবং যাহাদের অভাবে যথেষ্ট নির্দ্দোষ খাদ্য বিধিমত আহার করিলেও শরীর অপুষ্ট হয় এবং দেহে রোগ জন্মে।

শস্য ও অন্য উদ্ভিজ্জাদিতে বিশেষতঃ কচি শাক পাতায় ভিটামিন ভরপুর থাকে কিন্তু রন্ধনাদি আহার প্রস্তুত প্রণালীর দোষে উহার অনেক অপচয় হয়। ইহা আধুনিক আহার বিলাসিতার কুফল।

প্রসিদ্ধ পুষ্টিতত্ত্ববিদ্ সার রবার্ট ম্যাকক্যারিসন বলিয়াছেন, এক একটী ভিটামিন, ভিন্ন ভিন্ন শরীর যন্ত্রাদির ক্রিয়ার সহায়তা করে যথা—

ভিটামিন এ—চক্ষু, ফুসফুস, পাকাশয় ও অন্ত্রাশয়।

বি—মস্তিষ্ক, স্নায়ু, মাংস বা মাংসপেশী, আমাশয় ও অন্ত্রের পেশী।

সি—রক্ত।

ডি—দন্ত ও অস্থি।

সকল ভিটামিনই প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ-খাদ্যের মধ্য দিয়া জীব শরীরে গৃহীত হয়। ভিটামিন ডি সূর্য্যকিরণ হইতে সাক্ষাৎ ভাবেও গৃহীত হয়। আবার খাদ্যের বর্ণানুসারে ভিটামিনগুলির পার্থক্য নির্দ্দেশিত হইয়াছে যথা—

ভিটামিন এ—হরিদ্রা।

জন্তুর চর্ব্বি, দুধ, মাখম ও ঘৃত বিশেষতঃ গব্য ঘৃত ও মাখম, *ডিমের পীতাংশ,* মাছের তেল, ক্যারট, টোম্যাটো, মিষ্ট আলু, কলা এবং অপর হরিদ্রাবর্ণের তরিতরকারী।

ভিটামিন বি ও ই—পাটকিলে।

চাল, গম, বার্লি, ওট, রেজি, ছোলা, বাজরা ইত্যাদি।

ভিটামিন সি—সবুজ।

সকল সবুজ শাক ও তরিতরকারী যথা :—পালং ও অন্য শাক, বাঁধাকপি, লেটুস, মূলা, শালগম, বাঁশের কোঁড় ইত্যাদি।

প্রত্যেক ভিটামিন স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করে না। সকলগুলি এক-যোগে দেহের পুষ্টি সাধনাদি করে। উদ্ভিজ্জের পাতার উপর সূর্য্যকিরণ সম্পাতে, রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে, বিভিন্ন ভিটামিনগুলি উহাদের দেহে সঞ্চিত হয়। কিন্তু জন্তুদের দেহে ডি ভিটামিন ব্যতীত অপরগুলি সাক্ষাৎভাবে গৃহীত হয় না, তাহারা উদ্ভিজ্জাদি আহার করিয়া উহা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করে। উহা দেহ অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন যন্ত্রে বিশেষতঃ যকৃতে সঞ্চিত হয়।

পুষ্টিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ মানব ও জন্তুদেহে ভিটামিন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া উহাদের কার্য্যকারিতা এবং অভাবে কি ক্ষতি, দোষ বা রোগ জন্মে, উহা উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্যের কি উপকার হয়, কোন ভিটামিন কি পরিমাণে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে আছে, কিসে উহা নষ্ট হয় ইত্যাদি নির্দ্ধারিত ও স্থিরীকৃত করিয়াছেন।

ভিটামিন সাধারণতঃ সূর্য্যকিরণপক্ক ফলে, টাটকা কচি শাক, দুগ্ধ প্রভৃতিতে অধিক থাকে। এই সম্বন্ধে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, জমিতে ভাল সার না থাকিলে তদুৎপন্ন উদ্ভিজ্জে ভিটামিন কম থাকে। আজকাল বিলাত, মার্কিণ ও অন্য পাশ্চাত্য দেশে, ভিটামিনের অভাব পূরণার্থে কতকগুলি প্রয়োজনীয় ভিটামিন স্বতন্ত্রভাবে সেবনের জন্য উহা ট্যাবলেট আকারে প্রস্তুত করিবার একাধিক সুবৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখনকার অনেক প্রচলিত ঔষধ ও সংরক্ষিত খাদ্যে ভিটামিন এ, বি ও ডি মিশ্রিত করা হইতেছে। সাদা ময়দার রুটিতে ভিটামিন বি এর অভাব ঐ ট্যাবলেট মোচন করিতেছে।

সম্প্রতি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে বিলাতে কৃত্রিম ভিটামিন সি ট্যাবলেটও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিবার জন্য সুবৃহৎ রাসায়নিক কর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য—ইহা দ্বারা বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় সে দেশের সবুজ তরিতরকারী ও ফলের অভাব মিটিবে। সৈনিকদিগের জন্য এই ট্যাবলেট প্রচুর পরিমাণে সংরক্ষিত হইয়াছে। প্রতি ট্যাবলেটে এই ভিটামিন প্রায় দুইটী লেবুর সমতুল্য। অধুনা বিলাতের হাঁসপাতালেও ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। বিগত শতাব্দীতে দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় এবং যুদ্ধকালে লেবু ও তাজা তরিতরকারীর অভাবে সমুদ্রযাত্রী ও সৈনিকদের মধ্যে অনেকে ঐ ভিটামিন অভাবে মারা পড়িয়াছিল।

গত অ্যাবেসিনিয়া সমরে ইটালীয় সৈনিকদের মধ্যে একজনও স্কার্ভি রোগে মরে নাই। কারণ তাহাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন অন্ততঃ একটী লেবু আহার করিতে দিবার ব্যবস্থা ছিল।

নিম্নলিখিত খাদ্যে ভিটামিন মোটেই নাই :—

উদ্ভিজ্জ তৈল বা উদ্ভিজ্জ ঘৃত (Vegetable ghee), কড়াপাকের ঘৃত। কলের ছাঁটা চাল ও সাদা ময়দা বা উহা হইতে প্রস্তুত ভাত,

রুটি, লুচি, পাঁউরুটি এবং দেশী নোনতা খাবার। দুইবার সিদ্ধ অথবা অধিক তাপে সিদ্ধ দুধ। কলের সাদা চিনি এবং মিসরি, ক্ষীর, রাবড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, বেসম, ছাতু, পালো, সাগু, চা, কফি, শুষ্কশস্য বা শটি এবং অধিক ক্ষারবহুল খাদ্য। বহুক্ষণ অনাবৃত পাত্রে সিদ্ধ খাদ্য, বাসি বা শুষ্ক খাদ্য ও ব্যঞ্জন। সিদ্ধ ফল, ফলের সিরাপ, মোরব্বা এবং টিনে সংরক্ষিত খাদ্য। সাধারণতঃ এইগুলি বর্জ্জন করিলে ভিটামিন বিষয়ে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না। তবে ভিটামিনের কার্য্যকারিতা জানা থাকিলে দোষ বা রোগ নিবারণার্থে উপযুক্ত আহার নির্ব্বাচন করিবার কিম্বা উহার কৃত্রিম প্রকরণ স্বতন্ত্রভাবে সেবন করিবার সুবিধা হইবে। এই জন্য প্রচলিত বিভিন্ন খাদ্যে কোন ভিটামিন কি পরিমাণে আছে তাহা এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হইয়াছে।

ভিটামিন—এ।

ইহা শরীরের বৃদ্ধিসাধক ও ক্ষয়পূরক এবং যক্ষ্মা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগ প্রতিষেধক।

ইহার অভাবে বা অল্পতায় দেহের বৃদ্ধি স্থগিত হয়, অক্ষুধা এবং চক্ষু, ফুসফুস ও মূত্রযন্ত্র প্রভৃতির রোগ জন্মে। স্ত্রীলোকের সন্তান উৎপাদিকাশক্তি লোপ পায়। উদরাময়, আমাশা, শোথ, পাথুরী ও রাত্র্যন্ধতা রোগ জন্মে এবং শরীরের ব্যাধিপ্রতিষেধক শক্তি কমে। ইহা অনেকটা তাপসহ, অল্প তাপে নষ্ট হয় না।

ইহা হ্যালিবাট তেলে (বিলাতী মৎস্য বিশেষের তেলে) অত্যধিক পরিমাণে আছে। ইহার পর কডলিভার তেলে অধিক পরিমাণে আছে। সম্প্রতি বেঙ্গল কেমিক্যাল লেবোরেটারির পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে আমাদের দেশের ভেটকি, চিতল, মিরগেল, রোহিত, ইলিস প্রভৃতি মৎস্যের যকৃতের তেলে ঐ ভিটামিন কডলিভার তেল অপেক্ষা

অনেক অধিক পরিমাণে থাকে। ইহা কাঁকড়া; হাঁসের ও মুরগীর ডিমে বেশ আছে। মাংসে নাই বলিলে চলে। দুগ্ধ বিশেষতঃ কাঁচা দুগ্ধ, মাখম ও দধিতে উপরোক্ত দ্রব্য অপেক্ষা অনেক অল্প কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে আছে। পেঁপে, কিসমিস, বিলাতী গাব ও নাসপাতিতে প্রায় অন্য সমুদয় ফলাপেক্ষা অধিক আছে।

ম্যাক্‌ক্যারিসন সাহেব বলিয়াছেন—মাখমে দুগ্ধের অধিকাংশ "এ" ভিটামিন থাকে কিন্তু উহাতে দুগ্ধের ভিটামিন "বি" কিম্বা "সি" কিছুমাত্র থাকে না এবং অতি অল্প "ডি" থাকে। হলুদে মাখমে সাদা মাখম অপেক্ষা "এ" ভিটামিন অধিক থাকে। কেহ কেহ বলেন ছাগ ও মেষ দুগ্ধে উহা গোদুগ্ধ অপেক্ষা সমধিক পরিমাণে থাকে। জন্তুদের খাদ্যের প্রকৃতি অনুসারে ভিটামিনের ইতর বিশেষ হয়।

ভিটামিন "এ" শস্যবীজের মধ্যে বাজরা, ছোলা, ভুট্টা, ঢেঁকিছাটা চাল, ও গমে অল্প পরিমাণে আছে। উহাদের মধ্যে বাজরা ও গমে কিছু বেশী থাকে। অপরাপর শস্যবীজে নামমাত্র আছে বা নাই। ডাল কড়াইয়ে উপরোক্ত খাদ্য অপেক্ষা' অনেক বেশী থাকে। সকল উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্যে শাক পাতা ও তরিতরকারীতে বিশেষতঃ বাঁধাকপি, পালং শাক, লাল শাক, ক্যারট ও উহার পাতায়, কচি নিম পাতায়, মেথি, রাঁধুনি, লেটুস, সেলারি, পালং ও ছোলা শাকে অত্যধিক পরিমাণ আছে। পানে এবং সমুদ্র জল জাত উদ্ভিজ্জে বেশী আছে। সকল হরিদ্রা বা রক্ত-হরিদ্রা বর্ণের তরকারীতে ভিটামিন "এ" সাদা বর্ণের তরকারী অপেক্ষা অধিক আছে। আবার এই সকল মূলজ উদ্ভিজ্জের কাণ্ড অপেক্ষা সবুজ পাতায় উহা অধিক থাকে।

ভিটামিন—বি।

ইহা দুই শ্রেণীভুক্ত:—বি (১) এবং বি (২)। বি (১) বেরিবেরি, প্রতিষেধক ও আরোগ্যকর এবং স্নায়ুর স্ফীতি নিবারক।

ভিটামিন—বি (১)

ইহা হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, পরিপাকযন্ত্র, মূত্রস্থলী, মাংসপেশী এবং স্নায়ুমণ্ডলকে সুস্থ ও সবল রাখিতে, দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ, ক্ষুধাবৃদ্ধি ও কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ, শরীরের দূষিত পদার্থ নিষ্কাশন এবং পরিপাক শক্তি বর্দ্ধিত করিতে নিতান্ত প্রয়োজন। খাদ্যের শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় উপাদান পরিপাক করিতে এই ভিটামিনের বিশেষ প্রভাব আছে। ইহা ছাড়া পাকস্থলী ও অন্ত্রের ক্ষত এই ভিটামিনযুক্ত খাদ্যের আহারে আরোগ্য হয়।

ইহার অভাবে ক্ষুধা কমে, পাকস্থলী ও অন্ত্রের দুর্ব্বলতাবশতঃ পাচক রস সম্যক নির্গত হয় না, ফলে পরিপাকশক্তি ও হৃৎস্পন্দন হ্রাস পায়, খাদ্য বিস্বাদ বোধ ও অখাদ্যে রুচি হয়, অক্ষুধা, অজীর্ণজনিত দাস্ত, পেটব্যথা বা কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মে, পেশীসমূহ দুর্ব্বল বোধ হয়, পাকাশয়ে অধিকক্ষণ অপাক আহার্য্য থাকা প্রযুক্ত উহা সঙ্কুচিত না হইয়া প্রসারিত হয় যাহাতে নানা দোষ জন্মে, কার্য্যে উৎসাহ থাকে না, রোগ প্রতিষেধক শক্তি কমে, শারীরিক বৃদ্ধি কমে এবং বেরিবেরি ইত্যাদি রোগ জন্মে।

গর্ভাবস্থায় এই ভিটামিনের চাহিদা অধিক সেইজন্য যদি প্রসূতির খাদ্যে উহার অভাব হয়, মাতা ও সন্তান উভয়ই বেরিবেরি রোগাক্রান্ত হইতে পারে, অনেকক্ষেত্রে উহা হইতে দেখা গিয়াছে। অম্লাক্ত পদার্থ অধিক উত্তাপে রন্ধন করিলে এই ভিটামিন নষ্ট হয় না কিন্তু ক্ষারবহুল পদার্থ রন্ধনে উহা অনেক নষ্ট হয়। সাধারণ রন্ধনে অল্পই নষ্ট হয়।

দেহ পরিপোষণে সকল ভিটামিন অপেক্ষা এই ভিটামিন ও ভিটামিন বি (২) এর প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাধিক। ইহা পালং শাক, ট্যাঁড়স ও বিলাতী বেগুণে সর্ব্বাধিক পরিমাণে আছে, পোস্ততে খুব বেশী পরিমাণে

থাকে সুতরাং বেরিবেরি রোগে ঐগুলি উৎকৃষ্ট খাদ্য; তবে উপযু হজমশক্তি থাকা আবশ্যক। ইহা অন্য খাদ্য অপেক্ষা শস্যবীজ বিশেষ ডালে সমধিক পরিমাণে আছে। উহাদের মধ্যে ওটমিলে সর্ব্বাধিক এ চালে সর্ব্বাপেক্ষা কম। যব ও বাজরাতে চাল অপেক্ষা অনেক বে আছে। আবার কলের চালে বা ময়দায় ভিটামিন বি (১) বি (২) কিছু নাই বলিলে চলে।

শাকপাতার মধ্যে লেটুস, পালং, মেথি ও লাল শাকে শস্যবী অপেক্ষা অনেক অল্প পরিমাণে আছে। অপর উদ্ভিজ্জখাদ্যে কি অধিক পরিমাণ আছে তন্মধ্যে ফুলকপি, বেগুণ, হাতিচোক, ক্যার চিনাবাদাম, ফ্রেঞ্চ সিম, ঢ্যাঁড়স, রসুন, কাঁচকলা, মূলা, বিটপালং বিলাতী বেগুণ, বাঁধাকপি, কড়াইশুঁটি, শালগম, পিঁয়াজ, আলু ও ওল উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে চিনাবাদাম ও ফুলকপিতে সর্ব্বাধিক। ফলের মধ্যে অল্প পরিমাণে কমলালেবু, গ্রেপফ্রুট, খেজুর আপেল, কলা, শসা, বাদাম, আখরোট, কুল ও কিসমিসে আছে।

প্রাণীজ আমিষ খাদ্যের মধ্যে মাংস, চিংড়ীমাছ, দই ও মাখমতোলা দুধের গুঁড়ায় কিছু পরিমাণ আছে। মসলায় এই ভিটামিন ও বি (২) মোটেই নাই।

ভিটামিন—বি (২)

ইহা মাত্র নিম্নোক্ত কতকগুলি খাদ্যে আছে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। অপর খাদ্য দ্রব্যাদিতে মোটেই নাই বা লেশ মাত্র আছে। ইহা তাপসহ, রন্ধনে নষ্ট হয় না।

অড়হর ও ছোলার ডাল, মিঠে আলু, গোল আলু, কাঁচকলা, ওল, সয়াবিন, ধনে শাক, গরুর দুধ এবং শুষ্ক মাখমতোলা গুঁড়া দুধে

আছে। শেষোক্ত খাদ্যে সর্ব্বাধিক। গম, মসুরডাল, পালংশাক, ঢ্যাঁড়স, বাদাম ও খেজুরে কিছু বেশী পরিমাণে আছে।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সর্ব্বাঙ্গীণ সুস্থতা লাভের জন্য ভিটামিন বি (১)এর ন্যায় এই ভিটামিনও অতি প্রয়োজনীয়। ইহা একপ্রকার মারাত্মক চর্ম্ম রোগের (Scurvy) প্রতিষেধক। জীবনীশক্তির বৃদ্ধি ও সর্ব্বাঙ্গীণ সুস্থতা ইহার উপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে।

ইহার অভাবে শরীরের বৃদ্ধি স্থগিত হয় এবং ওজন হ্রাস হয়, উপরোক্ত চর্ম্মরোগ জন্মে, আমাশয় প্রদাহান্বিত হয়, নাড়ী বা স্নায়ু মণ্ডল উত্তমরূপে কার্য্যক্ষম হয় না এবং চোখে ছানি পড়ে বলিয়া কথিত হইয়াছে।

প্রসূতির ও প্রসূত সন্তানের বি(১) ভিটামিনের ন্যায় এই ভিটামিনের চাহিদা অধিক। পুষ্টিতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত বীরেশ চন্দ্র গুহ লিখিয়াছেন যে এই ভিটামিন প্রয়োগে দুইটী শ্বেতকুষ্ঠ রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

সম্প্রতি টাইম্ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, স্যান্ ফ্র্যানসিস্কো দক্ষিণ প্যাসিফিক হাঁসপাতালের ৭৬ বৎসর বয়স্ক অভিজ্ঞ কর্ণ চিকিৎসক ডাঃ গ্রাণ্ট সেলফরিজ্ বধিরতা রোগের একটি নূতন আরোগ্যকর ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। উহা আর কিছুই নয় মাত্র ভিটামিন বি। তিনি বলেন, যে অষ্টম স্নায়ুদ্বয় দুই কর্ণ অবধি গিয়াছে, তাহাদের বিকৃতি বা অপকর্ষে ঐ রোগ সাধারণতঃ জন্মে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার চিকিৎসিত অধিকাংশ বধিরগণ ঐ ভিটামিন-খাদ্য অতি অল্পই গ্রহণ করিত। তিনি ভিটামিন বি ট্যাবলেট এবং ভিটামিনবহুল চালের কুঁড়া, সবুজ তরিতরকারী প্রভৃতি খাওয়াইয়া এবং উক্ত ভিটামিন অন্তক্ষেপ (Injection) করিয়া অনেকের স্নায়ুদৌর্ব্বল্য ঘটিত বধিরতা রোগ নিরাময় করিয়াছেন।

ভিটামিন—সি।

ইহা সাধারণতঃ স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিশেষতঃ অকালবার্দ্ধক্য নিবারণ, রক্ত পরিষ্কার ও অপর ভিটামিনের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি করিতে, অন্ত্রাদিকে সুস্থ রাখিতে এবং নিউমোনিয়া, পাকস্থলীর ক্ষত, হুপিং কফ, ক্ষয় রোগ প্রভৃতিতে বিশেষ উপকার সাধন করে। ইহাতে ক্ষত শীঘ্র সারে, দন্তমাড়ি সুদৃঢ় হয়, পাইয়োরিয়া, ক্যারিজ প্রভৃতি দন্ত রোগে উপকার হয়। স্কার্ভি নামক একপ্রকার চর্ম্মরোগ এবং একপ্রকার মূত্র রোগে (Nephrites) বিশেষ উপকার করে।

ইহা চাল, গম, বার্লি ইত্যাদি শস্যবীজে ও ডালে মোটেই নাই কিন্তু অঙ্কুরিত শস্যে কিছু উৎপন্ন হয়। বাদাম জাতীয় খাদ্যে নাই। ইহা নেয়াপাতি ডাবের জলে ও নারিকেল ফোঁপরায় বেশী পাওয়া যায়।

বসু রাসায়নিকাগারের পরীক্ষায় প্রকাশিত হইয়াছে যে একটী কচি ডাবের জলে যে পরিমাণে এই ভিটামিন থাকে তাহা দৈনিক সি ভিটামিনের অভাব মিটাইতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যহ একটী ডাব খাইলেই উপযুক্ত পরিমাণ সি ভিটামিন দেহে গৃহীত হইতে পারে।

দিনে দুই ছটাক কমলালেবুর রসে এই ভিটামিনের চাহিদা মিটে। কমলালেবুর রস অপেক্ষা উহার খোলায় উক্ত ভিটামিন অধিক থাকে। আতা, আনারস, লেবু, পেঁপে এবং পেয়ারাতে উহা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। আবার সব ফলের চেয়ে পেয়ারাতে অধিক থাকে। তরিতরকারীর মধ্যে বেগুণ, বিলাতী বেগুণ, ফুলকপি, ব্রকোলি (এক জাতীয় ফুলকপি), মটর শুঁটি, বিট, মূলা, সিম, লেটুস, ঢ্যাঁড়স, বাঁধাকপি, পিঁয়াজ, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, আলু ও মিঠে আলুতে থাকে তন্মধ্যে বাঁধাকপি ও কাঁচা লঙ্কায় সর্ব্বাধিক। পালং, লালশাক, ধনে ও মেথি শাকে অধিক থাকে তন্মধ্যে লাল শাকে সর্ব্বাধিক।

সম্প্রতি একটী বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে টাটকা পার্শলি (Parsley), ব্রকোলি, কেল (Kale) এবং ফুলকপিতে লেবু জাতীয় ফলের দুই তিন গুণ পরিমাণ ভিটামিন সি আছে।

ফল প্রভৃতি পাকিবার সময় এই ভিটামিনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে থাকে। গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবান্তে এই ভিটামিনের চাহিদা অধিক হয়, সেইজন্য গর্ভিণী ও প্রসূতিদের এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রসূত সন্তানদের এই ভিটামিনবহুল ফল ও উপরোক্ত শস্যাদি সেবন বিশেষ প্রয়োজন। এই ভিটামিন তাপে সাধারণতঃ নষ্ট হয়। কাঁচা খাওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং তাহা প্রকৃতির নির্দ্দেশ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে। ইহা যে কত উপকারী বস্তু তাহা নিম্নোক্ত বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হইবে।

ইহা শরীরের ক্যালসিয়াম লবণের (চূণ ঘটিত লবণের) উপচয় ঘটায় এবং রোগ প্রতিষেধক শক্তি বর্দ্ধিত করে। ইহার অভাবে অস্থির ও দন্তের পুষ্টির ব্যাঘাত হয়, দাঁতে রক্ত পড়ে, দাঁত আলগা হয়, মাড়ি ফোলে, মুখে দুর্গন্ধ হয়, শরীরের বৃদ্ধি স্থগিত হয়, শরীর শীর্ণ, বিবর্ণ ও দুর্ব্বল এবং গাঁটে গাঁটে বেদনা ও ক্ষুধা হ্রাস হয়। আলস্য, অরুচি, রুক্ষস্বভাব, রক্তাল্পতা, শ্বাসাল্পতা, হৃৎস্পন্দন, জিহ্বাক্ষত, একপ্রকার চর্ম্মরোগ (Scurvy) ইত্যাদি দোষ বা রোগ জন্মে। শিশুদের যকৃত, চক্ষুপীড়া, উদরাময় এবং অকাল মৃত্যুর একটী অন্যতম প্রধান কারণ এই ভিটামিনের অভাব বলিয়া কথিত হইয়াছে। তামার সংস্পর্শে ইহা নষ্ট হয়।

ভিটামিন—ডি।

এই ভিটামিন সূর্য্য কিরণস্পৃষ্ট উদ্ভিজ্জ ও জীব দেহে সঞ্চিত হয়। ইহা সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জের সবুজ পাতায় ও ফলে অধিক থাকে। কোন কোন উদ্ভিজ্জের মূলে বা কন্দেও উহা প্রসারিত হয়। হরিদ্রা ও

লালচে কমলা লেবু বর্ণের কন্দ মূলে অধিক থাকে; সাদা বা বেগুণে বর্ণের কন্দ মূলে অতি অল্প থাকে।

ইহা ক্যাল্‌সিয়াম্‌, ফস্‌ফেট ও স্নেহ পদার্থের পরিপূরক। ইহা অস্থির প্রধান দুইটী উপাদান ফস্‌ফরাস্‌ ও ক্যাল্‌সিয়াম্‌ সংস্থানে এবং রক্তে এই দুই পদার্থের সমতা রক্ষণে সহায়তা করে। শারীরিক বৃদ্ধি ও ও সুস্থতা বিশেষতঃ দন্ত ও অস্থির সম্যক পরিপোষণ ও বৃদ্ধির জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজন।

যেদেশে রবিকর প্রখর, সে দেশের অধিবাসীগণের দেহের বর্ণ মলিন। আফ্রিকার নিগ্রোদের ত্বক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কারণ সেখানকার তাপ অত্যধিক। (রবিকর জীবদেহের বর্ণ প্রভাবিত করে।) ঐ সব দেশের লোক যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুকরণ বা অনুসরণ করিয়া সভ্য পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হয়, তখন তাহাদের দেহে সম্যক পরিমাণে উক্ত ভিটামিন সূর্য্য কিরণ সাহায্যে গৃহীত হয় না বলিয়া নানা প্রকার রোগ জন্মে। রবিকরস্পৃষ্ট উদ্ভিজ্জ আহারও যেমন প্রয়োজন, নগ্নগাত্রে রবিকর সেবা ততোধিক প্রয়োজন। ইহা যক্ষ্মারোগ প্রতিষেধক।

এই ভিটামিনের অল্পতায় বা অভাবে শিশুদের রিকেট এবং বয়স্কদের বিশেষতঃ পর্দ্দানশীন রমণীগণের অস্থি ও দন্তের ক্ষয়রোগ (Caries & Osteomalcia) ইত্যাদি জন্মে এবং রোগ প্রতিষেধক শক্তি কমে, শিশুদের দন্তোৎগমে বিলম্ব হয়, দন্তের বিকৃতি ঘটে এবং প্রসূতিদের প্রসবদ্বারসংলগ্ন অস্থিসমূহ (Pelvic bones) সম্যক পুষ্ট হয় না বলিয়া প্রসবের সময় সন্তান কিম্বা প্রসূতি অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুগ্রস্ত হয়। শিশুদের তেল মাখাইয়া মৃদু রৌদ্রে দিলে রিকেট (বালাস্থি গ্রহ) রোগ আরাম হয়।

সার রবার্ট ম্যাক্‌ক্যারিসন লিখিয়াছেন—শিশুদের স্নায়ুদৌর্ব্বল্য *জনিত খিটখিটে মেজাজ, অনিদ্রা, অস্থিরতা, সন্ধিস্থলগুলির শিথিলতা* এবং অস্থির কোমলতা, অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের বিকৃতি বা আঁকাবাঁকা গঠন, কোষ্ঠবদ্ধতা, দেহের বিবর্ণতা, রক্তাল্পতা, সর্দ্দি ও ফুসফুস পীড়া প্রবণতা, মূর্চ্ছাদি দেহের আক্ষেপ বা বিক্ষেপ, এ সকলই সাধারণতঃ ভিটামিন ডির অভাব বা অল্পতা নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে। যদি উক্ত দোষ ও রোগ সত্ত্বেও তাহাদের কেহ কোন গতিকে বাঁচিয়া যায়, তার দেহ খর্ব্ব হয় এবং তাকে জীবন ভোর অভিশপ্ত জীবনভার বহিতে হয়। উক্ত দোষ প্রতিষেধার্থে অনেক চিকিৎসক কড লিভার তেল মর্দ্দন বা সেবন করাইবার ব্যবস্থা করেন।

মাছের ও অন্য জন্তুদের যকৃতে এ, বি, সি ও ডি এই চারিটী ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। হিংস্র পশু ও মানবগণ যাহাদের মাংস প্রধান আহার তাহারা উহা খাইয়া উক্ত ভিটামিনগুলির উপকারিতা প্রাপ্ত হয়। যকৃতে ম্যাঙ্গানিজ এবং লৌহও অধিক পরিমাণে থাকে। প্রথমোক্তটি শরীরের বৃদ্ধিসাধন এবং শেষোক্তটী রক্তের বিভিন্ন উপাদানের সুষ্ঠু সমাবেশ বা মিলন ও কার্য্যকারিতা বর্দ্ধিত করে। কিন্তু জন্তুদের যকৃত যত ভাল খাদ্য হউক না কেন, উহা সভ্য মানবগণের অস্বাভাবিক এবং বিশেষ আপত্তিকর। উহাকে ঠিক খাদ্য বলিয়া অভিহিত করাও যায় না—উহা ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। দোষের চিকিৎসা অপেক্ষা দোষ নিবারণার্থে তাজা তরিতরকারী, শাক এবং উপযুক্ত রৌদ্রসেবনই শ্রেয়স্কর।

ভিটামিন ডি নারিকেল তেল ব্যতীত অপর তেলে আছে কি না জানা যায় নাই। রন্ধনার্থে আমরা যে সরিষার তেল ব্যবহার করি তাহা রৌদ্রে দিলে উহাতে ঐ ভিটামিন সঞ্চিত হইতে পারে।

স্যার লিওনার্ড হিল্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, শিশুদের রৌদ্রে রাখিলে তাহাদের পরিপাক শক্তি শতকরা ৪০ ভাগ বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু অধিক রৌদ্রসেবা অর্থাৎ এই ভিটামিনের অতি বা অপপ্রয়োগ সকলের পক্ষেই অনিষ্টকর। তেল, জল প্রভৃতি সূর্য্যকিরণে রাখিলে উহাতে ডি ভিটামিন সঞ্চিত হয়। ইহা কডলিভার তেল, টাটকা ফলের রসে বিশেষতঃ লেবুর রসে, টাটকা শাকসব্জি বিশেষতঃ বাঁধাকপি, পালং শাক, অঙ্কুরিত ছোলা, মটর ও মুগ, ডিমের পীতাংশ, মাছ, গুগলি, দুধ ও মাখমে অন্য খাদ্য অপেক্ষা অধিক থাকে।

ভিটামিন "ই"।

ইহা ভুট্টা, গম, মুগ প্রভৃতির অঙ্কুরে, লেটুস গাছের বীজে ও পাতায় আছে। টাট্‌কা সব্জি, আছাঁটা চাল, কডলিভার তেল, মাংস, ডিমের পীতাংশ, দুধ এবং চায়ের মধ্যে সামান্য পরিমাণ আছে। ইহা অতি সামান্য মাত্রায় ফলদায়ক। ইহা প্রজনন সহায়ক, স্ফূর্ত্তিকর এবং ভ্রুণ দেহ গঠন সহায়ক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহা উত্তাপে নষ্ট হয় না। এই নূতন আবিষ্কৃত ভিটামিন সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নাই।

উপরোক্ত পাঁচটী ভিটামিন ব্যতীত আরো অনেক ভিটামিনের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু তাহাদের সঠিক কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এখনও গবেষণা চলিতেছে।

খাদ্যপ্রাণ তালিকা।

সাধারণ আহারীয় দ্রব্যে যে যে ভিটামিন আছে তাহা সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের তালিকা দৃষ্টে পর পৃষ্ঠায় লিখিত হইল। (১) অল্প, (২) অধিক ও (৩) অধিকতর।

১। যে সকল খাদ্যে চারিটী ভিটামিন আছে।

কাঁচা দুধ (গাভীর)	ক (৩)	খ (২)	গ (২)	ঘ (২)
ঐ এক বন্ধ্যা	ক (৩)	খ (২)	গ (১)	ঘ (২)
মহিষ বা ছাগ দুগ্ধ	ক (৩)	খ (১)	গ (১)	ঘ (১)
ননী	ক (৩)	খ (২)	গ (১)	ঘ (৩)
মটর শুঁটি	ক (২)	খ (২)	গ (৩)	ঘ (১)
লেটুস শাক	ক (২)	খ (২)	গ (৩)	ঘ (১)
ধনে শাক, গুলফা শাক, পুদিনা ও বীট	ক (১)	খ (১)	গ (১)	ঘ (১)

২। যে যে খাদ্যে তিনটী ভিটামিন আছে।

পালং শাক	ক (৩)	খ (৩)	গ (৩)
গম	ক (২)	খ (২)	ঘ (১)
ময়দার রুটি (দুধে ছানা)	ক (১)	খ (১)	ঘ (১)
লাল আটার রুটি (জল দিয়া ঠাসা)	ক (১)	খ (২)	ঘ (১)
ঐ (দুধ দিয়া ছানা)	ক (২)	খ (২)	ঘ (১)
মাখম তোলা দুধ	ক (১)	খ (১)	গ (১)
ঘোল	ক (১)	খ (২)	গ (১)
সরিষার তেল	ক (১)	খ (২)	গ (১)
নারিকেল	ক (১)	খ (২)	ঘ (১)
ডাবের শাঁস	খ (১)	গ (১)	ঘ (১)
পাকা কাঁটাল	ক (১)	গ (১)	ঘ (১)
আনারস	ক (২)	খ (২)	গ (৩)

কমলা লেবুর রস	ক (১)	খ (২)	গ (৩)
আপেল	ক (১)	খ (২)	গ (২)
পিচফল	ক (২)	খ (১)	গ (২)
আমসত্ত্ব	ক (১)	খ (১)	গ (১)
আলু অল্প সিদ্ধ	ক (১)	খ (২)	গ (২)
ট্যাঁড়স	ক (১)	খ (৩)	গ (১)
বাঁধাকপি কাঁচা	ক (২)	খ (১)	গ (৩)
ঐ আধসিদ্ধ	ক (২)	খ (১)	গ (১)
গাজর	ক (২)	খ (১)	গ (১)
অঙ্কুরিত ছোলা ও মুগ	ক (১)	খ (২)	গ (২)
বিলাতী বেগুণ	ক (২)	খ (৩)	গ (৩)
রসুন	ক (১)	খ (১)	গ (২)

৩। কি কি খাদ্যে দুইটী ভিটামিন আছে।

ক (১), খ (১)—ঢেঁকিছাঁটা চাল, হাঁসের ও মুরগীর মাংস, কলা, বরবটি, মাছের তেল, আস্ত বার্লি দানা।

ক (১), খ (২)—মাছের ডিম, বাদাম, পেঁপে, সয়াবিন, চিনাবাদাম, রাইসরিষা, ওট (জই), ভুট্টা, আতপচিঁড়ে, মসুর, মটর ও ফুলকপি।

ক (১), খ (৩)—সুজি। ক (১), গ (২)—কাঁচকলা, বেল।

ক (১), গ (১), ঘ (১)—খেজুর। ক (২), খ (১) রাঙাআলু।

ক (২), খ (২)—টাটকা সিম, ছানা, গমের ভুষি।

ক (২), গ (৩)—মাতৃস্তন্য। ক (৩), খ (৩)—তৈলাক্ত মাংস কাঁচা মুগ।

খ (১), গ (১)—ওলকপি, তেঁতুল, বেগুণ, পটোল, ডালিম, নাসপাতি, জাম, আম, পিয়ারা। খ (১), গ (২)—লিচু।

খ (১), গ (১), ঘ (১)—ডাবের শাঁস।

খ (২), গ (২)—বাতাবী লেবু, আঙুর, পিঁয়াজ। খ (২), গ (৩) —লেবুর রস, শালগম। খ (৩), ঘ (৩)—মেষ মাংস।

৪। যে সকল খাদ্যে মাত্র একটি ভিটামিন আছে।

এঁচোড় ক (১), মূলা শাক, ঘৃত ও লাউ ক (২), কডলিভার তেল ক (৩)।

মধু, ময়দার জলে ছানা রুটি, লাল পাঁউরুটি, ডুমুর, খেজুর, শসা, কিসমিস খ (১)। আখরোট, শুক্‌নো সিম, খ (২)। ছোট মাছ খ (৩)। তরমুজ ও তালশাঁস, গ (১)। গুড়, গ (২)। টেঁপারি, কপির আচার ও মূলার খোসা, গ (৩)।

পঞ্চম অধ্যায়।

রস বিজ্ঞান।

প্রথম পল্লব।

শাস্ত্রে ছয় প্রকার রস উক্ত হইয়াছে যথা—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়। প্রথমে জল আকাশ হইতে পতিত হইয়া অন্য ভূতের সহিত মিশ্রিত হয়। এই জল হইতে মধুররস উৎপন্ন হয়। মতান্তরে পৃথিবী ও জলীয় গুণের আধিক্যে উক্ত রস উদ্ভূত হয়।

পার্থিব ও অগ্নি গুণের আধিক্যে অম্লরস, জল ও অগ্নিগুণের আধিক্যে লবণ রস, বায়ু ও আকাশ গুণের আধিক্যে তিক্ত রস, বায়ু ও পৃথিবী গুণের আধিক্যে কষায় এবং বায়ু ও অগ্নি গুণের আধিক্যে কটুরস জন্মে।

১। কটুরস—ঝাল।

লেখক কটুরসপ্রিয় নয় তথাপি প্রথমেই কটূক্তি করিবার কারণ আছে। এই রস নিত্য সমধিক পরিমাণে সেবনে দেহে দারুণ অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহা অনেকেই সম্যক উপলব্ধি করে না। এই জন্য বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে কটুরসশিরোমণি লঙ্কার কথা প্রথমেই উল্লিখিত হইল।

শাস্ত্র মতে লঙ্কা সাত্ত্বিক আহারশ্রেণীভুক্ত নয়। শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় কৃষিসম্পদ পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে ইহা তমোগুণ প্রধান বলিয়া ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীগণের প্রিয় খাদ্য ছিল।

ক্রমে আর্য্য ও অনার্য্যগণের সংমিশ্রণে উহা সকলের পাকগৃহে প্রবেশলাভ করিয়াছে।

ঔষধ হিসাবে কোন কোন রোগে ইহার কিছু উপকারিতা আছে কিন্তু খাদ্য হিসাবে লঙ্কার মূল্য অতি অল্প। অতি অল্প লঙ্কা সেবনে বিশেষ অনিষ্ট না ঘটিতে পারে কিন্তু উহার সংযত ব্যবহার প্রায়ই ঘটে না।

আমাদের দেশে লঙ্কার প্রচলন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। আজকাল প্রায় প্রতি ব্যঞ্জনে এমন কি অম্বলেও লঙ্কা দেওয়া হয়। হয়ত এমন দিন আসিবে যখন দুধেরও সহিত লঙ্কা সেবন প্রথা প্রচলিত হইবে। অপর কোন সভ্য জাতি আমাদের ন্যায় এত অধিক লঙ্কা সেবন করে না। অত্যধিক লঙ্কাপ্রিয়তা বিকৃত রুচি ও স্বাস্থ্যহীনতার প্রবল পরিচায়ক।

একেত উহা আহার্য্যদ্রব্যের প্রকৃত স্বাদ গোপন বা লোপ করে, দ্বিতীয়তঃ উহা দীর্ঘকাল অধিক পরিমাণে সেবিত হইলে পাকাশয়ে ও অন্ত্রে প্রদাহ উৎপন্ন করে। দেহের ত্বকে লঙ্কা বাটার পলস্তারা দিলে দারুণ প্রদাহ ও ক্ষত উৎপন্ন হইবেই হইবে, উহা সেবনে যে আভ্যন্তরীণ পরিপাক যন্ত্রের অর্থাৎ কোমল পাকাশয় ও অন্ত্রের উক্তরূপ অনিষ্ট সাধিত হইবে তাহা সুনিশ্চিত। অভ্যাসবশে উহার দোষ সহজে অনুভূত হয় না কারণ প্রকৃতি অনেক অনাচার সহ্য করে। কিন্তু যখন তাহার সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয় তখন কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

অতিরিক্ত লঙ্কা বাধ্য হইয়া সেবন করিয়া এক সময়ে লেখকের কি দুর্গতি হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিলে, আশা করি অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইবে না।

একবার ঢাকা যাইবার পথে, গোয়ালন্দে পৌছিয়া, ক্ষুধার তাড়নায়, তথাকার একটী হোটেলে বহুল লঙ্কা লাঞ্ছিত রক্তরাগরঞ্জিত পরম মুখরোচক ইলিশ মাছের বিবিধ ব্যঞ্জন উপভোগের সৌভাগ্য হইয়াছিল। আহারের এক ঘণ্টা পরে ঢাকা ষ্টীমারে চড়িয়া দারুণ পেট-জ্বালা, বমি ও ভেদ হইতে লাগিল, শেষে প্রবল আমাশারোগে আক্রান্ত হইয়া অবসন্ন ও দুর্ব্বল দেহে সেই সন্ধ্যায় ঢাকা পৌছিলাম। ঢাকার ষ্টেশন মাষ্টার অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাকে রোগের বিষয় জানাইলে তিনি বলিলেন "আপনার জন্য রাত্রে আহারের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছি কিন্তু লঙ্কা দেওয়া হইবে না।"

তখন শরীরের যেরূপ অবস্থা, কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা একেবারেই ছিল না। আমি বলিলাম জল গ্রহণ করিব না। তিনি বলিলেন "আচ্ছা সে ভার আমার, আপনি ১২টী কমলালেবু পর পর খাইয়া দীর্ঘকাল বিশ্রাম করুন। যদি ক্ষুধা না হয় এবং রোগের কোন উপসর্গ থাকে, খাইবেন না।" তাঁহার কথামত ঐ কয়েকটী লেবু (সিলেটের টাটকা মিষ্ট কমলা) খাইয়া ৩।৪ ঘণ্টা নিদ্রা যাইবার পর প্রচণ্ড ক্ষুধা বোধ হওয়াতে মাংসাদি যে সকল আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল একে একে সব গ্রহণ করি এবং পরে কোন অসুবিধা বোধ করি নাই। বিষের কৃপায় অমৃতের সন্ধান মিলিয়াছিল।

স্বাস্থ্যরক্ষার্থে পরিমিত পরিমাণ কটুরস সেবনও প্রয়োজন বটে কিন্তু অন্য কটুরসও আছে যথা আদা ও মরিচ। এইগুলি লঙ্কা অপেক্ষা অধিক গুণসম্পন্ন। হয়ত মরিচের অধিক মূল্য বলিয়া সুলভ লঙ্কা-দানবের প্রভুত্ব ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দাসত্ব ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে।

তিক্ত।

ইহা উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, অরুচিনাশক, বিষ ও ক্রিমিহর, মূর্চ্ছা, দাহ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও তৃষ্ণা প্রশমক, ত্বক ও মাংসের স্থৈর্য্যসম্পাদক, পিত্তাধিক্য ও সর্ব্বপ্রকার জ্বর নাশক, কফ ও স্থূলতা প্রশমক, বেদনা নিবারক, অগ্নির উদ্দীপক, পাচক, শীতল ও লঘু। পলতা, সর্ষপ তৈল, পিপুল, আদা, পিঁয়াজ, রসুন, মূলা, সজিনা, কর্পূর ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত।

তিক্ত রস শ্রেষ্ঠ রক্তপরিষ্কারক সেইজন্য শিশুদের আলুই যাহা তিক্ত কালমেঘ পাতার রস, জোয়ান ইত্যাদির দ্বারা প্রস্তুত হয় তাহা সেবন করান হয়, উহাতে যকৃতের বিশেষ উপকার হয়। বয়স্কেরা বিশেষতঃ বৃদ্ধেরা তিক্ত খাইতে লালায়িত হয় কারণ তাহাদের রক্তে অনেক ময়লা। বালক বালিকাগণের রক্ত অপেক্ষাকৃত অনেক পরিষ্কার সেইজন্য তাহারা তিক্ত খাইতে ভালবাসেনা। তথাপি তাহাদের পলতাদি অনুগ্র তিক্ত সেবন করান উচিত। আমরা সাধারণতঃ রক্তপরিষ্কারক ও জ্বরনাশক তিক্তরস রীতিমত সেবন করি না। কোন কোন ঋতুতে যখন রক্তে ময়লায় পূর্ণ হয় যথা বসন্ত কালে, কিছুদিনের জন্য, রোগের ভয়ে উহা সেবন করি—কেহ কেহ তাহাও করে না। উহা পূর্ব্ব হইতে সেবিত হইলে বসন্তাদি ত্বক রোগ নিবারিত হইতে পারে নচেৎ কুইনানাদি বিষম তিক্ত রস সেবনে ঐ দোষের কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

কষায়।

ইহা ত্রিদোষ শান্তিকারক, মলমূত্ররোধক, ধাতুপোষক, শরীরের শুষ্কতাকারক, শ্লেষ্মা ও রক্তপিত্ত প্রশমক ইত্যাদি। ইহা রুক্ষ, শীতল

ও গুরু

আম, বকুল, পালং ও সুষণি শাক, কাঁচকলা, মসুর ডাল, সজিনা, গন্ধভাদুলিয়া, প্রভৃতি কষায় দ্রব্য। এই রস উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে তরুণ সর্দ্দি, অতিসার, পুঁজ ও রক্তজনক ক্ষতাদি উপসর্গে উপকার হয়। কোষ্ঠবদ্ধ, আমাশা, শুষ্ককাসি ও অম্লশূল রোগে এবং যাহাদের স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত বা হীন, যাহারা বায়ুগ্রস্ত একটুতেই বুক ধড়ফড় করে, সর্ব্বদা মন হু হু করে তাহাদের পক্ষে কষায় রস অহিতকর।

অম্ল।

ইহা সেবনে আহারে রুচি জন্মে, অগ্নি উদ্দীপিত ও দেহপুষ্ট হয়, মনে চৈতন্য জন্মে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ সুদৃঢ় হয়। ইহা পাচক, বলবর্দ্ধক, বায়ুর অনুলোমক, তৃপ্তিসাধক, লঘু, উষ্ণ ও স্নিগ্ধ। ইহা সেবনে লালা ও পিত্ত নিঃসরণ বৃদ্ধি পায়। এই রস আহারের শেষের দিকে সেবনে উপকার হয়। ইহা পুঁরাতন কাস, কোষ্ঠকাঠিন্য ও অর রোগে, অন্য রোগের পিপাসাধিক্যে এবং বিষাক্তদ্রব্য সেবনের পর হিতকর। মৎস্য ও মাংস আহারের পর অম্ল সেবন করিলে ভুক্ত দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক হয়। শরীর পোষণার্থ ইহা একটী অপরিহার্য্য অন্যতম অতি আবশ্যকীয় উপাদান। ইহা সেবনে লবণের ন্যায় দেহের বিভিন্ন পাচক রস অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয় এবং ভুক্ত বস্তুর পরিপাকে সম্যক সহায়তা হয়। ইহা নিজে অম্লগুণাত্মক হইলেও পাচক রসের ও রক্তের অম্লত্ব দোষ সংশোধন করিয়া ক্ষারত্ব সম্পাদন করে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহা বায়ুর অক্সিজনের সহিত মিলিত হইয়া সামান্য পরিমাণ শক্তিও উদ্রিক্ত করে।

এই রস অনেকদিন যাবৎ সেবিত না হইলে দেহে এক প্রকার চর্ম্মরোগ (Scurvy) উৎপন্ন হয় তাহা নিবারণার্থে লেবুর রস সেবনের

ব্যবস্থা করা হয়। ইহা অধিক দিন অধিক পরিমাণে সেবনে দন্তহর্ষ, রোমহর্ষ, কফতারল্য, নেত্রসংমিলন, পিত্তবৃদ্ধি, রক্তদোষ এবং বক্ষ ও হৃদয়ে দাহ উপস্থিত হয়। মতান্তরে অম্লরসের অতি সেবনে ভ্রান্তি, দাহ, তিমির রোগ, জ্বর, কণ্ডু, পাণ্ডু, বিসর্গ, বিস্ফোটক এমন কি কুষ্ঠ রোগ পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে।

কেহ কেহ অম্লের নামে আঁতকে ওঠেন কিন্তু পরিমিত অম্লরস-সেবনে অম্ল উৎপন্ন হয় না বরং রক্তের ও পাচক রসের ক্ষারত্ব বর্দ্ধিত হয়। একজন যোগী তাঁহার প্রণীত একটী পুস্তকে অম্লের বহু নিন্দা করিয়াছেন, যথা উহা সেবনে শুক্র তরল হইয়া স্খলিত হয় ইত্যাদি। কিন্তু বিধাতা কোন পদার্থই অকারণ সৃষ্টি করেন নাই।

লবণ।

লবণআহার, সভ্যতার আদিযুগ হইতে প্রচলিত। পূর্ব্বে লবণের জন্য কত খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছে। একবার বিলাতের কোন প্রদেশে লবণাভাবে মহামারী হইয়াছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মানুষের নানাবিধ আহার্য্যে অল্প বিস্তর লবণ বিদ্যমান আছে কিন্তু যেক্ষেত্রে উহা দেহপোষণার্থে যথেষ্ট না হয় সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত লবণ প্রয়োজন হয়।

লবণ ব্যঞ্জনকে সুতার করে। "ব্যঞ্জনং লবণং বিনা।" যেমন কোন ব্যঞ্জনবর্ণ স্বর ব্যঞ্জনের সাহায্য বিনা উচ্চারিত হয় না তেমনি লবণ অভাবে ব্যঞ্জনের কোন ব্যঞ্জনা বা সার্থকতা থাকে না। "যার নুন খাই তার গুণ গাই। মুসলমানদের নিমকহারামের মত গালি আর নাই। মহাকবি হোমার লবণকে 'Salt Divine'—"লবণ স্বর্গীয়" এবং প্লেটো উহাকে দেবতাদেরও প্রিয় বলিয়াছেন।"

যে সকল চাষের জমিতে লবণ উপযুক্ত পরিমাণে থাকে না, বা অতি অল্প থাকে সেখানে যে সকল ফসল উৎপন্ন হয় তাহাতে উহার অভাব

হয়। সেইজন্য ঐ প্রকার জমি হইতে উৎপন্ন উদ্ভিজ্জ এবং সেই উদ্ভিজ্জভোজী জীব সকলেরই লবণের অভাব হয়। লবণ জমির একটী উৎকৃষ্ট সার, যে জমিতে উহার অভাব আছে সেখানে উহা প্রয়োগ করিলে উদ্ভিজ্জ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। জন্তুগণ স্বতন্ত্রভাবে লবণ আহার করিতে পায় না, যখন তাহাদের লবণের একান্ত অভাব হয় তখন লবণ খাইতে লালায়িত হয় এবং লোণা মাটি বা লবণবহুল উদ্ভিজ্জ অধিক পরিমাণে আহার করে। বিলাতে প্রতি পশুশালায় একটী বড় লবণের চাঁই রক্ষিত হয়, গো মহিষাদি উহা মধ্যে ২ লেহন করে। সিংহ ও ব্যাঘ্র অন্য জন্তু সংহার করিয়া প্রথমে উহার লবণাক্ত রক্ত পান করে পরিশেষে হাড় চিবাইয়া চূণের অভাব মিটায়।

নিম্নলিখিত প্রকার লবণ সচরাচর পাওয়া যায় :—

সৈন্ধব—পাঞ্জাব প্রদেশের লবণখনি হইতে উৎপন্ন হয়। সকল প্রকার লবণের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সচল বা সৌবচ্চল হিমালয়ের পাদ প্রদেশে প্রবাহিত ক্ষুদ্র প্রবাহিনীর লবণাক্ত জল হইতে প্রস্তুত হয়।

সম্বর বা স্তকম্ভরি—রাজপুতানার সম্বর হ্রদের জল হইতে প্রস্তুত হয়।

কর্কচ— সমুদ্র জল হইতে প্রস্তুত হয়।

কাল লবণ—লবণ মিশ্রিত মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত হয়।

বিটলবণ—উত্তাপ দ্বারা প্রস্তুত হরিতকী মিশ্রিত সৈন্ধব লবণ। বিটলবণ যকৃৎ ও প্লীহা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উক্ত রোগসংযুক্ত তরুণ বা পুরাতন জ্বরে উহার উষ্ণ স্বেদ বিশেষ কল্যাণকর—ইহা আমাদের বহু পুরাতন প্রথা। ডাক্তার প্রমদাপ্রসন্ন বিশ্বাস লিখিয়াছেন যে অনেক সময় দেখা যায় যে জ্বর কিছুতেই

ছাড়িতেছে না এবং প্লীহা ও লিভারের বিবৃদ্ধি কমিতেছে না তখন জলসিক্ত বিটলবণের উষ্ণ স্বেদে জ্বর ছাড়িয়া যায় ও উক্ত যন্ত্রগুলির বিবৃদ্ধি হ্রাস হয়। তিনি অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ লবণ হইতে প্রস্তুত হোমিওপ্যাথী ঔষধ নেট্রাম মিওর যাহা বিদেশ হইতে আনীত হয় তাহা ব্যবহার করিয়া ফল না পাইয়া স্বয়ং স্বদেশী বিটলবণ হইতে হোমিওপ্যাথী মতে নেট্রাম মিওর বিট প্রস্তুত ও ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদ মতে লবণ পাচক, আগ্নেয়, রুচিকর, ছেদক ও ভেদক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, গুরু, তীক্ষ্ণ, সারক, বাতহর, দেহের স্তম্ভন, বদ্ধতা ও কাঠিন্য নাশক এবং শিরাদি মার্গ সকলের শোষণকারী। ইহা কফ ও পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, শুক্র ও দৃষ্টিশক্তির ক্ষতিকর। অধিক সেবনে দেহের শিথিলতা ও মৃদুতা কারক।

আধুনিক মতে লবণ রক্তের ও শরীরের তরল রসের ঘনত্ব বা দানাবাঁধা নিবারণ করিয়া উহা দ্রবণীয় অবস্থায় রাখে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলে অধিক পরিমাণ জলীয় পদার্থ সঞ্চিত হইতে দেয় না এবং শরীরস্থ যে সব পদার্থের উপর জীবনীশক্তি নির্ভর করে, তদ্ভূত নানাপ্রকার রসের নিঃসরণ নিয়মিত করে।

লবণ পাচকরসের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি করিতে এবং অণ্ডলালা জাতীয় খাদ্য পরিপাকে বিশেষ সহায়তা করে। ইহা সেবনে অস্থিগঠন, আহার পরিপাক, পুষ্টিসাধন, সর্ব্বপ্রকার রসের ক্ষারত্ব ও দৃঢ়তা সম্পাদন ক্রিয়া সম্যকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। লবণ শরীরের অন্যতম প্রধান কার্য্যকরী উপাদান। ইহাতে রক্তপরিষ্কারক গুণ সমধিক পরিমাণে আছে। দেহের ভিন্ন ভিন্ন পাচকরসে যে লবণদ্রাবক এবং রক্তে ও পিত্তে যে সোডাক্ষার আছে তাহা লবণ হইতে উদ্ভূত

হয়। শরীরধারণ ও বৃদ্ধির জন্য অন্য কোন উপাদান ইহার স্থান লইতে পারে না। লবণ সেবনে দেহে নানাপ্রকার পীড়া জন্মে না, দেহ মৃত্যুর হস্ত হইতে সাধারণতঃ রক্ষিত হয়।

স্নানের জলে সৈন্ধব বা সামুদ্রিক লবণ মিশাইয়া মধ্যে মধ্যে স্নান করিলে সমুদ্র স্নানের উপকারিতা লাভ হয়। ইহা একজন পাশ্চাত্য দেশীয় স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ লিখিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন—

"The pores of the skin take it as eagerly as if so many hungry mouths were opening for a veritable feast."

"ত্বকের লোমকূপগুলি আগ্রহের সহিত লবণ গ্রহণ করে যেন তারা প্রকৃত ভোজোৎসবে মুখ খোলে।"

স্নান জলের সহিত প্রথমে চা চামচের অর্দ্ধভাগ লবণ ক্রমে এক চামচ অবধি মিশান যাইতে পারে। আহারের পূর্ব্বে ½ চায়ের চামচ লবণ এক গ্লাস জলে মিশাইয়া সেবন করিলে বুক জ্বালা ও অম্ল সভ্য প্রশমিত হয়। বিষাক্ত জীবের দংশনে, ক্ষতে ও রক্তস্রাবে উহা বিশেষ উপকার করে।

রক্ত পরিষ্কার করিতে লবণের বিশেষ ক্ষমতা আছে। সেইজন্য চক্ষু, কেশ ও মুখ রোগে এবং হাতপা ফাটিলে লবণ-জলের প্রলেপ হিতকর। দেহে উহার অভাব হইলে কৃমি প্রভৃতি রোগ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। খাদ্যের সহিত লবণ গ্রহণে মুখের লালা অধিক পরিমাণে ক্ষরিত হয়।

লবণের এত উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও কোন কোন গ্রন্থকার (তন্মধ্যে মহাত্মা গান্ধীও একজন) লবণের সর্ব্বপ্রকার

সংস্রব বর্জ্জন করিবার আদেশ দিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং দুই বৎসর যাবত লবণাহারাভ্যাস ত্যাগ করিয়া দেখিয়াছেন যে উহাতে স্বাস্থ্যহানি হয় না বরং অনেক বিষয়ে উন্নতি হয়। যথা, পূর্ব্বের ন্যায় তৃষ্ণা থাকে না, অধিক পরিশ্রম করিতে পারা যায় এবং শরীর হালকা ও সুস্থবোধ হয়।

কিন্তু উক্ত নিষেধাজ্ঞা সুস্থ ও অসুস্থ সকল বয়সের সকল লোকের পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে না। অপর কোন আহারতত্ত্ববিদ্ বা শাস্ত্রকার লবণ বর্জ্জনের ব্যবস্থা দেন নাই। উহার অভাবে অনেক দোষ ঘটে সুতরাং ঐ কথা কখনই যুক্তি, বিচার ও বিজ্ঞানসম্মত হইতে পারে না।

অধিকদিন যাবৎ অতিরিক্ত পরিমাণ লবণ ব্যবহারের প্রতিকারার্থে অবস্থা বিশেষে সাময়িক লবণ উপবাস প্রয়োজন—উপরোক্ত আদেশ-বাণীর ইহাই প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইবে। শোথ, বেরিবেরি, অর্শ, হাঁপানি, রক্তের চাপ (Blood pressure) ইত্যাদি রোগে লবণ নিষিদ্ধ। এই সকল রোগে লবণ আহার ত্যাগ করিলে সমূহ উপকার হয়।

অধিকদিন যাবৎ প্রয়োজনের অধিক লবণ সেবনে উহা দেহের বিভিন্ন সন্ধিতে সঞ্চিত হইয়া, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সে শরীরে গ্লানি, অকালে চর্ম্মের শিথিলতা বা লোলতা, কেশপক্কতা, টাক, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, চক্ষু, বাত ও চর্ম্মরোগ, মূত্রস্থলীর বিশৃঙ্খলতা ইত্যাদি দোষ বা রোগ জন্মে। এইজন্য উক্ত বয়সে লবণের পরিমাণ অল্পে অল্পে কমাইলে অনেক অনর্থ নিবারিত হইতে পারে।

মধুর।

আয়ুর্ব্বেদ মতে মধুর রস শরীরের রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, ওজঃ, শুক্র, স্তন্য ও দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধক; আয়ু, স্বর, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনের প্রসন্নতাকারক, বলবর্দ্ধক, পিত্ত, বিষ ও বায়ুনাশক; তৃষ্ণা, দাহ ও মূর্চ্ছা নিবারক; ত্বক, কেশ ও কণ্ঠের হিতকর; ক্ষীণ রোগীর ধাতুপোষক, প্রীতিজনক, জীবনীয়, তর্পণীয় ও স্নেহনীয়; দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদক ইত্যাদি। উহা স্নিগ্ধ, শীতল ও গুরু।

আধুনিক মতে মধুর রস উত্তেজক ও পাচক। ইহা সহজে দেহে শোষিত হয় এবং দেহমধ্যে গ্লাইকোজেনরূপে সঞ্চিত হইয়া আবশ্যকানুযায়ী ব্যয়িত হয়। ইহার দ্বারা পেশীর কার্য্যকারিতা শক্তি ও তাপ বর্দ্ধিত এবং সঞ্চিত হয়।

ক্লান্তি দূর করিতে শর্করা মদ্য অপেক্ষা অধিক উপকারী। যুদ্ধ বিগ্রহ কিম্বা দীর্ঘ পথ অতিক্রান্ত করিবার সময়, বিশেষতঃ উচ্চ পর্ব্বতারোহণ করিতে সৈন্যদিগকে চিনি বা চিনিবহুল কোকো ও চকোলেট খাইতে দেওয়া হয়, তাহাতে তাহারা শীঘ্র অবসন্ন হয় না। কৃশতা, দুর্ব্বলতা, ক্ষয় ও রক্তাল্পতা রোগে, বার্দ্ধক্যজনিত দুর্ব্বলতায়, পিত্তবিকারে এবং শুষ্ক কাসি ও হুপকাসিতে মিষ্টরস উপকারী।

উহা নিয়মিতভাবে অধিক সেবন করিলে গাত্রগুরুতা, শীতপ্রধান জ্বর, শ্বাস, কাস, অলসতা, নিদ্রাধিক্য, বমন, স্বরভঙ্গ, ক্রিমি, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, কোষবৃদ্ধি, শ্লীপদ, বস্তিদেশ ও মলদ্বারের উপলেপ এবং চক্ষু পীড়াদি জন্মে। বহুমূত্র, বাত, মধুমেহ ও মেদ রোগে অধিক মিষ্টরস সেবন বিষতুল্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মিষ্টত্ব হিসাবে মধু ও অন্য শর্করা জাত দ্রব্য এক, তবে মধুর কতকগুলি বিশেষত্ব আছে তাহা পরে বলা হইবে। মধু যদিও

অধিক পুষ্টিকর ও উপকারী কিন্তু মহার্ঘ, চিনি সুলভ। চিনির বিশেষত্ব, উহা হইতে আমাদের দেশে বহু উপাদেয় মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। আমরা অত্যধিক মিষ্টান্নপ্রিয়, এত মিষ্টান্নের প্রচলন আমাদের দেশ ভিন্ন আর কোথাও নাই। রসগোল্লা বা রাজভোগ ও সন্দেশ বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব আবিষ্কার। আমাদের অতিথি বা আত্মীয় ও বন্ধু সেবায় মিষ্ট মুখ বা মিষ্টান্নভোজন করাইবার প্রথা একটি বিশিষ্ট আপ্যায়ন।

বাঙ্গালা দেশের যে যে স্থানে যে যে মিষ্টান্নাদি প্রসিদ্ধ তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

কলিকাতা—সন্দেশ বিশেষতঃ আবারখাব সন্দেশ এবং রাজভোগ (রসগোল্লা)। গিরিশ ময়রার কড়াপাকের সন্দেশ এবং দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ও নব ময়রার নরম পাকের সন্দেশ অতি উৎকৃষ্ট।

বনগাঁ ও গোপাল নগর—কাঁচাগোল্লা।

চন্দন নগর—গোলাপী পেঁড়া ও জলভরা তালশাঁস সন্দেশ অতি উত্তম।

জনাই—মনোহরা সন্দেশ।

রাণাঘাট—পান্তুয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বনগাঁ ও উলুবেড়ের পান্তুয়ারও নাম আছে।

ধনেখালি—খইচুর।

জয়নগর মজিলপুর—মোয়া ও পয়রা (তাতারসি) গুড়।

বর্দ্ধমান—মিহিদানা, সীতাভোগ, খাজা ও ওলা।

বৈদ্যনাথ—ক্ষীরের পেঁড়া।

ঢাকা—অমৃতি জিলেবি, পাতক্ষীর ও মালাই।

বিক্রমপুর—পাতক্ষীর, দই ও নারিকেলের জিরা চিঁড়া।

মগরাহাট—(মোল্লার চকের) দই।

আয়ুর্ব্বেদে বহুতর অন্য মিষ্টান্নের গুণাগুণ বিবৃত আছে তাহাদের মধ্যে যেগুলির প্রচলন এখনও আছে তাহাদের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল :—

টাটকা জিলেবি—তৃপ্তি, পুষ্টি, শুক্র ও কান্তিবর্দ্ধক এবং বলকর।

মতিচূর—লঘু, ধারক, শীতবীর্য্য, রুচি ও তৃপ্তিজনক, চক্ষুর হিতকর ও বলজনক।

খাজা—শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘুপাক, পিত্ত ও বায়ু নাশক এবং তীক্ষ্ণাগ্নিযুক্ত ব্যক্তিদের হিতকর। অজীর্ণ রোগীর অপথ্য।

মোহন ভোগ—গুরুপাক, স্নিগ্ধ, রুচি, তৃপ্তি, পুষ্টি, বল, শুক্র ও কফবর্দ্ধক এবং বাত ও পিত্তনাশক। ইহা অম্লবহুল আহার্য্য কিন্তু কিসমিস যাহা ক্ষার বহুল তাহার সহিত মিলনে অম্লত্ব দোষ কাটিয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিভিন্ন মিষ্ট দ্রব্যের নিম্নলিখিত গুণাগুণ বর্ণিত হইয়াছে :—

ইক্ষু—শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মূত্রজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক, পুষ্টিকর, ক্লান্তিনিবারক, তৃপ্তিকর, ক্রিমি-উৎপাদক, বায়ু, পিত্ত ও রক্ত দোষে হিতকর।

গুড়—গুরুপাক, বলকারক ও ক্রিমিজনক।

বিশুদ্ধ চিনি—শীতল, রুচিকর, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং দাহ, তৃষ্ণা বমি, মূর্চ্ছা, ভ্রম, জ্বর, কাস, রক্তপিত্ত ও শোথ রোগে হিতকর।

ক্যাম্বোজ দেশে একপ্রকার মৃত্তিকা পাওয়া যায় তাহা তীব্র রৌদ্রে শুষ্ক করিলে শর্করার ন্যায় পদার্থে পরিণত হয়। সে দেশের লোক উহা ব্যবহার করে।

চিনি অপেক্ষা গুড়ে অধিক পরিমাণ ভিটামিন আছে। আখের অপেক্ষা খেজুরে গুড়ে অধিক, তবে গুড় মাত্রেই অল্প বিস্তর ময়লা থাকে।

কলের সাদা চিনিতে হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি আপত্তিকর পদার্থ মিশান হয় এবং অধিক পরিস্কৃত হয় বলিয়া উহার গুণের সমধিক অপচয় হয়। বিট চিনি পরিষ্কার করিতে রং, কার্ব্বলিক অ্যাসিড ও গন্ধকদ্রাবক মিশান হয় বলিয়া শোনা যায়।

উপরোক্ত কারণে কলের চিনি অপদার্থ ও পরিত্যজ্য। একথা অনেক পুষ্টিতত্ত্ববিদ বলিয়াছেন। অত্যধিক পরিমাণে উক্ত চিনি সেবনে পাকাশয়ে ক্ষত, আন্ত্রিকরোগ, অজীর্ণ, পরিপাক বিভ্রাট, অম্ল ও বহুমূত্র রোগাদি জন্মে। আধুনিক স্বাস্থ্য বিপর্য্যয়ের ইহা একটী প্রধান কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মাদক দ্রব্যের ন্যায় চিনি খাইবার স্পৃহা বা নেশা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। ইহা অধিক পরিমাণে সেবনে মদ খাইবার স্পৃহা থাকে না এইজন্য মদ্যপায়ীগণ চিনি ভক্ত নন।

আজকাল স্যাক্যারিণ নামে অতি মিষ্ট রাসায়নিক কৃত্রিম চিনি কোন কোন ক্ষেত্রে চিনির প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। সিস্টার এম্ বি কট্ (Sister M. B. Cott) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে উহা হৃৎপিণ্ড বিষাক্তকর, অতএব পরিত্যজ্য।

মিসরি চিনি অপেক্ষা গুণশালী। উহা রক্তদোষ নিবারক ও কোষ্ঠ পরিষ্কারক। বিশুদ্ধ দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত চিনি (Sugar of milk) সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

মধু।

সকল মধুর রসের মধ্যে মধু শীর্ষস্থানীয় বলিয়া উক্ত হয়। আয়ুর্ব্বেদে তিন প্রকার মধু বর্ণিত হইয়াছে। মাক্ষিক মধু তৈলবর্ণ, ভ্রমর হইতে

উৎপন্ন মধু শ্বেতবর্ণ, ক্ষৌদ্র মধু কপিল বর্ণ এবং পৌত্তিক মধু ঘৃতবর্ণ। মধুমক্ষিকাগণ সময়ে সময়ে বিষ পুষ্প হইতেও মধু সংগ্রহ করে সেইজন্য কোন কোন মধুতে বিষের সঞ্চার হয়। মধুতে যে চিনি থাকে তাহা মৌমাছির জঠরে পরিপাক হইয়া মানুষের ব্যবহারে আসে সেইজন্য উহা সহজেই দেহে শোষিত হয়। এ সম্বন্ধে আর একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, মধুতে রোগের বীজাণু বাঁচে না।

ইহা সিদ্ধ করিয়া সেবন, বিশেষতঃ উষ্ণ ব্যক্তির পক্ষে, নিষিদ্ধ। উহা সময়ে সময়ে প্রাণহানিকর হইতে পারে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ মধু সিদ্ধ করিয়া সেবনে বা অপরকে সেবন করাইয়া অনেক উপকার পাইয়াছেন। ইহার ভিতর সত্য এই যে, মধু যদি নির্দ্দোষ হয়, উহাতে যদি বিষাক্ত ফুলের রস বা মৌমাছির বিষাক্ত হুল না থাকে তাহা হইলে সিদ্ধ বা অসিদ্ধ উভয় অবস্থায়ই উহা গ্রহণযোগ্য। এইজন্য মধু বেশ করিয়া মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া প্রথমে অল্প পরিমাণ সেবন করিয়া উহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

শিলং পাহাড়ে যে কমলা-মধু পাওয়া যায়, তাহা খাসিয়া পাহাড়ের কমলালেবু গাছের চাক হইতে গৃহীত হয়। উহার বর্ণ সোনালী এবং উহা অতি সদ্গন্ধযুক্ত ও উপাদেয়। আমরা ঐখানকার চাক নিঙড়ান কাঁচা মধু, চা বা লুচির সহিত অনেকবার অনেকদিন ধরিয়া উপভোগ করিয়াছি—কোন অনিষ্ট হয় নাই।

শাস্ত্রমতে মধু শীতল, রুক্ষ, লঘুপাক, অগ্নি, বল ও মেধাজনক, মলরোধক, চক্ষুপরিষ্কারক, ভগ্নসংযোজক, ব্রণরোপক, স্বরবর্দ্ধক, স্রোতবিশোধক, শুক্রস্তম্ভনকারক বা শুক্রবর্দ্ধক। উহা কাস, শ্বাস, হিক্কা, জ্বর, অতিসার, বমি, তৃষ্ণা, ক্রিমি, বিষদোষ ও ত্রিদোষ নাশক বা উপশমক। পদ্মমধু অধিকন্তু অতিশয় বৃংহণ ও সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগে

কল্যাণকর। নূতন মধু কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মাজনক কিন্তু শরীরের স্থূলতা-সম্পাদক। পুরাতন মধু কৃশতাকারক, কুষ্ঠ, অর্শ, রক্তপিত্ত, প্রমেহ, ক্লান্তি, পিপাসা, বমি, মলবদ্ধতা, দাহ ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

অতি মাত্রায় মধু সেবন অহিতকর—ইহাতে উদরে আম জন্মে। অমৃতও অবস্থা বিশেষে বিষের কাজ করে। তুল্য পরিমাণ মধু ও ঘৃত বা মধু ও বৃষ্টির জল পান সংযোগবিরুদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

আধুনিক মতে মধু কাহারও পক্ষে কোষ্ঠবদ্ধকর কাহারও পক্ষে কোষ্ঠপরিষ্কারক। ইহার বহু রোগ-আরোগ্যকারী শক্তি আছে। এম্ প্ল্যাটেন্ সাহেব লিখিয়াছেন—বয়স্কদের প্রাতর্ভোজনের সময় লাল আটার রুটি ও গরম দুধের সহিত মধু আহার তৃপ্তিকর, পুষ্টিকর, কোষ্ঠ ও রক্ত পরিষ্কারক, বলকর ও স্বাস্থ্যকর। প্রসিদ্ধ স্বভাব চিকিৎসক ফাদার নিপ বলিয়াছেন যে অন্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রণে মধুর উপকারিতা বর্দ্ধিত হয়। এইজন্য বৈদ্যশাস্ত্রে অনেক ঔষধের সহিত মধু মাড়িয়া সেবনের ব্যবস্থা আছে।

চায়ের সহিত মধু ও আদার রস মিশ্রিত করিয়া সেবনে সর্দ্দি ও শ্লেষ্মারোগ উপশমিত হয়। দেহের বাহিরের ক্ষতরোগে নির্দ্দোষ মধুর ঘন মলম অন্য মলম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জল বা চায়ের সহিত অল্প অল্প মধু সেবনে পাকাশয়ের ক্ষত আরোগ্য হয়। জর্ম্মনীর একটী নগরের হাঁসপাতালে মাছের পিত্ত ও মধুর প্রলেপে পোড়া ঘা আরোগ্য করা হইতেছে। বাতরোগে মৌমাছির হুলের বিষ উপকারী। শ্বাসাল্পতায় ও হাঁপানীর মৃদু আক্রমণে মধু শুঁকিলে বিশেষ উপকার হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

গায়কদের জলসহ মধুর কুল্লী উৎকৃষ্ট স্বর-বর্দ্ধনকারী সুধা। ইহা নানা চক্ষুরোগেও হিতকর। শিশু ও বৃদ্ধদের ইহা আদর্শ শক্তিশালী আহার্য্য। প্ল্যাটেন্ সাহেব তাঁহার পরিচিত একজন নিত্য মধুসেবী

৮০ বৎসরের অধিক বয়স্ক বৃদ্ধের কথা লিখিয়াছেন। সে তাঁহাকে বলিয়াছিল, "আমার অক্ষুণ্ণ দৈহিক শক্তির একমাত্র কারণ আমি প্রতিদিন মাত্র ১ চামচ পরিমাণ মধু গরম জলে ফুটাইয়া পান করি। (অবশ্য সে অন্য স্বাস্থ্যনীতি প্রতিপালন করিত)। প্ল্যাটেন্ সাহেব নিজে উপরোক্ত মধু-মদ এক গ্লাস সেবন করিয়া দেখিয়াছেন যে উহাতে কোষ্ঠপরিষ্কার হয় এবং উহা মদিরা অপেক্ষা অধিকতর নির্দ্দোষ, পুষ্টিকর, রুচিকর ও শক্তিপ্রদ। উহা দুর্ব্বল, অবল, শিশু, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ ও অতিবৃদ্ধের পক্ষে সমান হিতকর। দেহে বিষ সঞ্চিত হইলে ১ বা ২ চামচ মাত্রায় মধু সেবনে উহা নিষ্কাশিত হয়। গরম জলের সহিত মধুর কুল্লী করিলে গলগণ্ড রোগেও উপকার হয়। মৌরীর জলের সহিত মধু সেবনে পাকস্থলীর গ্যাস বা বদ্ বাষ্প বাহির হইয়া যায়। মাত্রা ঘণ্টায় ১ চামচ। ঔষধার্থে তিনি কাঁচা মধু অপেক্ষা গরম জলে ফোটান মধুই অধিক উপযোগী ও হিতকর বলিয়াছেন। দুর্ব্বল বা অসুস্থদেহ শিশুদের দুধের সহিত ছুরিকার অগ্রভাগে যতটুকু মধু ধরে ততটুকু মাত্র দিনে ২।৩ বার সেবন করিতে দিলে তাহারা দিন দিন স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করে।

আর একজন ইংরাজ স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছেন যে পুরাকালে অনেক লোক মধু সেবন করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছে। বিখ্যাত বৈয়াকরণিক টেলিফাস্ কেবলমাত্র শস্য মণ্ডের সহিত মধু সেবন করিয়া ১০০ বৎসরের অধিক জীবিত ছিলেন। মধুর অপরাপর ওষধিগুণ আমাদের জানা আছে—যথা গাল, গলা, কুঁচকি বা বাগীতে ব্যথা ও বিচি হইলে প্রথম অবস্থায় চুণ ও মধু প্রলেপে উহা প্রশমিত হয়। মেদরোগে স্থূলদেহীকে কৃশ করিবার জন্য মধুর সহিত অল্প জল পান প্রশস্ত।

বিভিন্ন রস সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, সকল রসের নিত্য সেবন শরীর রক্ষার্থে প্রয়োজন। এক বা একাধিক রসের অতিরিক্ত সেবনই অনিষ্টকর। মহর্ষি চরক বলিয়াছেন —"সর্ব্বরসের সাত্ম্যতা উৎকৃষ্ট, দুই, তিন, চার ও পাঁচ প্রকার রসের সাত্ম্যতা মধ্যম, এক রসের সাত্ম্যতা নিকৃষ্ট এবং কোন রসের অতিসেবন অনিষ্টকর।"

খাদ্য রস সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আরও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য আছে তাহা জানা আবশ্যক। খাদ্যের ছয় প্রকার রস পৃথকভাবে বা মাত্রানুযায়ী সম্যক সংযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইলে শরীরের হিতকর হয়। কিন্তু অধিক মাত্রায় বা অযথা গৃহীত হইলে ত্রিদোষ কুপিত হইয়া নানাবিধ অপকার করে। উক্ত মতে এক একটী দোষ তিন তিনটী রস কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয় এবং তিন তিনটী রস দ্বারা প্রশান্ত হয়। যথা—কটু, তিক্ত ও কষায় রস বিশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণে বায়ু জন্মে এবং মধুর, অম্ল ও লবণ রসযুক্ত দ্রব্য ভোজনে বায়ুর শান্তি হয়। কটু, অম্ল ও লবণ রসে পিত্ত কুপিত হয়; সে দোষ মধুর, তিক্ত ও কষায় রস সেবনে উপশমিত হয়। অম্ল, মধুর ও লবণ রসে শ্লেষ্মা জন্মে, উহা কটু, তিক্ত ও কষায় রস সেবনে বিনষ্ট হয়।

আহার্য্য দ্রব্যের রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও শক্তি, এই পাঁচটী আপন আপন কার্য্য সম্পন্ন করে। বিভিন্ন রসের মিলনে উহাদের স্ব স্ব স্থূল ক্রিয়ার বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে।

গুণ—দ্রব্যের গুণের তারতম্যে উহার রসের কার্য্যের ব্যতিক্রম হয়।

বীর্য্য—এই জগতের সমস্তই প্রধানতঃ আগ্নেয় ও সোমগুণাত্মক বলিয়া যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ উষ্ণ বা শীত বীর্য্য। সেইজন্য এক রস সম্পন্ন আহার্য্য কোনটী উষ্ণবীর্য্য, কোনটী বা শীতবীর্য্য, আবার কোন

জাতীয় আহারীয় দ্রব্য, কফ, পিত্ত বা শ্লেষ্মা কারক হইলেও ঐ শ্রেণীর অন্য আহারীয়ে সে দোষ নাই। সুতরাং উহাদের মিলনে গুণের পরিবর্ত্তে দোষ অথবা দোষের পরিবর্ত্তে গুণ জন্মে।

বিপাক—ভুক্ত দ্রব্যের বিভিন্ন রস মুখগহ্বর, পাকাশয় ও অন্ত্রের বিভিন্ন পাচক রসের সহিত মিশ্রণে একটী নূতন যৌগিক রসের উৎপত্তি হয়। ইহারই নাম বিপাক। বিপাক তিন প্রকার—মধুর বিপাক, অম্ল বিপাক ও কটু বিপাক। মধুর ও লবণ রস বিশিষ্ট খাদ্য বিপাকান্তে মধুর হয়; ইহা কফকারক, বায়ু ও পিত্ত নাশক। অম্লরস বিশিষ্ট খাদ্য বিপাকে অম্লই থাকে; ইহা, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ু ও কফনাশক। কটু, তিক্ত ও কষায় এই তিন রস বিশিষ্ট খাদ্য বিপাকে কটু হয়, ইহা বায়ুবর্দ্ধক, কফ ও পিত্তনাশক।

শক্তি—শক্তি, রস ও বিপাকের শেষ পরিণতি। ইহা এত সূক্ষ্ম যে সহজে ধারণায় আসে না।

এত বিচার করিয়া আহার নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন। এই জটিল বিষয়ে সহজাত জ্ঞান অনেক সময় সহজ ও সরল পথ নির্দ্দেশিত করিতে পারে। আত্ম-পরীক্ষায় বিভিন্ন রস মিশ্রণের ফলাফল সঠিক ভাবে সত্যের সন্ধান দিতে পারে। রসতত্ত্ব বিষয়ক তথ্যগুলি প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য, যাহাতে সকলের কিছু না কিছু রস জ্ঞান জন্মে নচেৎ অরসিক বা বেরসিক হইতে হইবে।

কোন কোন আধুনিক পুষ্টিতত্ত্ববিদ্ লঙ্কা, লবণ ও মিষ্ট শরীরের বিষম বৈরী বলেন এবং তৎসম্বন্ধে যে যুক্তির অবতারণা করেন, যথা ঐ সকল রস সেবনে বীর্য্য তরল হয় এবং স্বস্থান অর্থাৎ মস্তক ও মাংসপেশীর সন্ধি চ্যুত হইয়া মূলাধারে বা বস্তি প্রদেশে আনীত হয় তজ্জন্য শুক্রক্ষরণ হয় এবং নানা রোগ জন্মে। কিন্তু ইহা অতিসেবনজনিত দোষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যবিদ্ যতিগণের

পক্ষে লবণ ও লঙ্কা নিষিদ্ধ, তাহা বিশেষ বিধি, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে উপযোগী নয়। পরিশেষে, মন ও ইন্দ্রিয়াদির উপর বিভিন্ন রসের প্রভাব বিষয়ক নিম্নোক্ত আলোচনা, আশা করি, অবান্তর বলিয়া মনে হইবে না।

মানুষের মনও বিভিন্ন রসে রসে যায়। যখন উহা কোন কারণে তিক্ত হয় তাহা ভাষায়, ভাবভঙ্গীতে বা ব্যবহারে প্রকাশ পায়। মন কটু হইলে রাগ, ঝাল বা রৌদ্রভাব উদ্রিক্ত হয়। মন যখন আর্দ্র বা করুণাসিঞ্চিত হয়, চোখের জলে বুক ভেসে যায়। মন যখন টকে যায় তখন কিছুই ভাল লাগে না। মন বা প্রাণ যখন মিষ্ট হয় তখন মহাত্মা কালী প্রসন্ন ঘোষের কারাবাস কালে রচিত প্রসিদ্ধ গানের ভাষায় বলা যায় "তখন সকলি মধুর, যা শুনি তাই সকলি মধুর, যা দেখি তাই সকলি মধুর, যা বলি তাই সকলি মধুর। তখন নিখিল বিশ্ব হয় মধুময়, তখন অনলে অনিলে জলে মধু প্রবাহিণী চলে, তখন মধুর রসে সকলি ভরপুর।"

মিষ্ট কথায় বা মিষ্ট ব্যবহারে শত্রু মিত্র হয় অন্য পরে কা কথা!

রস বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া হয়ত লেখক বিপাকে পাঠক-পাঠিকাগণের মনে কটু বা তিক্ত ভাব সঞ্চার করিয়াছে, সেইজন্য সেই অপরাধ স্খালনার্থে তাঁহাদিগকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ভোজন বিলাস ও রসালাপ আস্বাদন করাইয়া এই অধ্যায় মধুরেণ সমাপ্ত করিলাম।

> কুর্য্যাৎ ক্ষীরান্তমাহারং দধ্যন্তং ন কদাচন,
> লবণাম্ল কটূষ্ণাণি বিদাহী নি চ যানি তু,
> তদ্দোষং হর্ত্তুমাহারং মধুরেণ সমাপয়েৎ।

শ্রীকৃষ্ণের আহারকালীন মধুমঙ্গল (বটু) ও অন্যান্য সখার রস সম্বন্ধে হাস পরিহাস।—(শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত)

বটু—এই সকল চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্ব্বিধ লাড়ু, সরবৎ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গের মূর্ত্তিমান ফল।

শ্রীকৃষ্ণ—শাস্ত্রানুসারে রস কয়টী ?

বটু—আমার মতে রস ছয়টী, যেহেতু চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন এই ছয় জন মাত্রতো আস্বাদক, কাজেই রসও কটু, তিক্ত, মধুর, কষায়, ক্ষার ও অম্ল। মূর্ত্তিমান ষড়রসময় এই গঙ্গাজলি নাড়ু প্রভৃতির সুরূপতা নয়নেন্দ্রিয়ের, মধুরতা রসনান্দ্রিয়ের, সৌগন্ধ নাসিকার, মৃদুতা ত্বকের, চর্ব্বণকালীন সুস্বরতা কর্ণের ও ভোজনজনিত আনন্দ, মনের আস্বাদনীয়। সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত কথা চর্ব্বণেই রস নিষ্পত্তি সুতরাং সাকার রসের পরিবর্ত্তে শৃঙ্গারাদি নিরাকার রসের চর্ব্বণ কখনও কি হয় ?

বলদেব—তোমার কথিত রসাস্বাদেও তবে অষ্ট সাত্বিকাদি অনুভাব অবশ্যই বর্ত্তমান আছে।

বটু—(উচ্চ হাস্য করিয়া) তা না থাকিলে আবার রস কি ? সবই রহিয়াছে। আমি নিজেই ইহার অপূর্ব্ব উদাহরণ, যেহেতু এইরূপ অপূর্ব্ব মিষ্টান্নাদি না পাইলে আপনি চোখে জল আসে, পাইলে আনন্দ-রোমাঞ্চ হয়, আর ভোজনজনিত তৃপ্তিতে রুক্ষ শরীর স্নিগ্ধ হইয়া এই যে আমার চমৎকার বর্ণ বিকাশ দেখিতেছ ইহাই বৈবর্ণ্য ; ভোজন সত্বরতার শ্রমে স্বেদোদ্গম, সমস্ত ভোজনে অক্ষম হইয়া দুঃখে স্তম্ভকর এবং ভূরি ভোজনের ভাগ্য ঘটিলে পরিশেষে প্রলয় অর্থাৎ অচৈতন্যতা।

এইত গেল অষ্ট সাত্বিক, তা ছাড়া স্থায়ীভাবরূপা যে "রতি" তাহা হইতেই ত ভোজনপ্রেমের উদয়। আর হাস্যোত্থ—হর্ষ, নিদ্রালস্যাদি সঞ্চারী ভাব কার না হয় বল দেখি ?

শ্রীকৃষ্ণ—না জানি কত তপস্যায় তোমার এই সকল সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে।

বটু—নিশ্চয়, আমি পূর্ব্বজন্মে বনে গমন করিয়া ঘোর তপস্যাচরণ করিয়াছি। বনে বনে পশুচারণ কালে আমার পবিত্র অঙ্গ পরিমলময় সমীরণ তোমরাও স্পর্শ করিয়াছিলে, নহিলে নিত্য নিত্য এইরূপ সর্ব্বরসের আস্বাদন সৌভাগ্য তোমাদেরই বা অদৃষ্টে ঘটিবে কেন?

সুবল—রসজ্ঞ শিরোমণি! আমার মনে হয় বানরগুলোও তোমার মত বাত, বর্ষা, শীতোষ্ণাদি সহিয়া পত্র পুষ্প ফলাদি অরন্ধন ভোজনে তপস্যাকারী বটে; সেইজন্য তাহারা ষড়রসের রসিক হইয়া অট্টালিকার ছাদে বসিয়া সলালসে সুযোগান্বেষণ করিতেছে আর তোমার পানে চাহিতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রস বিজ্ঞান।—(দ্বিতীয় পল্লব)

অম্ল ও ক্ষার।

(আধুনিক মতবাদ)

ব্যামফোর্ড ষ্ট্যানলি সাহেব বলিয়াছেন যদি শরীরের কোন অংশ স্বাস্থ্যের জন্মভূমি বা আদি উৎস বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, তাহা রক্ত। সাধারণতঃ বিশুদ্ধ আহার বিধিমত সেবনে বিশুদ্ধ রক্ত উৎপন্ন হয়। সন্তান সন্ততি যেমন পিতামাতার দেহের রূপান্তর, দেহও রক্তের রূপান্তর। আবার রক্ত যাহাকে জীবনদ্রাবক (Liquified life) বলা যাইতে পারে তাহা আহার্য্যের রাসায়নিক রূপান্তর।

রক্ত স্বভাবতঃ ক্ষারবহুল। যদি অম্লবহুল বা অম্ল উৎপাদক খাদ্য অধিক পরিমাণে আহার করা যায় তাহা হইলে রক্ত অম্লবহুল হইয়া স্বাস্থ্যের ঘোরতর অনিষ্ট করে।

পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে যদি রক্ত ক্ষারবহুল হয় অর্থাৎ উহাতে যদি সোডা, পটাসাদি লাবণিক পদার্থ আবশ্যকের অধিক থাকে তাহা হইলে ঐগুলি দেহে প্রবিষ্ট সংক্রামক রোগের বীজাণুগুলি সম্যক বিনষ্ট করিতে পারে।

প্রত্যেক মানবদেহে বিভিন্ন প্রকার পরিপোষণকারী আহার্য্য-দ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়ায় অম্ল উৎপন্ন হইতেছে। উহার প্রতিষেধার্থে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষারবহুল খাদ্য আহার করা এবং ঐ সঙ্গে অম্লবহুল

খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করা প্রয়োজন যাহাতে ক্ষার ও অম্লের সঠিক অনুপাত রক্ষিত হয়।

পুষ্টিতত্ত্ববিদ্ শ্রীনিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন যে অনেকে লুচির সহিত হালুয়া খাইয়া থাকেন। দুইটীই অম্লবহুল। লুচির সহিত ক্ষারবহুল আলুর দম বা কিসমিস মিশ্রিত হালুয়া সেবনে অম্ল ও ক্ষারের বৈষম্য অনেকাংশে নিবারিত হইতে পারে। অনেক বাঙ্গালী বড়লোকের ছেলে-মেয়েরা প্রধানতঃ উক্ত প্রকার অসামঞ্জস উচ্চ মূল্যের খাদ্যগ্রহণে প্রায়ই রুগ্ন ও অপুষ্ট হয়।

দেহ রুগ্ন হইলে সাধারণতঃ অধিক ক্ষারবহুল খাদ্য বা পথ্য সেবন বিশেষ প্রয়োজন। এইজন্য রোগীকে ঘোল (Whey), ফল ইত্যাদি ক্ষারবহুল খাদ্য সেবন করাইয়া প্রকারান্তরে তাহার রক্তের ক্ষারত্ব বৃদ্ধি করা হয় যাহা রোগ নিরাময়ে বিশেষ সহায়তা করে। ঐজন্য অম্লরোগে অনেকে সোডা, চূণ ইত্যাদি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া গ্রহণ করে কিন্তু উহা রোগের মূলোৎপাটন করে না। কারণ সাধারণতঃ সেস্থলে অম্লবহুল খাদ্যের পরিমাণ কমান এবং ক্ষারবহুল খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয় না। দীর্ঘকাল রক্ত অম্লবহুল হইলে বার্দ্ধক্যের সকল লক্ষণগুলি যথা চর্ম্মের লোলতা, দেহের কৃশতা, বাত ইত্যাদি নানা রোগ বা দোষ অকালে দেখা দেয়। অকালবার্দ্ধক্যও একটী রোগবিশেষ। অনেক আধুনিক পুষ্টিতত্ত্ববিদ্গণের মতে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য, যথা ভাত, রুটি, লুচি, সাগু, বার্লি, চিনি, গুড় প্রভৃতির সহিত আমিষ জাতীয় খাদ্য যথা মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আহার, বিরুদ্ধভোজন পর্য্যায়ে পড়ে। কারণ উভয় প্রকার খাদ্যই অম্লধর্ম্মী এবং উহারা বিভিন্ন প্রকার পাচক রস দ্বারা জীর্ণ হয় বলিয়া অনেক সময় ঐ প্রকার মিশ্রিত খাদ্য উত্তমরূপে পরিপাক হয় না। আবার উহাতে অল্প ক্ষার থাকায় অম্ল ও ক্ষারের পরিমাণের সঠিক

অনুপাত রক্ষিত হয় না, সুতরাং যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার গ্রহণেও সাধারণতঃ উপযুক্ত ফললাভ হয় না। উপরন্তু ঐ সকল দ্রব্য দীর্ঘকাল পাকস্থলীর ভিতর থাকিয়া অজীর্ণ ও উদরাধ্মান সৃজন করে এবং অত্যধিক অম্ল রক্তে গৃহিত হইয়া রক্তস্রোতকে দূষিত করে, ফলে রোগ জন্মে।

ভাত রুটির সহিত মাছ বা মাংস সর্ব্বদেশে সকল লোকে আবহমান কাল হইতে আহার করিয়া আসিতেছে কিন্তু সকলেই কি এতকাল ভুল করিয়া বসিয়াছে? উপরোক্ত মতবাদ আংশিক সত্য বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ আমরা ঐ জাতীয় নানা প্রকার আহার গ্রহণ করিবার কালে প্রায়ই যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষার বা লবণ বহুল শাকসব্জি, মসলা, ফল ইত্যাদি আহার করি যদ্বারা অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষিত হয়। কিন্তু অনেক সময় অবস্থার বৈগুণ্যে উহার ব্যতিক্রম হয়। খাদ্যের লবণঘটিত উপাদান গুলির মধ্যে কোন্‌টী ক্ষার এবং কোন্‌টী অম্লবহুল সে বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে খাদ্য নির্ব্বাচনে সহায়তা করে। ডাঃ এইচ, সি, মেন্‌কেল (H. C. Menkel) বিভিন্ন লবণ জাতীয় উপাদানগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি অম্লধর্ম্মী এবং কোন্‌গুলি ক্ষারধর্ম্মী তাহার নিম্নোক্ত বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন।

অম্ল—গন্ধক, ফসফরাস, সিলিকা, ক্লোরিণ, ফ্লুরিণ, আইওডিন, আর্সেনিক ও ব্রোমাইন।

ক্ষার—পটাস, সোডা, চূণ, ম্যাগনেসিয়া, লোহা, অ্যালুইমিনা, তামা, লিথিয়াম, দস্তা ও নিকেল।

এই সকল উপাদানগুলি অক্সিজেন দ্বারা খাদ্যের সহিত পুড়িয়া দেহ হইতে বিভিন্ন যন্ত্রাদির দ্বারা মাটির জিনিষ মাটিতে চলিয়া যায়। উহাদের মাত্র স্পর্শের গুণ দেহ মধ্যে সঞ্চিত হয়।

রক্তের রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রকাশিত হইয়াছে যে উহার আটটি উপাদান ক্ষারধর্ম্মী, মাত্র একটী (ক্লোরিণ) অম্লধর্ম্মী। রক্তের ন্যায়

দেহের অন্যত্রও ক্ষারের আধিক্য আছে। দেহ তন্তু ও দেহের তরল রসেরও ক্ষার ও অম্লের পরিমাণের কম বেশীতে স্বাস্থ্য প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন একটীর অযথা আধিক্যে, অস্বাস্থ্য, রোগ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। উহাদের সঠিক মিলনে দেহ পুষ্ট ও সুরক্ষিত হইতে পারে। জীবন ভোর অম্ল ও ক্ষারের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে।

মোটামুটি, দুধ, ফল, শাক ও সব্‌জি অন্য খাদ্যের ৪ গুণ পরিমাণ আহার করিলে দেহে অম্লাধিক্য দোষ জন্মে না। কোন্ কোন্ দ্রব্য ক্ষার বা অম্লবহুল তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। উহা মনে রাখিলে উক্ত দুই প্রকার খাদ্যের কোন একটীর আধিক্য নিবারিত হইতে পারে।

অম্লজনক খাদ্য।

মাছ, মাংস, ডিম, ময়দা, রুটি বা পাঁউরুটি, বিস্কুট, লুচি, কচুরি, খাজা, গজা ও অন্যান্য ঘৃত বা তৈল পক্ক খাবার, মদ, চা, কফি, বাদাম, কুল, আখরোট, চিনাবাদাম, কড়াইসুঁটি, সিম, কুল, চাল, চিনি বিশেষতঃ কলের। সংযোগবিরুদ্ধ ভোজনেও অম্ল উৎপন্ন হয়।

ক্ষারজনক খাদ্য।

সকল প্রকার ফল (কুল, বাদাম ও আখরোট ব্যতীত), কড়াই-সুঁটি, চিনের বাদাম ও সিম ব্যতীত অন্য তরি তরকারি যথা পালংশাক, সেলারি, লেটুস, ডুমুর, টোম্যাটো, ক্যারট, জলপাই, বাঁধা ও ফুলকপি ইত্যাদি, দুধ, ঘোল, মাখম, লাল আটা এবং আবরণমুক্ত অন্যান্য শস্য। সব তরকারির মধ্যে আলু ও পর পৃষ্ঠায়লিখিত বিলাতী সব্জী এবং ডালের মধ্যে মুগের ডালে অধিক মাত্রায় ক্ষার পদার্থ আছে।

কতকগুলি প্রচলিত খাদ্যে প্রতি ১০০ গ্রামে কত গ্রাম ক্ষার বা অম্ল আছে যাহা বাইয়োকেমিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অম্ল	গ্রাম	ক্ষার	গ্রাম
ডিমের পীতাংশ	২৬·৬৯	সিম শুকনা	২৩·৮৭
মুরগীর মাংস	১৭·০১	বাদাম	১২·৩৮
মাছ্ বড়	১৬·০৭	বিটপালং	১০·৮৬
মাংস	১৩·৯১	গাজর	১০·৮২
খই চূর্ণ	১২·৯৩০	আলু	৭;১৯
আটা, খোসা বাদ	১২·৩৯	বাঁধাকপি	৭·১০
গমের আটা	১১·৬১	শুঁটি শুকনা	৭·০৭
ডিম	১১·১০	কমলা লেবু	৫·৬১
চাল	৯·৬৬	কলা	৫·৫৬
বিস্কুট	৭·৮১	ফুলকপি	৫·৩৩
ডিমের শ্বেতাংশ	৫·২৪	পিচফল	৫·০৪
চীনা বাদাম	৩·৯	আপেল	৩·৭৬
		গো দুগ্ধ	২·৩৭

সপ্তম অধ্যায়

আহার শিল্প—রন্ধন।

সৃষ্টির আদিযুগে মানব গাছের কাঁচা পাতা, ফলমূলাদি আহার করিত এবং বন্য পশুদের হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তর ক্রমে লৌহ দ্বারা নানা প্রকার অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা উহাদের আক্রমণে বাধা দিত বা মারিত। বংশবৃদ্ধির ফলে যখন উক্ত আহার্য্য দ্রব্যগুলি যথেষ্ট পরিমাণে মিলিত না তখন ক্রমবিকাশশীল উদ্ভাবনী শক্তির সহায়ে পাথরে পাথর ঘষিয়া অগ্নি আবিষ্কার করিয়া তাহার দ্বারা কাঠ জ্বালাইয়া এবং মাংসাদি পোড়াইয়া বা রাঁধিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

রন্ধন মানবসভ্যতার একটী অন্যতম সংস্কৃতি বা নিদর্শন। "প্রাচীন ভারতে পাকবিদ্যা চৌষট্টি কলার একটী অন্যতম কলা বলিয়া পরিগণিত হইত। এমনকি রাজ-পরিবারবর্গের সকলকে ঐ কলা শিখিতে হইত। তখন সাধারণ লোকেও এই বিদ্যায় পারদর্শী ছিল এবং তজ্জন্য তাহাদের অনেকের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে রন্ধন শিল্পের সবিশেষ উল্লেখ আছে।

রন্ধন একটী আদর্শ নারীধর্ম্ম বা স্ত্রী আচার। "বর্ত্তমান শিক্ষিত যুগের বহু পূর্ব্বে আমাদের দেশের কুলকামিনীগণ ঐ আচার সতত পালন করিত। দ্রৌপদী প্রভৃতি আদর্শ রমণীগণ আদর্শ পাচিকাও ছিলেন।

সেকালে কাজ, কর্ম্ম, পূজা, পাকাধিকার প্রভৃতি গৃহকর্ম্মে বা গৃহস্থধর্ম্মে সাধারণতঃ গৃহলক্ষ্মী পত্নী আজীবন ব্রতী থাকিত। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সিদ্ধি রমণীর অধীন ছিল।”

কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনকার অনেক মেয়েরা হেঁসেল ছাড়িয়া দিয়াছে বা দিতেছে। আজকাল কলিকাতার কোন কোন বালিকা-বিদ্যালয়ে রন্ধন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে কিন্তু তাহা অকিঞ্চিৎকর। জর্ম্মন দেশের ন্যায় আদর্শ চুলা বা রন্ধনশালা গড়িয়া মেয়েদের (সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদেরও) উপযুক্ত শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ প্রার্থনীয়।

এখন আমাদের পুরমহিলাগণের জীবন ধারা পরিবর্ত্তিত হইবার ফলে অনেক গৃহে বেতনভোগী পাচক নিযুক্ত হইতেছে। ইহাতে পরিবার বর্গের সকলের স্বাস্থ্যের অকল্যাণ হইতেছে। গৃহিণীগণ পূর্ব্বের ন্যায় নিজ হস্তে পাককার্য্যভার গ্রহণ করিলে আহার্য্যগুলি উপাদেয় ও অপচয় নিবারিত হইবে, সকলে খেয়ে বাঁচিবে। কথায় আছে “অরাধুনির হাতে প’ড়ে রুই মাছ কাঁদে।”

যদি একান্তই পাচক না হলে চলে না তবে তাহাদের রন্ধনকার্য্য তত্ত্বাবধান করা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে সতত লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

সময় সময়, মানব দেহে সংক্রামক রোগের বীজাণু সুপ্ত ভাবে থাকে তদ্দ্বারা অন্য সুস্থ দেহ আক্রান্ত হয়। ইহার কতকগুলি বিশ্বস্ত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

মার্কিন দেশের টাইফয়েড মেরী একটী অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহার একবার টাইফয়েড পীড়া হইয়াছিল, আরোগ্য লাভের পর সে কোন একটী বৃহৎ হোটেলে খাদ্য পরিবেশিকার কার্য্যে নিযুক্ত

হয়। কিছু দিন পরে দেখা গেল্ যে, সেই হোটেলে যাহারা আহার করিত তাহাদের অধিকাংশ ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। কারণ অনুসন্ধানে, হোটেলের খাদ্য বা পানীয় কিম্বা রন্ধনাদির ব্যবস্থায় কোন দোষ পাওয়া গেল না। অবশেষে মেরীর হস্ত পরীক্ষায় তাহার নখে উক্ত রোগের প্রচুর বীজাণু পাওয়া গিয়াছিল। তাহাকে বিদায় দিবার পর ঐ হোটেলের আর কোন ব্যক্তি ঐ রোগে আক্রান্ত হয় নাই। মেরী বিদেশে (ফ্রান্সে) গিয়া আর দুই স্থানে খাদ্য-পরিবেশিকার কাজ করিয়াছিল সেখানেও ঐ অবস্থা ঘটিয়াছিল। ইহা স্বপ্নেরও অগোচর।

There are more things in Heaven and earth than dreamt of in your philosophy Horatio !

Shakespere.

হ্যামলেট হোরেশিয়োকে বলিয়াছিল, "স্বর্গে ও মর্ত্তে আরো অনেক জিনিষ আছে যাহা তোমার দার্শনিক স্বপ্নেরও অগোচর।" আমাদের ঘরে যে উক্ত বিপদ ঘটিতে পারে তাহা বলা বাহুল্য। অতএব এ বিষয়ে সতত তীব্র দৃষ্টি রাখা সকল গৃহস্থের কর্ত্তব্য।

রন্ধনের গুণ।

শরীরের ভিতর যে তাপ আছে তাহার দ্বারা অনেক অপক্ক (কাঁচা) আহারীয় দ্রব্য পরিপাক হইতে পারে। কিন্তু উহাদের মধ্যে অনেকগুলি রুচিকর ও সহজে জীর্ণ হয় না বলিয়া উহাদিগকে অগ্নি সাহায্যে পাক করা হয়। মাছ মাংসাদি দগ্ধ বা সিদ্ধ না করিলে খাওয়া যায় না নচেৎ সভ্য মানবকে বাঘ সিংহাদি বন্য পশুর দলে ভিড়িতে হয়।

খাদ্য সুষ্ঠুভাবে রন্ধিত হইলে উহা মানবের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক স্বাস্থ্য সমুন্নত এবং ডিস্‌পেপ্‌সিয়া দৈত্য পরাভূত হইতে পারে। একজন ইংরাজ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

Dyspepsia is a cloud so dense that it shuts out the very light of heaven.

ডিস্‌পেপসিয়া এরূপ নিবিড় মেঘ যে উহা স্বর্গের আলোকও প্রতিরুদ্ধ করে।

দুষ্পাচ্য আহারীয় দ্রব্যকে সুপাচ্য এবং সকল খাদ্যকে সুঘ্রাণ, স্বাদু বা সুতার করিতে রন্ধন একটী যান্ত্রিক কৌশল-ক্রিয়া। ইহার দ্বারা মাছ, তরকারি ইত্যাদি পচনশীল দ্রব্য অধিকক্ষণ সংরক্ষিত এবং কাঁচা খাদ্যের দুষিত বীজাণু সমূহ বিনষ্ট হয়। কতকগুলি আহারীয় দ্রব্য অগ্নিপক্ব হইলে উহাদের গুণেরও সম্যক্ উপচয় হয়। রন্ধিত সুন্দর খাদ্য দর্শনে, ঘ্রাণে ও আস্বাদনে পাকরস অধিক ক্ষরিত, ক্ষুধা বর্দ্ধিত, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়।

রন্ধনের দোষ।

আহারীয় দ্রব্য অধিক সিদ্ধ হইলে—যাহা প্রায়ই হয়—উহার বীর্য্য বা প্রাণশক্তি ও লবণ ঘটিত উপাদান সমূহের কিছু অপচয় ঘটে। যে গুলি ভাজা হয় সেগুলি অধিকন্তু সহজে পরিপাক হয় না এবং তরকারীর নিজস্ব স্বাদ ও ঘ্রাণ হ্রাস পায়। অতিরিক্ত মসলাদি দ্বারা রন্ধিত খাদ্য অহিতকর হয়।

রাঁধা জিনিষ কাঁচা অপেক্ষা অধিক রসনাতৃপ্তিকর হয় বলিয়া উহা সময় সময় আবশ্যকের অধিক গৃহীত হয়। যে সকল খাদ্য কাঁচা

খাইয়া সহজে পরিপাক হইতে পারে তাহাও রন্ধিত হয়, যথা ছোলা, শসা ইত্যাদি। ক্রমাগত সিদ্ধ ও ভর্জ্জিত আহার্য্য সেবনে স্বাভাবিক পরিপাক শক্তিও কমিয়া যায়।

জর্ম্মন দেশের প্রসিদ্ধ ডাঃ কুন ও অন্য দেশের বহু আহার তত্ত্ব বিশারদগণ অনেক গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে ঘৃত, তৈল ও মসলাদি দ্বারা রন্ধিত রূপান্তরিত খাদ্যাপেক্ষা অরন্ধিত অর্থাৎ সদ্য স্বভাবজাত খাদ্য জলে ভিজাইয়া সেবনে অধিক উপকার লাভ হইতে পারে—অবশ্য উহা উপযুক্ত পরিপাক শক্তি সাপেক্ষ।

কেহ কেহ উপরোক্ত কারণে রন্ধনের নিন্দা করেন এবং অরন্ধিত দ্রব্য মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য বলিয়া সুপারিস করেন। কিন্তু মোটের উপর, নানাকারণে, রন্ধনের দোষ অপেক্ষা গুণ সমধিক বলিয়া মনে হয়। আমাদের পাকস্থলী অধিকাংশ অপক্ক দ্রব্য জীর্ণ করিতে সক্ষম নয়।

বিলাতের একজন মনীষী লিখিয়াছেন—

"Many advocate unfired diet and suggest "Back to Nature", but there are practical difficulties—a change of diet acts as a shock to stomach accustomed to fired diets for ages and ages past—we have been slowly but surely getting away from the habit thousands of years."

"অনেকে অরন্ধিত খাদ্য সেবনের অনুযোগ করেন এবং স্বভাবে ফিরিয়া যাইতে বলেন—কিন্তু অগ্নিপক্ক আহার্য্য গ্রহণে অভ্যস্ত পাকাশয় আহার পরিবর্ত্তনে সহসা আতঙ্কিত হয়। আমরা সহস্র

সহস্র বৎসর যাবত আস্তে আস্তে কিন্তু সুনিশ্চিত ভাবে প্রাচীন কালের অরন্ধিত খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস হইতে সরিয়া আসিতেছি।"

তবে যে সকল কাঁচা খাদ্য সহজে হজম করিতে পারা যায়, যথা ভিজা ছোলা, মুগ, কড়াইসুঁটি ও মূলা তাহা ক্রমে ক্রমে খাইতে অভ্যাস করা দেহের কল্যাণকর সন্দেহ নাই। সিদ্ধ ছোলা অপেক্ষা অঙ্কুরিত কাঁচা ছোলা অনেক অধিক উপকারী এবং একথা সত্য যে পক্ক আহারীয় দ্রব্যের অর্দ্ধেকের কম খরচে অপক্ক খাদ্য সেবনে জীবন রক্ষিত হইতে পারে।

অনেকদিন যাবত মার্কিণ দেশে ও বিলাতে কয়েক প্রকার কাঁচা বা অর্দ্ধ সিদ্ধ তরকারী (ক্যারট, পিঁয়াজ, টোম্যাটো, মূলা, শসা, কড়াইশুঁটি, বাঁধাকপি ইত্যাদি) যাহাকে 'স্যালাড' বলে তাহা তাহাদের নিত্য আহার্য্যের একটী বিশিষ্ট স্থান লইয়াছে। আমাদের দেশে উহার প্রচলন নাই বলিলে চলে। কাঁচা আহার্য্য দ্রব্যগুলি একাধিক গ্রহণে উহাদের বীর্য্য ও লবণ নষ্ট হয় না অধিকন্তু ঐপ্রকার খাদ্যে যে কোমল (Soft) পরিস্রুত জল থাকে তদ্দ্বারা রক্তের দূষিত পদার্থ সহজে নিষ্কাশিত এবং কোষ্ঠ পরিস্কৃত হয়।

উক্ত কাঁচা আহারীয় দ্রব্যগুলি যদি খাইতে প্রথম প্রথম প্রবৃত্তি না হয় তাহা হইলে উহা সহমত সরু কুচি কুচি করিয়া লেবুর রস ও লবণ সহ মিলাইয়া খাইলে অধিক রুচিকর হইবে। বহুদিনের অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা অনিষ্টকর। এইজন্য প্রথম প্রথম উহা অল্প পরিমাণে খাইতে অভ্যাস করিলে ক্রমে সাত্ম্য হইবে। যদি একান্ত সুবিধা না হয় তাহা হইলে প্রত্যহ কিছু ভিজে মুগ বা ছোলা, কড়াই-শুঁটি ইত্যাদি, কিম্বা আদা ছোলা, মূলা মুড়ী এবং ফলমূলাদি বা কিছু ছাতু খাইতে সহজে অভ্যাস করা যাইতে পারে।

ছোলা ও ছাতু পশ্চিমের লোক ও আমাদের দেশের অনেক গরীবদের সুলভ ও অতি আদরের পুষ্টিকর আহার। হয়ত আমরা "ছাতুখোর" বলিয়া আখ্যাত হইবার ভয়ে উহার উপর বীতরাগ। আবার ছোলা ঘোঁড়ার খাবার বলিয়া কেহ কেহ, বিশেষতঃ মেয়েরা অবজ্ঞাবশতঃ ঐ মূল্যবান আহার উপেক্ষা করে।

এইরূপ জনশ্রুতি, আওরঙ্গজেব বাদসা তাঁহার পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া কেবল মাত্র একপ্রকার আহার্য্য গ্রহণ করিতে অনুমতি দেন। সাজাহান শুনিয়া বড়ই ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পাচক তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন যে একমাত্র ছোলা খাইলে প্রাণরক্ষা হইতে পারে। সুতরাং তিনি এই খাদ্যই খাইতে চাহিলেন। তাঁহার এই খাদ্যের অসুবিধা নিবারণার্থে পাচক ছোলা হইতে নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য রন্ধন করিয়া দিত।

ইহা খোস গল্প বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু ছোলা খাইয়া যে জীবন ধারণ এবং যথেষ্ট শক্তি ও পুষ্টি লাভ হইতে পারে তাহা অসত্য নয়। এই নগণ্য ছোলা আহারে অশ্ব তাহার রক্ত, মাংস, চর্ব্বি, অস্থিময় বিশাল দেহ ও চলিবার শক্তি লাভ করে—একথা ভুলিলে চলিবে না।

মোট কথা যাহা কাঁচা খাইতে অসুবিধা না হয় তাহা রাঁধা ভাল নয়। জলে ভিজান ছোলা অপেক্ষা ভাজা বা সিদ্ধ ছোলা গুণে অনেক নিকৃষ্ট। পাকা কলার বড়া অপেক্ষা পাকা কলা অনেক উপকারী। রন্ধিত খাদ্য অধিক রুচিকর বটে কিন্তু সাধারণতঃ অধিক পুষ্টিকর নয়।

আমাদের বৎসরে একদিন অরন্ধন বা 'আরান্ধ' প্রথা আছে। কিন্তু উহা প্রকারান্তরে পূর্ব্বদিনের পর্য্যুসিত পক্কান্ন ও ব্যঞ্জন সেবন।

ইহা মুখ বদলান হিসাবে মন্দ নয়। মধ্যে মধ্যে রন্ধনে প্রকৃত বিরতিই স্বাস্থ্যের হিতকর। সকলেই ছুটি চায়। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া উদরের ও রাঁধুনীর মধ্যে মধ্যে ছুটি আবশ্যক।

রন্ধন উপকরণ।

ইন্ধন।

আজকাল রন্ধনার্থে কোক কয়লা উত্তরোত্তর অধিক ব্যবহৃত হইতেছে। কোককয়লায় রন্ধিত খাদ্য শরীরের পক্ষে হিতকর নয় কারণ উহার অতিরিক্ত আঁচে খাদ্যদ্রব্যের গুণ ও প্রাণশক্তি অনেক পরিমাণে নষ্ট হয় এবং শীঘ্র সিদ্ধ হইবার দরুণ উহাঁর স্বাদ ও গন্ধ বিকৃত হয়। অজীর্ণ ও অম্লরোগের উহা অন্যতম প্রবল কারণ বলিয়া উক্ত হয়।

উনান ধরাইবার সময় কেরোসিন তেল, কাঠের চক্‌লা, ঘুঁটে প্রভৃতির এবং কোককয়লার ধোঁয়া স্বাস্থ্যের ভীষণ অনিষ্টকর। আমাদের কলিকাতার বাটীতে রান্নাঘরের নিকট যতবার পাখী রাখিয়াছি ততবার দেখিয়াছি তারা নানা রোগে ভুগিয়া মরিয়াছে। কিন্তু ছাদের উপর যেখানে ধোঁয়া যায় না বা খুব কম যায় সেখানে পাখী রাখিয়া একটীও মরে নাই। উক্ত ধোঁয়ায় একটী কোকিল কিছুদিন থাকিবার পর তাহার ডাক বন্ধ হইয়াছিল কিন্তু বাগানে গিয়া তার রব পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিল।

যদি একান্তই কোককয়লার ব্যবহার অপরিহার্য্য হয় তাহা হইলে ৫।৬ খানি টিকা বা এক মুঠা কাঠের কয়লা উনানের নীচে শিকের উপর রাখিয়া পাখার বাতাসে উহা ধরাইয়া তদুপরি কোককয়লা দিয়া

পুনরায় বাতাস করিলে ধোঁয়া অনেক কম হয়। অথবা আধুনিক আবিষ্কৃত চিমনীওয়ালা চুলা ব্যবহার করিলে উক্ত দোষ নিবারিত হইতে পারে। ইহা অধিক ব্যয়সাধ্য নয়। তবে উক্তরূপ ব্যবস্থায় প্রতিবেশী-গণের উনানের ধোঁয়া আসা বন্ধ হয় না। সকলে একযোগে ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে বা সকলকে আইনদ্বারা বাধ্য না করিলে ধোঁয়া সম্পূর্ণ নিবারিত হইতে পারে না। আক্ষেপের বিষয় আমরা কয়লার ধূম পানে এতই অভ্যস্ত, উপায় থাকিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করি। বাটীর উপরতলের ছাদে রন্ধন করিলে ধোঁয়া অনেকাংশে নিবারিত হয়। ইহাও আর একটী সহজ পন্থা।

কাঠ কয়লার রান্না তত অনিষ্টকর নয়। ইহাতে ধোঁয়া অতি অল্প হয়। বাষ্প বা বিদ্যুতের সাহায্যে রান্না সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর কিন্তু ব্যয়বহুল। * আজকাল যে বৈজ্ঞানিক কুকার বা বাষ্পচুলির প্রচলন হইয়াছে তাহাতে খাদ্য রন্ধন করিলে ধোঁয়া মোটেই হয় না, রন্ধিত খাদ্যের স্বাদ বজায় থাকে এবং উহা অধিক স্বাস্থ্যকর হয়। কিন্তু কুকারের রন্ধনপাত্র বা পাত্রাধারগুলি সাধারণতঃ আপত্তিকর অ্যালুমিনাম দ্বারা প্রস্তুত হয়। উক্ত পাত্রগুলি যদি রৌপ্য, তাপসহ (fire proof) কাঁচ বা চীনামাটির তৈয়ারী হয় তাহা হইলে নির্দ্দোষ হইতে পারে।

কেরোসিন তেলের ষ্টোভের চলনও ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু উহাতে পাক করা খাদ্য স্বাস্থ্যকর হয় না অধিকন্তু উহা নিরাপদ নয়। কেহ কেহ অগ্নিদগ্ধ হইয়া মারা পড়িয়াছে।

---

* কয়লার জ্বালেও তরকারী ইত্যাদি বাষ্পদ্বারা রন্ধিত হইতে পারে। উপায়—তরকারীর কড়ার উপর আবরণ দেওয়া। কোন কোন তরকারী শীঘ্র সিদ্ধ করিবার জন্য কখন কখন এই প্রথা অবলম্বিত হয় কিন্তু সকল তরকারী উক্তরূপে রন্ধিত হওয়া আবশ্যক।

কাঠের জ্বালে রন্ধন কোককয়লা অপেক্ষা অনেক ভাল। উহাতে আগুনের আঁচ কমান বা বাড়ান যায়, রন্ধিতখাদ্য অধিক সুতার হয় কিন্তু কাঠের ধোঁয়া রোগ সৃষ্টি এবং জামা, কাপড় ও ঘরের আসবাব ময়লা করে। দগ্ধ কাষ্ঠের ধোঁয়ার অঙ্গারাম্ল (Carbon dioxide) কোককয়লার ধোঁয়ার ন্যায় অপকারী তবে উহাতে ক্রিয়োজোট, কার্ব্বলিক অ্যাসিড প্রভৃতি জীবাণু নাশক দ্রব্য আছে যদ্দ্বারা দেয়ালের ময়লা, থুথু, গয়ার ইত্যাদি ষ্টেরিলাইজড্ (বীজাণুহীন) হয়। ইহা মন্দের ভাল।

যেখানে কাঠ ভিন্ন গতি নাই সেখানে ভিজে কাঠে উনুন ধরাইয়া মা লক্ষ্মীদের চোখের ও নাকের জলে ভাসিতে বলি না। পূর্ব্ব হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। উনান একটু গভীর হইলে উহা অনেকটা চিমনীর কাজ করে, অর্থাৎ উহাতে বায়ু অধিক আকর্ষিত হয় বলিয়া উনান শীঘ্র ধরে এবং ধোঁয়াও শীঘ্র বাহির হয়। এই কারণে দার্জিলিং প্রদেশের ভুটিয়াগণ উনানের উপর একটা টিনের চোঙা বসাইয়া আগুন ধরায়।

রন্ধন উপকরণ।

তৈজসপত্র বা বাসন।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতে সোনার বাসন ও কলাপাতা শ্রেষ্ঠ ভোজন পাত্র। পত্রময় পাত্রে বিশেষতঃ কলাপাতায় ভোজনে অগ্নির দীপ্তি, অন্নে রুচি ও বিষদোষ নিবারিত হয়। স্বর্ণপাত্র ত্রিদোষ নাশক ও দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধক। রৌপ্যপাত্র দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধক ও পিত্তনাশক কিন্তু বায়ু ও কফ বৃদ্ধিকর। পিতলের তৈজস বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ ও উষ্ণ কিন্তু ক্রিমি ও কফনাশক। পিতলের পাত্রে গরম তৈলপক্ক ব্যঞ্জন রাখিলে

কলঙ্ক ধরিয়া বিষাক্ত হয়। কিন্তু কেহ ২ বলেন ভাত, ডাল ও পায়েস উহাতে রাঁধিলে অনিষ্টকর হয় না।

কাঁসার বাসন বুদ্ধিপ্রদ, রুচিকর, রক্ত ও পিত্তের শান্তিকর। লৌহ ও কাঁচের পাত্র সিদ্ধিদায়ক, বলকারক এবং শোথ, পাণ্ডু ও কামলারোগ প্রশমক। পাথর ও মাটির বাসন শ্রীহীনকারক, শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকর কিন্তু ক্লান্তিনাশক এবং কাষ্ঠময় পাত্র রুচিকারক কিন্তু শ্লেষ্মাবর্দ্ধক।

আমরা পলান্ন রন্ধনের জন্য সাধারণতঃ অ্যালুমিনাম বা তামার কলাইকরা ডেকচি বা হাঁড়ী ব্যবহার করি, কিন্তু দুইটাই অল্পবিস্তর অনিষ্টকর। আজকাল যে অ্যালুমিনামের বাসন বাজারে পাওয়া যায় তাহাতে কিছু না কিছু সীসা থাকে। উহার কোন অংশ সাদা কাগজে ঘসিলে সীসার কষ বা কাল দাগ পড়ে। বিশুদ্ধ ঐ ধাতুর বাসন সাধারণতঃ দুর্ম্মূল্য বা দুষ্প্রাপ্য।

বাঙ্গালোর বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিতে পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে উক্ত ধাতুর পাত্রে আহার্য্যদ্রব্য রন্ধিত হইয়া ঐ প্রকার পাত্রে রক্ষিত হইলে, তরকারীর রস অ্যালুমিনামের সূক্ষ্ম অংশের সহিত মিলিত হয়। তেঁতুলের রসের সহিত মিশিলে উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষিত হয়। এই ধাতু আমাদের দেহের একটী অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান কিন্তু উহার অধিক সেবন অনিষ্টকর।

মাটির বা চীনেমাটির বাসনে ব্যঞ্জন ও টক রন্ধন এবং সংরক্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। যদিও মাটির পাত্রের দোষ আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে তথাপি উহা অন্য ধাতব তৈজস অপেক্ষা নিরাপদ। এইজন্য অসুখের পর রোগীর জন্য মাটির হাঁড়ীতে পোরের ভাত রন্ধনের ব্যবস্থা করা হয়। আহার ও পাক পাত্র সমূহ ধাতুনির্ম্মিত হইলে তাহাদের কষ বা অম্ল তেলের সহিত মিশ্রিত হইয়া আহার্য্যদ্রব্যকে বিষাক্ত করে।

এমন কি লৌহপাত্রে পক্ক দ্রব্য দীর্ঘদিন ভোজনে লৌহের অতি সূক্ষ্ম অংশগুলি ক্রমে ক্রমে সমধিক পরিমাণে দেহে সঞ্চিত হয় এবং উহার বিষক্রিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়। পরিণামে অগ্নিমান্দ্য, অম্ল, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি রোগ জন্মিতে পারে। তামার ডেকচি যাহার রাঙের কলাই কিছুমাত্র উঠিয়া গিয়াছে তাহাতে মাংসাদি রন্ধন করিলে উহা সদ্য বিষাক্ত হয়। এই কারণে সময় সময় অনেকের প্রাণহানি হইয়াছে তাহা সকলেই জানে। অবশ্য কলাই থাকিলে তত অনিষ্টকর হয় না কিন্তু অনেক সময় লোকজনের অসাবধানতা বা অমনোযোগের বিষময় ফল ফলে। এইজন্য তাম্রপাকপাত্র বর্জ্জনই শ্রেয়স্কর।

রন্ধনে সাবধানতা।

শাস্ত্রমতে প্রবীরা অর্থাৎ পতিপুত্র হীনা কিম্বা রজস্বলা রমণীর পাকান্ন সেবন নিষিদ্ধ। কিন্তু সুস্থ, সপুত্র, সদাচারিণী স্ত্রী বা নিকট-আত্মীয়ার পাকান্ন দোষজনক নয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন পরের হাতে পক্ক অন্নাদি সেবনে পাচক বা পাচিকার আন্তরিক ভাব (দোষ ও রোগের বীজও) খাদ্যদ্রব্যে সংক্রমিত হইবার সম্ভাবনা, এইজন্য স্বপাক আহারই সর্ব্বোত্তম।

রন্ধন গৃহে জুতা পায়ে দিয়া প্রবেশ বা অবস্থান অনিষ্টকর। উহাতে বাহিরের ময়লা ও রোগের বীজাণু জুতার সহিত আনীত হইবার প্রবল সম্ভাবনা হয়। রন্ধন গৃহের ঝুল মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার করা উচিত নচেৎ উহা আহার্য্য দ্রব্যের উপর পতিত হইতে পারে।

অন্ন ও ব্যঞ্জন, রন্ধনের পর শীতল হইলে উহা পুনরায় উষ্ণ করিয়া সেবন নিষিদ্ধ। হাত দিয়া অন্নাদি পরিবেশন অহিতকর—চামচে বা হাতা ব্যবহার করা উচিত।

বেতনভোগী পাচক নিযুক্ত হইলে যাহাতে সে ময়লা কাপড়ে বা ময়লা হাতে না রাঁধে বিশেষতঃ তাহার নখে যাহাতে ময়লা না থাকে এবং হাত ও আঙ্গুল ডুবাইয়া অন্নাদি পরিবেশন না করে সে সব বিষয়ে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। মান্ধাতার আমলের ময়লা গামচা বা নেতা যাহার অভ্যস্ত সংস্পর্শ সুখ মেয়েরা সহজে ছাড়িতে চায় না তাহা যেন প্রত্যহ ভাল করিয়া কাচিয়া লওয়া ও মধ্যে মধ্যে বদলান হয়। আহার্য্য দ্রব্য যাহাতে কখনও অনাবৃত না থাকে তাহাও দেখিতে হইবে। বিনাবরণে ভোজ্যদ্রব্য স্তূপীকরণও বিশেষ আপত্তিকর।

টেক্স খাজনার ন্যায়, মশা ও মাছির উপদ্রব হইতে কাহারও নিস্তার নাই। শত্রু বিনাশের অনেক ব্যবস্থা বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে কিন্তু উহাদের সবংশে নিধনের কোন উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। এ ক্ষুদে শত্রুদের আঁটা দায়। অ্যালেন ডিভো সাহেব (Alan Devoe) একটা সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন মাছি, কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, দূষিত চর্ম্মরোগ (Anthrax), শিশুদের আমাশা ইত্যাদি মারাত্মক ব্যাধির অন্যতম কারণ। উহাদের বংশবৃদ্ধির হার বিস্ময়জনক। মাত্র এক জোড়া মাছির মিলিত সন্তানগুলির সংখ্যা, ৬ মাসের পর, বংশবৃদ্ধির জ্যামেতিক হারে ৩৩৫,৯২৩,২০০,০০০,০০০ হয়!!! মাত্র একটী মাছির গাত্রে যে অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোমাবলী আছে তৎসংলগ্ন ব্যাক্টিরিয়ার সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা ৫০ লক্ষ! ইহা দ্বারা একটি গৃহের সকল অধিবাসী রোগাক্রান্ত হইতে পারে।

সম্মুখ যুদ্ধে ইহাদের বিনাশ সাধন অসম্ভব অতএব তাহাদের গৃহে বিশেষতঃ রন্ধন গৃহে প্রবেশে প্রবল বাধা দান বিশেষ প্রয়োজন। রন্ধন গৃহের জানালা ও দরজায় জাল দেওয়া একমাত্র ফলকর ব্যবস্থা।

রন্ধন উপকরণ

স্নেহ দ্রব্য।

পাক কার্য্যে স্নেহ পদার্থ গুলির মধ্যে ঘৃত সর্ব্বোত্তম। কিন্তু বিশুদ্ধ ঘৃত মহার্ঘ ও সুদুর্ল্লভ। আজকাল ঘৃতের পরিবর্ত্তে বনস্পতি ঘৃত নামে অভিহিত একপ্রকার উদ্ভিজ্জ ঘৃত, (Hydrogeneted) fat আসল ঘৃতের পরিবর্ত্তে উত্তরোত্তর অধিক মাত্রায়, অনেক ময়রার দোকানে এবং কোন কোন গৃহস্থের ঘরে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা নানাবিধ উদ্ভিদের তেল গরম করিয়া উহার সহিত কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য মিশাইয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে কোন ভিটামিন বা খাদ্য বীর্য্য নাই, তেল অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। ইহা দুগ্ধ জাত ঘৃতের সহিত প্রায় সর্ব্বত্র ভেজাল দেওয়া হইতেছে। উহা নিবারণার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। ব্যঞ্জনাদি অন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিতে আমাদের দেশে প্রচলিত সরিষার তেলই শ্রেয়স্কর। অন্য কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ মহীশূর ও মাদ্রাস প্রদেশে নারিকেল তেল, তুলার বীজের তেল, চীনে বাদামের বা তিলের তেল (ঝিনঝিনি) সাধারণ পাককার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

সরিষার তেল আমাদের চির অভ্যস্ত আত্মানুকূল স্নেহ দ্রব্য। ভাব প্রকাশ মতে ইহা আগ্নেয়, কটু, লঘু, উষ্ণবীর্য্য ও তীক্ষ্ণ। কফ, মেদ, বায়ু, অর্শ, শিরঃশূল, কর্ণরোগ, কণ্ডু, ক্রিমি, ধবল, বাত, বিষদোষ, কোষ্ঠবদ্ধ ও দুষ্ট ব্রণে হিতকর কিন্তু অধিক সেবনে পিত্ত ও রক্ত দূষিত হয়।

সার্জ্জেন ডি, এন বসু লিখিয়াছেন খাঁটি সরিষার তেল মর্দ্দনে গলায় ব্যথা, রক্ত সঞ্চয় ও পুরাতন বাত রোগে বিশেষ উপকার করে।

ভার অপনোদিত হয়। শিশুদের বুকে খাঁটি সরষের তেল মাসকলাই সহ ফুটাইয়া মালিস করিলে সর্দ্দি সত্বর আরোগ্য হয়। গলক্ষতে উহার বাহ্য প্রলেপ উপকারী।

ডাক্তার ওয়াট লিখিয়াছেন বাতের ব্যথা ও দেহের কোন স্থানে রস জমিলে সরিষার পুলটিস উপযোগী। অল্প পরিমাণ সরিষার গুঁড়া খাইলে পরিপাক শক্তি বর্দ্ধিত এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হয়।

সরিষার তেল সংক্রামক দোষ নষ্ট করে। ইহা পচন নিবারক। রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে ভরত অযোধ্যায় পৌঁছান পর্য্যন্ত রাজার মৃতদেহ তৈল কটাঁহে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে। ফিক ও বাতের ব্যথায় এবং বুকে, পিটে শ্লেষ্মা জন্মিলে সরিষার তেল কর্পূর সহ মিশাইয়া মালিশ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

এই তেলের প্রদীপ জ্বালিয়া উহার মুখ কিছু নীচু করিয়া রাখিলে যে ফোঁটা ফোঁটা গরম তেল বাহির হইবে তাহা গরম গরম ছোট ছেলে মেয়েদের বুকে মালিস করিলে শ্লেষ্মা উঠিয়া যায়। প্রত্যহ স্নানের সময় কিছু সরিষার তেল মুখে কিছুক্ষণ রাখিয়া উহার দ্বারা দাঁত মাজিলে দাঁত শক্ত হয়। উহা লবণ সহ মাজিলে মুখের দুর্গন্ধ ও ক্লেদ নির্গত হইয়া দাঁত ও মুখাভ্যন্তর পরিষ্কৃত হয়। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন লবণ ও সরিষার তেল দিয়া দাঁত মাজা উচিত। প্রত্যহ স্নানের সময় পায়ের বৃদ্ধ অঙ্গুলিতে এই তেল ভাল করিয়া মর্দ্দন করিলে চক্ষুর জ্যোতিঃ বর্দ্ধিত হয়।

কিন্তু ঘৃতের ন্যায় সরিষার তেলে অনেকস্থলে নানা বিজাতীয় ও আপত্তিকর দ্রব্য ভেজাল দেওয়া হইতেছে, যথা—সোরগুজা, শিয়াল-

কাঁটা, তারাবীজ, শ্বেতী, কাজলা, নতুয়া, হুটনী, মাখী ইত্যাদি। মহুয়া ও চিনের বাদামের তেলও সরিষার তেলের সহিত মিশ্রিত করা হয় কিন্তু তাহা অস্বাস্থ্যকর নয়।

উপরোক্ত ভেজালগুলি ব্যতীত কোন কোন স্থলে গন্ধহীন মেটে তেল (ব্লুম অয়েল) মিশান হয়, ইহা পরীক্ষায় প্রকাশিত হইয়াছে। ভেজাল সরিষার তেল বেরিবেরির একমাত্র কারণ, ইহাও অনেকে বলিয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উক্ত রোগের অন্যান্য কারণ প্রকাশিত হইয়াছে, যথা—কলের মাজা চাল, ভিজা চাল, খাদ্যে যথেষ্ট আমিষ জাতীয় উপাদানের এবং খাদ্য প্রাণের অভাব. ইত্যাদি।

পাককার্য্যে অলিভ অয়েল (বিদেশী জলপাইয়ের তেল) বেশ স্বাস্থ্যকর। ইহার পুষ্টিকারিতা অন্য সব স্নেহ পদার্থ অপেক্ষা অধিক বলিয়া কথিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা সেবনে ও মর্দ্দনে যৌবন অনেক দিন অব্যাহত থাকে, দীর্ঘজীবন লাভের উহা একটী অন্যতম উপায়। আয়ুর্ব্বেদ মতে দেশী জলপাইয়ের তেল অন্য খাদ্যের সহিত ব্যবহার করিলে ভুক্তদ্রব্য সহজে হজম, কোষ্ঠ পরিষ্কার, ক্ষুধা বৃদ্ধি এবং বল ও পুষ্টি লাভ হয়।

পুরাকালে রোম দেশের লোক এই তেল মাখিত, ফলে তাহাদের ত্বক কোমল ও মসৃণ এবং স্বাস্থ্য উত্তম থাকিত। কিন্তু এই তেল মহার্ঘ। যাহাদের সঙ্গতি আছে তাঁহারা উহা ব্যবহার করিতে পারেন, সর্ব্ব সাধারণের সরিষার তেল ভিন্ন গতি নাই।

আজকাল প্রায় সব জিনিষেই ভেজাল দেওয়া হইতেছে। সেইজন্য সরিষা তেলের পরিবর্ত্তে বনস্পতি ঘৃতাদি অন্য আপত্তিকর দ্রব্য ব্যবহার আরো অনিষ্টকর এবং উহা স্বাস্থ্যসঙ্গত নয়। যাহাতে সরিষার তেলে অনিষ্টকর ভেজাল মিশ্রণ নিবারিত হয় সেই চেষ্টাই

যুক্তিযুক্ত। আইন কানুনে উহা নিবারণ করা বড়ই কঠিন। কিন্তু যদি আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ভেজাল তেল ব্যবহার না করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া জেহাদ বা সত্যাগ্রহ করি তাহা হইলে ব্যবসাদার ও দোকানীকে অকৃত্রিম তেল সংগ্রহ করিতে বাধ্য করান যাইতে পারে।

"প্রকৃত বলবতী ইচ্ছাই উপায়ের শ্রেষ্ঠ প্রসূতি।"

মসলা।

মসলা রন্ধিত দ্রব্যকে সুতার, সুঘ্রাণযুক্ত ও সুপাচ্য করে। উহা সেবনে ক্ষুধা অধিকতর উদ্রিক্ত হয়। উহাতে দেহ পরিপোষক আহারজাতীয় সকল উপাদানই অল্প বিস্তর আছে।

প্রত্যেক মসলার বিভিন্ন উপাদানগুলির শতকরা পরিমাণ যাহা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে পাওয়া গিয়াছে এবং ১৯৩৮ সালে কুন্নুরের খাদ্য ও পুষ্টি গবেষণাগারের ২৩ নং স্বাস্থ্য বুলেটিনে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। আমিষ জাতীয় উপাদান।

মেথিতে ইহা সর্ব্বাধিক—শতকরা ২৬, সরষে ২২, জিরা ১৮·৭, শুষ্ক লঙ্কা ১৫·৯, জোয়ান ১৫·৪, ধনে ১৪·১, গোলমরিচ ১১·৫, দালচিনি ১০·২, জায়ফল ৭·৫, জৈত্রি ৬·৫, হলুদ ৬·৩, লবঙ্গ ৫·২ ও হিং ৪। ফলে এবং অধিকাংশ উদ্ভিজে এত পরিমাণ আমিষ উপাদান নাই। আমাদের প্রধান আহারীয় (ঢেঁকি ছাটা) চালে উক্ত উপাদান শতকরা মাত্র ৮·৫ আছে।

২। স্নেহ জাতীয় উপাদান।

সরিষায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—শতকরা ৩৯·৬ তৎপরে জায়ফল ৩৬·৪, জৈত্রি ২৪·৪, জোয়ান ১৮·১, ধনে ১৬·১, লবঙ্গ ৮·৯, শুষ্ক লঙ্কা ·২,৬ মেথি ৫·৮, হলুদ ৫·১—বাকি শতকরা পাঁচের নীচে।

৩। লবণ জাতীয় উপাদান।

ইহা হিং ও জোয়ানে সবচেয়ে বেশী শতকরা ৭·১, শুষ্ক লঙ্কা ৬·১, জীরা ৫·৮, দালচিনি ৫·৪, লবঙ্গ ৫·২, ধনে ও মরিচ ৪·৪, হলুদ ৩·৫ মেথি ৩, জায়ফল ১·৭, জৈত্রি ১·৬, আদা ১·২—বাকি একের নীচে।

প্রথম পাঁচটীর পরিমাণ কি প্রাণীজ কি উদ্ভিজ্জ প্রায় সকল প্রকার খাদ্যের ঐ জাতীয় উপাদান অপেক্ষা অনেক অধিক।

আমাদের দেশজাত ফলে ঐ জাতীয় উপাদান শতকরা ০·২ হইতে ·০৭ মাত্র আছে। দুধে মাত্র ০·৭। মসলায় চূণ, ফসফরাস বিশেষতঃ লোহ, যেগুলি দেহ পোষণার্থে অতি প্রয়োজনীয় লবণ, তাহা সমধিক পরিমাণে আছে। সুতরাং সর্ব্বসাধারণের পক্ষে লবণ জাতীয় উপাদানের অভাব মোচনার্থ মসলা, দুগ্ধ ও ফলের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রূপে ব্যবহৃত হইবার যোগ্য। ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

৪। শ্বেতসার

মসলায় শ্বেতসার চাল, ডাল ব্যতীত প্রায় অন্য সকল আহার্য্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে। কিন্তু উহা অধিক পরিমাণে গ্রহণযোগ্য নয়, তথাপি খাদ্য হিসাবে উহার শ্বেতসার উপাদানের মূল্য আছে। মসলা অন্যান্য শ্বেতসার বহুল খাদ্যের লবণ-অপচয় কতকাংশে পূরণ করে। উপরোক্ত উক্তি মসলার অন্য উপাদান সম্বন্ধেও খাটে। মশলার নানা রোগনাশিনী শক্তি আছে, ইহা পরে যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন মসলা স্বাস্থ্যের পরম বৈরী, উহা বিষবৎ পরিত্যজ্য এবং মসলা বিহীন খাদ্য সেবনে আমরা সুস্থদেহ লাভ করিতে পারি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা বলেন যে মনুষ্যেতর জীবগণ মসলা না খাইয়া কেমন সুস্থ থাকে। কিন্তু তাহারা অনেক উদ্ভিজ্জ ভোজন করে

যাহাতে মসলার গুণ থাকে। অধিকন্তু, তাহারা কাঁচা উদ্ভিজ্জ খায় বলিয়া, তাহাদের খাদ্যে রন্ধন জনিত লবণের অপচয় ঘটে না। তাহাদের ও মানবদের জীবন ধারার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ বিদ্যমান।

অনেক গৃহপালিত পক্ষীগণকে, প্রধানতঃ ত্বকের কীট বিনাশার্থে, কাঁচা ঝাল লঙ্কা খাইতে দেওয়া হয়। উহা তাহারা আগ্রহ সহকারে আহার করে, যাহা ঐ খাদ্যের অভাব বিজ্ঞাপিত করে। ক্যাপ্‌সিকাম্‌ নামে এক প্রকার বিলাতী মিষ্ট লঙ্কা আছে তাহার চাষ আমাদের দেশে এখন কিছু কিছু হইতেছে। উহা কেহ কেহ ব্যঞ্জনে ব্যবহার করে। উহাতে স্নেহ জাতীয় উপাদান কিছু অধিক পরিমাণে থাকে। এই লঙ্কা, টিয়া, প্যারট প্রভৃতি পাখীর উপাদেয় আহার। উহা সেবনে তাহাদের পালখের বর্ণ গাঢ় ও উজ্জ্বল হয়।

মসলার নিত্য ব্যবহারের আর একটী আপত্তি, উহাতে উহার গুণের বিশেষতঃ ওষধী গুণের অপচয় হয় কিন্তু একথা অন্য ওষধীগুণ সম্পন্ন আহারীয় দ্রব্যের পক্ষেও প্রয়োজ্য।

সকল দিক দিয়া বিচার করিলে মসলার দোষ অপেক্ষা গুণ অধিক। উহার অপ বা অতি ব্যবহারই অনিষ্টকর। আমাদের কেহ কেহ শুধু মসলা দিয়া প্রস্তুত ব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত হন না, উহার সহিত সাহেবদের দেখাদেখি বা হোটেলের প্রথানুযায়ী সরিষা বা লঙ্কার গুড়া, ভিনিগার প্রভৃতি সেবন করেন। কিন্তু সাহেবরা আমাদের মত অত প্রকার ব্যঞ্জন, ভাজা বা পোড়া আহার করে না। তাহারা সাধারণতঃ অতি অল্প মসলা সেবন করে। আমরা উহাদের ভালোর দিকটা দেখিতে পাই না, মন্দটাই গ্রহণ করি।

ভিনিগার আখের বা তালের রস প্রভৃতি গাঁজাইয়া বা পচাইয়া প্রস্তুত হয়। উহাতে পোকা কিলবিল করিতে দেখিয়াছি সুতরাং ঐ অতি জঘন্য আহার পরিবর্জ্জন বাঞ্ছনীয়।

দুই একটী মসলা যথা, লঙ্কা ও মরিচ বিষম উত্তেজক, সেবনে পাকাশয় অল্প বিস্তর উত্তেজিত হয়। উত্তেজক দ্রব্য সাধারণতঃ দেহে নূতন শক্তি সৃজন করে না, প্রতিক্রিয়ায় অনিষ্ট সম্ভাবিত করে। দীর্ঘকাল লঙ্কা ও মরিচ সেবনে গলদেশ এবং পাকাশয়ে এক প্রকার সর্দ্দি জন্মে যাহাকে মসলা সর্দ্দি (Spice Catarrh) বলে। কিন্তু আমাদের চিরাভ্যস্ত আত্মানুকূল অনুগ্র হলুদ, ধনে প্রভৃতি নির্দ্দোষ মসলা উপযুক্ত পরিমাণ সেবনে কোন বিশেষ অপকার হইতে দেখা যায় না সুতরাং উহা বর্জ্জনীয় হইতে পারে না। শাস্ত্রমতে অল্প মরিচ সেবনও স্বাস্থ্যের অনিষ্টকর নয়। অবশ্য কোন প্রকার মসলার অতিসেবন অনিষ্টকর। উহাতে ভোক্তা স্বল্পে উত্তেজিত বা রাগান্বিত হয়, জল পিপাসা বাড়ে, মেজাজ খিটখিটে হয়, রক্তাল্পতা রোগাদি জন্মে বলিয়া কথিত হইয়াছে।

আর একটী নিন্দনীয় অভ্যাস, অধিক তেল ও উগ্র মসলা বা ঘৃতে রন্ধিত ব্যঞ্জন আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকে নির্ব্বিচারে খাইতে দেওয়া। ইহা অনেকের বিশেষতঃ শিশুদের স্বাস্থ্যের সর্ব্বনাশ সাধন করে তজ্জন্য উহা একটী শাস্তিমূলক অপরাধ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।

অতঃপর, পাককার্য্যে যে কয়েকটী মসলা আমরা নিত্য ব্যবহার করি, তাহাদের গুণাগুণ বিবৃত হইল। লবণ, পিঁয়াজ ও রসুনের বিষয় অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। মসলার গুণাগুণ, যাহা এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল, তাহার কতকাংশ, হাকিম মসিহর রহমন্ কোরায়শী প্রণীত হাকিমী দ্রব্যগুণ শিক্ষা পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।

আদা।

আয়ুর্ব্বেদ মতে আদা কটু, উষ্ণবীর্য্য কিন্তু বিপাকে শীতল, লঘুপাক, শুক্রজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, স্বরবর্দ্ধক, কোষ্ঠপরিস্কারক

এবং শোথ, কফ, কণ্ঠরোগ, আমবাত, কোষ্ঠবদ্ধতা ও শূল বেদনা প্রশমক। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে নিত্য আদা সেবন অহিতকর।

শুঁঠ বা শুষ্ক আদা স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কটু, বলকর, রুচিকর, পাচক, লঘুপাক, বায়ুনাশক, বিপাকে মধুর, স্বরবর্দ্ধক এবং বাত, কফ, আমবাত, শোথ, শূল, বমি, আধ্মান, শ্বাস, শ্লীপদ, অর্শ, গ্রীবা, মস্তিষ্ক ও হৃদ্‌রোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং উদর রোগে হিতকর। আদার কতকগুলি বৈদ্য শাস্ত্রোক্ত মুষ্টিযোগ নিম্নে দেওয়া হইল। ঔষধার্থে মাত্রা, আদার স্বরস ১—২ তোলা। শুঁঠ চূর্ণ ১—৪ আনা।

কর্ণশূলে—তিল তেল ও আদার রসে কিছু মধু ও সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া গরম করিয়া ফোঁটা ফোঁটা কাণে দেওয়া।

কামলা—কিছু পুরাতন গুড় ও শুঁঠ সেবন।

গ্রহণী—শুঁঠের কল্কের সহিত গাওয়া ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন। ইহা বায়ুর অনুলোমক।

অক্ষুধা বা অগ্নিমান্দ্য—মধ্যাহ্নের আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে সৈন্ধব লবণ সহ ৪।৫ টুকরা আদা চর্ব্বণ বা শুঁঠের কাথ গরম গরম পান।

নূতন সর্দ্দি কাসি—মধু ও আদার রস পান।

আম বাত—কাঁজির (আমানির) সহিত, শুঁঠের গুঁড়া সেবন।

শীত পিত্ত—পুরাতন গুড়ের সহিত আদার রস পান।

আধুনিক মতে, আদা ক্ষুধাবর্দ্ধক, জীবনীশক্তির ক্রিয়া বর্দ্ধক, উত্তেজক, অম্ল নিবারক এবং উদরাধ্মান রোগে মহোপকারী। আদার রস বা শুঁঠ সেবনে উদরশূল প্রশমিত হয়। আদার রস মধুর সহিত সেবনে সর্দ্দি, কাসি ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয় এবং উহার নস্য গ্রহণে শিরঃপীড়া আশু প্রশমিত হয়। আদা চর্ব্বণে দাঁতের পীড়া নষ্ট হয়। গলদেশের উভয় পার্শ্বের বাদামী আকারের গ্রন্থি-

প্রদাহ রোগে (Tonsil), আদা চিবাইলে উহা উপশমিত হয়। শুঁঠের গুঁড়া উষ্ণ দুগ্ধে মিলাইয়া সেবন করিলে বাত উপশমিত হয়। দন্তশূল ও শিরঃশূল রোগে আদা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। আদার রস চূণের জলের সহিত পানে অম্লরোগ শীঘ্র নিবারিত হয়।

হাকিমী মতে আদা বিরেচক ও পাচক; পাকস্থলী ও যকৃতের শক্তি ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধক; মস্তিষ্কের দূষিত রস, যকৃতের বদ্ধমল ও পাকস্থলীর ক্রিমি নিঃসারক এবং অরুচি নাশক। শিরা ও পেশী সমূহের বায়ুজনিত স্ফীতি, নাসিকা, কণ্ঠ ও কর্ণরোগ, শ্বাস, কাস, বধিরতা ও গুহ্যদেশ নির্গত হওয়া, শৈত্য ও পক্ষাঘাত, ছানি ও অন্য চক্ষু রোগে ইহা উপশমকারক। ইহার প্রলেপে শৈত্য জনিত বেদনা, শ্লেষ্মা জনিত ফুলা ও বেদনাদি নিবারিত হয়। আদার মোরব্বা শীত ও কফ প্রধান ধাতুর পক্ষে হিতকর। আদার রস ½ সের এক ছটাক তিল তেলের সহিত পাক করিয়া যখন রস নিঃশেষ হইবে তখন নামাইয়া কিছুক্ষণ পরে গরম থাকিতে থাকিতে উহা বায়ুজনিত বেদনা, ফিক বেদনা ও সন্ধিস্থলের বেদনাদিতে মালিশ করিলে উপকার পাওয়া যায়।

আদার আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ। আদা ব্যঞ্জনাদির স্বাদ ও সুগন্ধ বর্দ্ধক এবং পাচক। উহা চিবাইলে অধিক পরিমাণ লালা নিঃসৃত হয়। আদার আরো অনেক গুণ আছে। সে কারণ উহা আপত্তিকর লঙ্কার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। আমাদের দেশে মাংসাদি সৌখিন ব্যঞ্জন রন্ধনে আদা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় কিন্তু নিত্য পাককার্য্যে আদার ব্যবহার কমিয়া আসিতেছে এবং লঙ্কার প্রচলন উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। তবে কেহ কেহ ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট আদায় প্রস্তুত বিলাতীপানি জিঞ্জারেড বা

আদার সরবৎ মধ্যে মধ্যে পান করিয়া আদার অনাদর মোচন অথবা উহার প্রতি যৎকিঞ্চিৎ সম্মান প্রদর্শন করে।

পূর্ব্বে আমাদের ঘরে ঘরে. আদর্শ স্বাস্থ্যকর অঙ্কুরিত ছোলা ও আদা স্নানান্তে সেবিত হইত, এখন উহা গৃহস্থের ঘর ছাড়িয়া কলিকাতার গঙ্গাতীরস্থ উড়িয়া বামুনদের আশ্রয় লইয়াছে। অনেক সভ্য ও মার্জ্জিত রুচি লোক স্নানান্তে সেখানে ঐ অসভ্য খাদ্য গ্রহণে কুণ্ঠিত হন না, ইহা মন্দের ভাল বলিতে হইবে।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে আদা হইতে অনেক মুখরোচক ও পাচক আচার, মোরব্বা, পিষ্টক বা মিঠাই প্রস্তুত হইত ; উহা ক্রমে লোপ পাইতে বসিয়াছে। কিন্তু চীন, জাপান, ইউরোপ ও মার্কিণবাসীগণ ঐ সকল দ্রব্যের এখনও যথেষ্ট সমাদর করে। সেখানে উহার বিস্তৃত কারখানা ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান আছে যদ্দ্বারা উহা দেশবিদেশে চালান যাইতেছে। আমরাও চেষ্টা করিলে উহা করিতে পারি—অবশ্য যদি করি তবে হইতে পারে। এই 'যদিই' কার্য্যসূচনার বিষম অন্তরায়।

এই সম্বন্ধে আর একটী উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, আমাদের দেশে আদার চাষ অধিক হয় না বলিয়া পাটনা প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর দেশ হইতে অনেক টাকার আদা বৎসর বৎসর বাঙ্গলায় আমদানী করা হইতেছে। উহা আমাদের দেশজাত আদা হইতে নিকৃষ্ট। আদা বাঙ্গলা দেশে অতি সহজেই জন্মে কিন্তু চাষীদের ঔদাসীন্যের মূল্যস্বরূপ, দেশের বহু টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে যাহা তাহাদের ক্রমবর্দ্ধনশীল দৈন্য ও দারিদ্র্যতার একটী অন্যতম কারণ। যাহাতে দেশে অধিক আদা জন্মে তাহার চেষ্টা বিশেষ প্রয়োজন নচেৎ বাঙ্গলীকে সকল বিষয়ে চির-কাঙ্গালী হইয়া থাকিতে হইবে।

আম আদা।

ইহা অম্বল রন্ধনে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়, তবে কাঁচা পেপের সহিত ইহার প্রণয় বেশী। আম আদা ছেঁচিয়া স্পিরিট ও ডিমের শ্বেতাংশের সহিত মিশাইয়া আক্রান্ত স্থানে প্রলেপ দিলে বাতবেদনা দূর হয়। ইহার টাটকা রস রুচিকর ও পরিপাক শক্তি বর্দ্ধক। ইহার মূল উদরাময় ও প্রমেহ নিবারক, শ্লেষ্মা নিঃসারক এবং অর্শ, শূল ও মুখরোগে হিতকর।

জীরা।

আয়ুর্ব্বেদে পাঁচ প্রকার জীরা উল্লিখিত হইয়াছে—যথা (১) জীরক, (২) শুক্ল জীরক, (৩) কৃষ্ণাজাজী, (৪) শাজীরা ও (৫) বন্যজীরা। (২), (৩) ও (৪) সাধারণতঃ রন্ধনার্থে ব্যবহৃত হয়। (১) নম্বরের স্পষ্ট স্বরূপ জানা যায় নাই। (৫) নং ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

শুক্ল জীরক।

শুক্ল জীরা ঠিক শ্বেতবর্ণের জীরা নয়। একজন প্রসিদ্ধ হাকিমের মতে, যে কটা রঙের জীরা ব্যঞ্জন রন্ধনার্থে ব্যবহৃত হয় এবং যাহার গুণাগুণ নিম্নে উল্লিখিত হইল তাহাকেই শুক্ল জীরা বলা সঙ্গত।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা কটু, তিক্ত, মধুর, সুগন্ধী, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য, লঘু, পাচক, মলসংগ্রাহক, দীপক, চক্ষুর হিতকর, রুচিকর, গর্ভাশয়-বিশোধক, রুক্ষ ও বলবর্দ্ধক। ইহা বমি, রক্তদুষ্টি, অতিসার, ক্রিমি, গুল্ম, কুষ্ঠ, ক্ষয়, বিষদোষ, বাতজনিত উদরাধ্মান প্রভৃতি রোগে প্রয়োজ্য। ভাবপ্রকাশ মতে ইহা প্রসূতির সুতিকারোগ, যোনিরোগ,

শ্বাস, কাস, জ্বর ও বাতরোগে হিতকর। চক্রদত্ত মতে শুক্ল জীরার গুঁড়া পুরাতন গুড়ের সহিত সেবনে বিষমজ্বর আরোগ্য হয়। ভাবপ্রকাশ মতে বৃশ্চিকদংশনে ঘৃত ও সৈন্ধবলবণ সহ উহার কল্ক ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা নিবৃত্তি হয়।

ডাক্তারী মতে জীরা বায়ুনাশক, উষ্ণ ও পাচক। স্বরভঙ্গ, অজীর্ণ, গ্রহণী, উদরাধ্মান ও অতিসাররোগে উহা ব্যবস্থিত হয়।

হাকিমী মতে উহা পেটের বায়ু ও পেটফাঁপা দূর করে, যকৃৎ, পাকস্থলী, অন্ত্রমণ্ডল ও মূত্রাশয়কে সবল করে এবং স্ফীতি নিবারণ করে। উহা কফনিঃশেষক, কোষ্ঠকাঠিন্যনিবারক ও রতি-বর্দ্ধক। এই জিরা জলে ভিজাইয়া সেই জল চক্ষে দিলে চক্ষুরোগ দূর হয়। উহা কোন কোন প্রকার শুক্রমেহ রোগে উপকারী। পাকস্থলী বা মূত্রাশয়ে রক্ত বা পাথর জমিলে ইহা ব্যবহারে নিঃসৃত হয়। ইহা সির্কার সহিত সেবনে হিক্কা নিবারিত এবং পাকস্থলীর ক্রিমি বিনষ্ট হয়। ইহা সেবনে বীর্য্য ও স্তনদুগ্ধ বর্দ্ধিত হয়। ইহার চূর্ণ ক্ষতে প্রয়োগ করিলে ক্ষত শুষ্ক হয়। ইহার রস বা ক্বাথ নাকে টানিলে নাসারোগ নিবারিত হয়। ইহা চিবাইয়া চক্ষে দিলে চক্ষু-রোগ দূর হয়। ইহা অতিরিক্ত সেবন করিলে শরীর ও মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে, কৃশতা আনয়ন করে এবং ফুসফুস ও অন্ত্রমণ্ডলের অনিষ্ট সাধন করে।

শাজীরা।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা উষ্ণবীর্য্য, সুগন্ধী, কটুরস, মলসংগ্রাহক, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, কফনাশক, রুচিজনক ও চক্ষুর হিতকর। ভাবপ্রকাশ মতে শাজীরাচূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবনে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা আধ্মান ও বিষদোষ নাশক। হাকিমী মতে ইহা ব্যবহারে

শরীরে উষ্ণতা ও মনে স্ফূর্ত্তির আবির্ভাব হয়; কফ ও বায়ু বিনষ্ট হয়; স্ফীতি বিলীন হয়; রসদোষ নষ্ট হয়; পাকস্থলীর বিকৃত রস বিদূরিত হয়; ক্ষুধা বৰ্দ্ধিত এবং প্রস্রাব ও ঋতু পরিষ্কার হয়। ইহা সির্কা বা জলের সহিত বাটিয়া স্ত্রীলোকের স্তনে দিনে দুই তিন বার প্রলেপ দিলে স্তনযুগল দৃঢ় হয়।

ইহা সেবনে পাকস্থলী, যকৃৎ, অন্ত্রমণ্ডল ও মূত্রাশয় সবল এবং পেটের সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়। ইহার রস চক্ষে দিলে উহা হইতে রক্তপাত নিবারিত হয়। ইহার কাথ দ্বারা কুল্লি করিলে দন্তবেদনা উপশমিত হয় এবং ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব রোগ বিদূরিত হয়। এই জীরার জল দ্বারা সদ্যপ্রসূত শিশুর গাত্র ধৌত করিলে আজীবন তাহার গাত্রে উকুন হইতে পারে না। ইহা শীতলপ্রকৃতি লোকের ও বৃদ্ধের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহা ভাজিয়া সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে কিন্তু শুষ্ক জীরা ব্যবহারে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। শাজীরা সির্কাতে ভিজাইয়া শুষ্ক করিবার পর সেবন করিলে রমণীদের মাটী খাইবার ইচ্ছা থাকে না এবং হিক্কা নিবারিত ও পাকস্থলীর ক্রিমি নষ্ট হয়। ইহা ব্যবহারে ঘর্ম্ম নিবারিত ও শরীর হৃষ্টপুষ্ট হয়।

কালজীরা।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা উষ্ণবীর্য্য, কটু-তিক্ত রস, রুচি ও বলকর, মেধাজনক, অগ্নিদীপক, পাচক, ধারক, গর্ভাশয়বিশোধক। ইহা অজীর্ণ, গ্রহণী, বাতজনিত উদরাধ্মান, গুল্ম, রক্তপিত্ত, ক্রিমি, কফ, ব্রণ, বায়ু, পিত্ত, আমদোষ, অতিসার, বাত ও শূল রোগে ব্যবহৃত হয়। বঙ্গসেনের মতে তরুণ কফরোগে ইহার চূর্ণ নস্যরূপে গ্রহণ করিলে উপকার হয়।

ডাক্তারী মতে ইহা বায়ু ও ক্রিমিনাশক, পাচক, মূত্রকারক, ও স্বরভঙ্গনাশক। প্রসবান্তে ইহার ক্বাথ সেবনে গর্ভাশয়ের দ্বার সঙ্কুচিত এবং স্তন্য বর্দ্ধিত হয়। বিষম জ্বর, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও অতিসারে ইহা চিতামূলের সহিত সেবনে উপকার হয়। ইহা আর্ত্তব রজঃ নিঃসারক সেইজন্য রজঃকৃচ্ছ, রজোরোধ বা বিলম্বিত রজে অর্দ্ধ মাত্রায় সেবনীয়—অধিক মাত্রায় সেবনে গর্ভস্রাব হয়। প্রসবের পর কাল জিরা বাটা উপযুক্ত মাত্রায় সেবনে প্রসূতিদের গর্ভাশয়দ্বার সঙ্কুচিত এবং স্তন্যদুগ্ধ বর্দ্ধিত হয়। ইহা জলে পিষিয়া প্রলেপ দিলে হস্ত ও পদের শোথে উপকার করে। পশমী বস্ত্রাদি কীট হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহা তদুপরে ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

হাকিমী মতে, ইহা সেবনে শরীরের দূষিত রস এবং ধাতু সমূহ বিশোধিত হয়। ইহা জলে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে গর্ভস্থ জীবিত বা মৃত সন্তান প্রসূত হয়। ইহা বিষ নাশক। সর্দ্দিজনিত কাসি, বুকের বেদনা, বমনেচ্ছা, পাণ্ডু কামলা, প্লীহা এবং বায়ু জনিত শূলরোগে ইহার বাহ্যিক প্রলেপে ও আভ্যন্তরিক সেবনে বিশেষ উপকার হয়। ইহা দীর্ঘদিন ব্যবহারে মুখের বর্ণ উজ্জ্বল হয়, সির্কার সহিত সেবনে পেটের ক্রিমি নষ্ট হয়। গরম জলের সহিত ৯ মাসা গিলিয়া খাইলে ক্ষিপ্ত কুক্কুর দংশনের বিষ নষ্ট হয়। ইহা সিকিঞ্জিবিনের সহিত সেবনে পালা জ্বর বিনষ্ট হয় এবং মূত্রাশয় ও মূত্রস্থলীর পাথরি নির্গত এবং ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হওয়া নিবারিত হয়। ইহা সির্কাতে ভিজাইয়া ঘ্রাণ লইলে শিরোবেদনা প্রশমিত হয়। ইহার সাতটি দানা রমণীর স্তনদুগ্ধের সহিত বাটিয়া নাকে টানিলে কামলা রোগে উপকার হয়। ইহা দ্বারা সোরমা প্রস্তুত করিয়া চোখে দিলে ছানির প্রথম অবস্থায় বিশেষ উপকার হয়। ইহার কুল্লি করিলে দন্ত বেদনা বিদূরিত হয়।

ইহা বাটিয়া প্রলেপ দিলে, শিরোবেদনা, সন্ধিবেদনা, দাদ, ধবল ও চুলকণা ইত্যাদিতে উপকার হয় এবং ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ফুলা নিবারিত হয়। ইহা সেবনে প্রস্রাব ও ঋতু পরিষ্কার হয় এবং স্তনদুগ্ধ অধিক নিঃসৃত হয়। ঘৃতের সহিত সেবনে মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও বর্ণ পরিষ্কার হয়।

যদি রোগীর কাণ হ'তে পুঁজ নির্গত হয়, বমনেচ্ছা থাকে:বা প্লীহা বড় হয়, নিশ্বাস লইতে কষ্ট বোধ করে, এমনকি বিছানায় শুইতে, বসিতে, উঠিতে, ঘাড় সোজা করিতে বা নিঃশ্বাস লইতে না পারে, এরূপ অবস্থায় ইহা বিশেষ ফলদায়ক। ইহা পোড়াইয়া মোম এবং তেলের সহিত মিশাইয়া ক্ষতে লাগাইলে ক্ষত আরোগ্য হয় এবং দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে সেই স্থানে চুল গজায়। ইহা পোড়াইয়া ধূম দিলে বিষাক্ত পোকাদি দূরে পলায়ন করে।

লঙ্কা বা লঙ্কা মরিচ।

অনেকের মতে ইহার আদি জন্মস্থান ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। লঙ্কার আয়ুর্ব্বেদোক্ত গুণ, লঘু, উষ্ণ, রুক্ষ, পাচক, রোধক, অগ্নি উদ্দীপক, দাহকর, শরীরের বিভিন্ন মল নাশক ও ভুক্ত দ্রব্য শোধক। ইহা কণ্ডু, ক্রিমি, কফ, ক্লেদ ও ব্রণ নাশক। অজীর্ণ, বিসূচিকা, মেহ, প্রলাপ, অরুচি ও ধ্বজভঙ্গ, স্বরভঙ্গ ও শুক্রমেহে উপকারক, শিরা প্রভৃতি মার্গ সমূহের শ্লেষ্মা প্রশমক; অন্য প্রায় সকল রোগে অনিষ্টকর।

ডাক্তারী মতে ইহা আগ্নেয়, নিদ্রাকারক ও অজীর্ণ রোগে হিতকর। বেদনা ও বাতে উহার মালিশ বিশেষ উপকারী এবং উহা দ্বারা ডিলিরিয়াম্ বা ভুল বকা নিবারিত হয়। ইহা সেবনে দীর্ঘকাল সুরা

সেবনের কুফল প্রশমিত হয়, দেহের কোনস্থান থ্যাঁতলাইয়া গেলে লঙ্কাবাটার প্রলেপ উপকারক।

হাকিমী মতে লঙ্কা শীতল ও কফ প্রকৃতির লোকের পক্ষে হিতকর। অল্প পরিমাণ সেবনে কফ জনিত স্থূলতা বিদূরিত হয়। উহা বদ্ধমল ও লোমকূপ পরিষ্কার করে, ফুলা দূর করে এবং শিরাসমূহের আক্ষেপ ও কফজ বেদনা নাশ করে। উহার শুষ্ক খোলা সেবনে বহুমূত্র, ভেদ ও বমন নিবারিত হয়।

লঙ্কা সেবনে যকৃতের উষ্ণতা জন্মে, শুক্র তরল হয়, অতিরিক্ত পরিমাণ সেবনে রেতঃপাত রোগ, রতিশক্তি হ্রাস, নাড়ী দ্রুত, শরীর উষ্ণ, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল এবং পাকস্থলীতে বেদনা অনুভূত হয়; অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও পরিপাক শক্তি অকালে বিনষ্ট এবং দুঃসাধ্য সাংঘাতিক অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়। উহাতে চক্ষের জ্যোতিঃ বিনষ্ট হইয়া পরিণামে অন্ধ হইবার আশঙ্কা আছে।

হরিদ্রা।

ইহা বলবর্দ্ধক, রক্তপরিষ্কারক, পিত্তনাশক ও দাহ নিবারক। ইহার গুণজ্ঞাপক অন্য কতকগুলি নাম—কাঞ্চনী, পীতা, বর্ণবতী, বরবর্ণিনী ও যোষিৎপ্রিয়া। কফ, বাত, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, ব্রণাদি ত্বগ্ রোগ, শোথ, পাণ্ডু, ক্রিমি, প্রমেহ, অরুচি ও বিষদোষে কল্যাণকর। উহা উদর ও উদরী রোগ নিবারক।

আঘাত জনিত বেদনায় চূণে হলুদ আশু উপশম করে। হলুদ আগুনে পোড়াইয়া নাকে ঐ ধোঁয়া লইলে সর্দ্দি বা শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া শান্তি হয়। হলুদ দুধে সিদ্ধ করিয়া চিনির সহিত সেবন করিলে সর্দ্দির উপশম হয়। হলুদ পিষিয়া আমলকি সহ সেবনে প্রমেহ

আরোগ্য হয়। গুড় ও গরুর চোনার সহিত হলুদ সেবন করিলে গোদ উপশমিত হয়। হলুদ পিষিয়া তিল তেলে মিশাইয়া গায়ে মাখিলে চর্ম্মরোগ নিবৃত্ত হয়। হলুদ সেবনে শরীর মধ্যস্থ সকল প্রকার পোকা নষ্ট হয়। চারা গাছের উই ও অন্যান্য পোকা ধরা নিবারণার্থে হলুদ জল বৃক্ষমূলে সেচন ও পাতায় ছিটকাইয়া দেওয়া হয়।

শিশুদের ক্রিমি রোগে, গুড় ও কাঁচা হলুদের গুঁড়া অব্যর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অনেক আধুনিক চিকিৎসকগণের মতে হরিদ্রা চর্ম্মরোগে এবং কামলা ও বহুমূত্র রোগে বিশেষ উপযোগী। নাসিকার ভিতরের ক্ষতে হলুদ-গুঁড়া মহৌষধ। হাকিমী মতে প্রমেহ পীড়ায় কাঁচা হলুদ সেবন বিশেষ উপকারী।

মাছে হলুদ মাখাইলে উহার অনেক দোষ কাটে। শাকসব্জীর অনিষ্টকর জীবাণু হলুদ সেবনে বিনষ্ট হয়। পল্লীমঙ্গল সমিতির গৃহস্থ-মঙ্গল পুস্তকে লিখিত হইয়াছে—

হলুদ সংক্রামক রোগের বীজাণু নষ্ট করিতে সক্ষম। কলেরা রোগে উহা অব্যর্থ মহৌষধ। বসন্ত রোগেও উহা উপকারী। কাঁচা হলুদ ও তেঁতুল পাতার রস শীতল জল সহ সেবনে বসন্ত রোগ বিনষ্ট হয়। মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে প্রত্যহ প্রাতে হলুদের রস মধুসহ সেবন বসন্ত, কলেরা, জলবসন্ত ও অতিসার প্রতিষেধ করে এবং যকৃৎ, কোষ্ঠবদ্ধতা, রক্তাল্পতা, পরিপাক শক্তির দুর্ব্বলতা, পুরাতন কাসি, ঘুসঘুসে জ্বর প্রভৃতিতে বিশেষ উপকার করে। উহা সরিষার তেলের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে গরল আরাম হয়।

হলুদ কুমীরের শত্রু—উহার গন্ধে কুমীর পালায়। সাপও উহার গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে রমণীগণ গায়ে হলুদ মাখিয়া স্নান করে তাহাতে শরীরে লাবণ্য বিকশিত হয় এবং হলুদের বরবর্ণিনী নাম সার্থক হয়

আম হরিদ্রা বা আম হলুদ।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা তিক্ত-অম্ল-কষায় রস অর্থাৎ একাধারে তিনটী রস সম্পন্ন, লঘু, রুচিপ্রদ, অগ্নিদীপক, উষ্ণবীর্য্য ও সারক। ইহা কফ, ব্রণ, কাস, শ্বাস, হিক্কা, জ্বর, মুখরোগ, রক্তদোষ, বায়ু ও শূলরোগনাশার্থ ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ৵০।

ডাক্তারী মতে ইহা রুচিকর, আগ্নেয় ও বায়ুনাশক; অজীর্ণ রোগে ব্যবহার্য্য। হাকিমী মতে ইহা উষ্ণ প্রকৃতির লোকের পক্ষে অহিতকর। ইহা ব্যবহারে বায়ু ও ফুলা নিবারিত হয় এবং কোন ক্লেদ জন্মিতে পারে না। ইহা স্বয়ং অতি শীঘ্র জীর্ণ হয় এবং অপর ভুক্তদ্রব্যকে শীঘ্র জীর্ণ করে। ইহা মাথার, কাণের ও মুখের রোগে বিশেষ উপকারী। ইহা সেবনে পাথর নিষ্কাসিত হয় এবং প্রস্রাব বন্ধ থাকিলে তাহা খুলিয়া যায়। ইহার আভ্যন্তরিক সেবনে ও বাহ্যিক প্রলেপে খোস, পাঁচড়া ও দাদ আরোগ্য হয় এবং আঘাতজনিত বেদনা ও ফুলা ইত্যাদি দূর হয়। ইহাতে কফের জ্বর ও রক্তের দোষ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

ধনে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ধনে দীপক, পাচক, গ্রাহী এবং তৃষ্ণা, দাহ, পিত্ত, বমি, শ্বাস ও ক্রিমিনাশক। জীর্ণজ্বর, কফ, শোথ, শিরোরোগ, চক্ষু ও কুষ্ঠরোগে কল্যাণকর। ধনে ও শুঁঠসিদ্ধ জল পানে অজীর্ণ, আমাজীর্ণ ও শূলরোগ প্রশমিত ও বস্তি শোধিত হয়। অর্শরোগে ভোজনের মধ্যে ও শেষে উহার ক্বাথ পান ব্যবস্থিত হয়। চিনি ও মধুসহ ধনের ক্বাথ পানে জ্বরজনিত পিপাসা নিবারিত হয়। পূর্ব্বদিবসে উক্ত ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পরদিবসে পান করিলে বহুদিনের অন্তর্দাহ (জ্বালা) প্রশমিত হয়।

ডাক্তারী মতে ইহা বায়ুনাশক, উষ্ণ, পাচক, সুগন্ধি ও উত্তেজক। অন্যান্য ঔষধের তীব্র গন্ধ ও আস্বাদ নিবারণার্থে উহাদের সহিত ধনের ক্বাথ মিশান হয়। ইহা মুখরোগ, গ্রহণী ও প্রতিশ্যায়, বিরেচক ঔষধ ব্যবহার জনিত শূল এবং স্নায়ুশূল (Neuralgia), আধ্মান, বাত প্রভৃতি রোগে ব্যবস্থিত হয়।

হাকিমী মতে ধনে উদরের দূষিত বায়ু মস্তকে ওঠা ও তজ্জনিত মনের ঔদাস্য এবং হৃৎকম্প নিবারণ করে। উহা মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলী সবল, মনের প্রফুল্লতা আনয়ন এবং দাস্ত, বমন ও পিপাসা নিবারণ করে। উহাতে ক্ষুধা উৎপন্ন এবং ক্রিমি বিনষ্ট হয়। ধনে শুক্রমেহ রোগে হিতকর। উহা চিবাইলে মুখের মদ্যপানজনিত গন্ধ ও নেশা বিদূরিত হয়। ধনে শির্কায় ভিজাইয়া খাইলে উক্ত গুণ বিশেষভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার সরবৎ মাথাঘোরা, মাথাধরা ও প্রস্রাব দ্বারের ক্ষতে উপকারী। ইহার শুষ্কচূর্ণ ক্ষতে ব্যবহার করিলে রক্ত বন্ধ হয়। ইহার ফুলের রেণু ব্যবহারেও রক্ত বন্ধ হয়।

ভাজা ধনের ক্বাথ সেবনে গ্রহণী ও ওলাউঠা রোগে উপকার পাওয়া যায়। উহা বাটিয়া প্রলেপ দিলে উষ্ণতাজনিত শিরোবেদনা দূর হয়। তামাকের ন্যায় আমপাতা সহ ভাজা ধনে সাজিয়া ধূমপানে হিক্কা নিবারিত হয়।

ধনে পাতার রস বায়ুনাশক ও ক্ষুধাজনক। বসন্তরোগে ঐ রস চক্ষে দিলে, স্ফোটক বাহির হয় না। ঐ রস প্রসূতির দুগ্ধের সহিত চক্ষে দিলে বিশেষ উপকার হয়। ধনেপাতা চিবাইয়া তদ্দ্বারা দাঁত মাজিলে দাঁতের মাঢ়ি শক্ত ও রক্তপড়া বন্ধ হয়। উহার প্রলেপ দিলে গরমের জন্য ফুলা দূর হয় এবং চুলকণা ও পাঁচড়াতে উপকার করে। কিন্তু ১।০ তোলা বা তদধিক কাঁচা

ধনের রস পানে রতিশক্তি কমে ও দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়, মূর্চ্ছা ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, হাত-পা শীতল হইয়া যায়, মাথা ঘুরিতে থাকে, কণ্ঠস্বর রোধ হয় এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। অধিক ধনে সেবনে বীর্য্য হ্রাস এবং শ্বাসরোগে অনিষ্ট করে।

হিং।

ইহা ব্যঞ্জনের একটী প্রধান মশলা, অনেক ক্ষেত্রে উহা পিঁয়াজের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে হিং স্নিগ্ধ, পাচক, সারক, উষ্ণ, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, বাতনাশক, রস ও কফনিঃসারক, বায়ু ও আক্ষেপ নিবারক, স্নায়ু উত্তেজক, কামোদ্দীপক, অজীর্ণ, শূল, বিবদ্ধ, গুল্ম ও ক্রিমি রোগে শান্তিকর।

হাকিমী মতে ইহা শিরোরোগে উপকারী, চক্ষের জ্যোতিঃ ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধিকারক এবং বায়ুনাশক। ইহা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, কণ্ঠ, বক্ষ, পাকস্থলী, যকৃৎ, প্লীহা, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ সমূহে উপকারী। মদের সহিত হিং সেবনে স্নায়বিক রোগ প্রশমিত হয়। উহার অঞ্জন ব্যবহারে চক্ষুর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয় এবং ছানি ও অন্যান্য যাবতীয় নেত্ররোগে উপকার করে।

ডিমের পীতাংশের সহিত হিং সেবনে শুষ্ক কাসি ও পার্শ্ববেদনা উপশমিত হয়। জলের সহিত সেবনে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার এবং উদরের বায়ু, বেদনা ও শূলাদি বিদূরিত হয়। প্রসবকালে হিং প্রসবদ্বারে দিলে অনায়াসে সন্তান প্রসূত হয়। তিল তেলে হিং মিশাইয়া মালিশ করিলে বাতবেদনা ও আঘাতপ্রাপ্তি জনিত বেদনা উপশমিত হয়। ইহা নানা বিষনাশক।

পুরাতন বাটীতে বট বা অন্য আগাছা জন্মিলে উহা কাটিয়া অবশিষ্ট অংশে হিং প্রয়োগ করিলে গাছ মরিয়া যায়। একবার প্রয়োগে না মরিলে পুনঃ প্রয়োগ করা উচিত।

আধুনিক ডাক্তারী মতে উদরাধ্মান, হিষ্টিরিয়া বা অন্য প্রকার স্নায়বিক পীড়ায়, শ্বাস, কাস ও ফুস্‌ফুস্ ইত্যাদির প্রদাহে হিং ব্যবহার্য্য। হৃৎস্পন্দন, শিশুদের দন্তোদ্গমকালীন আক্ষেপ এবং মহীলতার ন্যায় ক্রিমিরোগে উহা বিশেষ উপকারক।

কবিরাজী, হাকিমী ও ডাক্তারী নানা ঔষধে হিং ব্যবহৃত হয়। ইহা ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক এবং স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে ও যে সকল রমণীর বার বার গর্ভস্রাব হয় তাহাদের পক্ষে উত্তম ঔষধ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

গোল মরিচ।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা উষ্ণ, কটু, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, অগ্নিউদ্দীপক, রুচিকর, কফ ও বায়ুনাশক। ইহা শ্বাস, শূল, কফ, বায়ু, ক্রিমি ও হৃৎরোগে হিতকর। গোলমরিচ চূর্ণ, ঘৃত, চিনি ও মধুর সহিত লেহনে সর্ব্বপ্রকার কাস রোগ প্রশমিত হয়। উহা জলের সহিত পানে আমাশা আরোগ্য হয়, দধির সহিত ঘসিয়া চোখে অঞ্জন দিলে রাতকাণা রোগ ভাল হয়। মধু ও অশ্বের লালায় মরিচ ঘসিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে অতিনিদ্রা প্রশমিত হয়। মুখের লালার সহিত মরিচ ঘসিয়া চোখে অঞ্জন দিলে নিদ্রা আসে। শিশুদের শোথরোগে মাংসের সহিত উহা লেপনে বিশেষ উপকার হয়।

ডাক্তারী মতে গোল মরিচ উত্তেজক, পাচক, বায়ু নাশক ও পর্য্যায় নিবারক। উহা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, অর্শ ও পক্ষাঘাত রোগে

উপকারী। একটী গোল মরিচ বড় সূচে ফুটাইয়া প্রদীপ শিখায় ধরিলে যে ধূম নির্গত হইবে তাহা হিক্কা, বিশেষতঃ বিসূচিকা জনিত হিক্কা রোগে কার্য্যকরী। মরিচ উদরাধ্মান ও গ্রহণী রোগে এবং পাকাশয়ের দুর্ব্বলতায় ব্যবস্থিত হয়। উহা প্রমেহ, শুক্রমেহ, অর্শ প্রভৃতি গুহ্যদেশজাত রোগে সেবনীয়। দন্তশূলে মরিচের প্রলেপ হিতকর। গলক্ষত ও আলজিব বিবর্দ্ধিত হইলে মরিচের ক্কাথের কবল উপকারী।

ম্যালেরিয়া, মস্তিষ্কের সর্দ্দি, তালুদেশের ক্ষত এবং কলেরা রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। উগ্র শক্তি বিশিষ্ট মরিচের ক্কাথ সেবনে কলেরার বমন, রেচন, উদরাধ্মান প্রভৃতি উপসর্গ দূর হয়। উহা হিং ও কর্পূরের সহিত সেবনে ডিসপেপসিয়া আরাম হয়। মরিচ সেবন চক্ষুরোগেও হিতকর। উহা গরম জলে ভিজাইয়া সেই জল পান করিলে প্রমেহ ও শূলব্যথা নিবারিত হয়।

বিষাক্ত কীটাদি দংশনে দষ্টস্থানে সির্কার সহিত মরিচ চূর্ণ প্রলেপ ব্যবস্থিত হয়। টাকে পিঁয়াজ ও লবণের সহিত মরিচের প্রলেপ দিলে টাক ভাল হয়।

হাকিমী মতে মরিচ কফ নাশক, স্মৃতি শক্তি বর্দ্ধক, পেশী, স্নায়ুমণ্ডল, পাকস্থলী ও যকৃৎ সবলকারক, অম্লোদ্গার নিবারক, কামোদ্দীপক, আগ্নেয়, ফুলা ও বায়ু নিঃশেষক, রক্তশোধক, উষ্ণতা ও ক্ষুধা উৎপাদক এবং শ্বাস, কাস, প্রমেহ, বক্ষ বেদনা ও কফ ঘটিত সর্ব্বপ্রকার মস্তিষ্ক রোগে উপকারক। ইহা মূত্র ও ঋতু আনয়ন করে। ইহা চক্ষুতে অঞ্জন লাগাইলে ঝাপসা দূর হয় এবং ছানি প্রভৃতি চক্ষু রোগে উপকার করে। ইহা শ্বেত কুষ্ঠ রোগেও উপকারী। ইহার চূর্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া সর্প ও বৃশ্চিক দংশিত

ব্যক্তি কিম্বা অধিক আফিম সেবনকারীকে বার বার খাওয়াইলে, বমন হইয়া বিষদোষ দূর হয়।

মনাক্কার সহিত মরিচ চিবাইয়া খাইলে মস্তিষ্কের ও পাকস্থলীর দূষিত বায়ু বিনষ্ট হয়। ইহার প্রলেপে দাদ আরাম হয়। ইহা বাটিয়া স্ফোটকে দিলে উপকার হয়। লবণ ও গোলমরিচ চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে নানা প্রকার দাঁতের রোগ আরাম হয়।

বড় এলাচ।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা কটুরস, কটুবিপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা পিত্ত, কফ, রক্তদোষ, কণ্ডু, শ্বাস, তৃষ্ণা, হৃল্লাস, বিষ দোষ, বস্তিগত দোষ, শিরোরোগ, মুখরোগ, বমি ও কাস নিবারক।

হাকিমী মতে ইহা মন প্রফুল্ল করে, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী ও দন্তমাড়ি সবল ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে। ইহা মুখে জল আসাতে উপকার ও দাস্ত বন্ধ করে। ইহা ভাজিয়া খাইলে বমনেচ্ছা নিবারিত ও পাকস্থলীর দূষিত বায়ু নিষ্কাষিত হয়। ইহা ওলাউঠা রোগে ও যকৃতের বেদনাতে হিতকর। ইহার খোসা বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে উষ্ণতা বশতঃ শিরোবেদনা প্রশমিত হয়। ইহার খোসা চূর্ণ করিয়া মাজন ব্যবহার করিলে দাঁতের মাড়ি শক্ত হয় ও মুখ আসা নিবারিত হয়।

ছোট এলাচ।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা কটুরস, শীতবীর্য্য ও লঘু। ইহা কফ, শ্বাস, কাশ, অর্শ, মূত্রকৃচ্ছ ও বায়ুনাশক। মাত্রা ২—৪ আনা। ইহা

আয়ুর্ব্বেদোক্ত কতকগুলি ঔষধের অন্যতম উপাদান। অনেকের ধারণা ছোট এলাচ, ডালচিনি, লবঙ্গ প্রভৃতি যাহা গরম মসলা রূপে ব্যবহৃত হয় তাহা গরম কিন্তু উহাদের শৈত্য গুণই প্রবল বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ডাক্তারী মতে ইহার তেল উত্তেজক, বায়ুনাশক ও আগ্নেয়। ইহা অজীর্ণ, উদরাধ্মান ও অন্ত্রের আক্ষেপিক বেদনাতে ব্যবস্থিত হয়। ইহা বাতঘ্ন বলিয়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

হাকিমী মতে ইহা সেবনে মন প্রফুল্ল হয়, মুখ ও চর্ম্ম সুগন্ধযুক্ত হয়। ইহার সূক্ষ্মচূর্ণ নাসিকায় টানিলে হাঁচি হইয়া শিরোবেদনা দূর হয় এবং মৃগী রোগেও উপকার হয়। ইহা কাণে দিলে কাণের ব্যথার উপশম হয়। ইহা চিবাইলে দাঁতের গোড়া শক্ত হয়, পাকস্থলী, কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের রস শুষ্ক এবং হৃৎপিণ্ড সবল করে, বমন বা বমনেচ্ছা ও বায়ু জনিত পেটের বেদনা দূর হয়, ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক ও দাস্ত বন্ধ করে। অল্প পরিমাণে লবণ ও ছোট এলাচ দানা চূর্ণ মিশাইয়া উহাতে জল দিয়া নাকে টানিলে সর্ব্বপ্রকার বেদনা দূর হয়। ইহা খোলা সমেত কুটিয়া গোলাপ জলে মিশাইয়া সেবন করিলে বমন, বমনেচ্ছা ও ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে উপকার করে। ইহার তেল চোখে লাগাইলে রাতকাণা রোগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

লবঙ্গ।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা কটু, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, লঘু, চক্ষুর হিতকর, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও রুচিকর। ইহা ত্রিদোষনাশক, মুখের দুর্গন্ধ নাশক ও রক্ত দোষ, তৃষ্ণা, বমি, উদরাধ্মান, শূল, কাস, শ্বাস, হিক্কা, ক্ষয়, চক্ষু ও শিরোরোগ উপশমকর। মাত্রা দুই আনা।

২ তোলা লবঙ্গ কুটিয়া ৪ সের জলে পাক করিয়া ২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে পিপাসা ও উৎকাশি প্রশমিত হয়।

ডাক্তারী মতে ইহা উত্তেজক, বায়ুনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক। উদরাধ্মাননাশক এবং পরিপাকক্রিয়া সবলকারক। ইহার উদ্বায়ী তেল সুগন্ধের জন্য এবং চক্ষু চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। গর্ভিণীর গর্ভাবস্থায় বমন ও বিরেচন নিবারণার্থে ইহার ফাণ্ট ব্যবস্থিত হয়। অগ্নিমান্দ্য ও জ্বরাদি রোগের পর দুর্ব্বলতা দূর করিতে চিরতামিশ্রিত লবঙ্গের ফাণ্ট বিশেষ উপকারক। ইহা পচননিবারক, পাচক, বমন ও আক্ষেপনিবারক। আমাশয় জনিত অন্ত্রশূল ও আক্ষেপ নিবারণ করে। বাতের বেদনা গৃধ্রসী (Sciatica) কটিশূল (Lumbago), শিরঃশূল ও দন্তশূলে ইহার প্রলেপাদি ব্যবস্থিত হয়। লবঙ্গ প্রদীপের শিখার উপর পোড়াইয়া মুখে ধারণ করিলে মুখ ও নিশ্বাস সুগন্ধযুক্ত ও দন্তমাড়ি দৃঢ় হয়।

হাকিমী মতে ইহা বায়ুনাশক, স্ফীতিনিবারক, রতিশক্তিবর্দ্ধক, মনের প্রফুল্লতাকারক, পরিপাকশক্তি বর্দ্ধক ও পাকস্থলীর বেদনা-নাশক। ইহা সেবনে শ্বাস ও শ্লেষ্মা জনিত কাস রোগে উপকার হয়, ভয়, অবসাদ, দন্ত বেদনা ও মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, চিন্তা ও স্মৃতি শক্তি বর্দ্ধিত হয়, শৈত্যজনিত শিরোবেদনা এবং পক্ষাঘাতাদি রোগ উপশমিত হয়। ইহা অতি সুগন্ধী ও সুস্বাদু—সেবনে হিক্কা, বমনেচ্ছা ও বমন নিবারিত হয়। ইহার ১৮০ মাষা লবণের সহিত পিষিয়া কাঁচা দুধের সহিত কিছুদিন সেবন করিলে কামোত্তেজনা অতিশয় বর্দ্ধিত হয়, সেইজন্য ধ্বজভঙ্গ রোগে উহা বিশেষ ফলপ্রদ। লবঙ্গের বিষনাশক গুণ আছে। উহা দ্বারা সোরমা প্রস্তুত করিয়া চক্ষে দিলে চক্ষুর জ্যোতিঃ বর্দ্ধিত হয় এবং চক্ষু রোগে উপকার করে।

প্রত্যহ একটী করিয়া লবঙ্গ খাইলে স্ত্রীলোকের গর্ভ হয় না। কিন্তু ঋতু স্নানান্তে ৪৷৷০ মাষা মাত্রায় লবঙ্গ সেবনে গর্ভ ধারণ করিতে সক্ষম হয়। ইহা ব্যবহারে ঠাণ্ডার দরুণ ফুলা দূর হয়।

কুঙ্কুম বা জাফরাণ।

ইহার সংস্কৃত নাম কাশ্মীরক, কুঙ্কুম, বাহ্লিক, শোণিত, পীতক ও সুরভি। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা তিক্ত-কটু রস, স্নিগ্ধ ও বর্ণ প্রসাদক। শিরোরোগ, ব্রণ, ক্রিমি, বমি, ছুলি ও ত্রিদোষনাশক। মাত্রা ⁄০, কল্ক ৴১০ হইতে ⁄১০, ক্বাথ ৫—১০ তোলা। কিসমিসের ক্বাথের সহিত জাফরাণ পেষণ করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ রোগ প্রশমিত হয়। উত্তম মধুর সহিত আট গুণ শীতল জল মিশাইয়া উহার সহিত উপযুক্ত মাত্রায় জাফরাণ পেষণ করিয়া প্রস্তর বা কাচ পাত্রে এক রাত্রি স্থাপন করিয়া পরদিন প্রাতে সেবন করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্ত হয়। যে শিরোরোগে, অর্দ্ধমস্তকে বেদনা হয় এবং বেলা বৃদ্ধির সহিত বেদনা বৃদ্ধি হয়, সেই রোগে, জাফরাণ গব্য ঘৃতে ভাজিয়া, উহার সহিত সম পরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য লইলে বিশেষ উপকার হয়।

ডাক্তারী মতে ইহা ক্রোকস স্যাটাইভাস নামক বৃক্ষের পুষ্পের গর্ভকেশর। ইহা উষ্ণ, সুগন্ধ, বায়ুনাশক ও আক্ষেপনিবারক। ঋতুরোধ, ক্লোরোসিস্ (স্ত্রীলোকদের রক্তহীনতা এবং ঐ রোগ জনিত গাত্রের নীলিমা), ক্ষীণ শুক্র, প্রদর, রজকৃচ্ছ, বায়ুজনিত শূল এবং শ্লেষ্মা রোগে সেবনীয়। জাফ্রাণের তেল আমবাত ও স্নায়বিক রোগে হিতকর। শিশুগণের বার বার দাস্ত হইলে ঘৃতসহ জাফ্রাণ পেষণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবনও ব্যবস্থিত হয়।

হাকিমী মতে জাফরাণ সেবনে মন প্রফুল্ল, অন্ত্রমণ্ডলী, মূত্রাশয়, মূত্রকোষ ও যকৃৎ সবল হয়, প্লীহা ও যকৃতের বদ্ধমল নিষ্কাসিত হয়, উক্ত যন্ত্রগুলি পরিষ্কার থাকে এবং শ্বাসযন্ত্র সবল হয়। ইহা ব্যবহারে প্রস্রাব ও ঋতু পরিষ্কার হয়। প্রস্রাব বন্ধ হইলে প্রস্রাব পথে ইহার একগাছি আঁশ প্রবেশ করাইয়া রাখিলে প্রস্রাব উপনীত হয়। ইহার আর একটী অসাধারণ গুণ—কোন ঔষধের সহিত ইহা ব্যবহার করিলে সেই ঔষধের ক্রিয়া সত্বর সকল অঙ্গে পৌঁছাইয়া দেয়। অল্প পরিমাণ জাফ্রাণ জলের সহিত পিষিয়া চক্ষুর অঞ্জনীতে লাগাইলে উপকার হয়।

স্ত্রীলোকের প্রসবে বিলম্ব হইলে ২ মাসা হইতে ½ তোলা মাত্রায় জাফ্রাণ কিঞ্চিৎ জল বা গোলাপজলের সহিত সেবন করাইলে সন্তান প্রসূত হয়। কিম্বা ২॥০ তোলা পরিমাণ জাফ্রান প্রসবকালে প্রসূতির হস্তে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিলে যখন উহা ঘর্ম্মাক্ত হইয়া ভিজিয়া যাইবে তখনই সহজে সন্তান প্রসূত হইবে। জাফ্‌রাণ বাটিয়া জরায়ু মধ্যে রাখিলে জরায়ুর বেদনা দূর হয়। মুখে মালিশ করিলে বর্ণ সমুজ্জ্বল হয়। ইহার আঘ্রাণে নিদ্রা আসে। ইহার সোরমা চক্ষুতে লাগাইলে চক্ষুর ক্ষত ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগ দূর হয়। ইহা নাকে টানিলে শিরোবেদনা দূর হয়। ইহা মধুর সহিত সেবনে পাথর বহির্গত হয়। ইহা অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে ক্ষুধা ও চক্ষুর জ্যোতিঃ হ্রাস হয়, শিরোবেদনা জন্মে ও চৈতন্য লোপ পায়, অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

জাফরাণ বর্ত্তমান কালে কাশ্মীর, পারস্য, স্পেন, ফ্রান্স, ও সিসিলিতে চাষ হইতেছে। কাশ্মীর দেশজাত জাফ্রাণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রায় ১৫০০ ফুল হইতে ১ ভরি জাফ্রাণ প্রস্তুত হয়। জাফ্রাণের অনেক নকল হইতেছে। উৎকৃষ্ট জাফ্রাণ গাঢ় লেবুর রং বিশিষ্ট।

জৈত্রি।

জায়ফলের আবরণকে জৈত্রি বলে। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা কটু, তিক্ত ও মধুর রস, লঘু, উষ্ণ, রুচিকর, বর্ণপ্রসাদক ও মুখশুদ্ধি কারক। ইহা কফ, কাস, বমি, শ্বাস, তৃষ্ণা, ক্রিমি রোগে ও বিষ দোষে উপকারক এবং দুর্গন্ধনাশক। মাত্রা ৪ রতি।

হাকিমী মতে অধিক মাত্রায় সেবনে ইহা যকৃতের পক্ষে অপকারী এবং শিরোবেদনা উৎপাদক। ইহা মনের প্রফুল্লতা উৎপাদক, পাকস্থলী সরলকারক, পাচক, মুখে সুগন্ধি উৎপাদক ও বায়ুনাশক। ইহা পাকস্থলী ও জরায়ুর দূষিত রস নষ্ট করে, পাকস্থলীতে কোন প্রকার ক্লেদ জন্মিতে দেয় না ও জরায়ুকে সবল করে। ইহা মস্তকে মর্দ্দন করিলে আধ কপালে ও মৃগী রোগে উপকার পাওয়া যায়। ঋতুর অবসানে ইহা বাটিয়া জরায়ুর মধ্যে রাখিলে স্ত্রীলোকের গর্ভধারণ ক্ষমতা জন্মে। ইহা জাফ্রাণের সহিত ব্যবহারে জরায়ু শোধিত হয় এবং মূত্রাশয়ের পাথরী বিনষ্ট হয়। ইহা ব্যবহারে শৈত্যজনিত বহুমূত্র রোগ আরাম হয় এবং মুখ দিয়া রক্ত উঠা, অন্ত্র মণ্ডলীর ক্ষত ও পুরাতন গ্রহণী প্রভৃতি রোগে উপকার করে। বহুমূত্র রোগে ইহা নাভি ও তলপেটের নিম্নদেশে মালিশ করিলে উপকার পাওয়া যায়। ইহা মধুর সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে পৃষ্ঠের বেদনা ও প্রসবান্ত বেদনা বিদূরিত হয়।

জায়ফল।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা তিক্ত ও কটুরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুচি ও বলকর, লঘু, ত্রিদোষহারক, অগ্নিউদ্দীপক, বর্ণ প্রসাদক, মলসংগ্রাহক ও স্বর বর্দ্ধক। ইহা বায়ু, কফ, মুখের বিরসতা, মলের দুর্গন্ধ, ও কৃষ্ণ

বর্ণতা এবং ক্রিমি, শিরোরোগ, কাস, ব্রণ, বমি, ক্রিমি, মেহ, শ্বাস, শোষ, পীনস ও হৃৎরোগে ব্যবস্থিত হয়। ইহা জীর্ণাতিসার, আধ্মান, আক্ষেপ, শূল, আমবাত, তৃষ্ণা, মুখদুর্গন্ধ ও দন্তবেষ্ট রোগে শান্তি কারক। মাত্রা ২ হইতে ১০ রতি।

ভাব প্রকাশ মতে মুখের মেছেতা বা নীলবর্ণ চিহ্ন দূর করিবার নিমিত্ত জায়ফল ঘসিয়া উহার প্রলেপ ব্যবহার্য্য। বঙ্গসেনের মতে উহাতে পাদস্ফোট প্রশমিত হয়। ইহার ফাণ্ট পানে বমন নিবারিত হয়।

ডাক্তারী মতে জায়ফল সুগন্ধি, পাচক, উষ্ণ, বায়ুনাশক ও আক্ষেপ নিবারক। অল্প মাত্রায় সেবনে ক্ষুধা উদ্রিক্ত ও পরিপাকক্রিয়া সত্বর সাধিত হয় এবং উদরাধ্মান, গ্রহণী, শূল ও মূত্রকৃচ্ছাদি রোগ প্রশমিত হয়। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে জড়তা বা মূঢ়তা ও প্রলাপ উৎপন্ন হয়। ইহা পাচক, ধারক ও বেদনা নাশক বলিয়া অতিসার, রক্তাতিসার, বিবিমিষা ও বমন রোগে ব্যবস্থিত হয়। শিরঃপীড়া, বাত ব্যাধি ও হস্তপদ সঙ্কোচে (Cramp) ইহার প্রলেপ হিতকর। পুরাতন বাত ও পক্ষাঘাত রোগে ইহা সরিষা তেলে ফুটাইয়া সাবানের সহিত পীড়িত অঙ্গে মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়। অধিক মাত্রায় সেবনে মত্ততা জন্মে।

হাকিমী মতে ইহা উষ্ণ প্রকৃতির লোকের অর্থাৎ যাহাদের পৈত্তিক ধাত তাহাদের যকৃৎ ও ফুসফুসের অপকারী এবং শিরোবেদনা উৎপাদক। অন্যক্ষেত্রে ইহা সেবনে শৈত্য জনিত রোগ সমূহ বিনষ্ট, রতি শক্তি বর্দ্ধিত এবং মনের প্রফুল্লতা উৎপন্ন হয়। মাত্রা ১ হইতে ৯ মাষা। ইহা পাচক, পাকস্থলী ও প্লীহা সবলকারক। ইহা দ্বারা যকৃৎ ও প্লীহার স্ফীতি বিলীন হয় এবং পাকস্থলীর দূষিত রস দূর

হয়। গেঁটে বাত প্রভৃতিতে ইহার তৈলসহ মালিশ হিতকর। ইহা মুখে সুগন্ধ উৎপন্ন করে, বহুমূত্র রোগনাশক এবং চক্ষুর চুলকণায় উহার প্রলেপে উপকার হয়। ইহার দ্বারা ঘর্ম্মজনিত দুর্গন্ধ নষ্ট হয়, বায়ু শোষিত ও বমন বা বমনেচ্ছা নিবারিত এবং শৈত্য জনিত দাস্তে উপকার হয়। ভাজিয়া সেবনে দাস্ত বন্ধ হয় ও তেলের সহিত মিশাইয়া কাণে দিলে বধিরতা দূর হয়। ইহার সোরমা চক্ষে দিলে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগে উপকার হয়।

মৌরি।

আয়ুর্ব্বেদ মতে মৌরি শীতবীর্য্য, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, মুখদোষ নিবারক, রক্তপিত্ত, জ্বর, অতিসার, নেত্র ও শ্লেষ্মারোগে হিতকর। ইহা যোনিশূল, কোষ্টবদ্ধ, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি, কাস, বমন, শূল ও বায়ুনাশক এবং পাচক।

হাকিমী মতে ইহা বক্ষঃস্থল, যকৃৎ, প্লীহা ও মূত্রাশয়ের বদ্ধমল নিঃসারক, শৈত্য জনিত বেদনা ও বায়ু-নাশক, শুক্র ও স্তন্যদুগ্ধ বৃদ্ধিকারক এবং ঋতু ও প্রস্রাব পরিষ্কারক। ইহা পুরাতন গ্রহণী রোগে উপকারক ও পাকস্থলীর জ্বালা নিবারক। ইহার সূক্ষ্ম গুঁড়া শিশুদের উদরে মর্দ্দন করিলে পেটফুলা ও পেটের বেদনা নিবারিত হয়। ইহার পাতার রস চক্ষে দিলে চক্ষুর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়, সেবনে উদ্গার উঠিয়া বদ গ্যাস নির্গত, শ্লেষ্মা নষ্ট ও পাথরি বিদূরিত হয়। ইহা বাটিয়া গুলকন্দের সহিত সেবনে কোষ্ঠ পরিষ্কার ও পেটের ব্যথা উপশমিত হয় এবং পাকস্থলী হইতে দূষিত বাষ্প মস্তকে উঠে না। ভাজা মৌরি বিশেষতঃ বন্য মৌরি পুরাতন গ্রহণী, নিউমোনিয়া ও শূলরোগে হিতকর। মৌরি চূর্ণ শীতল জলের সহিত সেবনে জ্বর কালীন বমনেচ্ছা বন্ধ এবং পাকস্থলীর জ্বালা নিবারিত হয়।

আধুনিক মতে ইহা অগ্নিবৰ্দ্ধক, উত্তেজক ও বায়ুনাশক। উদরাধ্মান ও শূল রোগে হিতকর। ইহা সেবনে কাসের উগ্রতা কমে এবং দুগ্ধস্রাব বৰ্দ্ধিত হয়।

তেজ পাতা।

উষ্ণবীর্য্য, পাচক, আগ্নেয়, মুখশুদ্ধিকারক, কফ, বায়ু, অর্শ, বমি ভাব, অরুচি, বস্তিশূল ও বিষদোষে কল্যাণকর।

রাঁধুনি।

উষ্ণবীর্য্য, লঘু, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, রুচিকর, আগ্নেয়, বিদাহী, মলরোধক, বলকর, শুক্রজনক এবং ক্রিমি, বমি, হিক্কা, বস্তিশূল ও চক্ষু রোগে হিতকর।

ডাল্‌চিনি।

উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুক্ষ, পিত্তবৰ্দ্ধক, শুক্র নাশক, অরুচি, ক্রিমি, বস্তিদোষ, কণ্ডু, অর্শ, আমবাত, কফ ও বায়ু প্রশমক।

অষ্টম অধ্যায়।

মিতাহার ও হিতাহার।

এইরূপ কিম্বদন্তী আছে একদা দেববৈদ্য ধম্বন্তরী পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিলেন। এক অরণ্য মধ্যে একটী উচ্চ বৃক্ষে বসিয়া এক পাখা 'কোহরুক' 'কোহরুক' রব করিতেছিল। উহা শুনিয়া তিনি মনে করিলেন যে পাখী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিতেছে 'কে আরোগী'? 'কে আরোগী'? তদুত্তরে তিনি বলিলেন:—

"জীর্ণে হিতমিতভোজী শতপদগামী বামশায়ী,
অবিজিত মূত্র পূরীষি বিহগরাজ 'কোহরুক' 'কোহরুক।'

অর্থাৎ, যে ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে মিত পরিমাণে হিতকর বস্তু ভোজন করে, ভোজনের পর একশত পদ ধীরে গমন করিয়া বামকাতে শয়ন করে এবং মলমূত্রের বেগ ধারণ না করে, হে খগেন্দ্র! সেই অরোগী! সেই অরোগী!

শুশ্রুতের মতে আহারের পর যতক্ষণ আহার জনিত ক্লান্তি না যায় ততক্ষণ রাজার মত সুখে সোজা হইয়া বসিবে এবং শত পদ ধীরে ধীরে চলিয়া বাম কাতে শয়ন করিবে। শাস্ত্র মতে আহারের পর বামকাতে শয়নের উপকারিতা এই পুস্তকের প্রথম পর্য্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

এক জন শাস্ত্রকারের মতে কিছুক্ষণ পায়চালি করিলে আয়ু, বল, মেধা ও অগ্নি বর্দ্ধিত এবং ইন্দ্রিয়াদির জড়তা বিনষ্ট হয়। সুস্থ দেহীগণ পূর্ণ আহারের পর গ্রীষ্ম ব্যতীত অন্য সময়ে

দিবসে নিদ্রা যাইবে না। গ্রীষ্মকালেও এক ঘণ্টায় অধিক নিদ্রা যাইবে না। রোগী, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির সর্ব্বকালে অল্পাধিক দিবানিদ্রা অহিতকর নয়। অধিকাংশ মহাজনগণের মতে আহারের পর অল্প নিদ্রা খাদ্যপরিপাকে সহায়তা করে। এই বিষয় এই পুস্তকের প্রথম পর্য্যায়ে এবং কতক ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

চরক বলিয়াছেন মাত্রাশী অর্থাৎ মিতাহারী হইবে, আহারের মাত্রা কিরূপ হইলে পরিমিত হইবে তাহা নিজ নিজ স্বাভাবিক অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া স্থির করিবে। যিনি যে পরিমাণ আহার করিয়া বিনা ক্লেশে যথাকালে পরিপাক করিতে পারেন তাহাই তাঁহার আহারের মাত্রা। পরিমিত হিতাহারই স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনের মূল।

আয়ুর্ব্বেদকার বাণভট্টও বলিয়াছেন:—

মাত্রাশী সর্ব্বকালং স্যান্মাত্রা হ্যগ্নে প্রবর্ত্তিকা।
মাত্রাং দ্রব্যান্যপেক্ষন্তে গুরুণ্যাপি লঘূন্যপি॥
গুরুণামর্দ্ধ সৌহিতং লঘুনাং ন্যাতি তৃপ্ততা।
মাত্রা প্রমাণং নির্দ্দিষ্টং সুখং যাবদ্বিজীর্য্যতি॥

সকল সময়ে পরিমিতাহার করা বিধেয় কারণ আহারের পরিমাণ জঠরাগ্নির দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। সকল দ্রব্যই মাত্রাকে অপেক্ষা করে। গুরুপাক দ্রব্যের অর্দ্ধতৃপ্তি ও লঘুপাক দ্রব্যের তৃপ্তিমাত্র হিতকর। যে পরিমাণ আহার সুখে পরিপাকপ্রাপ্ত হয় তাহাই আহারের নির্দ্দিষ্ট মাত্রা।

সাধারণতঃ, কুক্ষি দেশের তিন ভাগের ২ ভাগ হিতকর কঠিন খাদ্য দ্রব্যাদি দ্বারা পূরণ ও এক ভাগ লেহ্য, পেয় বা তরল খাদ্যের দ্বারা পূরণ এবং অবশিষ্ট ভাগ বায়ু, পিত্ত ও কফের জন্য শূন্য রাখা প্রশস্ত। পরিমিত আহারে হৃদয় ও কুক্ষি দেশ পীড়িত হয় না, পার্শ্বদেশে কোন প্রকার ক্লেশ জন্মে না, উদর ভার বোধ হয় না, ইন্দ্রিয়গণ পরিতৃপ্ত হয়, কোন প্রকার অস্বোয়াস্তি বোধ হয় না, সুখে মলমূত্র নির্গমন এবং বল, বর্ণ ও পুষ্টি বৃদ্ধি হয়।

মতান্তরে, পাকাশয়ের চারিভাগের দুই ভাগ হিতকর কঠিন আহারীয় দ্রব্য দ্বারা এবং এক ভাগ জলীয় আহার্য্য দ্বারা পূরণ এবং অবশিষ্ট বায়ু চলাচলের জন্য খালি রাখিবে। মোট কথা পেটে কিছু ফাঁক বা শূন্য রাখিতে হইবে নচেৎ ব্যোম বাদ দিয়া অন্য ভূতের ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেই পারে না।

মহাত্মা হজরৎ রসুল বলিয়াছেন উদরের তিন ভাগের একভাগ অন্নের জন্য, একভাগ পানীয়ের জন্য, অবশিষ্ট নিশ্বাসের জন্য রাখিবে। ভোজন কর, পান কর কিন্তু অপচয় করিও না (পেট ভরিয়া আহারও অপচয়)। দেশ, কাল, পাত্রভেদে এবং শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতা বা আধিক্য অনুসারে আহারের পরিমাণ অল্প বিস্তর হওয়া উচিত। এই সম্বন্ধে একটী সাধারণ নিয়ম, আহার সমাপ্তির পর পাত্র হইতে হাত তুলিয়া লইবার সময় যেন উদরে ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকে।

পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই অত্যাহার করে। কতিপয় পাশ্চাত্য পুষ্টিতত্ত্ববিদ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে বয়স্কের দিনে দুইবার পাকশক্তি অনুযায়ী পরিমিত আহার সেবনে শরীর ও মস্তিষ্ক সুস্থ এবং কর্ম্মক্ষম থাকিতে পারে।

শাস্ত্রমতে পরিমিত ভোজনে ধাতুর প্রকোপ জন্মে না, জঠরাগ্নি অযথা ব্যয়িত হয় না, ভুক্ত দ্রব্য সহজে জীর্ণ হয়। ভুক্ত দ্রব্য সুজীর্ণ হইলে শরীর লঘু বোধ হয় অর্থাৎ কোন গ্লানি থাকে না, স্রোত সমূহের মুখ বিকশিত ও যথা সময়ে মল মূত্রাদি নিঃসৃত হয়—ফলে শরীরের পুষ্টি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষতা লাভ হয়, উহা ইন্দ্রিয়প্রীতিজনক, রোগনাশক ও আয়ুবর্দ্ধক।

কিন্তু হিতমিত আহারেও উক্ত ফললাভ সকল ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয় যদি সঙ্গে ২ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালিত না হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে আহারের হিতকারীতা বা অহিতকারীতা সাধারণতঃ আটটী বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা—

১। **প্রকৃতি**—আহার্য্য দ্রব্যের সাধারণ গুণ।

২। **করণ**—গুণাগুণ ধারণার্থ দ্রব্যের রূপান্তর বা সংস্কার।

৩। **সংযোগ**—দুই বা ততোধিক দ্রব্যের সংমিশ্রণ।

৪। **রাশি**—আহারের পরিমাণ।

৫। **দেশ**—স্থান বা দেশ ভেদে আহার্য্যের গুণাগুণ।

৬। **কাল**—ঋতুভেদে ও তিথিভেদে দ্রব্যের ইতর বিশেষ।

৭। **উপযোগ**—কোন্ খাদ্য কাহার পক্ষে উপযোগী।

৮। **উপযোক্তা**—আহার্য্য দ্রব্যের প্রকৃতি ও ভোক্তার নিজ প্রকৃতির সামঞ্জস্য।

প্রত্যহ একবার মাত্র আহার গ্রহণ করিলে উহার মাত্রা বাড়াইতে হয়। কিন্তু পাচক রস তত অধিক বাড়ে না—ফলে পরিপাক বিভ্রাট ঘটে। এরূপ শোনা যায়, একজন প্রোফেসার বিকালে একবার মাত্র আহার গ্রহণ করিয়া বাতরোগে মারা পড়িয়াছেন। দুই আহারের

মধ্যে ফল সেবন অহিতকর নয় বরং উহা ভুক্তান্ন পরিপাকে সহায়তা করে।

মিতাহারের মূল উদ্দেশ্য, বায়ু চলাচলের জন্য পাকাশয়ে ফাঁক বা শূন্য রাখা, তাহা হইলে ভুক্ত দ্রব্য বায়ুর অম্লজান দ্বারা দগ্ধ (Oxidized) হইয়া পরিপাকক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন এবং দূষিত পদার্থগুলি সম্যকভাবে নিঃসৃত হইতে পারে।

"উনা ভাতে দুনা বল, ভরা পেটে রসাতল" এই প্রবাদ বাক্যটা হাড়ে হাড়ে সত্য। উদরের ভিতর যদি যথেষ্ট ফাঁক না থাকে উপযুক্ত পরিমাণ বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে :—

"Eat to live, not live to eat."

"বাঁচিবার জন্য আহার করিবে, আহার করিবার জন্য বাঁচিও না।" দীর্ঘদিন অল্পাহারের মোট পরিমাণ অল্প দিনের অধিক আহার সমষ্টি অপেক্ষা অনেক অধিক। অর্থাৎ একটীতে জীবন দীর্ঘ হয়, অপরটীতে হ্রাস হয়।

"If thou wilt observe
The rule of "not too much" by temperance taught
In what thou eatest & drinkest, seeking from thence
Due nourishment—not gluttonous delight,
Till many years over thy head return ;
So mayest thou live, till like ripe fruit, thou drop
Into thy mother's lap, or be with ease
Gathered, not harshly plucked, for death mature."

ভাবার্থ :—

সংযম শিক্ষা করিয়া "বেশী অধিক নয়" এই নিয়মে বহু বৎসর-কাল ভোজন ও পান করিলে, তাহা হইতে উপযুক্ত পুষ্টিলাভ করিতে পারিবে। এইরূপে শেষে পাকা ফলের মত মাটিতে মার কোলে ঝরিয়া পড়িবে কিম্বা মৃত্যুর সময়ে—অসময়ে নয়, জীবনতরু হইতে স্বচ্ছন্দে, কঠোর ভাবে বিচ্ছিন্ন না হইয়া আহৃত হইবে।

সার হেন্‌রি ওয়েবার তাঁহার "Means for the prolongation of life" পুস্তকে লিখিয়াছেন "অনেক দিন হইল আমি নিজের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে আমার খাদ্যের পরিমাণ বিশেষতঃ আমিষ খাদ্যের মাত্রা অর্দ্ধেক কমাইয়া, আমার কার্য্য করিবার শক্তি অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, ক্লান্তি ও অবসাদ সহজে আসে না এবং চা ও কফি খাইবার প্রবৃত্তিও অনেক কমিয়া গিয়াছে। ডাক্তার সিলিরও অভিজ্ঞতা আমারই মত। তিনি বলেন প্রচুর আমিষ খাদ্য হজম করিতে অনেক স্নায়ুশক্তি ব্যয়িত হয়।

ইহা সত্য যে অনেকে খাদ্য-মাত্রা সহসা কমান অনিষ্টকর অন্ততঃ সাময়িক অনিষ্টকর বলিয়া মনে করেন। কিন্তু যদি খাদ্য ধীরে ধীরে কমান যায় তাহা হইলে শরীর ও মন উহাতে সহজেই অভ্যস্ত হইয়া যায়। বহুশত রোগীর বৃত্তান্ত হইতে আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, ধীরে ধীরে বুদ্ধিপূর্ব্বক এবং অধ্যবসায়ের সহিত খাদ্য-মাত্রা কমাইলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মানসিক ও শারীরিক শক্তির বৃদ্ধি হয়, প্রফুল্লতা জন্মে, অকাল বার্দ্ধক্য দূর হয় এবং বৃদ্ধাবস্থার অসুবিধা ও কষ্ট কমিয়া যায়।

আমার ৫০ বৎসরাধিক কাল ব্যাপী পর্য্যবেক্ষণের ফলে আমি ৮৬ হইতে ১০০ শত বৎসর জীবী ৮০ জনের জীবনযাত্রা-প্রণালী

সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাদের মধ্যে ৫।৬ জন মাত্র অধিক আহার ও মদ্যপান করিতেন। বেশীর ভাগ আহারাদিতে অত্যন্ত মিতাচারী ছিলেন; কয়েকজনের খাদ্যের অধিকাংশ ভাগ আনাজ, ফল, দুধ, ছানা ও মাখম ছিল।

আমি কতিপয় বৃদ্ধের চুলকণা, ব্রণ, চর্ম্মের কর্কশতা ও মুখ দুর্গন্ধ রোগে কয়েক মাস বা বৎসর আমিষ আহার বন্ধ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সবুজ তরিতরকারী, দুধ, ছানা ও ডিম্বযুক্ত খাদ্য খাওয়াইয়া তাহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। এই আহার লইবার পর তাহাদের দেহের বর্ণেরও উন্নতি হইয়াছে। তবে বেশী ডাল ও শাক আনাজ আহার সময় সময় অনিষ্টকর। আমি অনেক পুরুষ ও স্ত্রীর কথা উত্তমরূপে জানি যাহারা মধ্য বয়সের পর পরিমিত মাত্রায় সবুজ আনাজ, শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য, দুগ্ধ ও পনির মাত্র খাইয়া শারীরিক ও মানসিক কার্য্যক্ষমতা অব্যাহত রাখিয়া সুস্থ ছিল এবং বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত আনন্দপূর্ণ জীবন যাপন করিয়াছে।”

সাদাসিদে স্বল্পাহারে লোক দীর্ঘজীবী হইতে পারে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত এই পুস্তকের প্রথম পর্য্যায়ে দীর্ঘজীবন তত্ত্ব অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে, নিম্নে আর কতকগুলি দেওয়া হইল।

পুরাকালের অতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসক গ্যালেন ১৪০ বৎসর অবধি বাঁচিয়া ছিলেন এবং ৭০০ হইতে ৮০০ ডাক্তারী ও দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি ২৮ বৎসর বয়স হইতে অতি অল্প আহার করিতেন।

লরেন্স নামক একজন ইংরাজ মিতাহার ও উপযুক্ত পরিশ্রম করিয়া ১৪০ বৎসর অবধি বাঁচিয়াছিলেন। আর একজন সেণ্ট মোঙ্গা (St. Mongah) কঠিন পরিশ্রম ও মৃত্তিকায় শয়ন করিতেন,

কখন মদ স্পর্শ করিতেন না। তিনি ১৮৫ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছিলেন।

লুই কর্ণেরিও ইটালী দেশের ভিনিস নগরে একটী উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ ও ১০৪ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। যৌবনের অসংযম ও অত্যাচারের ফলে ৩৫ বৎসর বয়স হইতে তিনি নানা রোগে পীড়িত হইয়া ৪০ বৎসর বয়সে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হন। কোনরূপ চিকিৎসায় ফল না পাইয়া অবশেষে একজন চিকিৎসকের উপদেশে তিনি আহার সংযম করিয়া নিয়মিত জীবনযাপন করিতে আরম্ভ করেন এবং অল্প পরিমাণ রোগীর পথ্য মত আহার গ্রহণ করিতে থাকেন।

এক বৎসর পরে তাহার সকল গ্লানি ও রোগ দূরীভূত হয়। ইহার পর সুস্থদেহে যে সব খাদ্য সহজে পরিপাক করিতে পারিতেন তাহা পরীক্ষা করিয়া অতি অল্প মাত্রায় পেট খালি রাখিয়া খাইতে থাকেন। ঐ সঙ্গে তিনি কতকগুলি স্বাস্থ্যবিধি পালন করেন, যথা শীত, গ্রীষ্ম হইতে শরীর রক্ষা, নিয়মিত নিদ্রা ও বিশ্রাম, রিপুর সংযম এবং অনাচার বা অত্যাচার না করা।

৪০ হইতে ৮৩ বৎসর পর্য্যন্ত এই ভাবে চলিয়া তাহার স্বাস্থ্য ও শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সংযমের ফলে নানা সাংসারিক দুশ্চিন্তা ও দুর্ঘটনা সত্ত্বেও তিনি অবিচলিত ছিলেন। তাহার ৮৩ বৎসর বয়সে লিখিত আত্মজীবনী পুস্তকে বলিয়াছেন যে সে সময় তিনি নিজে গাড়ী হাঁকাইতেন। একদিন গাড়ী উল্টাইয়া যায় এবং ঘোড়া ক্ষেপিয়া গাড়ী হিঁচড়াইয়া লইয়া যায়। তিনি গাড়ী হইতে বাহির হইতে পারেন নাই তজ্জন্য অতিরিক্ত চোট পান। তাহার মাথা ও সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ একটী হাত ও একটী পা ভয়ানক থেঁতলাইয়া যায়।

বাড়ী পৌঁছিলে তাঁহার ডাক্তার তাঁহাকে এত খারাপ অবস্থায় দেখে যে তিনি আর বেশী দিন বাঁচিবেন না বলিয়া চলিয়া যান। করণেরিও কোনরূপ ঔষধ সেবনে বা চিকিৎসা করাইতে সম্মত হন নাই। তিনি কেবলমাত্র হাত ও পা সোজা করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া সর্ব্বাঙ্গে একটী তেল মালিশ করিতে থাকেন; আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুদিন পরে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হন। যত তাঁহার বয়স বাড়িত আহার পূর্ব্বাপেক্ষা আরো কমাইয়া দিতেন কিন্তু একবার তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধুদের অনুরোধে তাহার অভ্যস্ত দৈনিক ১২ আউন্স আহার ও পানীয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১৪ আউন্স খাইতে থাকেন।

১২ দিন পরে তাঁহার ভয়ানক জ্বর হয় তাহা ১৫ দিন বাদে ছাড়ে। একটু সামান্য অধিক মাত্রা আহারের কি বিষময় ফল হয় তাহা উপলব্ধি করিয়া পূর্ব্ব অভ্যস্ত পরিমাণ আহার পুনরায় গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়াছেন মানুষ নিজেই তার পরম চিকিৎসক। মিতাহার, হিতাহার ও নিয়মানুবর্ত্তিতাই শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যদাতা। যিনি সংযমী তিনি কখনই রোগে পীড়িত হন না। অবশ্য তিনি একথা বলিয়াছেন যে সকলেরই একরূপ আহার বা একমাত্রায় আহার উপযোগী হইতে পারে না, পরীক্ষা করিয়া হিতকর আহার ও তাহার মাত্রা স্থির করিতে হইবে।

অত অল্প আহারে কত শক্তিশালী ছিলেন তাহার প্রমাণস্বরূপ বলিয়াছেন যে তিনি ৮৩ বৎসর বয়সে বিনা সাহায্যে অশ্বারোহণ করিতে পারিতেন, উঁচু সিঁড়ি ও পাহাড়ের উপর হাঁটিয়া উঠিতে পারিতেন, তাঁহার মন সদাই শান্তি ও আনন্দে ভরিয়া থাকিত। তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়শক্তি প্রখর ছিল; বৎসরে দুইবার বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে অন্যত্র যাইতেন।

তাঁহার আত্মজীবনীর দ্বিতীয় ভাগ ৮৬ বৎসর বয়সে মুদ্রিত হয়। তখনও তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট এবং মানসিক শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সতেজ ছিল। এই সময়ে তিনি আহারের মাত্রা আরো কমাইয়া দেন। উক্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে বৃদ্ধের শেষ বয়সে শিশুর মত দিনে ৪ বার অল্পমাত্রায় আহার করা কর্ত্তব্য। ঐরূপ আহারের পর তাহার পেট হালকা থাকিত ও গান গাহিতে ইচ্ছা হইত। তিনি অনেক সময় গান গাহিতে গাহিতে পুস্তক লিখিতেন, অল্প আহারের দরুণ শরীরে জড়তা বা নিদ্রাভাব আদৌ আসিত না।

৯৩ বৎসর বয়সে তাঁহার আত্মজীবনীর তৃতীয় বা শেষ পুস্তকে লিখিয়াছেন যে তখনও তাহার সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, তিনি প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা নানা বিষয়ের বই লিখিতেন এবং অনেক সময় হাঁটিতেন বা গান করিতেন। শোকে, বা অর্থহানিতে বিচলিত হইতেন না।

১০৪ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার সমবয়স্কা স্ত্রী এবং অপর আত্মীয়-পরিজন এবং বন্ধুদের সমক্ষে কোন ক্লেশ বা যাতনা না পাইয়া শান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়েন।

হিতাহার।

হিতাহারের ব্যাপক অর্থ, যে আহার শরীরের তিনটী ধাতু—বায়ু, পিত্ত ও কফ, অম্ল ও ক্ষার এবং শীত ও তাপের সমতা রক্ষা করে, যাহা বিরুদ্ধভোজন পর্য্যায়ে পড়ে না বা দুষ্পাচ্য এবং অবিধিপূর্ব্বক প্রস্তুত ও সেবিত হয় না।

হিতাহার ও মিতাহার দুইটী একসঙ্গে জড়িত। হিত খাদ্য মিত পরিমাণে আহার প্রকৃত হিতাহার। উহা অমিত পরিমাণে

কিম্বা অহিত খাদ্য মিত পরিমাণে আহার, অহিত আহার বলিয়া গণ্য হয়। এই সকল বিষয় অন্যত্র যথাস্থানে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

সকল হিতাহার আবার পাত্রভেদে উপযোগী হয় না। সুতরাং যাহার যে হিতকর খাদ্য সহ্য বা আত্মানুকূল হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া নির্ব্বাচন করাই যুক্তিযুক্ত।

শাস্ত্রে সাত্বিক আহারকে সাধারণতঃ হিতাহার বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

আয়ুঃ সত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনঃ।
রস্যা স্নিগ্ধা স্থিরা হৃদ্যা আহার সাত্বিকপ্রিয়াঃ॥

—গীতা।

"যাহা আয়ুঃ, সাত্বিকভাব, বল, আরোগ্য, আনন্দ ও রুচিবর্দ্ধক, সুখদর্শন, রস ও স্নেহযুক্ত এইরূপ আহারই সাত্বিকের প্রিয় আহার।"

যোগীদের জন্য নিম্নোক্ত খাদ্যদ্রব্যগুলি বিশুদ্ধ সাত্বিক আহার বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই সকল দ্রব্য লঘুপাক, স্নিগ্ধ, ধাতুপোষক ও প্রফুল্লতাকারক। অবশ্য এইগুলি বিশুদ্ধ ও টাটকা হওয়া এবং স্ব স্ব অগ্নির বলানুসারে বিধিমত সেবন করা প্রয়োজন নচেৎ সাত্বিক আহারের কোন স্বার্থকতা থাকে না।

শালি তণ্ডুলের অন্ন, যব, গম, মুগের যুস, পটোল, কাঁঠাল, কাকুঁড়, ডুমুর, কাঁচকলা, থোড়, মূলা, দেশী আলু, ঝিঙ্গে, কচিশাক, পলতা, বেতো শাক, হিঞ্চে, ননী, ঘৃত, দুগ্ধ, আকের গুড়, আকের গুড়ের চিনি, নারিকেল, ডালিম, পায়েস, আঙ্গুর, নোনা, আতা, আমলকি, জাম, অম্লহীন ও অকটু অন্যান্য ফল, এলাচ, লবঙ্গ, হরিতকী, পিণ্ডি খেজুর, ক্ষীর, মিষ্টান্ন, চুণবর্জ্জিত পান, কর্পূর ইত্যাদি।

হবিষ্যও সাত্ত্বিক আহার বলিয়া পরিগণিত হয়। উহার উপাদান—আতপ চাল, খই, কাঁচামুগ, তিল, যব, মটর, বেতো শাক, হিঞ্চে, সৈন্ধব লবণ, গব্যদুগ্ধ, গব্যঘৃত, কাঁঠাল, আম, কলা, নোড়, আমলকি, হরিতকী, জীরা, তেঁতুল, আক, আকের চিনি ইত্যাদি।

বিভিন্ন জাতীয় হিত আহারের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

চালের মধ্যে রক্তশালি বা দাদখানি, ডালের মধ্যে যথাক্রমে মুগ ও মসুর, শাকের মধ্যে জীবন্তী ও পালম শাক। ফলের মধ্যে আম্র, লবণের মধ্যে সৈন্ধব, মৎসের মধ্যে রোহিত, মাংসের মধ্যে মৃগমাংস, বিভিন্ন জন্তুর দুগ্ধের ও দুগ্ধজাত পদার্থের মধ্যে গব্য, মিষ্টের মধ্যে মধু এবং জলের মধ্যে সুবৃষ্টির জল বা পরিস্রুত জল।

আমিষভোজীদের মাংস এবং নিরামিষ ভোজীদের দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি ও ফল সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহারীয়।

এই সকল জিনিষ অবশ্য পরিমিত পরিমাণে বিধিমত সেবন করা প্রয়োজন। লোভের তাড়নায় যাহারা আবশ্যকের অধিক আহার করে শেষে উক্তরূপ আহারই তাহাদের খাইয়া বসে।

নবম অধ্যায়।

—:*:—

আহারের সাধারণ বিধি।

নিম্নলিখিত সাধারণ আহার বিধিগুলির মধ্যে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ, কতকগুলি আপ্তবাক্য, কতকগুলি শাস্ত্র ও বিজ্ঞান সম্মত। ফল, জল, বায়ু, দুধ, দধি, অন্যান্য পানীয়, ঘৃত, মসলা ইত্যাদি সেবনের বিশেষ বিধি যথাস্থানে উক্ত হইয়াছে।

আহারের পূর্ব্বকৃত্য।

১। আহার গ্রহণের পূর্ব্বে স্নান করিয়া আদা ও ছোলা কিম্বা আদা ও সৈন্ধব লবণ সেবন করিবে। ইহাতে জিহ্বা ও কণ্ঠ শুদ্ধি এবং আহারে রুচি হয়। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে আদা নিষিদ্ধ, ঐ সময় উহার পরিবর্ত্তে ২।১টী গোলমরিচ সেব্য।

আহারের পূর্ব্বে শারীরিক নির্ম্মলতা বা শুচিতা প্রয়োজন। আহ্নিকতত্ত্বে উক্ত হইয়াছে :—

"অস্নাতাশী মলং ভুঙতে।"

"স্নান না করিয়া যে আহার করে সে মল ভোজন করে।"

২। পূর্ব্বভুক্তান্ন জীর্ণ এবং ক্ষুধা না হইলে পুনরায় আহার করিবে না। একবার আহারের অন্ততঃ ৪।৫ ঘণ্টা পরে ক্ষুধা হইলে আর একবার আহার করিবে। এই উপায়ে কঠিন অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হইয়াছে। ঘন ঘন আহারে পাকস্থলীর কাজ বাড়ে তদ্দারা স্নায়ুশক্তির বৃথা অপচয় হয়।

৩। আহারের পূর্ব্বে যদি দেহ ও মন শ্রান্ত হয় অন্ততঃ আধ ঘণ্টা বিশ্রাম না করিয়া আহার করিবে না।

৪। স্বরোদয় শাস্ত্র মতে যখন শ্বাস ডানদিকে বহিবে তখন আহার গ্রহণ (ও মৈথুন) প্রশস্ত। ইহাতে আহার বিশেষতঃ গুরুপাক আহার শীঘ্র পরিপাক হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

৫। আহারের পূর্ব্বে পঞ্চার্দ্র হইয়া অর্থাৎ দুই পা, মুখ চক্ষু ও কর্ণ জলে ধুইয়া এবং কিঞ্চিৎ জল গণ্ডুষ করিয়া আহার করিতে বসিবে। মতান্তরে আহারের পূর্ব্বে কিছু জল পান করিলে পিত্তপ্রকোপ নষ্ট হয়। সেইজন্য শাস্ত্রে ঐ সময় জল গণ্ডুষ করিবার ব্যবস্থা আছে। সাহেবরাও প্রথমে তরল আহার (Soup) সেবন করে। হাত মুখ না ধুইয়া খাইলে দন্ত, জিহ্বা, ওষ্ঠ ও হস্তস্পৃষ্ট ময়লা, আহারের সহিত পাকস্থলীতে প্রবেশ করে।

৬। এক প্রহরের মধ্যে আহার করিবে না, উহাতে রস বৃদ্ধি হয়। দ্বিপ্রহরে অর্থাৎ বেলা ৯টা হইতে ১২টার মধ্যে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে ক্ষুধা হইলে আহার গ্রহণই প্রশস্ত। তৃতীয় প্রহরে আহার করিলে রস ক্ষয় হয়।

যামমধ্যে ন ভোক্তব্যম্ যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ।
যামমধ্যে রসোৎপত্তি যামযুগ্মাৎ বলক্ষয়ঃ॥

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মতে দিবসের প্রথম ৪ ঘণ্টা শ্লেষ্মার, দ্বিতীয় ৪ ঘণ্টা পিত্তের এবং শেষ ৪ ঘণ্টায় বায়ুর প্রাবল্য থাকে। পিত্তই আহারাগ্নি। পাশ্চাত্য পুষ্টিতত্ত্ববিদগণ ইহাকে সকল পাচক রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন।

কিন্তু যাঁহাদের ৯টার পূর্ব্বে ও ১২টার পরে ভোজন করা অভ্যাস আছে তাহাদের ঐ সময় ক্ষুধা সাধারণতঃ উদয় হয় সুতরাং উক্ত সময়ে আহার করিলে হয়ত দোষ না হইতে পারে। প্রত্যহ ঠিক সময়ে আহার অভ্যাস করিলে সাধারণতঃ ক্ষুধা ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া আবির্ভূত হয় সঙ্গে সঙ্গে পাচক রস উদ্রিক্ত হয়। রাশিয়ার পুষ্টি-বৈজ্ঞানিক পাভ্লো পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কুকুরদের প্রত্যহ এক সময়ে আহার দিলে তাহাদের ক্ষুধা সে সময়ে জাগিয়া উঠে, তখন তাহাদের জিহ্বা দিয়া লালা ঝরে এবং খাবার জন্য লালায়িত হয়।

৭। ক্ষুধার উপর জল ঢালিবে না। তৃষ্ণা পাইলে অন্ন গ্রহণ না করিয়া পানীয় সেবন করিবে। নচেৎ প্রাণহানির পর্য্যন্ত আশঙ্কা আছে।

৮। আর্দ্র বস্ত্র বা মস্তকে বিশেষতঃ অতি প্রত্যুষে, সায়ংকালে, অধিক রাত্রে, পা ছড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, চলিতে চলিতে, শয়নাবস্থায়, মস্তকে বস্ত্র জড়াইয়া, চর্ম্মাসনে বসিয়া বা জুতা পায়ে দিয়া ভোজন করিবে না। সন্ধ্যাকালে আহার, মৈথুন, নিদ্রা ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। যান, শ্মশান ও দেবালয়ে বা যত্রতত্র অজানিত স্থানে ভোজন অবিধেয়।

৯। পিতা বর্ত্তমানে দক্ষিণ মুখে এবং পুত্র বর্ত্তমানে উত্তর মুখে আহার করিতে বসিবে না। ঘরের কোন কোণে মুখ করিয়া বসিবে না। মতান্তরে উত্তর মুখে বসিবে না।

১০। উপুড় হইয়া খাইতে বসিবে না।

একটী প্রবাদ আছে—

যদি ব'সে খাও উপুড় হ'য়ে,
মরবে বাছা রক্ত বয়ে।

ঐ প্রকার বসিয়া আহার করিলে গুহ্যদ্বারে চাপ পড়িয়া বলি ও অর্শ রোগ জন্মিতে পারে।

আহারকালে।

১। প্রশস্ত আসনে বসিয়া সুখপ্রদ পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনে, আলোকময় স্থানে, অধিক কথা কহিয়া বা উচ্চ হাস্য না করিয়া বা অন্যমনস্ক না হইয়া নিবিষ্টচিত্তে ধীরে ধীরে আহার গ্রহণ করিবে। এই সময় স্ত্রী কন্যাদি নিজ জন কাছে বসিলে তাহাদের সহিত মাঝে মাঝে আস্তে আস্তে দুই একটী কথা কহিলে দোষ হয় না। উহাতে মন তৃপ্ত হয় এবং ধীরে ধীরে খাদ্য সেবনের সুবিধা হয়। একলা আহার গ্রহণে অনেক সময় দুশ্চিন্তা আসিয়া জোটে।

২। প্রথমে ঘৃতাক্ত উষ্ণ অন্ন তিক্তের সহিত গ্রহণ করিয়া একে একে পর পর অন্য ব্যঞ্জনাদি, অন্তে দুগ্ধ ও মধুর রস সেবন করিবে। কার পর কি খাওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। উপরোক্ত প্রথা আবহমানকাল হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। রসতত্ত্বাধ্যায়ে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য। শাস্ত্রমতে ঈষদুষ্ণ স্নেহযুক্ত অন্ন সেবনে জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয় তজ্জন্য ভুক্তদ্রব্য শীঘ্র জীর্ণ হয়, বায়ুর অনুলোমতা সম্পাদিত এবং শ্লেষ্মা শুষ্ক হয়। লবণ, অম্ল, কটু ও তিক্ত দ্রব্যাদি শেষে ভোজন করিলে প্রদাহ ও দোষ উৎপন্ন হয়।

৩। অতি আস্তে বা দ্রুত ভোজন করিবে না। ইহার অপকারীতা চর্ব্বণতত্ত্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

Urgent meals make ill digestion.

—Shakespere.

আঃ, উঃ, হাপুস, হুপুস শব্দ করিয়া, অধিক কথা কহিতে কহিতে আহার গ্রহণ করিবে না। উহাতে বায়ু পাকাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়া খাদ্য পরিপাকে বিঘ্ন ঘটায়, পেটফাঁপা ইত্যাদি জন্মিতে পারে।

৪। অতি শীতল বা অত্যুষ্ণ অন্ন বা পানীয় গ্রহণ করিবে না ইহাতে পরিপাকের বিশৃঙ্খলা জন্মে।

অতি উষ্ণ দুধ বা চা পানে জিহ্বা ঝলসাইয়া যায়, স্বাদ কমিয়া যায়, দন্তের অনিষ্ট হয় ইত্যাদি। উষ্ণ দ্রব্য সেবনের অব্যবহিত পরে শীতল দ্রব্য বিশেষতঃ বরফ বা বরফসংরক্ষিত খাদ্য গ্রহণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর কারণ উহাতে তাপ ও শৈত্যের সমতা রক্ষিত হয় না।

৫। শেষ না রাখিয়া ভোজন করিবে না। কিন্তু জল, ক্ষীর, দধি, মধু, ঘৃত, ছাতু ও শাক নিঃশেষে ভোজন করা যাইতে পারে। কারণ অজ্ঞাত।

৬। আহার অতি বিলম্বিত ভাবে গ্রহণ করিবে না। উহাতে খাদ্যদ্রব্য শীতল হয়, উহার স্বাদ কমে এবং পরিপাকে ব্যাঘাত ঘটে।

৭। আহারকালে ও আহার শেষে জলপান করিবে না। ইহা ত্রিদোষজনক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া সেবন করিলে অতিরিক্ত জলপান প্রয়োজন হইবে না কারণ খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ জল আছে। অতিরিক্ত জলপানে পাকাশয়ের ঝিল্লি সঙ্কুচিত হয় সেজন্য পাচক রস কিছু সময়ের জন্য ভালরূপে

নির্গত হয় না, পাচক রসের তাপ কমে এবং উহার অধিক তারল্য সম্পাদিত হয়। ইহা খাদ্য পরিপাকে বিভ্রাট ঘটায়।

আহারের ½ ঘণ্টা পূর্ব্বে ও ২।৩ ঘণ্টা পরে জলপান হিতকর। উপযুক্তভাবে চর্ব্বণ না করিয়া শীঘ্র আহার গ্রহণ করিলে উহা প্রায়ই গলায় আটকাইয়া যায়, সেইজন্য মধ্যে মধ্যে জল পান করিতে হয়। ইহা অতি নিন্দনীয় অভ্যাস। আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে গলা ভিজাইবার জন্য কিঞ্চিৎ জলপান নিষিদ্ধ নয়। সেইরূপ আহারশেষে অবস্থা বিশেষে অন্ননলী পরিষ্কার করিবার জন্য অতি অল্প জলপান দোষকর নয়। আহারকালে জলপাত্র সম্মুখে থাকা উচিত নয়। জল সামনে থাকিলে সময়ে সময়ে উহা পান করিবার ইচ্ছা হয়।

আহারের পর।

১। আহারের পর বাম হাত পেটে বুলাইলে ভুক্ত দ্রব্য শীঘ্র জীর্ণ হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। যোগবিধান মতে নাভীর চারিদিকে কনিষ্ঠ ভিন্ন অন্য চারিটী অঙ্গুলী চক্রাকারে ঘুরাইলে তাড়িতশক্তি সঞ্চারিত হইয়া জঠরাগ্নি সদ্য বর্দ্ধিত হয়।

২। আহারের পর কিছুক্ষণ পায়চারি করিবে, ইহাতে আয়ুঃ, বল, মেধা ও অগ্নি উদ্দীপিত এবং ইন্দ্রিয়াদির জড়তা বিনষ্ট হয়। এ বিষয় মিতাহার তত্ত্বাধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

৩। আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে ইন্দ্রিয়সেবা নিষিদ্ধ।

৪। আহারের পর (কিছুক্ষণ পায়চারি ব্যতীত) অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল এবং আহার গ্রহণের পূর্ব্বে অর্দ্ধঘণ্টা কোনরূপ কঠিন কায়িক বা মানসিক পরিশ্রম করিবে না। সে সময় বিশ্রাম গ্রহণ

করিবে নচেৎ রক্ত পাকস্থলী হইতে অন্য অঙ্গে সঞ্চালিত হইয়া পরিপাক ক্রিয়া বিশৃঙ্খল করিবে।

একটী প্রবাদ আছে—

খেয়ে যে না জিরিয়ে যায়।
তার পাছে পাছে যম ধায়॥

৫। আহারের পর দীর্ঘ বিশ্রাম বা নিদ্রা যাওয়া উচিত কি না সে সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে কিন্তু অবস্থা বিশেষে উহা যে বিশেষ উপযোগী ও উপকারী তাহা বহু মনীষীগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। নিম্নে কয়েকজনের মতবাদ উদ্ধৃত হইল।

Quiet of body and mind for 2 hours after dinner is certainly useful to the studious, the delicate and the invalid.

"Adair"

অধ্যায়নরত, দুর্ব্বল ও রোগজীর্ণ লোকের আহারের পর দুই ঘণ্টা শরীর ও মনের নিস্পন্দতা বা বিরাম নিশ্চয়ই প্রয়োজন।

From eating comes sleep—from sleep digestion.

Sanctorius.

আহার গ্রহণে নিদ্রা, নিদ্রা যাইলে খাদ্য পরিপাক হয়।

Sleep is the mother of digestion.

Bilundeville.

নিদ্রা খাদ্য পরিপাকের প্রসূতি।

He who sleeps eats.

French proverb.

যে নিদ্রা যায় সে আহারের প্রকৃত সার্থকতা লাভ করে।

Nothing more contributes to digestion than sleep.

Bury.

নিদ্রা ভিন্ন আর কিছু পরিপাকের সহায়তা করে না।

If you have strong propensity to sleep after dinner indulge ; the process of digestion goes on much better during sleep.

Walker.

যদি মধ্যাহ্ন আহারের পর নিদ্রা যাইবার প্রবল ইচ্ছা হয়, নিদ্রা উপভোগ কর ; পরিপাক প্রক্রিয়া নিদ্রাবস্থায় অধিক এবং উত্তমভাবে নির্ব্বাহিত হয়।

Aged men and weak bodies, a short sleep after dinner doth help to nourish.

Bacon.

প্রবীণ এবং দুর্ব্বল লোকের আহারের পর কিছুক্ষণ নিদ্রাসেবা পুষ্টিলাভে সহায়তা করে।

The brute creation invariably lie down and enjoy a state of rest the moment their stomachs are filled. People who are feeble, digest their dinner best if they lie down and sleep as most animals do when their stomachs are full.

Darwin.

পশুদের পাকস্থলী আহার দ্বারা পূর্ণ হইবা মাত্র নিত্য শুইয়া পড়ে এবং বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করে। দুর্ব্বল মানব যদি পূর্ণ আহারের পর কিছুক্ষণ শয়ন করিয়া নিদ্রা যায় তাহা হইলে অধিকাংশ পশুদের ন্যায় ভুক্তাহার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমভাবে পরিপাক করিতে পারে।

We should indulge in the muscular and mental repose which is demanded and this should last not much less than an hour after each (principal) meal. Also a short period of rest or very light occupation should be allowed before every (principal) meal.

Chambers.

আমাদের যতটুকু পৈশিক ও মানসিক বিশ্রাম গ্রহণ প্রয়োজন ততটুকু প্রত্যেক প্রধান আহার সেবনের পরে গ্রহণ করিতে চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য। উহা অন্ততঃ ১ ঘণ্টার কম না হয়। পুনশ্চ উক্ত আহার গ্রহণের পূর্ব্বেও স্বল্প বিশ্রাম বা খুব হালকা পরিশ্রম করা উচিত।

অন্যান্য বিশিষ্ট বিধি।

স্বরোদয় শাস্ত্র মতে ভগবতী আসনে অর্থাৎ বাঁ হাঁটু বাঁ বগলের নীচে রাখিয়া ডান হাঁটু পাতিয়া ও গোড়ালি গুহ্যের নিম্নে দিয়া আহার করিতে বসা প্রশস্ত।

আহারান্তে বীরাসনে বসিয়া অর্থাৎ গুহ্যদ্বার এক পায়ের গোড়ালির দ্বারা চাপিয়া, আর এক পা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কাঠের চিরুণি দ্বারা মাথা আঁচড়াইলে চক্ষুর কল্যাণ ও ভুক্তবস্তু পরিপাকের সহায়তা হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীযোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন ইহা অজীর্ণ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

এক পাত্রে অন্যের সহিত খাইবে না। বহুজনস্পৃষ্ট বা পণিকের (হোটেলওয়ালার) অন্ন গ্রহণ করিবে না।

পতিপুত্রহীনা অবীরা, বিষকন্যা বা সাময়িক বিষদুষ্ট রজস্বলা কৃত পক্কান্ন সেবন করিবে না—উহা সংক্রামক দোষে দূষিত হয়। কিন্তু পবিত্রচেতা নিরোগ মাতা, স্ত্রী, মাসি, পিসি, ভগিনী প্রভৃতি নিকট আত্মীয়া অবীরা হইলেও ইহাদের হস্তে পক্ক অন্নাদি দুষ্ট নহে।

শাস্ত্রকার মনু নিম্নলিখিত স্পর্শদোষ এবং চরিত্র ও বৃত্তি গত দোষে দূষিত অন্ন সেবন নিষেধ করিয়াছেন :—

১। কাক, ইঁদুর, মাছি, আরস্থলা, কুকুর, ইত্যাদির স্পৃষ্ট বা আস্বাদিত অন্ন এমন কি কুকুর পোষণকারীর অন্ন।

২। গণিকার অন্ন।

৩। চিকিৎসক, চর্ম্মকার, শিল্পী, রজক, শৌণ্ডিক, ব্যাধ ও কসাইয়ের অন্ন।

৪। সুদখোর, লম্পট, ক্রুদ্ধ, ক্রুর বা তস্করের অন্ন।

৫। পর্য্যুষিত অন্ন।

৬। বৃথা মাংস (যাহা দেবতাকে উৎসর্গীকৃত হয় নাই।)

৭। কাহারও উচ্ছিষ্টান্ন, শ্রাদ্ধান্ন বা প্রেতান্ন, মরণাশৌচির অন্ন, মঠবাসীর অন্ন ইত্যাদি।

আহারের সময় দরিদ্র, ক্ষুধার্ত্ত, আহারলোভী, রুগ্ন, স্ত্রৈণ, কুক্কুট, কুকুর ও সর্পাদির দৃষ্টি অহিতকর। খাদ্যের প্রাণশক্তি তাহারা টানিয়া লয়। কাহারও অসুখ হইলে চলিত সংস্কার মত বলা হয় উহার খাদ্যে অমুকের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

যদি গুরুজনও রুগ্ন বা দূষিত চরিত্র হয় তাহাদের প্রসাদ গ্রহণ অবিধেয়। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন গুরু বা

দেবতার প্রসন্নভাব, কৃপা বা দয়াই আসল প্রসাদ। যার তার হাতে খাইলে অনেক ক্ষতি হয়। যাহার পকান্ন সেবন করা যায় তাহার দোষ এমন কি আন্তরিক ভাব পর্য্যন্ত আহার্য্য বস্তুর সহিত আহারকারীর মনে সংক্রমিত হয়। ইহা চাক্ষুষ দেখিতে বা বুঝিতে পারা যায় না কিন্তু সত্য।

ভোজনকালে যদি কোন নিন্দনীয় ব্যক্তি এক পঙক্তিতে আহার গ্রহণ করে তাহা হইলে অন্য ভোক্তার আহার পাত্রের চারিদিকে ছাই বা জলের রেখা টানিলে অর্থাৎ পঙক্তিচ্ছেদ করিলে কোন অপকার হয় না বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

আহারের অব্যবহিত পরে দাঁত মাজিবে ও কুলকুচা করিয়া মুখ ধুইবে। লোকে সাধারণতঃ প্রত্যূষে খালি পেটে দাঁত মাজে কিন্তু প্রত্যেক আহারের পর দাঁত মাজা বিধেয় নচেৎ দাঁতে আহার্য্য দ্রব্যের অংশ লাগিয়া থাকে অর্থাৎ ছেতলা পড়ে যাহা পরিণামে অনিষ্টকর।

সম্প্রতি স্বাস্থ্য ও শক্তি (Health and Vitality) সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে ইতালী দেশের যুদ্ধের রাজমন্ত্রী সৈনিক-চিকিৎসকগণকে আদেশ দিয়াছেন যেন সৈন্যগণ আহারান্তে দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করে। এইজন্য প্রত্যেক ছাউনিতে একটী স্বতন্ত্র ঘর রাখা হইয়াছে। রোম দেশের প্রতি এরোপ্লেনের আড্ডায়, আহারের প্রতি কামরার পাশে ঐরূপ ঘর আছে। সেখানে মন্ত্রী হইতে সকল নিম্নতর সৈনিক ও কর্ম্মচারীকে ঐ বিষয়ে বাধ্য করা হয়। এইজন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে, সে দেখে সকলে যেন উক্ত আদেশ পালন করে।

আহার করিবার সময় ধূপ বা ধূনা জ্বালিলে বা আসনের অতি নিকটে সুগন্ধ ফুল রাখিলে মনে একটী তৃপ্তিভাব আসে তদ্দ্বারা আহারের সুখ, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধাও বর্দ্ধিত হয়। ইহা রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এইজন্য সাহেবরা আহার-টেবিলে ফুল রাখে, ইহা অবশ্য অনুকরণীয়।

দশম অধ্যায়।

——:(০):——

আহারের বিশেষ বিধি।

চর্ব্বণ বিজ্ঞান।

"Eat liquid and drink solid."

তরল পানীয় ভোজন কর এবং কঠিন আহারীয় দ্রব্য পান কর।

চর্ব্বণতত্ত্ব পূর্ব্বোক্ত মিতাহার তত্ত্বের অঙ্গীভূত একটী আধুনিক বিশিষ্ট সংস্করণ। ইহার দ্বারা মিতাহারের অনেক উপকার লাভ হইতে পারে। জিহ্বার বিভিন্ন স্থানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুগুচ্ছ আছে তাহাদিগকে ইংরাজীতে প্যাপিলি (Papillae) বলে। খাদ্যের স্বাদ প্রধানতঃ উহাদের দ্বারা অনুভূত হয়। একজন পুষ্টিতত্ত্ববিদ বলিয়াছেন জিহ্বার মধ্যভাগে যে স্নায়ুগুচ্ছ থাকে তাহার দ্বারা খাদ্যদ্রব্যের স্পর্শ ও সাধারণ স্বাদ বোধ, উহার দুই পার্শ্বের স্নায়ুগুলির দ্বারা মিষ্ট ও লবণ রস এবং পশ্চাৎ ভাগের স্নায়ু দ্বারা তিক্তরস বিশেষ ভাবে আস্বাদিত হয়। মুখের লালা বা পাচক রস জিহ্বা ব্যতীত দাঁতের মাড়ী ও মুখগহ্বর হইতেও নিঃসৃত হয়।

মুখবিবর হইতে আরম্ভ করিয়া মলদ্বার পর্য্যন্ত সমুদয় অংশ পরিপাকযন্ত্রের অন্তর্গত। উহার দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট, মতান্তরে ৩৩ ফুট। গলনলীর মধ্য দিয়া খাদ্যদ্রব্য নামিবার সময় উহার রস কতক রক্তে শোষিত হয়, পরে অন্ননলী, পাকাশয় ও অন্ত্রে উপস্থিত হইলে যে যন্ত্রের যতটুকু শক্তি তত পরিমাণে ঐ রস শুষিয়া লয়। মুখগহ্বর, পাকাশয় ও অন্ত্র, এই তিনটী খাদ্য পরিপাকের প্রধান যন্ত্র।

সাধারণতঃ এক এক প্রকার খাদ্য এক এক যন্ত্রের পাচক রস দ্বারা সহজে জীর্ণ হয়। পরিপাকের প্রাথমিক ক্রিয়া জিহ্বা দ্বারা মুখ-গহ্বর মধ্যে নিষ্পন্ন হয়। ক্ষুধার সময় খাদ্যের দর্শন, ঘ্রাণ বা আস্বাদনে মুখ-গহ্বরের বিভিন্ন লালা নিঃসরণকারী গণ্ড ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে রস ঝরে। তরল খাদ্য অপেক্ষা শুষ্ক খাদ্য গ্রহণে এই রস সমধিক ঝরে। মুখের লালা ক্ষার গুণ সম্পন্ন। ডাক্তার লুইস বলিয়াছেন ইহার মধ্যে টাইলিন নামে যে পদার্থ আছে যাহার পরিমাণ ২০০ ভাগের এক ভাগ তাহা খাদ্যের শ্বেতসার জাতীয় উপাদানকে শর্করায় পরিণত করে।

খাদ্য যত অধিক চর্ব্বিত হইবে তত অধিক লালা নিঃসৃত ও উহার সহিত মিশ্রিত হইতে পারিবে। উপযুক্ত চর্ব্বণাভাবে শ্বেতসার-বহুল খাদ্য যথা ভাত রুটি প্রভৃতি যাহার পরিপাকের প্রধান স্থান মুখবিবর, অপাক অবস্থায় পাকাশয়ে যায়। সেখানে কতক ভাগ জীর্ণ হইয়া অবশিষ্ট শ্বেতসার পুনরায় অপাক অবস্থায় অন্ত্রে প্রেরিত হয়। সেইজন্য পাকস্থলী ও অন্ত্রের উপর অতিরিক্ত ভার পড়ে, অর্থাৎ উহাদের অযথা কাজ বাড়ে, ফলে বায়ু এবং বহু পরিমাণ অপাক মল নিঃসৃত হয়। উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা বা অজীর্ণ রোগের উহা অন্যতম প্রধান কারণ। মুখবিবরে খাদ্য অতি সূক্ষ্ম ভাবে বিভক্ত হইলে জঠরের ও অন্ত্রের ক্রিয়ার লাঘব হয় এবং পরিপাক ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে শীঘ্র সম্পন্ন হয়। এ সম্বন্ধে আধুনিক চর্ব্বণতত্ত্ব বিশারদ ফ্লেচার সাহেব বলিয়াছেন—

"Nothing is even accomplished except by a division of labour and on the just division of responsibility depends the success of effort. Nature has given us the head-end responsibility."

"শ্রমের বিভাগ বিনা কোন কাজই সম্পন্ন হয় না। কর্ম্ম প্রচেষ্টার সুফল ঠিকমত দায়িত্ব বিভাজনের উপর নির্ভর করে। প্রকৃতি আমাদিগকে মাথার দিকের অর্থাৎ মুখ-গহ্বরের সুচারু ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য দায়ী করিয়াছে।"

আজকাল জীবনযাত্রায় সমধিক দ্রুতগতি সকল দিকেই দেখা যায়—ইহা সভ্যতার কুফল। দ্রুত আহার সেবন যে আমাদের স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণ ও সাধারণ স্বাস্থ্যহীনতার অন্যতম প্রধান কারণ তাহা অনেকে উপলব্ধি করে না। খাদ্য সমধিক ছেদিত বা কুট্টিত ও চর্ব্বিত না হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষ ব্যতীত খাদ্যের স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যায় না এবং তৃপ্তিলাভ হয় না; সময়ে সময়ে ভুক্তদ্রব্য ঊর্দ্ধে উৎসেচিত হয় যাহা অম্লরোগের একটী বিশেষ লক্ষণ।

গব্ গব্ করিয়া গিলিয়া খাওয়া অস্বাভাবিক। আমাদের ছেদন ও পেষণ দুই প্রকার দন্তই সৃষ্ট হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্য ছেদন ও পেষণ না করিয়া গেলন কখনই বিধাতার অভিপ্রেত নয়। এ বিষয়ে আমরা মূর্খ ঘৃণাস্পদ গো মহিষাদি জন্তুদের কাছ থেকে কিছু শিক্ষালাভ করিতে পারি। তাহারা ছেদন, পেষণ ও চর্ব্বণ করিয়া ক্ষান্ত হয় না অধিকন্তু রোমন্থন বা চর্ব্বিত চর্ব্বণও করে (জাবর কাটে)। আমরা বেশ জানি, পুস্তকে লিখিত বিষয় বার বার আবৃত্তি বা চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিলে উহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় বা মনে অঙ্কিত হয়।

অধিক চর্ব্বণে অধিক লালারস নির্গত হইয়া ভুক্তদ্রব্যের সহিত মিলিত হয়। চর্ব্বণ কমাইলে রস নিঃসরণ কমে। চর্ব্বণ বাড়াইলে উহা বাড়ে। অতি দ্রুত ভোজনে আহার্য্য দ্রব্য গল-নলীতে প্রায়ই আবদ্ধ হয়। গলায় কাঁটা লাগিয়া একজনের প্রাণান্ত হইয়াছিল শোনা গিয়াছে। কখনও কখনও উহা বিপথে অর্থাৎ বায়ুনলীতে চালিত হয়

তখন বিষম লাগে। অধিকন্তু গলা হইতে আবদ্ধ আহার নামাইয়া দিবার জন্য ঘন ২ জলপান করিতে হয় সেইজন্য পাকস্থলীর উত্তাপ হ্রাস ও পাচক রসের তারল্য সাধিত হয় যাহা পরিপাকের বিঘ্ন ঘটায়।

'চর্ব্বণক্রিয়া' ব্যায়াম পর্য্যায়ভুক্ত বলা যাইতে পারে। ইহার অভাবে গণ্ডাস্থি বা চোয়ালের পূর্ণ পরিণতি লাভ এবং মুখের আকৃতি বা গঠনের সুষমা বা সুসামঞ্জস্য সম্যকভাবে হয় না। চর্ব্বণাভাবে দাঁত অকেজো হয় বা পড়িয়া যায় যাহা পরিপাকের পরিপন্থী।

দাঁতের সহিত মুখাকৃতির অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ ডাঃ সিসিল ওয়েব জনসন লিখিয়াছেন যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ (আমাদেরও বটে) অধিক অবসর পাইত বলিয়া খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইত এবং তাঁহাদের চোয়াল এখনকার লোকেদের অপেক্ষা বড় ছিল।

পূর্ব্বকালের এবং এখনকারের প্রকাশিত পুস্তকে মানব প্রতিকৃতি বা ছবি তুলনা করিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথেষ্ট প্রভেদ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। আমাদের দেশের সেকালের লোক মোটা ভাত, মোটা কাপড় পরিয়া, নগ্ন গাত্রে ও নগ্নপদে থাকিয়া প্রচুর রৌদ্রসেবা ও কায়িক পরিশ্রম করিয়া এবং মোটা চালে চলিয়া এখনকার বিলাসী লোকেদের অপেক্ষা অধিক সুস্থ ও কর্ম্মঠ ছিল। যাহারা আহার শীঘ্র ২ গ্রহণ করে অর্থাৎ "নাকে, চোকে, মুখে গোঁজে", অন্য দোষ ব্যতীত তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয় যাহা হৃৎযন্ত্রের অপকারী।

যাহারা দুর্ব্বল বা যাহাদের শরীরের রক্ত বা রস রোগে ক্ষয় হইয়াছে বিশেষতঃ অজীর্ণরোগী, তাহারা আকুল আগ্রহে অতি দ্রুত আহার গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ঐ প্রবৃত্তি দমন না করিলে স্বাস্থ্যের

অশেষ দুর্দ্দশা ঘটে। অভ্যাস বশতঃ প্রথম ২ অধিকক্ষণ ধরিয়া আহার চর্ব্বণ করিয়া খাইতে তৃপ্তিলাভ হয় না, কিন্তু ক্রমে ঐ নূতন অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়। সম্মুখে ঘড়ি রাখিয়া নিষ্ঠাপূর্ব্বক চর্ব্বণ অভ্যাস করিলে আহারের সময় উত্তরোত্তর আপনি বাড়িয়া যাইবে তাহাতে অসুবিধা বোধ হইবে না।

বিধিমত চর্ব্বণ করিয়া আহার গ্রহণ করিলে, অধিক খাদ্য গ্রহণের অভিলাষ বা প্রয়োজন বোধ হয় না। অভ্যস্ত আহারের মাত্রা $\frac{1}{3}$ হইতে $\frac{1}{2}$ ভাগ কমিয়া যায়। ইহাতে কোন দোষ ত হয়ই না বরং অর্থের সাশ্রয় ও স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয় এমন কি নৈতিক উন্নতি ও ইন্দ্রিয় দমন শক্তি বর্দ্ধিত হয়, মাদক দ্রব্য সেবনাভিলাষ কমে বা অন্তর্হিত এবং চর্ম্ম পরিষ্কৃত হয়, খাদ্য অল্প সময়ে পরিপাক ও অল্পাহারে অধিক পুষ্টিলাভ হয়। রোগা মোটা হয় আবার মোটা রোগা হয়। কিন্তু সবল দুর্ব্বল হয় না। দেহের অতিরিক্ত মেদ কমিয়া যায় সেইজন্য দেহ অধিকতর সুস্থ ও কর্ম্মঠ হইয়া থাকে। ইহা পরীক্ষিত সত্য।

আমাদের স্বরোদয় শাস্ত্র মতে যখন ডান নাসিকায় শ্বাস বহে তখন আহার করা উচিত এবং মুখ বিবরের বাম দিকে চর্ব্বণ করা স্বাস্থ্যানুকুল কারণ ইহাতে ডান নাসিকায় সূর্য্য বা অগ্নি নাড়ী দিয়া শ্বাস প্রবাহিত হয়, ফলে ভুক্ত দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক হয়। ডান দিকে চিবাইলে বাম শ্বাসে, চন্দ্র বা জল নাড়ীতে আহুতি দেওয়া হয় যাহা অজীর্ণাদি রোগজনক।

কিন্তু উক্ত ব্যবস্থাবলম্বনে প্রকৃতি প্রদত্ত দুই পাটি দাঁতের সার্থকতা থাকে না। উহাতে একপার্শ্বিক অঙ্গচালনার দোষ জন্মে ও যথেষ্ট

পাচক রস নিঃসৃত হইতে পারে না। এক সঙ্গে দুই পাটি দন্ত দ্বারা বা পর্য্যায়ক্রমে আহার চর্ব্বণই প্রকৃতির অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়।

অতএব ঐ দুইটী প্রতিক্রিয়ার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া অধিকাংশ সময় বাম দিকে চিবাইলে ঐ মীমাংসার সমাধান হইতে পারে।

প্রায়ই দেখা যায় অনেকে সকালে শয্যা হইতে বিলম্বে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন বা নিত্য সাংসারিক কার্য্য করিয়া, বাজে কাজে বা দেহ প্রসাধনে অনেক সময় নষ্ট করিয়া ভাল করিয়া চিবিয়া খাইবার যথেষ্ট সময় পায় না।

আবার কোন কোন গৃহিণীর আলস্যপরায়ণতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্যাদি নানা কারণে যথাসময়ে আহার্য্য প্রস্তুত হয় না। তাঁহারা সাধারণতঃ ঘড়ির ধার ধারেন না। উক্ত গৃহিণীপনার দোষে পরিবারস্থ ছাত্র, ছাত্রী, কেরাণী ও অন্য কর্ম্মচারী চর্ব্বণ ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত প্রকরণ অর্থাৎ কোঁৎ করিয়া আহার করিতে বা গোগ্রাসে গিলিতে বাধ্য হয়। শুধু তাহাই নয়, অনেককে ঊর্দ্ধশ্বাসে কর্ম্মস্থলে দৌড়াইতে হয়। উহা আরো অনিষ্টকর।

উপরোক্ত দোষগুলি নিবারণের একমাত্র অব্যর্থ উপায়, সকলের সকাল সকাল ঘুম হইতে উঠা। ইহা দ্বারা সর্ব্ববিষয়ে উপকার হইতে পারে। একথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে আহারের সময় সংক্ষেপ করিলে বাঁচিবার সময়ও সংক্ষিপ্ত হইবে।

মনে রাখিতে হইবে যে পাকাশয়ের দাঁত নাই। কেহ বলিতে পারেন পাখীদের দাঁত নাই তাহারা গিলিয়া খাইয়া সুস্থ দেহ লাভ করে। কিন্তু উহাদের একটী অতিরিক্ত পাকস্থলী আছে যাহা কঠিন পেশী বা ঝিল্লির দ্বারা গঠিত। উহা দ্বারা কঠিন আহারীয় দ্রব্য প্রথমে

পিষ্ট হয় তদ্ব্যতীত কতিপয় শ্রেণীর পক্ষীগণ স্বতন্ত্রভাবে ছোট ছোট পাথরের নুড়ি বা ইটের টুকরা খুঁটিয়া খায় যাহা ভুক্ত খাদ্যের পরিপাকে বিশেষ সহায়তা করে। শোনা গিয়াছে অষ্ট্রীচ নামক পক্ষী কাঁচ, লোহার টুকরা পর্য্যন্ত খায়।

আমাদের শাস্ত্রে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চর্ব্বণবিধি নির্দ্দেশিত হইয়াছিল এবং উহার উপকারীতা মোটামুটি সকলেই জানিত এবং এখনও কিছু না কিছু জানে। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন তাঁহার সন্তানদের ঐ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং উহা প্রতিপালন করিয়া এবং অন্য স্বাস্থ্যনীতি অনুসরণ করিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের শেষ অবধি সুস্থ ও কর্ম্মঠ ছিলেন।

"Chew your food 32 times at least so as to give each of your 32 teeth a chance at it."

"তোমাদের খাদ্য অন্ততঃ ৩২ বার চিবাইয়া খাইবে যাহাতে তোমাদের ৩২টী দাঁতের প্রত্যেকটীকে চর্ব্বণের সুযোগ দেওয়া হয়।"

গ্ল্যাডষ্টোন সাহেব এক সময়ে একটী ভোজে প্রত্যেক গ্রাস ৭৫ বার অবধি চিবাইয়া খাইয়াছিলেন। কিন্তু সাদা সিদে আহার করিতে এতবার চিবাইতে হয় না। আসল কথা, খাদ্য দ্রব্যের প্রকৃতি (কঠিন বা কোমল) চর্ব্বণের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করে।

মার্কিণদেশের বিংশ শতাব্দীর ধনকুবের ও অর্থনীতি বিশারদ জন, ডি, রকফেলার বলিয়াছেন :—

Don't gobble your food. Flecherise or chew very slowly while you eat. Talk on pleasant topics. Don't be in a hurry. Take time to masticate and cultivate a

cheerful appetite while you eat. So will the demon indigestion be encompassed round about and his slaughter complete.

গব গব করিয়া খাইও না অর্থাৎ আহার আড়ে গিলিও না। ফ্লেচার রীতি অনুযায়ী আস্তে আস্তে খাদ্য চিবাইয়া খাইবে। মনোরম প্রসঙ্গ বা আলাপের সহিত খাইবে। ত্বরান্বিত হইও না। খাইবার কালে চিবাইতে সময় লইবে এবং ক্ষুধার আনন্দজনক অনুশীলন করিবে। এইরূপে অজীর্ণ দৈত্য চারিদিকে বেষ্টিত হইয়া সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইবে।

রকফেলার সাহেব জীবনবাতির আগা, পাছা এবং মাঝ পোড়াইয়া মরিতে বসিয়াছিলেন কিন্তু আহার আস্তে আস্তে চিবাইয়া খাইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন।

কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে বিলম্বিত চর্ব্বণে সময় অনেক নষ্ট হইবে। কিন্তু আধুনিক চর্ব্বণ-তত্ত্ব-বিশারদ ফ্লেচার ও পুষ্টিতত্ত্ববিদ ডাঃ সিসিল ওয়েব জনসন বলিয়াছেন যে ক্ষুধা মিটাইবার জন্য সাধারণতঃ ২০ মিনিট, বড় জোর ½ ঘণ্টা চর্ব্বণই যথেষ্ট। শীঘ্র শীঘ্র আহার গ্রহণ অভ্যাস বিদূরিত করিতে হইলে প্রথম প্রথম ঘড়ি ধরিয়া আহার করা উচিত।

অন্ততঃ ৩০ মিনিট কাল আসনে উপবিষ্ট থাকিব প্রতিজ্ঞা করিলে উহা নূতন অভ্যাসে পরিণত হইবে। বাধ্য হইয়া ঐ সময় আহার ধীরে ধীরে গৃহীত হইবে নচেৎ খামকা বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিবে না। অভ্যাসের গুণে উক্ত সময়ের আগে আসন ছাড়িয়া উঠিবার ইচ্ছা হইবে না। অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাব, আমরা কু-অভ্যাসকে অল্প আয়াসেই সু-অভ্যাসে পরিণত করিতে পারি। তদ্দ্বারা দেহের কল্যাণ বই অকল্যাণ হইতে পারে না।

ফ্লেচার সাহেব খাদ্য বিধিমত চর্ব্বণ করিয়া খাইয়া সমূহ উপকার পাইয়াছেন। তিনি তৎসংক্রান্ত যে সকল বিধি স্বয়ং পালন করিয়া কঠিন রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন ও অসংখ্য রোগীকে উহাদ্বারা নানাবিধ কঠিন রোগ হইতে আরাম করিয়া চিকিৎসা ও পুষ্টি বিজ্ঞান শাস্ত্রে যে বিস্ময়কর যুগান্তর আনিয়াছেন বা উহাতে যে নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিম্ন আত্মকাহিনী বিশেষ অবধান যোগ্য। তিনি অনেক নূতন তথ্যের অভ্রান্ত সন্ধান পাইয়াছেন যাহা পূর্ব্বে এক প্রকার অজ্ঞাত ছিল।

তাঁহার ৪০ বৎসর বয়সে মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছিল এবং ওজন ২½ মণেরও অধিক ছিল, উহা দৈর্ঘ্য অনুপাতে প্রায় ½ মণ অধিক। তখন তিনি প্রতি ৬ মাস অন্তর ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং নিয়ত দারুণ অজীর্ণ রোগে ভুগিতেন। ঐ বয়সে তাঁহার বার্দ্ধক্যের সব লক্ষণগুলি দেখা দিয়াছিল। সে সময় তিনি জীবন বীমা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কোন বীমা কোম্পানী তাঁহার শোচনীয় স্বাস্থ্যের জন্য উহা করিতে সম্মত হয় নাই। সুদীর্ঘ কাল নানা ঔষধ সেবন, বিভিন্ন আরোগ্য ও স্বাস্থ্য নিকেতনে অবস্থান করিয়া এবং অনেক স্বাস্থ্য পুস্তক পাঠ করিয়া কোন উপকার লাভ করেন নাই।

অবশেষে হতাশ হইয়া প্রকৃতি মাতার সাহায্য গ্রহণে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া তাঁহার স্বাস্থ্য দুর্দ্দশার মূল কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং আত্ম প্রেরণার দ্বারা অনুধাবন করিলেন যে উহা একমাত্র পুষ্টি-হীনতার জন্য ঘটিয়াছে এবং ঐ দোষ আহার গলাধঃকরণ করিবার পূর্ব্বেই সংঘটিত হয়। সেই জন্য তিনি খাদ্য রীতিমত চর্ব্বণ করিয়া যতক্ষণ না উহা তরলিত হইয়া মুখগহ্বরের দ্বারে খাদ্য নলীর মুখে

উপস্থিত হয় ও স্বতঃই উহার মধ্যে নাবিয়া যায় ততক্ষণ চর্ব্বণ করিতে অভ্যাস করিলেন।

দিন দিন খাদ্যের নূতন স্বাদ এবং অভূতপূর্ব্ব সুখকর অনুভূতি পাইতে লাগিলেন। তিনি গৃহীত খাদ্যের স্বাদ যতক্ষণ থাকিত ততক্ষণ চিবাইতেন। এই সম্বন্ধে তিনি পাঁচটী বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১। যতক্ষণ না প্রকৃত ক্ষুধা হয় ততক্ষণ আহার গ্রহণ করিবে না।

মন্তব্য—অভ্যাস বা দুষ্ট ক্ষুধা প্রকৃত ক্ষুধা নয়। প্রকৃত ক্ষুধা হইলে বিনা ব্যঞ্জনে রুটী বা ভাত কাঁউ কাঁউ করিয়া খাইতে ইচ্ছা হইবে ও তৃপ্তির সহিত উহা খাওয়া যাইবে। নিয়মিত সময়ে আহার গ্রহণাভ্যাস করিলে কখনও প্রকৃত ক্ষুধা কখনও বা অভ্যাস ক্ষুধা উদ্রিক্ত হইতে পারে। এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে তখন এক গ্লাস ঠাণ্ডা কিম্বা গরম জল চিনি বা দুধ সহ কিম্বা কোন কিছু না মিশাইয়া পান করিলে দুষ্ট বা অভ্যাস ক্ষুধা নিবৃত্ত হইবে অর্থাৎ উহা যে প্রকৃত ক্ষুধা নয় তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। আর একটী অব্যর্থ লক্ষণ, প্রকৃত ক্ষুধা হইলে খাদ্য দ্রব্য দর্শনে মুখে জল আসিবে।

এক পরিবার ভুক্ত লোকেদের, নানা কারণে, সাধারণতঃ এক সময়ে সব দিন প্রকৃত ক্ষুধা হইতে পারে না, তথাপি তাহারা বাধ্য হইয়া এক সময়ে খাদ্য গ্রহণ করে। সুতরাং উপরোক্ত আদেশ সব ক্ষেত্রে পালন করা সম্ভবপর নয়। ইহার প্রতিবিধানার্থে যাহাদের ঐ সময়ে ক্ষুধা না হয় তাহাদের পরে খাওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহাতেও প্রতিবন্ধক আছে। ছাত্র, কেরাণী ইত্যাদি প্রতিদিন বাধ্য হইয়া এক সময় প্রাতের আহার গ্রহণ করে। সে ক্ষেত্রে ক্ষুধা না থাকিলে এক বেলা অভ্যস্ত আহার ত্যাগ করিয়া খই, মুড়কী, ফল, সন্দেশ প্রভৃতি শিক্ষা

বা কর্ম্মস্থলে লইয়া গিয়া ক্ষুধা পাইলে আহার করিলে লাভ বই ক্ষতি হইবে না। পূর্ব্ব রাত্রের আহার কমাইলে কিম্বা রাত্রি আটটার সময় খাইলে পরদিন যথা সময়ে ক্ষুধা উদ্রিক্ত হইতে পারে।

২। যেদিন যে খাদ্যটী খাইবার প্রবল অভিলাষ হয় সেদিন যেন উহা আহার্য্য দ্রব্যাদির মধ্যে থাকে। আহার করিতে বসিয়া ইচ্ছামত বিভিন্ন খাদ্য আগে পরে খাইবে।

মন্তব্য—আমাদের দেহে যখন যে জিনিষটী বা খাদ্যের যে জাতীয় উপাদানের অভাব ঘটে তখন ঐ উপাদানবহুল খাদ্য খাইবার প্রবল বাসনা হয়। উহা অপূর্ণ রাখা উচিত নয়। অবশ্য রোগীর অপথ্য বা কুখাদ্য খাইবার প্রবল প্রবৃত্তি দমিত হওয়া কর্ত্তব্য। বিভিন্ন আহারীয় দ্রব্যগুলি বিধিমত পর পর খাওয়াই যুক্তি সঙ্গত নচেৎ পরিপাক বিভ্রাট ঘটিতে পারে কিন্তু ব্যতিরেক হিসাবে কোন দ্রব্য শেষের পরিবর্ত্তে যদি প্রথমে খাইবার প্রবল অভিলাষ হয় তাহা পূর্ণ করা কর্ত্তব্য। এ বিষয় অন্যত্র বিশদভাবে বলা হইয়াছে।

"ক্ষুধার সময় দর্শন, ঘ্রাণ, স্পর্শ ও স্বাদেন্দ্রিয়গণ আহার গ্রহণে প্রবুদ্ধ হয়। দেহে কোন এক জাতীয় আহারীয় উপাদানের অভাব হইলে ঐ সকল ইন্দ্রিয় দ্বারাই উহা প্রবলভাবে বিজ্ঞাপিত হয়। এই যে ইন্দ্রিয় ক্ষুধা বা বোধ তাহার ভিতরও বোধ বা বুদ্ধি রহিয়াছে, কি চমৎকার!"

শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আহারকালে সাক্ষাৎ ভাবে দেখা যায় না। কিন্তু ভোজের নিমন্ত্রণের সংবাদ শ্রবণে বা ভোজের আয়োজনের কথা আলাপনে তৃপ্তি জাগে। আহারের ব্যাপারে ইন্দ্রিয়রাজ মন সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া আহার আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হন। কিন্তু আহার অবিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ বিধিমত চর্ব্বণ না করিয়া (কিম্বা

অহিতাহার বিধিমত চর্ব্বণ করিয়া গ্রহণ করিলে), তৃপ্তির পরিবর্ত্তে অতৃপ্তি এবং শারীরিক ও মানসিক দুর্দ্দশা সূচিত হয়। সেইরূপ অন্য বিষয়ে মনের অন্যায় ক্ষুধা মিটাইলে ঐ দশা হয়।

৩। আহারের স্বাদ যতক্ষণ থাকিবে এবং যতক্ষণ না ভুক্তদ্রব্য গলিয়া গলনলীতে আপনি নামিয়া পড়ে ততক্ষণ চিবাইবে।

মন্তব্য—আমাদের খাদ্যে ঝোল প্রভৃতি তরল পদার্থ অধিক থাকায় অর্থাৎ উহা অধিক জলবহুল বলিয়া, চর্ব্বণ ক্রিয়া সমধিক পরিমাণে হয় না। সেইজন্য জলীয় অংশের পরিমাণ কমান এবং কঠিন খাদ্যের পরিমাণ বাড়ান প্রয়োজন নচেৎ চর্ব্বণের পূর্ণ উপকারীতা লাভ হইতে পারে না। প্রথমে নিম্নলিখিত বিধি অনুযায়ী আহারের জলীয়াংশ চুষিয়া খাইয়া শেষে কঠিন খাদ্যাংশ রীতিমত চর্ব্বণ করিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য। যখনই পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ কঠিন খাদ্য চর্ব্বিত হইবার পূর্ব্বে বা অর্দ্ধ চর্ব্বিত অবস্থায় গলার নিকট যাইবে তখনই উহা মুখে ফিরাইয়া আনিয়া পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণ করিবে। প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা বোধ হইতে পারে কিন্তু শেষে উহা অভ্যাসে পরিণত হইবে।

৪। তরল পানীয় বা আহারীয় দ্রব্য মুখের ভিতর কিছুক্ষণ রাখিয়া উহা লালার সহিত মিশ্রিত করিয়া চেকে চেকে চুষে বা চুষে খাবে।

মন্তব্য—ইহা সাধারণ আহার বিধি। এ বিষয় অন্যত্র বিশদভাবে বলা হইয়াছে।

৫। ক্ষুধা নিবৃত্ত হইবা মাত্র পুনরায় আহার গ্রহণ করিবে না। অধিক আহার গ্রহণ বা চর্ব্বণ অনিষ্টকর।

উপরোক্ত নিয়ম কয়টী ৫ মাস যাবত পালন করাতে ফ্লেচার সাহেবের স্বাস্থ্যের সমূহ উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার শরীরের মেদ ৩০ সের কমিয়া গিয়াছিল। সকল দিকেই তিনি ভাল বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তক এবং অন্য অঙ্গগুলি হালকা বোধ হইয়াছিল, সর্দ্দি রোগে পুনরাক্রান্ত হন নাই এবং পূর্ব্বের ন্যায় দেহ পরিশ্রান্ত বা দুর্ব্বল বোধ করেন নাই।

কিন্তু তাঁহার দেশবাসীগণ কেহই উক্ত চর্ব্বণজনিত উপকারের কথা তিন বৎসর যাবত বিশ্বাস করে নাই। পরে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি, বহু ছাত্র, সৈনিক ও সাধারণ গৃহস্থ উক্ত আহার বিধি পালন করিয়া আশ্চর্য্য উপকার লাভ করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে যাহাদের মদ খাইবার অভ্যাস ছিল তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছিল। সকলেরই আহারের পরিমাণ অর্দ্ধেকেরও বেশী কমিয়া গিয়াছিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় কাহারও বিশ্রান্তভাব (tired feeling) বোধ হয় নাই।

ইহাদের মধ্যে একজন (J. H. Granger) ২ ঘণ্টা ১৯ মিনিট কাল ক্রমান্বয়ে ওঠবোস্ এবং অব্যবহিত পরে তাঁহার নিত্য অভ্যস্ত সন্তরণক্রিয়া করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তজ্জন্য পরে কোন অসুবিধা বা দুর্ব্বলতা বোধ করেন নাই। একজন পরীক্ষার্থীর কটি দেশের মাপ ৩০ ইঞ্চি কমিয়া গিয়াছিল এবং বক্ষের মাপ ৪৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত এবং দৈহিক শক্তি বিশেষতঃ সহ্যশক্তি প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছিল। ইহা অন্য সকলেরও অল্প বিস্তর হইয়াছিল।

অন্য একটী পরীক্ষায় নাইট্রোজেনবহুল খাদ্যের মাত্রা যথেষ্ট কমান হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে উপকার বই অপকার হয় নাই। সুতরাং অতি অল্প আমিষাহারে যে দেহ পুষ্ট হইতে পারে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ফ্রেচার সাহেব বলিয়াছেন—

"Money, leasure and easily accessible cafes are the menace of right nutrition."

"অর্থের স্বচ্ছলতা, অবসর এবং সহজগম্য হোটেল, এইগুলি সমুচিত পুষ্টির আশঙ্কাস্থল।"

তাঁহার পরীক্ষায় আরও প্রকাশিত হইয়াছে যে উপযুক্তভাবে আহার চর্ব্বণ করিলে মলের অল্পতা ঘটে, উহাতে দুর্গন্ধ থাকে না কারণ খাদ্য ভালভাবে হজম হইলে অধিক পরিমাণে অপাক মল বাহির হয় না। উহাতে অন্ত্রাদির ক্রিয়ারও লাঘব হয়।

ফ্লেচার সাহেবের বয়স যখন ৫০ বৎসর তখন তাঁহার জন্মতিথিতে তিনি বাইসিকিলে ২০০ মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু তজ্জন্য ক্লান্তি বা দুর্ব্বলতাবোধ করেন নাই। তাঁহার যখন ৫৮ বৎসর বয়স, তিনি ইয়েল জিমন্যাষ্টিক বিদ্যালয়ে ডান পায়ের হাঁটুর নিম্নের পেশীর উপর ভর দিয়া ৩০০ পাউণ্ড (কিছু কম ৪ মণ) ভার ৩৫০ বার তুলিয়াছিলেন। সে সময়ের ঐ বিদ্যালয়ে উহা সর্ব্বোচ্চ রেকর্ডের প্রায় দ্বিগুণ। ইহার পর আর তিনটী পরীক্ষায় তিনি ভারোত্তলনের পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ রেকর্ড অতিক্রম করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি মাত্র দুইবার আহার দিনে ও রাত্রে বিধিমত চর্ব্বণ করিয়া গ্রহণ করিতেন। কখন কখন কঠিন পরিশ্রম যথা ৮ ঘণ্টা লেখা ও ১০।১২ মাইল বাইসিকিলে পরিভ্রমণ সত্ত্বেও দিনে মাত্র একবার আহার গ্রহণ করিতেন। তখন তাঁহার একবারের আহারের খরচ মাত্র ১১ সেণ্ট অর্থাৎ ৵১০ ছিল!

৬৪ বৎসর বয়সে তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ ছিল এবং তখন ৪০ বৎসর বয়স্ক অপেক্ষা অধিক কর্ম্ম করিতে পারিতেন, কদাচ সর্দ্দি বা ঠাণ্ডা লাগিত এবং শরীরে দুর্ব্বল ভাব বোধ হইত। রাত্রে বিছানায়

বালিসে মস্তক রাখিবা মাত্র প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইতেন এবং মাত্র ৪॥ ঘণ্টা হইতে ৫ ঘণ্টা কাল নিদ্রা যাইতেন।

তিনি দেখিয়াছেন যে বিধিমত চর্ব্বণে আহার অতি অল্প সময়ে পরিপাক হয়। তিনি ৩৫ মিনিট কাল ব্যাপী আহার গ্রহণের পর কোন অসচ্ছন্দ বোধ না করিয়া দৈহিক ও মানসিক শ্রমকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিতেন। তিনি দিবসে আহারের পর অল্প সময় বিশ্রাম করিতেন।

তিনি আর একটী সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন যথা, খাদ্যের আমিষ উপাদানের পরিমাণ শরীর ধারণের পক্ষে দিনে মাত্র ৫।৬ ড্রামই যথেষ্ট। ইহা বৈপ্লবিক উপপত্তি বলিয়া মনে হইবে কারণ আধুনিক পুষ্টিতত্ত্ববিদগণের মতে ঐ উপাদান উহার অনেক অধিক প্রয়োজন।

ফ্লেচার সাহেব উপযুক্ত চর্ব্বণ করিলে যে সব উপকার হয় বলিয়াছেন তাহা বস্তুতই বিস্ময়কর। উক্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা কথিত অনেক উপকার যে অল্প বিস্তর লাভ করা যাইতে পারে তাহা আমরা পরীক্ষা করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি। আহার উপযুক্তভাবে চর্ব্বণ করিয়া খাইলে পুষ্টিকারীতা যে বাড়ে তাহার প্রধান কারণ মুখের লালারসের আধিক্য, এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বিশেষতঃ অধিকক্ষণ চিবাইয়া যে অপূর্ব্ব তৃপ্তি বা ভোজনাস্বাদ সুখ লাভ হয় তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঐ প্রকার ভোজনে যে কাম প্রবৃত্তি দমিত হয়, আমিষ ও মদ্যপানের স্পৃহা কমিয়া যায় বা অন্তর্হিত হয় এবং মলের পরিমাণ কমিয়া যায়, অর্দ্ধেক পরিমাণ খাদ্যে অধিক পরিমাণ পুষ্টিলাভ হয় এই নব আবিষ্কৃত সত্যগুলি বস্তুতই অমূল্য। সবচেয়ে বড় কথা, উক্ত বিধি পালন করিলে অর্দ্ধেক পরিমাণ আহারে অধিক পরিমাণ পুষ্টিলাভ ও পরিপাক যন্ত্রের যথেষ্ট বিরাম লাভ হয়

এবং ত্বরিত আহার জনিত বুকজ্বালা বা অম্লোদ্গার নিবারিত হয়। অধিকন্তু ইহাতে সংসারের অর্দ্ধেক আহারের ব্যয় কমিবে, রোগ কমিবে, রোগ-প্রতিষেধক শক্তি বাড়িবে যাহা দীর্ঘজীবন লাভে বিশেষ সহায়তা করিবে।

ফ্লেচার সাহেব গৃহীত খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। উপযুক্ত হিতকর খাদ্য নির্ব্বাচিত না হইলে অহিতকর খাদ্য চর্ব্বণের কোনই সার্থকতা থাকে না। ইহা বিশেষ উপলব্ধি করিতে হইবে। আক্ষেপ হয় যদি বাল্যে উপরোক্ত আহার-বিধির সম্যক জ্ঞান ও পালনের শিক্ষা পাইতাম তাহা হইলে পরিণত বয়সে স্বাস্থ্যের দুর্দ্দশা ঘটিত না। সকল আহার-বিধির উপর উক্ত চর্ব্বণবিধি আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অতএব লেখকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যেন উহা সকলে অন্যতম ব্রতের ন্যায় গ্রহণ ও পালন করেন।

একাদশ অধ্যায়।

নিরামিষ আহার।

খাদ্য-বিজ্ঞান মতে কি উদ্ভিজ্জ কি প্রাণীজ প্রায় সকল প্রকার আহার্য্যের একটী অন্যতম উপাদান "আমিষ"। কিন্তু তাই বলিয়া দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত পদার্থগুলি ঠিক আমিষ পর্য্যায়ে পড়ে না। ডিম, মাছ বা মাংসকে সাধারণতঃ আমিষ খাদ্য বলিয়া পরিগণিত করা হয়। এইজন্য এই পুস্তকে ফল, উদ্ভিজ্জ, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাতীয় আহার্য্য যাহা শাস্ত্রমতে সাত্বিক আহার শ্রেণী ভুক্ত, তাহাদিগকে নিরামিষ আহার এবং মাছ, মাংস, ডিম্বাদি প্রাণীজ খাদ্যকে আমিষ পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে।

অধিকাংশ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আহারতত্ত্ববিদ মনীষীগণের মতে নিরামিষ আহারই শ্রেষ্ঠ আহার। ইহা গ্রহণে সুস্থদেহ ও দীর্ঘজীবন সাধারণতঃ লাভ করা সম্ভবপর। কিন্তু ঐ সঙ্গে যদি স্বাস্থ্য বা আহারনীতি বা বিধিগুলি সম্যক প্রতিপালিত না হয় তাহা হইলে ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট হয়।

উপযুক্ত খাদ্যনির্ব্বাচনের দোষ, বিধিমত চর্ব্বণের অভাব, অতিরিক্ত শ্বেতসার বা স্বল্প লবণজাতীয় উপাদান সেবন, মিশ্র বা বিরুদ্ধ ভোজন, পরিপাকশক্তির অধিক খাদ্যগ্রহণ, ইত্যাদি বহু কারণে নিরামিষাহারীদেরও অজীর্ণ, বাত, বহুমূত্র, শূল, চর্ম্মরোগ ইত্যাদি জন্মে তাহা অহরহ দেখিতে পাওয়া যায়।

সুতরাং নিরামিষাহারের পূর্ণ উপকারীতা লাভ করিতে হইলে ঐ সকল দোষ যাহাতে না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া সর্ব্বদা প্রয়োজন।

দুধ ও ফল সকল আহার্য্যের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া উহাদের বিষয় প্রথমে আলোচিত হইবে।

দুগ্ধ

মহাকবি গেটে বলিয়াছেন—

"Milch ist ein ganz besondrer saft."

"দুগ্ধ বাস্তবিকই অমৃত কল্প রস।"

অন্য এক জন মনীষী বলিয়াছেন—

"Milk and blood differ in nothing but their color."

"দুধ ও রক্তের কোন পার্থক্য নাই কেবল বর্ণে।"

"দুইশত বর্ষ আগে
একদিন গাঙ্গিনীর তীরে,
অন্নপূর্ণা বলিলেন, খেয়া পাটিনীরে,
"বর মাগ যাহা খুসী ;"
পাটিনী মাগিল জোড় হাতে
আমার সন্তান যেন চিরদিন
থাকে দুধে ভাতে।"

"দুধ শিশুর জীবন, বালক বালিকা এবং যুবক যুবতীর স্বাস্থ্য এবং বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার শক্তি, উহা আজীবন বা আমরণ সঞ্জীবনী সুধা।"

দুগ্ধের আয়ুর্ব্বেদোক্ত সাধারণ গুণ স্নিগ্ধকর, সারক, সদ্য শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, সকল জীবের আত্মানুকুল, শ্রমহর, অগ্নি-উদ্দীপক, পুষ্টি, বল ও ত্রিদোষ সাম্যকর, বয়ঃস্থাপক, ক্ষয়পূরক, মেধাকর, ওজঃ, রস ও রক্তাদি সপ্ত ধাতুবর্দ্ধক, আয়ুস্কর এবং রসায়ন।

উপবাসের পর, অধিক পরিশ্রম বা পথশ্রমে ক্লান্ত হইলে, বক্তৃতা বা কথকতার পর এবং সংসর্গের পর গরম দুধ আস্তে আস্তে চাকিয়া পান করিলে দেহ ও মন সদ্য সঞ্জীবিত হয়।

দুধ একটী পূর্ণ খাদ্য। কেবলমাত্র উহা সেবনে জীবন ধারণ সম্ভবপর। উহাতে আমাদের শরীর পোষণোপযোগী সকল উপাদান এবং পাঁচটী ভিটামিন আছে। একজন রসায়ন তত্ত্ববিদ (Moles clott) বহু গবেষণার পর প্রমাণ করিয়াছেন যে খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলির প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ যাহা মানব দেহ ধারণের জন্য প্রয়োজন তাহা দুগ্ধে ঠিক সেই পরিমাণে আছে, ইহা বস্তুতই বিস্ময়কর। অবশ্য বিভিন্ন জন্তুর দুগ্ধে উহার তারতম্য আছে। সেই জন্য অবস্থা ভেদে যাহার যে প্রকার দুগ্ধ উপযোগী তাহা সেবিত হইয়া থাকে।

নিম্নে বিভিন্ন দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পদার্থের বিভিন্ন জাতীয় উপাদান-গুলির প্রত্যেকটী শতকরা কত থাকে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

	আমিষ	স্নেহ	লবণ ঘটিত	শর্করা ও শ্বেতসার
গো দুগ্ধ	৩'৩ হইতে ৩'৩৭	৩'৬ হইতে ৪'২৮	০'৭	৪'৮
মহিষী ,,	৮'৮	৮'৮	০'৮	৫'১
ছাগী ,,	৩'৭	৫'৬	০'৮	৪'৭
নারী ,,	১'০	৩'৯	০'৩০	৭'০
গর্দ্দভী ,,	১'৭৯	১'০২	০'৫০	৪'০
ঘোটকী,,	১'৯৯	১'১৭	?	৫'৭০
দধি ,,	২'৯	২'৯	০'৬	৩'৩
ছানার জল	০'৮	১'১	০'১	০'৫
সন্দেশ	১৮'১৭	১৯'৭৫	১'৫৫	৪০'১৮
ছানা	২৪'১	২৫'১	৪'২	৬'০
খোয়া ক্ষীর	১৪'৬	৩১'২	৩'১	২০'৫

শেষোক্ত তিনটী দ্রব্যে জল বাদ পড়ে বলিয়া উহাদের কঠিনাংশের বিভিন্ন উপাদানগুলির শতকরা পরিমাণ জল সুদ্ধ দুগ্ধের অপেক্ষা অনেক অধিক সেই জন্য ঐ তিনটী সুপাচ্য নয়।

দুগ্ধে লবণ ঘটিত পদার্থের মধ্যে পটাস, ফসফরাস, চূণ, ক্লোরিণ ও ম্যাগনেসিয়াম অধিক পরিমাণ আছে, উপরন্তু সামান্য পরিমাণ লৌহ, তাম্র, দস্তা, অ্যালিউমিনাম, সিলিকন এবং অতি সূক্ষ্ম পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ, বোরণ, টিটেনিয়াম, ভেলেনিয়াম, লিথিয়াম, ষ্ট্রন্‌সিয়াম, রুবিডিয়াম প্রভৃতি রাসায়নিক পরীক্ষায় পাওয়া গিয়াছে। এই সকল পদার্থ গোগণ তাহাদের আহার্য্যের সহিত গ্রহণ করে। তবে স্থান, কাল ও পাত্র হিসাবে উহাদের কোন কোনটীর অভাব হয় এবং পরিমাণ কম বেশী হয়।

আজকাল কলের মাজা চালের ফেন গালা ভাত, কলের আটা ও ময়দা এবং খোসা ছাড়ান তরকারী ব্যবহার জন্য যে লবণ ঘটিত পদার্থের অপচয় হয় তাহা দুগ্ধ পানে বা ফল ও মসলা সেবনে অনেকাংশে মিটিতে পারে।

দুগ্ধ পরিপাক করিতে, অন্য আমিষ প্রধান খাদ্যের ন্যায় অধিক পাচক রস ব্যয়িত হয় না। দুগ্ধে জলীয় অংশের পরিমাণ অধিক থাকিলেও উহার অবশিষ্ট কঠিন অংশ যাহার ওজন শতকরা ১০ ভাগ মাত্র তাহাতে যে আমিষ, স্নেহ ও খনিজ লবণ আছে তাহার খাদ্য মূল্য অন্য খাদ্যের ঐ ঐ উপাদানের মূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক বলিয়া পরীক্ষায় প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ দুগ্ধের ঠিক সম পরিমাণ উক্ত কঠিন উপাদানগুলি অন্য খাদ্য হইতে গৃহীত হইলে শেষোক্ত পদার্থ দুগ্ধ অপেক্ষা কম পুষ্টিকর হয়। ইহার প্রধান কারণ দুধের কতকাংশ শরীরে সদ্য শোষিত বা গৃহীত হয়।

দুগ্ধের নানা ওষধি গুণ আছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে দুগ্ধ জীর্ণজ্বর, মনোরোগ, পাণ্ডু, শোষ, মূর্চ্ছা, দাহ, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, শূল, গুল্ম, উদাবর্ত্ত, বস্তিরোগ, অর্শ, রক্তপিত্ত, অতিসার ও যোনী রোগ এবং শ্রম, ক্লম, গর্ভস্রাব, ক্ষত, ক্ষীণতা ও ক্ষুধাতুরতায় হিতকর।

পল্লীগ্রামের গরু, মহিষ ও ছাগাদি অনেক ওষধি গুণ সম্পন্ন ভিটামিন পূর্ণ তৃণ ও উদ্ভিজ্জ আহার করে বলিয়া উহাদের দুধ সহরে পালিত খড় খোল ভূসি ভক্ষণকারী ঐ ঐ জন্তুদের দুধ অপেক্ষা অধিকতর গুণশালী। কতিপয় জন্তুর দুগ্ধের বিভিন্ন রোগ নাশিনী শক্তি পরে ব্যক্ত হইবে।

সকালে খালি পেটে ঈষদুষ্ণ দুধ আস্তে আস্তে চুমুক দিয়া খাইলে শরীর পুষ্ট, অগ্নি ও শুক্রবৃদ্ধি, মধ্যাহ্নে খাইলে অগ্নি ও বল বৃদ্ধি এবং কফ ও পিত্ত নাশ হয়, উহা রাত্রে পানে চক্ষুর কল্যাণ, বিরুদ্ধ-ভোজন প্রভৃতি বহুবিধ দোষের শান্তি হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

আধুনিক মতে পুরাতন অতিসার, হিষ্টিরিয়া, বাত ও বহুমূত্র রোগে দুধ, আহার ও ঔষধ। ধারোষ্ণ দুগ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা দেহের হিতকর। খালিপেটে দুধ গরম করিয়া খাইলে কাহারও কাহারও অপকার ঘটিতে পারে। সেই জন্য উহার সহিত কিছু মিসরি খাওয়া কর্ত্তব্য।

বিভিন্ন প্রকার দুগ্ধের বিশেষ গুণাগুণ।

গো দুগ্ধ—আয়ুর্ব্বেদমতে অন্য সকল জন্তুর দুগ্ধাপেক্ষা গোদুগ্ধের উপকারীতা সমধিক। সবৎসা, উচ্চশৃঙ্গী বিশেষতঃ তৃণভোজী গাভীর দুগ্ধ প্রশস্ত। আবার সুলক্ষণা কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধ অধিকতর মিষ্ট, ত্রিদোষ নাশক ও বাতহারী, উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কাল গরুর দুধে সাদা জবাফুল বাটিয়া স্তনের উপর লেপনে পতিত স্তন পুনরায় স্থূল, উন্নত ও সুশ্রী হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

শ্বেতবর্ণের গাভীর দুধ অপেক্ষাকৃত গুরুপাক, মতান্তরে শ্লেষ্মাজনক। লোহিত ও মিশ্রিত বর্ণের গাভীর দুধ বায়ুনাশক এবং পীত বর্ণের দুধ পিত্ত ও বায়ুনাশক। গাভীর ও বৎসের এক বর্ণ হইলে দুধ সমধিক অপেক্ষাকৃত গুণসম্পন্ন হয়। বালবৎস্যা বা বৎসহীনার দুধ নিকৃষ্ট। প্রথম বিয়ানের এবং বৃদ্ধা গাভীর দুগ্ধ অধিক ক্ষারগুণ বিশিষ্ট, লবণাক্ত এবং সারহীন। মধ্য বয়সে প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন।

গাভী ও অন্যান্য দুগ্ধদাত্রী জন্তুর বাসস্থান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জলহাওয়া, সূর্য্যালোক প্রাপ্তির তারতম্য ইত্যাদি কারণে উহাদের দুগ্ধের খাদ্যবীর্য্যাংশ ও গুণের ব্যতিক্রম হয়। যাহারা রৌদ্রে চরিয়া কাঁচা ঘাস ও অন্য উদ্ভিজ্জাদি আহার করে তাহাদের দুগ্ধে পাঁচটী ভিটামিন পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। অন্ধকার ও বায়ুচলাচলহীন অস্বাস্থ্যকর গোশালায় আবদ্ধ গৃহপালিত গো মহিষাদি এবং অসূর্য্যস্পশ্যা রমণীগণের স্তনদুগ্ধে এ, সি ও ডি ভিটামিন অতি অল্প থাকে তাহা প্রসূত সন্তানগণের স্বাস্থ্যের দুর্দ্দশা সূচিত করে।

গো দুগ্ধের একটী বিস্ময়কর অভিনব তথ্য প্রোফেসার বোয়োডিকার অনেক গবেষণায় পর প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি দিনের বিভিন্ন সময়ের দুগ্ধ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে সন্ধ্যায় দোহিত দুগ্ধে প্রাতের দুগ্ধাপেক্ষা জলীয় উপাদানের পরিমাণ শতকরা ৩ ভাগ অল্প থাকে অর্থাৎ উহার অন্য উপাদানগুলি শতকরা ৩ ভাগ অধিক থাকে। আর দুগ্ধের মাখমের পরিমাণ প্রাতে শতকরা ২$\frac{1}{2}$, দ্বিপ্রহরে ৩$\frac{1}{2}$ ও বিকালে ৫$\frac{1}{4}$ ভাগ থাকে। কেসিন বা ছানার পরিমাণ সকাল অপেক্ষা বিকালে শতকরা ২$\frac{1}{2}$ হইতে ২$\frac{3}{4}$ ভাগ বেশী কিন্তু অণ্ডলালার (Albumen's) পরিমাণ দিনের বৃদ্ধির সহিত কমিতে থাকে, শর্করার পরিমাণও দিনের শেষ ভাগে কমিতে থাকে কিন্তু লবণের পরিমাণ দিনের কোন সময়ে তারতম্য হয় না। আর একটী

বিষয় উল্লেখযোগ্য, বর্ষাকালের দুগ্ধে শীতকাল অপেক্ষা অধিক জল এবং অল্প ননী থাকে।

৮ তোলা গোদুগ্ধের সহিত ২ তোলা মেথি পিষিয়া ২১ দিন প্রাতে সেবনে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, অকাল প্রসব প্রভৃতি দোষ নিবারিত হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মহিষ দুগ্ধ—আয়ুর্ব্বেদ মতে মহিষদুগ্ধ গব্যদুগ্ধ অপেক্ষা অধিক মধুর, স্নিগ্ধ, শুক্রকর, ক্ষুধাধিক্যকর, শীতবীর্য্য কিন্তু অধিক গুরুপাক। শেষোক্ত কারণে যাহাদের পাচকশক্তি প্রবল তাহাদের পক্ষেই মহিষ দুগ্ধ উপযোগী। উহা সেবনে শরীরে জড়তা ও তন্দ্রা আসে। যাহাদের পরিপাকশক্তি দুর্ব্বল, শিশু, স্ত্রীলোক, রোগী, শ্লেষ্মল, বৃদ্ধ, স্থূলকায়, যাহারা অধিক পরিশ্রমে কাতর, তাহাদের পক্ষে গো বা ছাগ দুগ্ধই অধিক উপযোগী।

ছাগ দুগ্ধ—ইহা কষায়, মধুর, শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, লঘু, রক্ত-পিত্ত, মেহ, অর্শ, পৈত্তিকতা, অতিসার, জ্বর ও ক্ষয় রোগে হিতকর। রুগ্ন শিশুর দেহের পুষ্টি বিধানে ইহা অসীম কার্য্যকরী। যক্ষ্মা রোগীকে ছাগ সংস্পর্শে থাকিবার ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ছাগ দুগ্ধে যক্ষ্মার বীজাণু বাঁচে না বা থাকে না বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শিশুদের বিশেষতঃ যে সকল শিশু যকৃৎ রোগ প্রবণ তাহাদের পক্ষে এই দুগ্ধ আদর্শ আহার।

ছাগ বা অন্য দুগ্ধ আবৃত পাত্রে রাখিয়া জলপূর্ণ কড়ায় সিদ্ধ করিলে সমধিক গুণসম্পন্ন হয়। ছাগ দুগ্ধ শরীরের স্বাভাবিক তাপে ছানা বা দানা বাঁধে না সুতরাং সহজপাচ্য। উহার অম্লত্ব গোদুগ্ধ অপেক্ষা কম। ডাঃ রজনীকান্ত মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন মোটা অপেক্ষা রোগা ছাগীর দুগ্ধ অধিক উপকারী। এইগুলি ছাগ দুগ্ধের বিশেষত্ব।

ছাগ দুগ্ধে আমিষ ও স্নেহজাতীয় উপাদান নারীর স্তনদুগ্ধ অপেক্ষা অনেক অধিক আছে। সেইজন্য পূর্ব্বোক্ত দুগ্ধে অন্ততঃ সম পরিমাণ জল দিয়া শিশুদের সেবন করান কর্ত্তব্য।

"Goat is poor man's cow"

"ছাগী গরিবের গরু।"

অনেক গরিব গৃহস্থেরা অতি যত্ন করিয়া ছাগল পোষে। আজকাল বিশুদ্ধ গোদুগ্ধের যেরূপ অভাব, প্রতি গৃহস্থের ছাগ পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। এক সময় আমাদের বাটীতে একটী ছোট পাঁটী সখ করিয়া পোষা হইয়াছিল। যখন সে সন্তান প্রসব করিল, তাহার দুধ কেহই খাইতে চায় নাই, কারণ এই দুগ্ধে স্বভাবতঃ একটা বোট্‌কা গন্ধ থাকে। তখন আমার ও মধ্যম ভ্রাতার দুজনেরই শরীর পাকতাড়া ছিল আমরা সেই দুধ বিনা দ্বিধায় খাইয়াছিলাম। ৬ মাস বাদে আমাদের শরীরের ওজন প্রত্যেকের ১০।১২ সের বাড়িয়াছিল।

ছাগলনাদি ভস্ম মাখমের সহিত মিশাইয়া দূষিত বা পারার ক্ষতে লাগাইলে ক্ষত আরাম হয়। ছাগ দুগ্ধ আতপ চালের চেলেনি জলে মিশাইয়া সেবনে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। জাম পাতার রস ও ছাগ দুধ আমাশার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মেষ দুগ্ধ—ইহা জিহ্বা ও মুখ ক্ষতে উপকারী। বহুমূত্র, পিত্ত-শিলা ও অন্যান্য পাকস্থলীর রোগে ইহা ব্যবস্থিত হয়। ইহা শুক্র গাঢ় করে। মধুর সহিত খাইলে ইন্দ্রিয় ও প্রজনন শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

মাথার চুল উঠিতে থাকিলে উহা পানে কেশমূল সুদৃঢ় হয় কিন্তু অধিক সেবনে পিত্ত ও কফ বর্দ্ধিত হয় এবং পরিপাকের ব্যাঘাত করে। ইহা সেবনে হুপ কাসিতে বিশেষ উপকার হয়। ঠাণ্ডা দুধ অপকারক। গরম থাকিতে পান করা কর্ত্তব্য।

হস্তী দুগ্ধ—ইহাতে পুষ্টিকর পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া সুপাচ্য নয় কিন্তু উপযুক্ত পরিপাকশক্তি থাকিলে ইহা স্নায়ু-উত্তেজক এবং ইন্দ্রিয় ও জীবনীশক্তি বৰ্দ্ধক এবং চক্ষুরোগে বিশেষ উপকারক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

উষ্ট্র দুগ্ধ—ছাগ দুগ্ধের ন্যায় ইহা অনেক ঔষধিগুণসম্পন্ন। ইহা ক্রিমি, কাসি, শ্বাসনলী এবং নিম্নোদরের প্রদাহ ইত্যাদি রোগে হিতকর।

ঘোটকী দুগ্ধ—ইহা প্রায় গাধার দুধের সমতুল্য উপকারী এবং অতিশয় শীতবীর্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। রুষিয়ার কৃষকগণ ইহা আগ্রহের সহিত সেবন করে। মতান্তরে ইহার সেবন অবিধেয়।

গাধার দুধ—যে প্রসূতিদের স্তনে দুগ্ধ থাকে না বা উহা রোগ দূষিত হয় তাহাদের শিশুগণকে এই দুধ খাইতে দেওয়া হয়। উহা স্তনদুগ্ধ অপেক্ষাও সহজপাচ্য, শীত-বীর্য্য, উপদংশ, মূত্রস্থলীর প্রদাহে বা প্রস্রাবের পীড়ায়, ক্ষয়, বায়ু ও শ্বাসরোগে ব্যবস্থিত হয়। উহা দুর্ব্বল শিশুদের শ্লেষ্মা প্রশমিত, অগ্নিবল বৃদ্ধি ও যকৃত দোষ নিবারণ করে। গাধার দুধ মাই দুধের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

হরিণের দুধ—শীতল, লঘুপাক, মলরোধক, জ্বর, কাস, রক্তাতিসার ক্ষয়, পিত্তবিকার ও সান্নিপাত দোষে হিতকর।

নারীর দুগ্ধ—লঘু, শীতল, অগ্নি-উদ্দীপক, বাতপিত্ত প্রশমক, চক্ষু, কর্ণশূল ও অভিঘাত নাশক এবং নানাপ্রকার চক্ষু প্রদাহের মহৌষধ। দীর্ঘ দিন যাবত বার বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ইহার প্রলেপ চক্ষু প্রদাহ রোগে, অধিকাংশস্থলে অব্যর্থ উপকার করে। শয়ন করিয়া ২।১ ফোঁটা মাই দুধ (দিনে ২।৩ বার) দুই চোখের ভিতর দিয়া চোখ বুজিয়া থাকিলে দূষিত জলীয় পদার্থ নিষ্কাশিত হয়।

ঐ সঙ্গে নীল রঙের শিশিতে জল ৪।৫ ঘণ্টা কাল রৌদ্রে রাখিয়া সেই জলে একবার বা দুইবার চোখ ধুইয়া ফেলিলে সমধিক উপকার হয়।

শিশুর সর্ব্বোত্তম আহার নির্দ্দোষ মাইদুধ। ইহা বাহিরের বাতাসের দূষিত বীজাণু বা জীবাণুর সহিত মিলিত হয় না এবং সদ্যদোহিত গোদুগ্ধের ন্যায় ঈষৎ উষ্ণ থাকে বলিয়া শীঘ্র পরিপাক হয়। কিন্তু অপর সকলের পক্ষে উহা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

খাঁটি গরুর দুধ শিশুদের উপযোগী নয় কারণ উহাতে অধিক মাত্রায় আমিষ জাতীয় উপাদান আছে যাহা দুষ্পাচ্য। আবার মাইদুধ অপেক্ষা উহাতে অল্প মাত্রায় শর্করা আছে বলিয়া শিশুদের পক্ষে তত পুষ্টিকর নয়। যদি বিশুদ্ধ মাইদুধের অভাব হয় এবং ছাগল কিংবা গাধার দুধ পাওয়া না যায়, তাহা হইলে বয়স হিসাবে, গরুর দুধের সহিত চার, তিন বা দ্বিগুণ ফোটান জল ও কিছু মিসরি মিশাইয়া শিশুদের খাওয়ান যাইতে পারে। কিন্তু এই কৃত্রিম দুগ্ধ একেবারে দোষহীন নয় কারণ অনেক বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন অন্য দোষ ব্যতীত গোদুগ্ধ শিশুর অন্ত্রে গিয়া জমাট বাঁধে সুতরাং সহজপাচ্য নয়।

শিশুর ২ মাস বয়স হইতে দুধের সহিত মিষ্ট ফল বা লেবুর রস প্রতিবারে চা চামচের ২ চামচ মিশাইলে আরও উপকার হয়। ইহাতে ভিটামিন ডি-এর অল্পতা দোষও নিবারিত হয়।

গোদুগ্ধে ডি ভিটামিন স্তনদুগ্ধ অপেক্ষা সাধারণতঃ অল্প থাকে। সেক্ষেত্রে শিশুকে রৌদ্রে দিলে উহা তাহার দেহে সঞ্চিত হইতে পারে। রৌদ্র সেবনাভাব ও অবরুদ্ধ স্থানে আবদ্ধ থাকিবার ফলে অনেক প্রসূতির স্তনদুগ্ধেও ডি ভিটামিন কম থাকে। এইজন্য উহাদেরও নিত্য রৌদ্র সেবন ও ডি ভিটামিনবহুল আহার্য্য বা ঐ ট্যাবলেট সেবন প্রয়োজন।

পেটেণ্ট মিল্ক—বিশুদ্ধ স্তনদুধ বা গোদুধ অভাবে বিলাতী জীবাণু ও বায়ু শূন্য টিনে রক্ষিত শুষ্ক দুধ শিশুদের হিতকর কি অহিতকর এ বিষয়ে কিছু মতভেদ আছে। কোন কোন নামজাদা স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ বলেন উহা শিশুদের অনুপযোগী। কিন্তু তাহা সুচিন্তিত বিজ্ঞান-সম্মত মন্তব্য বলিয়া মনে হয় না। মতান্তরে টাটকা গুঁড়া দুধ কাঁচা দুধ অপেক্ষা শীঘ্র হজম হয়।

বিভিন্ন প্রকার পেটেণ্ট দুধের পরীক্ষালব্ধ শতকরা বিভিন্ন জাতীয় উপাদানের পরিমাণ ডাঃ রমেশচন্দ্র রায়ের ইংরাজী স্বাস্থ্য-পুস্তক হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

	আমিষ	স্নেহ বা চর্ব্বি	শ্বেতসার	খনিজ পদার্থ
এলেনবারি ১নং দুধ	৯'৭	১৪'০	৬৬'৮৫	৩'৫০
„ ২নং „	৯'২	১২'৩	৭২'১	„
„ ৩নং „	৯'২	১'০	৮২'৮	„
হরলিক্স মলটেড দুধ	১৩'৮	৯	৭০'৮	২'৭০
গ্ল্যাক্সো	২২'২	২৭'৪	৪১'০	অজ্ঞাত
মিলো ফুড	১৪'৪	৫'২	৭৫'৩	অজ্ঞাত
মেলিনস্ ফুড	৭'৯	?	৮২'০	৩'৮০
বেঙ্গার্স ফুড	১০'২	১'২	৭৯'৫	১'৮০
নেসলস্ ফুড	৯'৮৫	৩'৬৭	৭৯-৬১	১-০
সুইস দুধ	৯'৯৩	৮'৮৫	৬৩'৭০	অজ্ঞাত
রবিনসন পেটেণ্ট বার্লি	৫'১	০'৯	৮২-০	১'৯০
শটির পালো	০'৪৯	০'৬৮	৭৯-০	০'৩৪

শেষোক্ত দুইটী খাদ্য পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ঐগুলি সর্ব্বাপেক্ষা সহজপাচ্য। পেটেণ্ট দুধে আমিষাদি উপাদানের পরিমাণ গোদুগ্ধ

অপেক্ষা অনেক অধিক তাহার কারণ উহাতে জলের পরিমাণ অনেক কম থাকে।

পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষালব্ধ ফলে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে পুরাতন আমদানী, টিনে রক্ষিত বিলাতী ফুড বা দুধ আপত্তিকর। এই জন্য নূতন আমদানী কাঁচের পাত্রে রক্ষিত ফুড শীতল স্থানে রাখিয়া ব্যবহার করা উচিত। এলেনবারি ৩ নং ও বেঙ্গার্স্ ফুড এবং শটী রোগীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

শটী সম্বন্ধে অনেকের ধারণা উহা নির্দ্দোষ ও পুষ্টিকর, স্বদেশী ও সুলভ শিশু খাদ্য কিন্তু পূর্ব্বপ্রদত্ত তালিকা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে উহার খাদ্যমূল্য অন্যান্য ফুড বা দুগ্ধ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সুতরাং উহা অতি রুগ্ন শিশুর উপযোগী, সুস্থ শিশুকে অন্য দুগ্ধের পরিবর্ত্তে উহা নিত্য খাওয়াইলে স্বাস্থ্যহীনতা অনিবার্য্য।

গ্ল্যাক্সো ছাগী ও গর্দ্দভী দুগ্ধের ন্যায় আদর্শ শিশু খাদ্য। আমাদের পরিবারভুক্ত ২০।২৫ জন শিশুকে যখন ছাগ দুগ্ধের অভাব হইত তখন গ্ল্যাক্সো সেবন করান হইয়াছে। উপকার ভিন্ন কোন ক্ষেত্রে অপকার হয় নাই।

যে সকল জমান দুধে অধিক পরিমান চিনি আছে তাহা অহিতকর। অশর্কর দুধের গুঁড়াই শিশুদের পক্ষে উপযোগী। ইহার সহিত মিষ্ট ফলের রস সংযোগ প্রয়োজন নচেৎ উপযুক্ত পরিমাণ সি ভিটামিনের অভাব হয়।

আজকাল পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে পেটেণ্ট ফুড শিশু খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। অবশ্য উহা বিশুদ্ধ স্তনদুগ্ধের সমান উপকারী নয় তবে অবিশুদ্ধ বাজার চলিত গোদুগ্ধ ও দূষিত স্তন দুগ্ধের

পরিবর্ত্তে বোতলে রক্ষিত উক্ত খাদ্য শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন কোথাও কিছু নাই হঠাৎ শিশুগণ কঠিন বমন, অতিসার ও আমাশাদি রোগে আক্রান্ত হয়, তাহার একমাত্র কারণ দূষিত বা বিকৃত দুগ্ধ। একজন বহুদর্শী চিকিৎসক (ডাক্তার হার্ট) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে এক স্থানে দুগ্ধের অন্তর্নিহিত বীজাণুর দ্বারা কতকগুলি লোক স্কার্লেটজ্বর, টাইফয়েড বা রোহিণী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল।

কাঁচা গোদুগ্ধ যদি বিশুদ্ধও হয় উহা বার বার গরম করিয়া শিশুদের বা বালক বালিকাদের সেবন করাইলে উহার বীজাণু সংখ্যা ক্রমে অতিরিক্ত বাড়িয়া যায় বলিয়া অনিষ্টকর হয়। এ আপত্তি প্যাষ্ট-রাইজড্ দুধ সম্বন্ধেও খাটে। গুঁড়া দুধ এ সম্বন্ধে নির্দ্দোষ। সম্প্রতি ন্যাশানাল নিউট্রিমেণ্ট (জাতীয় পুষ্টি) সমিতি গুঁড়া দুধের একটী বৃহৎ প্রতিষ্ঠান কলিকাতার নিকট স্থাপিত করিয়াছে। এ দুধ বিলাত হইতে আনীত দুধ অপেক্ষা অনেক টাট্কা। এই কোম্পানী ঐ সঙ্গে ভিটামিল্ক শিশু সমিতিও স্থাপন করিয়াছে। প্রথমে ২০০০ শিশুর পালন ভার ঐ সমিতি গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছে। সমিতির ধাত্রী ও চিকিৎসক মাসে অন্ততঃ একবার ঐ দুগ্ধসেবী প্রত্যেক শিশুকে প্রত্যক্ষ তদারক করিয়া উক্ত দুগ্ধের মাত্রা ও সেবন ব্যবস্থা দিবে উপরন্তু যদি হজমের গোলমাল হয় তাহার প্রতিকারার্থে চিকিৎসক পাঠাইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবে। যদি কথা মত কাজ হয় তাহা হইলে শিশু দুগ্ধ সমস্যা অনেকাংশে মিটিতে পারে। তবে এইরূপ বহু প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন।

মানব শিশুর ৮ মাস কাল যতদিন না দুগ্ধদন্ত বাহির হয় ততদিন দুধ তাহার প্রধান খাদ্য। গরুর বৎস এক পাটি দাঁত লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ২।৩ মাস পরে মাই দুধ ছাড়িয়া দেয়।

দুগ্ধজাত দ্রব্য।

দধি।

আয়ুর্ব্বেদ মতে দধি সাধারণতঃ গুরু, রুচি ও বলপ্রদ, অগ্নি-উদ্দীপক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, অম্লবিপাক, বায়ুনাশক, মলসংগ্রাহক কিন্তু রক্তপিত্ত, শোথ, কফ ও মেদবর্দ্ধক। মতান্তরে জ্বাল দেওয়া দুধের দধি ধাতু ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং বায়ু ও পিত্তনাশক। অসার বা মাখন তোলা দুধের দধি ধারক, শীতবীর্য্য, লঘু, অগ্নি উদ্দীপক, রুচিকর ও গ্রহণী রোগে বিশেষ হিতকর। জ্বর, কাসি, সর্দ্দি, কোষ্ঠ-বদ্ধতায় এবং বাত, অম্ল, রক্তপিত্তাদি রোগে দধি কদাচ হিতকর।

গব্য দধি সর্ব্বোৎকৃষ্ট; মহিষ দুগ্ধের দধি সুস্নিগ্ধ, শ্লেষ্মাকর, বাতপিত্তনাশক, শরীরের বিষাক্ত রস নিষ্কাসক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, কিন্তু রক্তদূষক (রাজ নির্ঘণ্ট)।

দধির জল বিরেচক কিন্তু জলঝরা শুষ্ক দধি ধারক। দধি অনেকক্ষণ থাকিলে টকিয়া যায়। উহা সেবনে বাত প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে। কিন্তু ঐ টক দধি কাপড়ে বাঁধিয়া উহার জল নিঙড়াইলে বা পুঁটলী কিছুক্ষণ ঝুলাইয়া রাখিয়া পরে উক্ত দধি সোডার জলে ধুইয়া ব্যবহার করিলে উহা তত বেশী টক হয় না এবং সেবনে ক্ষতিকর হয় না। ইহার সহিত সামান্য পরিমাণ লবণ ও কিছু চিনি মিশাইয়া সেবন করিলে রসায়নের কাজ করে। এ কথা গো তত্ত্ব বিশারদ শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার মহাশয় বলিয়াছেন।

শাস্ত্রমতে দধির সহিত অন্য কতকগুলি দ্রব্য মিশাইয়া সেবন করিলে অনেক দোষের শান্তি হয়, যথা গুড় মিশ্রিত দধি বায়ুনাশক ও শরীরের উপচয়কারক; মুগের যুষের সহিত সেবনে বায়ু ও রক্ত প্রকোপ

বিনষ্ট হয় ; আমলকীর রসের সহিত সেবনে কুপিত মল নিঃসৃত হয় ; মধুর সহিত সেবনে ত্রিদোষ নষ্ট হয়।

ভাব প্রকাশ মতে দধি প্রতিশ্যায়, বিষম জ্বর, অতিসার, অরুচি ও কৃশতায় প্রশস্ত।

দধি বা তক্রে সংক্রামক রোগের বীজাণু থাকিবার সম্ভাবনা দুধ অপেক্ষা অনেক কম। সেই জন্য দুধ অপেক্ষা দধি সাধারণতঃ অনেক নিরাপদ। দধি বা তক্রের অন্য বহুবিধ উপকারীতা আছে তাহা পরে বিবৃত হইবে।

দধি পাতিবার নিয়ম—ঈষদুষ্ণ বা আমাদের দৈহিক উত্তাপে, মতান্তরে ৮০° ফারেন হাইট তাপে জ্বাল দেওয়া খাঁটি দুধে পূর্ব্ব দিনের দধির সাঁজা (সেরে এক রতি) ভাল করিয়া মিশ্রিত করিলে উহা স্বাদু দধিতে পরিণত হয়। ছানার জলেও দধি পাতা যায়। জল দুধে দই ভাল বসে না। দুধ বেশী গরম করিয়া দই পাতিলে, কিম্বা সাঁজা বেশী টক হইলে কিম্বা অধিক সাঁজা দিলে দধিতে জল কাটে। সাঁজা যত ভাল হইবে দধি তত ভাল হইবে। মধ্যে মধ্যে টাটকা দধির সাঁজা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নচেৎ সমূহ অনিষ্ট হইতে পারে। ডাক্তারখানায় যে দুগ্ধাম্ল ট্যাবলেট (Lactic acid Tablet) পাওয়া যায় তাহা উৎকৃষ্ট সাঁজা। প্রসিদ্ধ ডাঃ শ্রী গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের দেশের জল বায়ুর উপযোগী এক প্রকার দধি-বীজ আবিষ্কার করিয়াছেন, উহা সুলভ ও উৎকৃষ্ট বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ঐ বীজ ডাঃ শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র বসুর ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

ঠাণ্ডার দিনে বা খুব শীত পড়িলে দই ভাল জমে না, সেইজন্য সে সময় রৌদ্রতাপে বা উনানের নিকট দধিপাত্র রাখিলে উহা ভালরূপে জমে। গোতত্ত্ববিদ শ্রী প্রকাশ চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন যে দুধে অল্প চিনি ও খড়ির গুঁড়া মিশাইয়া পাতিলে উহা শক্ত হইয়া বসে এবং টক হয় না। ইহা অধিকতর বলকর এবং অজীর্ণ, উদরাময়, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, অস্থিবিকৃতি, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে বিশেষ হিতকর এবং অস্থি, স্নায়ু ও বিধানতন্তু পোষক। ইহা সাধারণ নিয়মে প্রস্তুত দধি অপেক্ষা লঘুপাক এবং ইহাতে খড়ি (ক্যাল্‌সিয়াম ল্যাকটেট্) থাকায় আশু বল ও ফলদায়ক। দুধে কতকগুলি টাকা রাখিলে দধি জমিয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত সত্য।

মাটির বা পাথরের পাত্রে দধি পাতা প্রশস্ত। তবে পুরাতন পাত্রটী বেশ করিয়া ধুইয়া মাঝে মাঝে পোড়াইয়া লইতে হইবে নচেৎ দারুণ অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। ইহা বাতিকগ্রস্তের কথা নয়, ভুক্তভোগীর নিষেধ বাণী। মাটির বা পাথরের পাত্রের অভাবে কাঠ বা কাঁচের পাত্রে দধি জমাইলে কোন দোষ হয় না। কিন্তু ধাতু পাত্র বর্জ্জনীয়। অ্যালিউমিনাম পাত্রে দধি বসাইলে উহাদের সূক্ষ্ম অংশগুলি দধি টানিয়া লয়। বাজারের অ্যালিউমিনিয়াম বাসনে সিসা আছে যাহা আপত্তিকর। কিছুদিন পূর্ব্বে একটী সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে একস্থানে অ্যালিউমিনাম পাত্রে বসান দধি সেবনে কতকগুলি লোক মারা গিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন আহারের প্রথম গ্রাসের সহিত দধি সেবন করিলে পাচক রস সম্যক নিঃসৃত হয় এবং দধি ভোজনান্তে অনিষ্টকর। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে আহারের প্রথমে দধি ভোজন প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু আমাদের দেশে বহুকাল যাবত আহারের শেষে

বিশেষত; লুচি ও অন্য ঘৃতপক্ক দ্রব্য আহারের পর লোকে সাধারণতঃ দধি সেবন করে। ইহাতে অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না বরং উহা মিশ্রাহারের বা বিরুদ্ধ ভোজনের দোষ কতকাংশে নিবারণ করে।

ঘোল—সরের সহিত নির্জ্জলা দধি মন্থন করিয়া নবনীত উদ্ধার না করিলে ঘোল প্রস্তুত হয়। মিস্‌রির সহিত ঘোল পরম উপকারক, উহা ত্রিদোষনাশক ও রোগের উৎকৃষ্ট পথ্য, কেবল মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্ত রোগে নয়।

মথিত—ইহা সরবিহীন মথিত দধি, কফ ও পিত্তনাশক।

তক্র—দধি ও উহার চতুর্থাংশ জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে এবং তাহা হইতে মাখম তুলিয়া লইলে তক্র প্রস্তুত হয়। ইহার সাধারণ গুণ ধারক, লঘু, আগ্নেয়, শুক্র ও স্মৃতি বর্দ্ধক।

উদস্বিৎ—দধির সহিত উহার অর্দ্ধেক পরিমাণ জল মিশাইয়া মন্থন দ্বারা নবনীত পৃথক করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই উদস্বিৎ। ইহার বিশেষ গুণ, বলকারক ও অত্যন্ত শ্রমনাশক কিন্তু কফবর্দ্ধক।

ছচ্ছিকা—বহু পরিমাণ জলের সহিত মথিত মাখন তোলা দধি। ইহার বিশেষ গুণ লঘুপাক, পিপাসানাশক, শ্রমহারক, বায়ু ও পিত্ত প্রশমক কিন্তু কফকারক; লবণ মিশ্রিত করিলে অগ্নিবর্দ্ধক।

শাস্ত্রে উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকার দধির মধ্যে তক্র উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। হেমন্ত, শীত ও বর্ষাকালে দধি এবং শীতকালে তক্র প্রশস্ত। শাস্ত্রমতে তক্রপানে কোন শারীরিক ক্লেশ বা কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। দেবতার অমৃত পানের ন্যায় মানবের তক্র পান হিতকর। উহা জরাবিনাশক ও দীর্ঘজীবনপ্রদ রসায়ন বলিয়া কথিত

হইয়াছে। শিশুদেরও উহা পরম হিতকর, উহাতে দুগ্ধের সব ভিটামিন গুলি থাকে।

শীতকালে মন্দাগ্নিতে, বায়ুরোগে, অরুচিতে ও মলমূত্রাদি রুদ্ধাবস্থায়, স্বরদোষ, মুখপ্রসেক, বমি, বিষমজ্বর, পাণ্ডু, মেদরোগ, গ্রহণী, অর্শ, মূত্রাঘাত, ভগন্দর, প্রমেহ, গুল্ম, অতিসার, শূল, প্লীহা, উদরী, শ্বেতরোগ, কুষ্ঠ, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুরোগ, শোথ, পিপাসা ও ক্রিমিরোগে তক্র পরম কল্যাণকর। ক্ষতরোগে, দুর্ব্বলতা, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও রক্তপিত্ত রোগে তক্র সেবন নিষিদ্ধ।

দধি বা ঘোলে দুগ্ধের ছানা (কেসিন) ও স্নেহ (মাখম) জাতীয় উপাদান দুইটী পূর্ণ মাত্রায় থাকে বলিয়া রোগী বা যাহাদের পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল তাহাদের পক্ষে ঐ গুলি উপযোগী নয়; পূর্ব্ববর্ণিত বিভিন্ন দধির রূপান্তর গুলিতে অল্প বিস্তর ছানা ও মাখম থাকে। কিন্তু এই দুইটী পদার্থ মন্থন দণ্ড দ্বারা সূক্ষ্মতম অংশে বিভাজিত করিলে উহা পাকাশয় ও রক্তে শীঘ্র শোষিত হয়। এইজন্য দধি বা ঘোলের উক্ত দোষের মাত্রা অনেক কমিয়া যায়।

দুগ্ধের ছানা কাটান জল বা ছানার জল যাহাকে ইংরাজীতে হোয়ে (whey) বলে তাহাতে ছানা ও নবনীত ভাগ তক্র অপেক্ষাও অনেক কম থাকে। সেইজন্য অবস্থা বিশেষে, হোয়ে অধিকতর উপযোগী। আবার ছানার জলে আমিষ জাতীয় উপাদান শতকরা মাত্র ০·৮৫ ভাগ কিন্তু গোদুগ্ধ ও গব্য দধিতে উহা ৩ হইতে ৪ ভাগ থাকে। সুতরাং ছানার জল অপেক্ষাকৃত অধিক সুপাচ্য—অপদার্থ নয়।

সম্প্রতি পাশ্চাত্যদেশে হোয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রোগ-আরোগ্যকর ও দীর্ঘজীবনপ্রদ রসায়ন বলিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে।

উহা সেবনে রক্তকণিকা বর্দ্ধিত হয় এবং টনিক হিসাবে খনিজ লৌহঘটিত টনিক অপেক্ষা অধিক উপযোগী বলিয়া কথিত হইয়াছে। অনেক পুরাতন জটিল রোগগ্রস্ত লোকে কেবলমাত্র হোয়ে সেবনে রোগমুক্ত হইয়াছে। ইহা রোগীর ও ভোগীর উৎকৃষ্ট তৃপ্তি, পুষ্টি ও বলকর পানীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহা গণ্ডমালা, বালাস্থিগ্রহ পীড়া (Rickets) মূত্রাশয়ের পীড়া, কাসি, যকৃৎ, পরিপাক যন্ত্রের বিকৃতি, রক্তশূন্যতা, জ্বরঘটিত পীড়া, পুরাতন আমাশা, পাকাশয় ও অন্ত্র পীড়া বা ক্ষতে এবং রোগের পর দুর্ব্বলতা সারিতে বিশেষ উপকারী। যখন রোগী কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণে অক্ষম তখন হোয়ে সেবনে জীবনরক্ষা সম্ভবপর।

হোয়ে বা ছানার জল প্রস্তুত করিবার সহজ উপায়, যতখানি দুধ ততখানি জলে মিশাইয়া একটী পাতি লেবুর রস দিয়া কিছু গরম করিতে হইবে। বিশুদ্ধ টাটকা দুধে উহা প্রস্তুত হইলে অধিক উপকার হয়। ছানা কাটিবার পর উনান হইতে নামাইয়া কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লওয়া উচিত। যদি উহা হজমের ব্যাঘাত করে তাহলে দুই প্রস্থ কাপড় বা মোটা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। যদি ইহাতেও অসুবিধা হয়, ব্লটিং কাগজ দিয়া ছাঁকিবে।

পাশ্চাত্য দেশের বিখ্যাত অধ্যাপক ম্যাচ্‌নিকফ্‌ (Matchnikoff) অনেক গবেষণা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে জরা আনয়নকারী বীজাণুগণ আমাদের বৃহৎ অন্ত্রে বাস করে ও বংশ বৃদ্ধি করিয়া দেহকে জরাগ্রস্ত করে। তিনি বৃদ্ধের পুরীষ হইতে এই ক্ষয়কারী বীজাণুর বীজ (serum) প্রস্তুত করিয়া গরিলা ও বানরের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেখিয়াছেন যে তাহারা শীঘ্র বিকলাঙ্গ ও বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হইয়া অবশেষে মৃত্যুগ্রস্ত হয়।

ইহার প্রতিষেধক আবিষ্কারে তিনি ও তাহার দুইজন বন্ধু বুলগেরিয়া রাজ্যে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন ঐ রাজ্যের বহুলোক দীর্ঘজীবী। জনসংখ্যা ৩০ লক্ষ তাহার ভিতর ৩।৪ সহস্র শতায়ু, তাহারা অতি পরিণত বয়সেও কর্ম্মঠ ও স্বচ্ছন্দে কাজকর্ম্ম করে অর্থাৎ বয়সে বৃদ্ধ হইলেও আকারে, স্বাস্থ্যে ও স্ফূর্ত্তিতে যুবা। সেদেশে ১১০, ১১৫ ও ১২০ বয়স্ক অনেক লোক আছে।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে সেখানে বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই প্রত্যহ দই খায়। তিনি পরীক্ষা দ্বারা নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন বুলগেরিয়ার দধিতে যে একজাতীয় অণুবীজ থাকে তাহা শরীর ক্ষয় ও জরা উৎপন্নকারী অপর বিষাক্ত অণুবীজকে নষ্ট করিতে পারে। তিনি উক্ত জরাজননশীল বীজাণুর সিরাম (serum) প্রস্তুত করিয়া উহা কতকগুলি বানরকে সেবন করাইয়া রোগান্বিত করেন পরে তাহাদের শরীরে দধি-বীজ প্রবেশ করাইয়া সুস্থ করেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে জীবাণুতত্ত্ববিদ রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরীক্ষায় নির্ণয় করিয়াছেন যে আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট দধিতে যে উদ্ভিজ্জাণু বা বীজাণু থাকে তাহা বুলগেরিয়ার টক দুগ্ধের বীজাণু অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী। ইহা প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে ল্যাক্‌টিক এসিড উৎপন্ন ও নানা অনিষ্ট-কারী বীজাণু নষ্ট করে। তিনি আরও দেখিয়াছেন যে কলেরার বীজ ঐ দধিবীজের সহিত মিশ্রিত করিলে ১২ ঘণ্টায় এবং টাইফয়েড জ্বরের বীজ ৪৮ ঘণ্টায় বিনষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন দধিবীজের অন্য অনেক রোগ আরোগ্যকর শক্তি আছে। রোগে দধি অপেক্ষা তক্র বা ঘোল (whey) অধিক উপযোগী।

দধি—অপকারীতা।

দধি গরম করিয়া খাইলে অনিষ্টকর হয়। এইরূপ কিম্বদন্তী, “ন রাত্রে দধি ভোজনম।” কেহ কেহ বলেন উহাতে অলক্ষ্মী দোষ জন্মে। এক জন গ্রন্থকার বলিয়াছেন রাত্রে দধি খাইলে উহা উদরে দীর্ঘকাল সঞ্চিত থাকে বলিয়া শীঘ্র হজম হয় না। কিন্তু ভাব প্রকাশ ও চরকের মতে দধির সহিত ঘৃত, চিনি, মিস্‌রি, মুগের যুষ, মধু বা আমলকীর রস ও জল মিশাইয়া রাত্রে খাইলে দোষ হয় না। সুতরাং শেষোক্ত মতই প্রবল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। আমি প্রায় ৪০ বৎসর যাবত রাত্রের আহারের শেষ ভাগে বেলের পানা বা চিনির সহিত দধি খাইয়াছি তাহাতে কোন অসুবিধা বোধ করি নাই।

দুগ্ধজাত সামগ্রী।

দুগ্ধে মাখম বা ননী, সর, ছানা, ঘৃত সকলই অদৃশ্য ভাবে থাকে। এই সকল বস্তু দুগ্ধের নানাবিধ রূপান্তর।

ছানা।

ছানার সংস্কৃত নাম তক্রপিণ্ড ও তক্র কুর্চ্চিকা। ছানার জলের নাম মোরট। পিণ্ডাকারে চাপ চাপ হইলে তক্রপিণ্ড এবং ছোট ছোট ছোট কুচি হইলে তক্রকুর্চ্চিকা। দুগ্ধে উপযুক্ত পরিমাণ ছানার জল বা বীজ মিশ্রিত করিলে ছানা প্রস্তুত হয়। দধি আগুণে জ্বাল দিলে বা গরম দুগ্ধে লেবুর রস বা কোন প্রকার অম্ল দিলে ছানা পৃথক হয়। ছানার জলে যে সবুজ আভা যুক্ত পীতবর্ণ পদার্থ থাকে তাহা বি$_2$ ভিটামিন প্রধান। আমাদের দেশে অজ্ঞতা বশতঃ ঐ মহোপকারী জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।

ছানা, মাছ মাংস অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর অধিকন্তু মাছ মাংসে যে দূষিত পদার্থ (Purin bodies) থাকে তাহা বিশুদ্ধ ছানায় নাই। শক্ত ছানা দুষ্পাচ্য। টাট্‌কা বা সদ্য প্রস্তুত নরম ছানা অতি মূল্যবান, সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর আহার্য্য। যাহারা অলসে জীবন যাপন করে কিম্বা রুগ্ন বা দুর্ব্বল অর্থাৎ যাহাদের পরিপাক শক্তি অপ্রবল তাহাদের পক্ষে উহা উপযোগী নয়। ছানার তৈলাক্ত বা ঘৃতাক্ত ব্যঞ্জন অনিষ্টকর। উহা সহজে হজম হয় না সুতরাং পরিত্যজ্য।

পনির, ছানার প্রকারান্তর। সাহেবদের দেখা দেখি এখন অনেক বাবুরা পনির আহার করিতেছেন। ইহা ছানা ও মাংস অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর বলিয়া কথিত হইয়াছে কিন্তু সাধারণতঃ গুরুপাক এবং সময়ে সময়ে উহাতে কীট ও এক প্রকার বিষ জন্মে। সুতরাং আমাদের উহার আস্বাদ গ্রহণ না করাই উচিত। কত বিষে দেশের লোকের স্বাস্থ্যের দুর্দ্দশা সূচিত হইতেছে; আর বিষের মাত্রা বাড়াইয়া কাজ নাই। তবে যদি বিষপানে অমর হইবার কাহারও বাঞ্ছা হয় তাহাতে আপত্তি নাই।

ক্ষীর।

ইহা বায়ুর শান্তিকর, শুক্র ও নিদ্রাকর কিন্তু গুরুপাক। ক্ষীরের প্রস্তুত খাদ্য অধিকন্তু পিত্তনাশক ও অদাহী।

ননী বা মাখম।

মাখমের সংস্কৃত নাম মৃক্ষণ, ননীর নাম নবনীত বা নবনী। কাঁচা দুধ মথিলে ননী পৃথক হয়, জলের সহিত দধি মথিলে মাখম উৎপন্ন হয়, বাকি ঘোল। আয়ুর্ব্বেদ মতে সদ্যজাত, নবনী স্বাদু, ধারক, বর্ণ-প্রসাদক, শীতবীর্য্য, লঘু, মেধাবর্দ্ধক, পুষ্টিকর ও মস্তিষ্কের আশু

বলকারক। অধিক উত্তাপে ননী বা মাখম গলাইলে উহার খাদ্য-প্রাণ অনেক নষ্ট হয়।

অন্যমতে মাখম চক্ষুর হিতকর, রক্তপিত্ত নাশক, শুক্র ও বলবৰ্দ্ধক, ধারক, স্নিগ্ধ এবং শীতল। অনেক দিনের তোলা মাখম বিষম অনিষ্টকর। গব্য দধির টাটকা মাখম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণ সম্পন্ন। ইহা বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, অর্শ, অৰ্দ্দিত (বায়ু রোগ বিশেষ) ও কাশ নাশক। উহাতে মিস্‌রি মিশাইয়া খাইলে রসায়নের কাজ হয়। উহা শিশুদের পক্ষে অসীম হিতকারী। মহিষ দধির মাখম বায়ুবৰ্দ্ধক, কফ-কারক, মেদ ও শুক্রজনক, দাহ, পিত্ত এবং শ্রম নাশক। ছাগ দুগ্ধের মাখম লঘু, অগ্নি ও বলবৰ্দ্ধক, ক্ষয়কাস, নেত্ররোগ এবং কফ প্রশমক। সাধারণতঃ ১০০ ভাগ দুগ্ধে প্রায় ৫½ ভাগ মাখম পাওয়া যায়।

দুধের সর।

ইহা তৃপ্তি, বল ও পুষ্টিকর, শীতল, ক্ষয়রোগে হিতকর, রতিশক্তি-বৰ্দ্ধক, মেধা ও স্মৃতি জনক কিন্তু দুষ্পাচ্য। বায়ু ও রক্তপিত্ত রোগে এবং যাহাদের অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয় তাহাদের উহা সহ্য হইলে মাখমের ন্যায় নিত্য সেব্য। অজীর্ণ রোগীর অপথ্য।

ঘৃত।

দুগ্ধের শেষ পরিণতি বা অভিব্যক্তি ঘৃত। শাস্ত্রে একটী উক্তি আছে "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" অর্থাৎ ধার করিয়া ঘি খাইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সঙ্গে শাস্ত্রকার ধার শোধের কোন ব্যবস্থা করেন নাই। সাধারণতঃ মাখম, ননী বা সর গরম করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করা হয়। জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য রোগে ঘৃত অপকারী

বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে, কফজ ও তরুণ রোগে, বিসূচিকা, মলবদ্ধতা, মদাত্যয়, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্যে ঘৃত সেবন নিষিদ্ধ।

গব্য ঘৃত রুচিকর, অগ্নি, বুদ্ধি, মেধা, ওজঃ, মেদ ও স্মৃতি-শক্তি বৰ্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মা, পিত্ত ও শ্রান্তি নাশক। রক্তপিত্ত, নেত্র রোগ, পাণ্ডু, কামলা, বিষ, উন্মাদ, শোথ ও ক্ষয় রোগে উপকারী এবং অলক্ষ্মী নাশক।

অন্য ঘৃত অপেক্ষা গব্যঘৃত উৎকৃষ্ট। নীতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে গব্যহীন ভোজন বৃথা ভোজন এবং ঘৃতহীন ব্যঞ্জন ভোজনে ইন্দ্রেরও লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায়। ইহা যদিও প্রাণীজ তথাপি উৎকৃষ্ট সাত্বিক আহার।

ঘৃত যথাবিধি অপরাপর দ্রব্যের সহিত মিলনে অধিকতর বীর্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু দূষিত দুগ্ধের ন্যায় অবিশুদ্ধ ঘৃত ব্যবহারে ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। বাজার চলিত ঘৃতে চর্ব্বি, ভেজিটেবল (উদ্ভিজ্জ) ঘৃত প্রভৃতি ভেজাল মিশ্রিত করা হয়।

ডাক্তার বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন, কলিকাতায় প্রতি বৎসর প্রায় দুই লক্ষ ৭০ হাজার মণ ঘৃত বিদেশ হইতে আমদানী হয়, বেশীর ভাগ মহিষ দুগ্ধ জাত। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে উক্ত অধিকাংশ ঘৃতে সাপের চর্ব্বি বা চিনেবাদাম বা মহুয়া বা পোস্ত বীজের তেল বা গন্ধ ও বর্ণহীন বিদেশ হইতে আনীত মেটে তেল (পেট্রোলিয়াম জেলি) একটী বা ততোধিক মিশ্রিত থাকে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থানে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে গরীব গৃহস্থেরা সাধারণতঃ বাসি দধি হইতে মাখম বা দুধ হইতে সর তুলিয়া প্রত্যহ কিছু কিছু জমা করে। ১০।১৫ দিন

সংগৃহীত হইবার পর যখন পচিবার উপক্রম হয় তখন উহা লেবুপাতা ইত্যাদির সহিত জ্বাল দিয়া ঘৃত প্রস্তুত করে। এই ঘৃত হাটে বিক্রয় হয়। উহাতে কড়া টক গন্ধ থাকে এবং অনেক ঘৃতের মহাজন উহা সংগ্রহ করিয়া লেবুপাতা ইত্যাদির সহিত পুনর্ব্বার জ্বাল দিয়া টিনে পুরিয়া কলিকাতায় চালান্ দেয়।

ইহা অধিকাংশ স্থলে কোন মতে বিশুদ্ধ হইতে পারে না। বিশুদ্ধ টাটকা মাখম গালান ঘৃতই নিরাপদ।

যে দেশে মহিষ নাই যথা ঘাঁটাল, পাবনা, যশোহর ইত্যাদি, সেই সব দেশ হইতে আনীত বিশুদ্ধ মাখম জ্বালাইয়া ঘৃত প্রস্তুত করিলে অনিষ্টের আশঙ্কা অল্পই থাকে। তবে বাজারে মাখম একেবারে নিরাপদ নয়। ডাঃ গাস্কেরিণী (Dr. Gaskerini) তাঁহাদের দেশের একটী মাখম পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে উহাতে যক্ষ্মারোগের বীজাণু ছিল।

পুরাতন ঘৃত—ইহা ত্রিদোষ, মেদরোগ, মৃগী, মূর্চ্ছা, শোথ, বিষম জ্বর, যোনিশূল, কর্ণশূল ও শিরঃশূল নাশক এবং কুষ্ঠ, উন্মাদ, তিমিরাদি রোগ উপশমকারক। পুরাতন বাতরোগে ও বেদনায় পুরাতন ঘৃতের সহিত স্পিরিট, কর্পূর, টারপিন তেল ও সরিষার তেল গরম করিয়া লেপনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহা বিশেষ পরীক্ষিত। ঘৃত যত পুরাতন হইবে তত অধিক উপকার করিবে। ইহা রোগ বিশেষে কিঞ্চিৎ গরম দুধের সহিত সেব্য।

পল্লী মঙ্গল সমিতির পুস্তকে পুরাতন ঘৃতের নিম্নোক্ত গুণ গুলি বর্ণিত হইয়াছে।

মাথা গরম হইলে অথবা মস্তিষ্ক বিকারে, পুরাতন ঘৃত জল দিয়া এক শত বার ধৌত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ হয়।

রক্তের চাপ বৃদ্ধিতে (Blood pressure), শুষ্ক আমলকী বাটিয়া উক্ত শত ধৌত ঘৃতের সহিত মিশাইয়া কপালাস্থি, তাহার পার্শ্ব এবং মস্তিষ্ক প্রদেশে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। যক্ষ্মারোগে, বক্ষের পার্শ্ব ও অন্য অংশের বেদনায় গরম পুরাতন ঘৃত বেদনার স্থানে মালিস করিলে, বেদনা প্রশমিত হয়।

বাতশ্লেষ্মা-প্রধান সান্নিপাতিক জ্বরে (নিউমোনিয়ায়) আদার রস ও পুরাতন ঘি সম পরিমাণে মিশাইয়া অগ্নি তাপে জ্বালাইয়া ঘৃত অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে একটু কর্পূর মিশাইয়া মালিস করিলে শ্লেষ্মা তরল হয় এবং হাঁপ বন্ধ হয়। বাত, পক্ষাঘাত, শ্বাস ও কাস রোগে উক্ত মালিস বিশেষ ফলদায়ক। পুরাতন ঘি ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে ক্ষতের রস ও কলতানি পরিষ্কৃত হইয়া ক্ষত শীঘ্র পুরিয়া উঠে।

মহিষদুগ্ধের ঘৃত—বায়ু ও পিত্তনাশক, রক্তপিত্তহর, কফ প্রদায়ক, গুরু, শীতবীর্য্য, বিপাকে মধুর এবং বল, বর্ণ, শুক্র ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

ছাগ দুগ্ধের ঘৃত—কটুবিপাক, অগ্নি ও বলকর, কফ, কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা ও নেত্ররোগে হিতকর।

উষ্ট্র দুগ্ধের ঘৃত—কটু, গুল্ম, উদরাদি রোগ উপশমক।

মেষ দুগ্ধের ঘৃত—লঘুপাক, নেত্রের হিতকর, অগ্নি উত্তেজক, অশ্মরী ও বাতদোষনাশক এবং জিহ্বাক্ষতে বিশেষ উপকারী।

পোড়া ঘৃত—পিত্তবর্দ্ধক ও অগ্নিমান্দ্যকর বলিয়া কথিত হইয়াছে। ধাতুপাত্রে বিশেষতঃ কাংস্যপাত্রে ঘৃত ভোজন অনিষ্টকর।

প্রস্তর বা মৃণ্ময়পাত্রে ঘৃত ভোজনই প্রশস্ত। ঘৃতের সহিত মিসরি ও লেবুর রস মিশাইয়া সেবন করিলে উহা সহজপাচ্য হয় এবং আয়ু, স্বাস্থ্য ও লাবণ্য বৃদ্ধি করে বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ঘৃতপক্ক দ্রব্য—লঘুপাক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, দৃষ্টির হিতকর কিন্তু বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, অজীর্ণ রোগীর অপথ্য। উক্ত গুণগুলি বিশুদ্ধ ঘৃতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে প্রয়োজ্য।

দুগ্ধের অপকারীতা

নিম্নলিখিত কারণে দুগ্ধ দূষিত হয়ঃ—

১। দুধ দুহিবার সময় দোয়ালের হাত, গরুর বাঁট এবং দুগ্ধ পাত্রাদি ভাল করিয়া পরিষ্কার না করিলে দুধ দূষিত হয়। বিশেষতঃ দোয়াল, গরু বা দুগ্ধ বিক্রেতা (যাহারা সাধারণতঃ হাত ডুবাইয়া দুধ উঠায়) তাহাদের চর্ম্ম বা অন্য সংক্রামক রোগ থাকিলে দুগ্ধ-পায়ীতে ঐ ঐ রোগ সংক্রমিত হয়।

২। দুধে আপত্তিকর পদার্থ যথা পচা পুষ্করিণীর জল বা রোগ-বীজাণুপূর্ণ জল মিশ্রণ।

৩। সদ্যপ্রসূত বা রুগ্ন জন্তুর দুধের সহিত অন্য ভাল দুগ্ধের মিশ্রণ। সদ্যপ্রসূত গাভীর দুগ্ধে প্রায় তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত অধিক ক্ষার পদার্থ থাকে বলিয়া উহা বিরেচক। আর্য্য ঋষিগণ নবপ্রসূত গো, মহিষ ও ছাগাদি পশুর দশদিন অশৌচ ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে ২১ দিন পর্য্যন্ত অশৌচ প্রতিপালিত হয়। পাশ্চাত্য পুষ্টিতত্ত্ববিদগণ উহা সপ্তাহকাল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

বিধাতার সুনির্দ্দিষ্ট বিধানে প্রসবের পর গাভীর দুগ্ধে অধিক ছানাজাতীয় পদার্থ থাকে না, কারণ বৎস তাহা পরিপাক করিতে

পারে না, সেই জন্য তাহার পক্ষে প্রথমে ক্ষারবহুল দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা যাহা মানব শিশুর উপযোগী নয়।

পুনশ্চ, দোহাদের বা বৃষ সঙ্গমের পর গাভীর দোহিত দুগ্ধ এবং বৎসহীন গাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষজনক বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এই জন্য ঐ প্রকার দুগ্ধ ব্যবহার কিম্বা উহা অন্য দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করা আপত্তিকর।

৪। দোহনী বা দুগ্ধ পাত্রে গরুর চোনা পড়িলে এবং তাহা অন্য দুগ্ধের সহিত মিশাইলে সব দুধ নষ্ট এবং ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়।

৫। কোন কোন গরু, দুধ দুহিবার সময় দুরন্তপনা করে, তাহা নিবারণের নিমিত্ত উহাদিগকে প্রহারাদি করা হয়। কুকুর ইত্যাদি জন্তু সম্মুখে থাকিলে কিম্বা অধিক শব্দ বা গোলমাল হইলে গরু দুধ দানে বিরত হয় বা অল্প দুধ দেয়। সে সব স্থলে স্নায়ুর বিষম উত্তেজনা হয় বলিয়া দোহিত দুধ বিষাক্ত হয়। এই কারণে ক্রোধার্ত্ত বা শোকার্ত্ত রমণীর স্তনদুগ্ধ বিষম অনিষ্টকর হয়, উহা সেবনে কোন কোন স্থলে সন্তান মৃত্যুগ্রস্থ হইয়াছে শোনা গিয়াছে।

৬। গরুর দুধে অন্য বিজাতীয় পদার্থ মিশ্রণ। মধ্যে মধ্যে কলিকাতা করপোরেশনের স্বাস্থ্য-পরিদর্শকগণ একমাত্র দুগ্ধবীক্ষণ বা ল্যাক্টোমেটার যন্ত্র দ্বারা দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব ঠিক আছে কিনা দেখে, দুগ্ধের বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ ও জীবাণু ইত্যাদি পরীক্ষা করে না। এই লোক দেখান পরীক্ষার কোনই মূল্য নাই। গয়লারা তাহাদের চোখে ধুলা দিবার জন্য দুধে সুজি, ময়দা, এরারুট, বাতাসা, চিনি প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া ল্যাক্টোমেটর সাহায্যে উহার আপেক্ষিক

গুরুত্ব বজায় রাখে। আবার দুধের চলকানি নিবারণের জন্য গাছের অধৌত কাঁচা পাতা ইত্যাদি দুগ্ধ পাত্রে দিয়া সহরে আনে।

কোন প্রকার যন্ত্র সাহায্যে দুগ্ধের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা কার্য্যতঃ নিস্ফল। দুগ্ধ উৎপাদন হইতে বিক্রয় অবধি আগা গোড়া সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। মার্কিণ দেশে দুগ্ধের বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং দুগ্ধ সংরক্ষণ ও সরবরাহের ভার পুলিসের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

৭। টাট্‌কা দুধের সহিত বাসি বা মাটাতোলা বা রোগের বীজাণু মিশ্রিত দুধ মিশ্রণ।

৮। অনেক সময় দুধ উন্মুক্ত পাত্রে বা ক্যানে মফস্বল হইতে সহরের বাজারে আনীত ও বিক্রীত হয়, তাহাতে ধূলা ও দূষিত বীজাণু মিশ্রণের অবাধ সুযোগ হয়। উপরন্তু উহা অনেকবার হস্তস্পৃষ্ট হয়।

৯। গরুকে ফুঁকা দেওয়া। ফুঁকা দিলে দুধের গুণের ব্যতিক্র হয়। ইহা সহরে অত্যধিক প্রচলিত। কেহ২ এই নিষ্ঠুর প্রং নিবারণের চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হয় নাই।

১০। অ্যামেরিকার যুক্তপ্রদেশে একটী পরীক্ষায় প্রকাশি হইয়াছে যে সেখানে প্রতি এক শত দুগ্ধবতী গাভীর মধ্যে ৩০টি দেহে যক্ষার বীজ সুপ্তভাবে ছিল। অনেক মানুষের দেহে এরূপ থা তাহারা নিজে ঐ রোগে আক্রান্ত হয় না কিন্তু সংসর্গে অন্য আক্রান্ত করে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। বাজা দুগ্ধে নানা রোগের যথা, রোহিণী (Diphtheria), টাইফয়েড, কলে একজিমা বা চর্ম্মপীড়া এমন কি যক্ষারোগের বীজাণু ইত্যাদি পরী পাওয়া গিয়াছে।

দুধ দূষিত হইবার পূর্ব্বোক্ত কারণগুলি ব্যতীত শাস্ত্র মতে ভাদ্র মাসে যে গাভী গর্ভবতী হয় বা প্রসব করে তাহার দুগ্ধ দূষিত হয় সেই জন্য উহা বিষবৎ পরিত্যজ্য।

দুধ জ্বাল দিয়া খাইলে রোগবীজ নষ্ট হয়। একজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে দুধ ৯০° তাপে ৫ মিনিট রাখিলে উহার সকল বীজাণু বিনষ্ট হয় এবং উহার খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ লবণাদি নষ্ট হয় না। কিন্তু অধিকাংশ পুষ্টিতত্ত্ববিদগণের মতে বেশীক্ষণ অধিক উত্তাপে জ্বাল দিলে উহার খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয়। কেহবা এক বলকা দুধই প্রশস্ত বলিয়াছেন। এই বিভিন্ন মতবাদের ভিতর সত্য খুঁজিয়া পাওয়া সুকঠিন। তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে দুধ বেশী জ্বাল দিলে যদিও উহার গুণের কিছু অপচয় হয়, তথাপি উহা অপেক্ষাকৃত অধিক নিরাপদ।

অবশ্য যাহাদের জীবনী শক্তি প্রবল, তাহারা অক্লেশে বীজাণু হজম করিতে পারে কিন্তু দুর্ব্বল ও শিশুদিগের পক্ষে, গৃহে উপযুক্ত ভাবে পালিত জন্তুর দুগ্ধই নিরাপদ। সেখানে ইহা সম্ভবপর নয়, জমান শুষ্ক দুগ্ধ ব্যবহার করা বিধেয়।

আপত্তিকর দুগ্ধের দোষ নষ্ট করিবার নিম্নোক্ত দুইটি বিশিষ্ট প্রথা পুষ্টিবৈজ্ঞানিকগণ নির্দ্দেশিত করিয়াছেন।

১। দুধ বোতলে ভরিয়া ছিপি বদ্ধ করিয়া জল মধ্যে রাখিয়া সেই জলকে ১৫৮° ডিগ্রি তাপে ৪৫ মিনিট রাখিয়া আস্তে আস্তে শীতল করা। ইহাকে বীজাণুহীন (Sterilize) করা বলে।

(২) দুধকে দ্রুত ১৪৫-১৫০° তাপে ৩০ মিনিট রাখিয়া হঠাৎ ৫০° তাপে নামাইয়া তদবস্থায় রাখা। ইহাতে সব জীবাণু বা বীজাণু

মরে না, সি ভিটামিন সামান্য কমে। ইহাকে প্যাস্টরাইজড দুধ বলে। কিন্তু এই দুধ পুনরায় জ্বাল দিলে বীজাণুর বৃদ্ধি হয় সেইজন্য একজন স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ উহা অনিষ্টকর বলিয়াছেন।

গৃহস্থ ঘরে পূর্ব্বোক্ত কোন একটী প্রক্রিয়ার দ্বারা দুগ্ধ জ্বাল দেওয়া কঠিন ব্যাপার। ইহা বৃহৎ দুগ্ধ-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভবপর। কলিকাতায় শেষোক্ত প্রথার একটী দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু বহু কারণে যাহা অন্যত্র বলা হইয়াছে, উহা বিশুদ্ধ ও সেবনযোগ্য হইতে পারে না। যদিও উহা বিশুদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তথাপি উহার বর্ত্তমান পরিমাণ সহরের মোট চাহিদার একটী অতি অকিঞ্চিৎকর ভগ্নাংশ মাত্র।

দুধ যদি বিশুদ্ধ হয়, উহা গরম না করিয়া খাওয়াই ভাল। বিশুদ্ধ কাঁচা দুধ বিশুদ্ধ জ্বাল দেওয়া দুধ অপেক্ষা অনেক উপকারী। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে। "Boiled milk is spoiled milk"—"জ্বাল দেওয়া দুধ নষ্টদুধ।" দুধের আদি উৎস মাতার স্তন। স্তনদুগ্ধ গরম করিয়া শিশুকে সেবন করাইবার ব্যবস্থা নাই। উহা স্বভাবতঃ ঈষৎ গরম থাকে। বিশুদ্ধভাবে সদ্য দোহিত ধারোষ্ণ দুগ্ধ, লঘু, শীতবীর্য্য, অমৃতোপম ও অতি হিতকর বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

নিম্নে দুগ্ধ দীর্ঘকাল অবিকৃত রাখিবার তিনটী সহজ উপায় দেওয়া হইল। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

১। একটী বোতলে দুধ ভরিয়া এক কড়া জলের ভিতর উহা এমনি ভাবে রাখিবে যেন বোতলের মুখ জলের বাহিরে থাকে অর্থাৎ দুধে যেন জল মিশিয়া না যায়। বোতলের সহিত কড়া ১৫

মিনিট জ্বালে চড়াইয়া বোতল জল হইতে তুলিয়া যাহাতে উহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ না করে এরূপ ভাবে মুখ ছিপি দ্বারা আঁটিয়া দিবে 'এবং উহা শীতল স্থানে রাখিবে। প্রসিদ্ধ পাকতত্ত্ববিদ শ্রী বিপ্র দাস মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন উপরোক্ত উপায়ে দুধ দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকিবে।

২। ১ ফোঁটা ফরমালিন (Formalin) কিছু জলে মিশাইয়া উহার কয়েক ফোঁটা দুধে দিলে উহা ৭ দিন অবিকৃত থাকে।

৩। দুগ্ধে ২।১ ফোঁটা ভ্যানিলা এসেন্স মিশাইলে উহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাজা ও মিষ্ট থাকে।

দুগ্ধে প্রস্তুত কুলপিবরফ ও আইসক্রিম যাহা সহরবাসীদের আদরের সৌখিন আহার এবং যাহা খাইবার লোভ অতি অল্প লোকেই সম্বরণ করিতে পারে তাহা অধিকাংশ স্থলে বিষম অনিষ্টকর হয়।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব কুলপিবরফ বড় ভাল বাসিতেন। এরূপ শোনা যায় তজ্জন্য তাঁহার গলপ্রদাহ বা গলক্ষত রোগ হইয়াছিল। নানা চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই।

কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতা করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ পরীক্ষান্তে প্রকাশ করিয়াছে, কলিকাতার পথে পথে যে মালাই বা কুলপিবরফ বিক্রী হয় তাহা সাধারণতঃ পর্য্যুষিত দুগ্ধে ও দূষিত পাত্রে প্রস্তুত হয় এবং উহাতে বহু অনিষ্টকর রোগবীজাণু বিদ্যমান থাকে। অধিক দিন বরফে সংরক্ষিত মালাই আরো অনিষ্টকর হয় কারণ উহাতে দোষের মাত্রা বাড়িয়া যায়।

উক্ত দূষিত খাদ্য সেবনে হঠাৎ উদরাময় বা কলেরা হইতে দেখা গিয়াছে। আমরা জেনে শুনে অম্লান বদনে উহা উপভোগ করি ও

ছেলে মেয়েদের ঐ বিষ পয়সা দিয়া কিনিয়া খাওয়াই এবং "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু" এই সত্যটি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি। যদি উহা খাইবার একান্ত ইচ্ছা হয়, ঘরে নির্দ্দোষ পাত্রে বিশুদ্ধ দুগ্ধ বা ফলের রসে প্রস্তুত উক্ত দ্রব্য কখন সখন খাইলে অল্প পয়সায় উহা নিরাপদে উপভোগ করিতে পারা যায়।

একথা মনে রাখিতে হইবে, বরফ বা বরফজাত খাদ্য সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর নয়। কিন্তু একথা কে শুনিবে ও মানিবে? আইসক্রিম আধুনিক অন্যতম সভ্য উপাদেয় ভোগ। মার্কিণ দেশে বৎসরে তথাকার অধিবাসীগণ ২৭৫ কোটী গ্যালন আইসক্রিম খায়! এই বিষয় এই পুস্তকের তৃতীয় পর্য্যায়ে পঞ্চ মহাভূত তত্ত্বের জল (পানীয়) অধ্যায়ে আরও বিশদভাবে আলোচিত হইবে।

দুধ একবার গরম হইবার 'পর শীতল হইলে বিশেষতঃ অনাবৃত পাত্রে রাখিলে উহা অধিকতর অনিষ্টকর হয়। অনেক অজীর্ণগ্রস্ত রোগী দুধ সহজে হজম করিতে পারে না, তাঁহার প্রধান কারণ দুধে যে কেসিন বা ছানা থাকে তাহা সহজপাচ্য নয়। সেইজন্য দুধে চূণের জল বা সোডা মিশ্রিত করিয়া খাইলে উহা সহজে হজম হইতে পারে কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে ঘোল বা তক্র সেবনই প্রশস্ত।

সহরবাসীদের, বিশেষতঃ শিশুদের, যকৃৎ বা অম্লরোগ প্রাবল্যের অন্যতম কারণ, দূষিত দুগ্ধ বা দূষিত দুগ্ধজাত দ্রব্য সেবন। দুধের সহিত ডিফ্‌থিরিয়া (রোহিণী), কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত ইত্যাদি মারাত্মক রোগের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করে সুতরাং এই দোষ নিবারণার্থ উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বন সর্ব্বক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন একথা বলাই বাহুল্য।

দুগ্ধের সহিত অম্লফলের রস বা মাচ, মাংস সেবন অনিষ্টকর। উহা বিরুদ্ধ ভোজন কিন্তু উহার সহিত মিষ্ট আম, কাঁটাল, বেল প্রভৃতি ফলের রস সেবন অহিতকর নয় বরং তাহা জীর্ণকর ও অধিক পুষ্টিকর।

অনেকের মতে আহারশেষে দুগ্ধ পান করিলে বিরুদ্ধ ভোজনের দোষ প্রশমিত হয়। একজন স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ লিখিয়াছেন, রাত্রে শয়নের ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে সহমত গরম দুধ আস্তে ২ চাকিয়া পান করিলে সারা দিবসের কুখাদ্য ভক্ষণ জনিত কুপিত বায়ু ও পিত্তদোষ নিবারিত হয়। অন্য একজন শাস্ত্রকার লিখিয়াছেন—

দিনান্তে যো পিবেৎ দুগ্ধং নিশান্তে চ পিবেৎ পয়ঃ।
ভোজনান্তে পিবেৎ তক্রং কিং বৈদ্যস্য প্রয়োজনম্।

শিশুদের ঝিনুকের পরিবর্ত্তে মাইপোষে দুগ্ধ সেবন করাইলে অনেক সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুগ্ধ সেবিত হয় ফলে তাহাদের উদরাময়াদি রোগ জন্মে। মাইপোষ দ্বারা শিশুর ক্রন্দন নিবারণ করিবার বা চাপা দিবার ব্যবস্থা অনেক সময় অহিতকর হয়। কারণ শিশু, আহার ব্যতীত অন্য কারণেও কাঁদিয়া থাকে। অনেক সময় কিছু জল পান করাইলে তাহারা সুস্থ হয়।

ধাতব পাত্রে দুধ পাক বা রক্ষিত করা অনিষ্টকর, লৌহ পাত্র তত দোষের নয়। বাজারে চলিত অ্যালিউমিনাম পাত্রে সিসা থাকে বলিয়া উহাতে দুগ্ধ পাক বা সংরক্ষণ করা অকর্ত্তব্য। একজন স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন অ্যালিউমিনাম পাত্রে দুধ জ্বাল দিলে বা রক্ষিত হইলে অন্য দোষ ব্যতীত সি ভিটামিন নষ্ট হয়। কাঁচ, মাটি ও পাথরের পাত্র সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ।

দুগ্ধে উপযুক্ত পরিমাণ লবণ আছে, সেইজন্য অন্য অধিকাংশ খাদ্যে যেরূপ লবণ মিশাইতে হয়, দুগ্ধে উহা মিশাইতে হয় না। লবণ মিশ্রিত দুগ্ধ সেবনে কুষ্ঠাদি রোগ জন্মিতে পারে। মাখমে লবণ ঘটিত উপাদান অনেক কম থাকে বলিয়া উহাতে সামান্য পরিমাণ লবণ মিশাইলে উহা অধিক দিন টাটকা থাকে এবং অনিষ্টকর হয় না।

কোন কোন মনীষী (তাহাদের সংখ্যা অতি বিরল) দুগ্ধকে মানবের অস্বাভাবিক, অনুপযোগী এবং অনুপকারী আহার বলিয়াছেন, উপরন্তু অনুযোগ করিয়াছেন যে আমরা জন্তুদের শাবকদের দুগ্ধ কাড়িয়া খাইতেছি। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার স্বাস্থ্য পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"আমার মনে হয় দুধ পর্য্যন্ত ত্যাগ করা যাইতে পারে। অনেক (?) ডাক্তারের মতে দুগ্ধ সেবনে এক প্রকার জ্বর হয়। দুধে অতি সহজে অনেক বিষাক্ত পরমাণু আকৃষ্ট হয় বিশেষতঃ অনেক গাভীই রোগগ্রস্ত। গোবৎসের দন্তোৎগম হইলে সে আর দুধ খায় না। মানব শিশু স্তনদুগ্ধ শেষ হইবার পর অন্য দুগ্ধ খাইলে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী হয়।"

মহাত্মা, ঘৃত, মাখমাদি দুগ্ধজাত পদার্থ বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা স্পষ্টতঃ দেন নাই কিন্তু উহা উহ্য আছে। বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহার কথা মানিয়া চলিলে, আমাদের পরম উপভোগ্য আহারগুলি বাদ পড়ে, ইহা নিশ্চয়ই কঠিন নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু দুই এক জন মহাজনের ভ্রান্ত বৈপ্লবিক মতবাদে আবহমানকাল প্রচলিত শাস্ত্র ও বিজ্ঞান সম্মত দুগ্ধাহারের উপযোগীতা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, মহাত্মা গান্ধী বহুদিন যাবত ছাগ দুগ্ধ খাইতেছেন সুতরাং তাঁহার দুগ্ধের নিন্দা একটী বিরাট উপহাস বলিয়াই মনে হয়।

সকলেই জানে, কোন জিনিষ বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্য সাধারণতঃ শুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া সম্ভবপর নয়। জল ও বায়ু, দূষিত জীবাণুর বাহন, উহাদের বর্জ্জন কি সম্ভবপর? সুতরাং দুগ্ধ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে উহার দোষ অনেকাংশে নিরাকৃত হইতে পারে।

আর দুগ্ধ সেবন অপ্রাকৃতিক হইতে পারে না। একটু স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে বিধাতা মানবগণের হিতার্থে গো মহিষাদি জন্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাদের দুধ এত অপর্য্যাপ্ত হয় যে শাবকদের খাওয়াইয়া অনেক উৎবৃত্ত থাকে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে দ্রোণদুঘা গাভী, ১ দ্রোণ=৩২ সের দুধ দিনে দিত। এখনও পশ্চিম ভারতে অনেক জাতীয় গরু দিনে ২০৷২২ সের দুধ দিতেছে। অত দুধ কখনই বাচুরের খোরাক নয়। তাহাদের বড় জোর দিনে ৪৷৫ সের প্রয়োজন, বাঁকি দুধ কি তাহার দেহে শুখাইয়া দেওয়া পরম কারুণিক কার্য্য, ইহাই কি বিধাতার অভিপ্রেত?

সেইরূপ বলদগুলিকে জোর করিয়া চাষের জন্য খাটান কি নিষ্ঠুরতা? এ পৃথিবীটা জুড়িয়া পিঁজরাপোল নাই। গাভী দুধ দিবে ও বলদ খাটিবে, মানুষ তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবে, লেন দেনই প্রাকৃতিক বিধান। সুতরাং মাভৈ! আমাদের গাওয়া ঘি, রাবড়ি রাজভোগ ও সন্দেশাদি বাঁচিয়া থাকুক।

পরিশেষে দুগ্ধের আদি উৎস গো ও গবীর বিষয় কিছু আলোচনা প্রয়োজন। আশা করি উহা অবান্তর বলিয়া মনে হইবে না। "পুরাণে বর্ণিত আছে, পৃথুরাজার উপদেশানুযায়ী ইন্দ্রকে বৎস এবং ধরিত্রীকে গোস্বরূপ করিয়া দেবতারা সুবর্ণপাত্রে পয়ঃ দোহন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে অমৃত উদ্ভূত হইয়াছিল। সেই অমৃত

পানে দেবতারা অমর হইয়াছিলেন। ইহা একটী রূপক, তাহা হইলেও ইহাতে সত্য রহিয়াছে। "গাভীরূপা ধরিত্রীই অমৃতের আদি জননী তাই *হিন্দুগণ অমৃতক্ষরণী গাভীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করে।*

শুধু আমাদের দেশে নয়, অনেক পাশ্চাত্য দেশেও পূর্ব্বে গরুর আদর ছিল এবং এখনও আছে। মিশর দেশের প্রাচীন মঠে নানা জাতীয় গরুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইয়াছিল, উহা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে ইংলণ্ডের ধর্ম্ম যাজকগণ বৃষচিত্রান্বিত পরিচ্ছদ পরিধান করিত। এখনও ইংরাজগণ জন বুল (John Bull) নামে পরিচিত হইতে গৌরব বোধ করে।

"ধর্ম্মরূপী যক্ষ যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অন্ন কি ? যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়াছিলেন "গোধন"। গোসেবা কাহাকে বলে এবং কেমন করিয়া করিতে হয় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাল্য লীলায় তাহা শিখাইয়া গিয়াছেন।"

শ্রীশ্রী রাম শাস্ত্রী লিখিয়াছেন—"ভারতের ধন বলিতে প্রধানতঃ গোধন ও ধান্য ধন বুঝায়। আবার ইহাদের মধ্যে গোধন শ্রেষ্ঠ অনন্য সাধারণ ধন। ধান্যের প্রাধান্য থাকিলেও, অভিধানে ধান্যধন নামে কথা নাই। ধান্য গরুর সাহায্যে উৎপন্ন হয়। গোধন যে কেবল দুগ্ধবতী গাভী তাহা নয়, বৃষগণও গোধন মধ্যে পরিগণিত। .... এই গো ও গবী, উভয়ই আমাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনের প্রধান অবলম্বন। পিতা যেমন ধনার্জ্জন করিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করে, জননী যেমন স্তন্য দানে তাহার দেহ বর্দ্ধন ও পোষণ করে, সেইরূপ গো-গবীও আমাদের পোষণ ও পালন করে। পিতৃ স্থানীয় গো আমাদের অন্ন উৎপাদন করে আর জননীস্থানীয়া গবী আমাদের স্তন্য দানে পোষণ করে। এই জন্য সত্যদর্শী ঋষিগণ গো-গণকে পিতা এবং গাভীদিগকে মাতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।"

অন্য একজন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"গরু আমাদের চাষী, ভার-বাহী, অন্ন দাতা ও জীবন দাতা, তাই গো রক্ষা বা সেবা আমাদের প্রধান ধর্ম্ম। গো হইতেই হিন্দুর কৌলিক 'গোত্রের' নাম। সবৎসা গাভী গৃহের শোভা বৃদ্ধি করে।

আর এক জন লিখিয়াছেন শাস্ত্রমতে গোমূত্র, গোময়, গোদুগ্ধ, ঘৃত, দধি ও গোরোচনা, গো সম্বন্ধীয় এই ছয়টি পদার্থ পরম পবিত্র ও মাঙ্গল্য। নিত্য গো সেবায় মহাপাতক নাশ হয়। গোপদোদ্ধৃত ধূলিকণা দেহে লাগিলে বায়ব্যস্নান সিদ্ধ হয়। গোময়ভস্ম অনুলেপনে আগ্নেয় স্নান হয়। শুষ্ক গোময় বা ঘুঁটের জ্বালে নির্দ্দোষ পথ্য প্রস্তুত হয়। উহার ধূমে বায়ু বিশোধিত হয়। গোময় ও গোমূত্র ফসলের অত্যুৎকৃষ্ট সার।"

স্বাস্থ্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, গো-নিশ্বাস সর্ব্বদা গ্রহণ করিলে অর্থাৎ গরুর সংসর্গে থাকিলে, শ্বাস রোগ প্রশমিত হয় এবং গো স্পর্শে গো শরীরের তাড়িত মানবের স্বাস্থ্য ও আয়ু বৃদ্ধি করে।

ভাব মিশ্র বলিয়াছেন শূল, গুল্ম, কণ্ডুরোগ, উদরাময়, চুলকনা, চক্ষু রোগ, মুখ রোগ, ছুলি, বাত, মূত্রকোষ রোগ, কুষ্ঠ, ক্ষয়কাস, শোথ, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, অতিসার, ক্রিমি, প্লীহা, প্রভৃতি রোগে, গোমূত্র মহৌষধ।

শাস্ত্রে শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিবসে গোমুণ্ড পূজার ব্যবস্থা আছে। গোগণের গাত্র স্পর্শে, গোগ্রাস দানে, গোচারণে ও প্রণামে, পাপ বা দোষ খণ্ডিত হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। গোমূত্রাদি পঞ্চ গব্য পানে প্রসূতির নাড়ী শুদ্ধ হয় এবং বাধকাদি দোষ দূর হয়।

আধুনিক মতে, নিত্য গোমূত্র পানে রক্ত পরিষ্কার হয় এবং কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগ উপশমিত হয়। প্লীহাদি যান্ত্রিক পীড়ায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

"গোগণের আজীবন অযাচিত নিঃস্বার্থ দান অতুলনীয়। মরণের পরও উহারা আমাদের নানা উপকার করে। উহার পুচ্ছে দেব সেবার উৎকৃষ্ট চামর, চর্ম্মে পাদুকা প্রভৃতি ও শৃঙ্গে বহু প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত হয় এবং অস্থি নানা কাজে লাগে। গোদেহ হইতে গোরোচনা নামক একটী দুর্ল্লভ বস্তু পাওয়া যায় যাহা অনেক মহৌষধ প্রস্তুত করিতে এবং বিবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যে প্রয়োজন হয়।

গরুর হাড়ের ভস্মে রৌপ্য পরিষ্কৃত হয়। গোচর্ম্মে, জুতা, ঘোঁড়ার সাজ, ব্যাগ, পোর্টম্যাণ্ট, ইত্যাদি প্রস্তুত হয় এবং উহাতে মৃদঙ্গ ও ঢোলকাদি ছাওয়ান হয়। গরুর লোম হইতে গদি, জিন, ইত্যাদি, শিং হইতে ছুরির বাঁট, চিরুণি ইত্যাদি এবং খুর, হাড় ও চর্ম্ম হইতে শিরীস প্রস্তুত হয়। শিং, রক্ত ও খুর হইতে রঙ এবং চর্ব্বি হইতে সাবান, বাতি ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।"

দুঃখের বিষয় আমরা গোদুগ্ধ সেবনই একমাত্র কর্ত্তব্য জ্ঞান করি। গাভীর সেবা আমাদের দেশে প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। কত গরু উপযুক্ত আহার ও চিকিৎসার অভাবে অকালে ভাগাড়ে যাইতেছে আমরা দেখিয়াও দেখি না, জানিয়াও জানি না। প্রকৃত পক্ষে এখন আমরা গোমাতার কুসন্তান।

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে উহাদের বাস্তব পূজা হইতেছে। সেখানে ক্রমাগত বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়া গাভীর উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর খাদ্য উৎপন্ন ও উন্নত জাতীয় বৃষের সহিত সঙ্গমের ব্যবস্থা ইত্যাদি করিয়া উহাদের দুগ্ধ উৎপাদন শক্তির অসম্ভব বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে।

"পূর্ব্বে আমাদের দেশে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে সুস্থকায় বৃষ উৎসর্গীকৃত হইত, তাহাকে ধর্ম্মের ষাঁড় বা খোদাই ষাঁড় বলা হইত। উহারা

মুখ্যতঃ প্রজননের উন্নতিবিধান বা অভাব মোচন করিত। এই সকল বৃষকে চাষ বা ভার বহন কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত না এবং তখনকার সমাজে উহাদের সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত। কিন্তু অবস্থার গতিকে এখন বৃষোৎসর্গ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। যদিও অল্প সংখ্যক বৃষকে পথে আহারার্থে বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা অনেক ক্ষেত্রে বেওয়ারিস মাল রূপে গৃহীত হইয়া পাউণ্ডে আবদ্ধ করা হয় এবং মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ী টানিতে নিযুক্ত করা হয়।”

উত্তম বৃষ সংযোজনে গাভীর অধিক দুগ্ধ হয়, ইহা পরীক্ষিত সত্য। কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতে একটী উৎকৃষ্ট জাতীয় বলদ ১৮৪,০০০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ স্বগণ বা স্ববংশ মধ্যে প্রজননের ফলে, গাভীর দুগ্ধদায়িনী শক্তি উত্তরোত্তর কমিয়া আসিতেছে।

গোপালন ও দুগ্ধজননের উৎকৃষ্ট প্রথাগুলি অবলম্বন করিয়া এখন অষ্ট্রেলিয়া দেশে গো দুগ্ধের ও গো দুগ্ধ জাত দ্রব্য শিল্পের বিস্ময়কর উন্নতিলাভ হইয়াছে তাহা আমাদের রূপকথা বলিয়া মনে হইবে। বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর সর্ব্বাধিক দুগ্ধ প্রদাত্রী অষ্ট্রেলিয়া দেশস্থ মেলবা ১০ নং গাভী দিনে ১ মণ দুধ দেয়। মার্কিণদেশেও একটী হলষ্টন জাতীয় গাভী ১ বিয়ানে প্রতিদিন গড়ে ১ মণ দুধ দিয়াছে। ইহা ভারতের পূর্ব্বকালের দ্রোণদুঘা বা দ্রোণক্ষীরা গাভীর সহিত তুলনীয়। পাশ্চাত্য দেশসমুহে আলফালফা, শালগম, গাজর প্রভৃতি নানা প্রকার পুষ্টিকর পশুখাদ্যের বিরাট চাষ হইতেছে। এক সুইডেনে এক বৎসরে সকল প্রকার ফসলের পাঁচ ভাগের চার ভাগ গবাদি পশুর জন্য উৎপন্ন হইয়াছিল। আর আমাদের দেশে, অধিকাংশস্থলে, গবাদির উপযুক্ত পরিমাণ ঘাসও জোটে না।

সুতরাং এখন পাশ্চাত্যদেশে গোমাতার যথার্থ সেবা হইতেছে। সেইজন্য সেদেশবাসীগণ গোমাতার প্রকৃত সুসন্তান। সেখানে কলের সাহায্যে দুধ দোহা হইতেছে তাহাতে দুধে হাতের ময়লা লাগিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আবার কাঁচপাত্রে দুগ্ধ সংরক্ষণাদি কার্য্য কলের সাহায্যে হইতেছে। সে দেশে এখন অনেক কৃতবিদ্য ভদ্র সন্তান দুধের ব্যবসা করিতেছে, তাহারা বিজ্ঞানসম্মত বহু উন্নত গোশালা বা ডেয়ারি এবং গোজাতির উন্নতির জন্য বহু সভা, সমিতি, গোসেবাশ্রম, চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আর আমাদের দেশে দুধ যে নানা কারণে দূষিত ও দুষ্প্রাপ্য হইতেছে তাহা জানিয়াও আমরা স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হইয়া বৃথাই হা হুতাশ করিতেছি।

বর্ত্তমান কালে বাঙ্গলা দেশে দুগ্ধ দুর্ভিক্ষের একটী অন্যতম প্রবল কারণ, গোসংখ্যা হ্রাস। লোকসংখ্যা অনুপাতে আমাদের দেশের গোসংখ্যা অন্য বিদেশের অপেক্ষা অনেক কম। প্রতি সহস্র অধিবাসীদের যুক্তপ্রদেশে (মার্কিণ) ৭৮৯, আর্জ্জেনটাইনে ৫১৫, অষ্ট্রেলিয়ায় ২৫৯, নিউজিলাণ্ডে ১৪০, ভারতবর্ষে মাত্র ৫০টী গরু।

দুগ্ধ দুর্ভিক্ষের আর একটী প্রবল কারণ, যে অল্প দুগ্ধ দেশে জন্মে পল্লীবাসীগণ অন্নাভাব প্রযুক্ত তাহার অধিকাংশ সহরে চালান দেয়। দুগ্ধজাত ছানা, মাখম ও ঘৃত ঐরূপ রপ্তানী হইতেছে।

একজন প্রসিদ্ধ গণিতবিদ হিসাব করিয়াছেন আমাদের দেশে দিনে জন প্রতি গড়ে মাত্র ১ ছটাক (মতান্তরে ২ ছটাক) দুগ্ধের সংস্থান আছে। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ উহা অপেক্ষা অনেক অধিক দুধ আহার করে বলিয়া, নিম্নশ্রেণীর লোকেদের অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ লোকের অংশে প্রায় শূন্যাঙ্ক পড়ে। মার্কিণ দেশে সর্ব্ব সাধারণের দুধের

খরচ সমগ্র আহার মূল্যের প্রায় পঞ্চমাংশ, তাহারা দিনে গড়ে প্রতি জন ১ সের দুধ খায়, বিলাতে ১।০, ১॥০ সের দিনে খায়।

দেশে যে স্বল্পসংখ্যক বৃষ ও গাভী আছে তাহারা উপযুক্ত আহার পায় না।. দেশের কৃষকগণ দুর্দ্দান্ত ম্যালেরিয়ার প্রকোপে (যাহা ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ছিল না) দিন দিন স্বাস্থ্য ও শক্তি হীন হইতেছে। এই জন্যও চাষের ক্ষতি ও দুগ্ধের অভাব হইতেছে।

অন্ন বা ধান্য সংস্থান শীর্ষস্থানীয় বলিয়া, বিস্তর গোচারণ ভূমি চাষের জমিতে পরিণত হইয়াছে। আবার উপরোক্ত কারণে কোন কোন জমি বিনা আবাদে জঙ্গলাদি পূর্ণ হইয়া পতিত জমিতে পরিণত হইয়াছে।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাংসাহারীর সংখ্যাও বাড়িতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতা গোরক্ষা সমিতি সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছিল, কলিকাতায় মাত্র ট্যাংরার কসাইখানায় বৎসরে লক্ষাধিক গবাদি জবাই করা হয়। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর লক্ষাধিক গরু মহিষাদি কলিকাতায় আনীত হয়। এই সকল গাভী ও মহিষকে সাধারণতঃ ফুঁকা দেওয়া হয় এবং যখন দুধ ফুরায়, গয়লারা তখন কসাইদের উহা বিক্রয় করে। উহাদের অধিকাংশ অল্পবয়স্কা দুগ্ধবতী গাভী। আমাদের শাস্ত্রে আছে কসাইকে গরু বিক্রয় করিলে গোবধের পাতক হইতে হয়।

সমগ্র ভারত গো কন্‌ফারেন্সের সভাপতি উডরফ সাহেব ১৯২২ সালে লিখিয়াছিলেন সে ভারতবর্ষে সে সময় বৎসরে প্রায় ১ কোটী গোহত্যা হইত।

গোতত্ত্ব বিশারদ শ্রী প্রকাশ চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন যে মোসলেম ধর্ম্মে গোবধ "ওয়াজেব" বা বাধ্যকর নয়। কোরাণাদি ধর্ম্ম

শাস্ত্রে গোহত্যার বিধান নাই। বাবর, হুমায়ুন, আকবর, সাহাজাহান প্রভৃতি মুসলমান সম্রাটগণের গোবধ নিষেধক ফারমান ছিল। এমন কি, কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে স্বাধীন আফগানিস্থানের সম্রাট আমানুল্লা সে দেশের প্রধান কাজী ও ওলেমাদের নিম্নলিখিত ফতেয়া অনুসারে তাঁহার দেশে গো কোর্‌বানী একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

"এই ঘোর সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আমরা আলম বৃন্দের সারগর্ভ উপদেশ স্মরণ করিয়া এই কথা প্রকাশ করিতেছি, যে যদি ভারত মাতার যুগল সন্তান হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ও মিলনের স্বর্ণ সিংহাসন অধিষ্টিত করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে অবিলম্বে গরুর পরিবর্ত্তে ছাগল বা দোম্বা বা ভেড়ার দ্বারা কোরবানী কার্য্য সম্পন্ন করিবে। ইহার ফলে সকলের হৃদয়ে প্রেমের বন্যা সিঞ্চিত হইবে আর ইসলামের ব্যবস্থানুসারে উহা উত্তম কার্য্য এবং উহাতে মুসলমান-গণের পাপী হইবার কোন কারণ নাই।"

বিলাতে দুগ্ধবতী গাভী কদাচ হত্যা করা হয়। সেখানকার পার্লা-মেণ্টে বৎসহত্যার বিরুদ্ধে বিধি ব্যবস্থা বার বার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। হাইদ্রাবাদের নিজামও অবাধ গোহত্যা নিষেধক আইন পাশ করিয়াছেন কিন্তু ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষে, শাসকগণ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জন্য ইচ্ছা করিয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে নাই। ইহাতে উক্ত বিরোধ বর্দ্ধিত হইবারই পথ প্রশস্ত করা হইয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম প্রথম ভারতবর্ষে অবাধ গোহত্যা প্রচলিত ছিল না কিন্তু গত ৫০।৬০ বৎসর যাবৎ উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গোহত্যার আংশিক নিবারণার্থে পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণে এদেশে উপযুক্ত সংখ্যক গো-বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। বিলাতে এই সকল কোম্পানী দুধ ছাড়িবার পর গৃহস্থের গাভী লইয়া

গিয়া পুনশ্চ গর্ভিণী না হওয়া পর্য্যন্ত দূরস্থ চারণক্ষেত্রে পালন করে এবং গর্ভিণী হইবার পর গোস্বামীকে উহা প্রত্যর্পণ করে। কিছুকাল পূর্ব্বে, আমাদের দেশের এক সম্প্রদায়ের লোক এই প্রকার কার্য্যের জন্য মাসে ২।৩ টাকা গরু পিছু লইত তাহাতে উপরোক্ত উদ্দেশ্য আংশিক সাধিত হইত কিন্তু এখন সে সব লোক পাওয়া যায় না।

মাংস ও দুধ কোনটী শ্রেষ্ঠ আহার? সকলেই এমনকি গোখাদকেরা এক বাক্যে বলিবে যে দুগ্ধই শুধু শ্রেষ্ঠতর নয়, অন্যতম শ্রেষ্ঠ আহার। একটী বলদ বা দুগ্ধবতী গাভীকে অকালে মারিতে দিলে ৩০।৩৫ টাকা পাওয়া যায় কিন্তু তাহাতে কত শত টাকার ফসল ও দুধ ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট করা হয়। সুতরাং নীতি ও ধর্ম্মের দিক ছাড়িয়া দিলেও উহা আর্থিক ও স্বাস্থ্যিক কত ক্ষতিকর ও ও কত অন্যায় অন্ধ আত্মঘাতীর কার্য্য তাহা সহজেই অনুমিত হইবে।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অনুপাতে এবং দুগ্ধ ও ফসলের অল্পতায় দেশের লোকের উত্তরোত্তর অনটন, অনশন ও স্বাস্থ্যহানি হইতেছে এবং তাহাদের রোগ প্রতিষেধক শক্তি, কর্ম্ম ও অর্থ শক্তি ক্রমেই কমিতেছে, যাহা প্রতিকূলভাবে দুগ্ধ ও ফসলের চাষ প্রভাবিত করিতেছে। ইহা একটী দুষ্ট পাপ-চক্র বা আবর্ত্তন (Vicious circle)। স্বাস্থ্যহীনতাই দৈহিক, আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধোগতির মূল কারণ।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে কবি হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন ভারতে তখন বিংশতি কোটী লোকের বাস ছিল, এখন ৪০ কোটীর কাছাকাছি, প্রায় দ্বিগুণ। ইহা যে দেশের অভাব ও দৈন্যের অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের পরাধীন দেশে এ বিষয়ে বিদেশী শাসকদিগের দৃষ্টি একেবারে নাই। এমনকি ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ভারতবাসীর স্থায়ী বসবাস এক প্রকার নিষিদ্ধ।

কিন্তু আমাদের দেশ যখন স্বাধীন ছিল তখন উপনিবেশ প্রথা অবলম্বিত হইত। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস মহাশয় তাঁহার "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" পুস্তকে লিখিয়াছেন, বাঙ্গালীরা পূর্ব্বে বঙ্গের ও ভারতের আশে পাশে এবং সুদূর বিদেশে যথা ব্রহ্মদেশ, ক্যাম্বোডিয়া, আনাম, মালয় প্রভৃতি দেশে বহু উপনিবেশ এমন কি সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল তাহার বিশ্বস্ত প্রমাণ প্রাচীন শিলালিপি হইতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ও ৫ম শতাব্দীতে ক্যাম্বোডিয়া ও আনাম (আধুনিক ফরাসী অধিকৃত ইন্দোচীন ও কোচিন চায়না) দেশ হিন্দুরাজ্য ছিল এবং আনাম দেশবাসী ক্যাম্বোজ দেশবাসীর ন্যায় বাঙ্গালীর বংশধর। পুরুষদের মুখশ্রী অনেকটা এবং রমণীদের মুখশ্রী অবিকল বাঙ্গালীদের মত। ওদেশে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই যুদ্ধ করে।

সম্প্রতি ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় শ্যামদেশ পরিভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছেন, অনিমা (আনাম) দেশের একটী অংশ ব্রহ্মপুর বলিয়া অভিহিত হয়। উহার একটী গ্রাম কমলপুর। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী এখনও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ। উহাদের ভাষা, বেশভূষা, আচার প্রণালী, প্রকৃতি ও মুখের আকৃতি অবিকল বাঙ্গালীদের মত। ইহারা রামোপাসক। অনেকের গৃহে পালি ও সংস্কৃত রামায়ণ আছে। কতকগুলি ব্রাহ্মণের নাম মনোরঞ্জন, শিখিধর, নারদ, তরুরাজ, গোলোক চন্দ্র, কানাই, সদাশিব ইত্যাদি। স্ত্রীলোকদের নাম সুন্দরী, মোহিনী, ভবরাণী, ভবানী, গিরিরাণী, শিখরী, কমলা, তট্নি (তটিনী), কাবেরি, কাঞ্চনি ইত্যাদি, এখানে বৈশ্যের উপাধি বদা এবং ব্রাহ্মণের শর্ম্মা ও শিরমাই। ব্রাহ্মণের সাধারণ নাম দিওতা (দেবতা)।

অবশ্য একমাত্র বাস পরিবর্ত্তন বা উপনিবেশ স্থাপন দ্বারা জনতার সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পূর্ণ নিবারিত হইতে পারে না। উহা সাময়িক উপায় মাত্র,

চিরন্তন উপায় নয়। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে দুগ্ধ ও খাদ্যের অভাব মোচনার্থ নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তজ্জন্য সকলকেই এ বিষয়ে উদ্দীপিত, চিন্তিত ও চেষ্টিত হওয়া আশু প্রয়োজন।

(১) জনসংখ্যা অনুপাতে অধিক সংখ্যক গো ও মহিষ পালন।

(২) আইন দ্বারা গো ও মহিষ, বৎস্য এবং দুগ্ধবতী গাভী বা মহিষী হত্যা নিষিদ্ধ করা।

(৩) জন বিরল দেশান্তরে বাস পরিবর্ত্তন।

(৪) জন্ম নিয়ন্ত্রণ। ইহা একটী ফলকরী উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি উহা সমর্থন করিয়া সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। কিন্তু ইহা কার্য্যতঃ কত দূর সম্ভবপর তাহা বলা যায় না। তবে উহার দ্বারা রুগ্ন বা কঠিন পুরাতন রোগগ্রস্তজনের সন্তান প্রজনন প্রতিরুদ্ধ এবং অনর্থক অকর্ম্মণ্য লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও অনেক অসুবিধা আংশিক স্থগিত হইতে পারে। ইহা স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকল্পেও প্রার্থনীয়।

(৫) পাশ্চাত্যদেশের পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলি অবলম্বনে বিশুদ্ধ দুগ্ধ উৎপাদন ও উহার প্রাচুর্য্য সাধন। এজন্য পশু খাদ্যের বিস্তৃত চাষ প্রবর্ত্তন, গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে, বহুসংখ্যক বিরাট দুগ্ধ সমবায় বা সমিতি এবং গো ও মহিষশালা, জনন শালা (Breeding station), গো চিকিৎসালয় এবং গো বিমা প্রভৃতির অনুষ্ঠান।

(৬) বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে একই জমিতে অধিক ফসল বৎসরে অধিকবার জন্মানি এবং পতিত জমিগুলির চাষ। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফসলের অসম্ভব বৃদ্ধি সম্ভবপর।

মনীষী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায়, শ্রী অমরনাথ রায় মহাশয়ের "আদর্শ ফলকর" পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে বিলাতের একজন উদ্ভিদ যাদুকর (চার্লি সিক্রুক) এক বৎসরে একর প্রতি গড়ে প্রায় ৪৬০০৲ টাকা মূল্যের তরিতরকারী উৎপন্ন করিয়াছেন। ইহা খোস গল্পের কথা নয়, প্রমাণিত সত্য।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ফল।

"Fruits are food cooked by the Sun."

ফল একটী খাদ্য যাহা রবিকরে রন্ধিত হয়।

ফল অমৃতোপম তৃপ্তি ও পুষ্টিকর তথা স্বাস্থ্যকর আহার্য্য। ইহা বিধাতার অপার করুণাদান। ফল হিন্দুদের পূজার নৈবিদ্য এবং অন্য প্রীতি উপহারের অন্যতম উপকরণ। আমাদের দেশে বৈশাখ মাসে যখন আম্রাদি নানাবিধ ফল জন্মে তখন অনেকে বিশেষতঃ হিন্দু-ললনাগণ উহা ঠাকুরকে নিবেদন না করিয়া উপভোগ করে না। ইহা সেবা ও ভক্তির উজ্জ্বল নিদর্শন।

"যিস্‌কা বস্তু তিস্ আগে রাখেঃ।"

ফল উদ্ভিদের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি—চরম বা পরম বিকাশ—মানবের প্রতি অপূর্ব্ব ভক্তি নিবেদন। তাই ফলবৃক্ষ ছেদন শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ।

দুঃখের বিষয় আজকাল অধিকাংশ হিন্দুগৃহে নিত্য পূজা ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। সুতরাং ফল নিবেদন ও উহা প্রসাদ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্য অর্জ্জন করিবার সুবিধা এখন আর নাই বলিলেই চলে। তথাপি আমাদের দেশের সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক পরিবারে ফলভোজন প্রথা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের ভোজে ও উৎসবে ফল অপরিহার্য্য। এই প্রশংসনীয় প্রথা অন্য সম্প্রদায়ের অনুকরণীয়। অধিক মূল্যের ফলের পরিবর্ত্তে খাদ্য-প্রাণপূর্ণ কচি শশা, কলা, শাঁকালু, বেল, আখ ইত্যাদি সুলভ ফল ভোজন করিবার সঙ্গতি এখনও প্রায় সকলেরই আছে কিন্তু রুচিবিকার

বা রুচিবিভ্রাট প্রযুক্ত উহাদের স্থল আপত্তিকর ও অধিক মূল্যের চা, রুটি, বিস্কুট ও পচা মাখম অধিকার করিয়াছে।

বেশ মনে পড়ে, বাল্যাবস্থায় যখন পাটনা (বাঁকিপুরে) ছিলাম, সেখানকার ফলের বাগানের রক্ষককে ফলের সময় মাত্র /০ জন পিছু দিলে পেট ভরিয়া আঁব ও অন্যান্য ফল আহার করিতে দিত। সে কি আনন্দ! সে সময় আমাদের বাঙ্গলার পল্লীগ্রামেও ফল প্রায়ই কিনিয়া খাইতে হইত না। তখন ছেলেরা পরের বাগানে ফল লুটিয়া খাইত—উহা চুরী বলিয়া গণ্য হইত না। তখন তাহারা ফলের গাছে চড়িবার, ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িবার, উদ্যানরক্ষকের বা উদ্যানস্বামীর তাড়া খাইবার ও নেড়ার বার বার বেলতলায় যাইবার সুখ উপভোগ করিবার জন্য আকুল ব্যাকুল হইত।

কিন্তু এখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত ক্রমবর্দ্ধনশীল দরিদ্রতার ফলে পল্লীগ্রামে উৎপন্ন অধিকাংশ ফল ও তরিতরকারী সহরে চালান হইতেছে, তজ্জন্য সেখানকার লোকেদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। তথাপি এখনও যে বৎসর দেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে আম, কাঁটাল ও ইলিস মাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে সে বৎসর সকলের স্বাস্থ্যের অল্প বিস্তর উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে ফলাহার প্রচলিত ছিল। উহা প্রতি ভোজের একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল। কিন্তু এখন ফল দুষ্প্রাপ্য বলিয়া চিঁড়া, মুড়ি, মুড়কি, দুধ বা দধি ও মাত্র কদলী সহযোগে প্রস্তুত ফলাহারের অপভ্রংশ 'ফলার' নামক গরীবি আহার উহার স্থান লইয়াছে।

উক্ত ফলার একটী পুষ্টিকর আহার বটে কিন্তু ক্ষীর বা কাঁটালের রস সহযোগে প্রস্তুত উহার মার্জ্জিত সংস্করণ বৈষ্ণবদের পরম

আদরের আহার 'মালসাভোগ' পরিপাক করিবার শক্তি এখন অনেকের নাই। অনেক সময় মলিন হস্তস্পৃষ্ট বাসি বা পচা ফলের রস ও ক্ষীরাদি দ্বারা প্রস্তুত ফলার বা মালসাভোগ বিপজ্জনক হয়। যেখানে এই প্রকার খাদ্যের বিরাট আয়োজন হয়, সেখানে দ্রব্যাদির বিশুদ্ধতা বজায় রাখা বড়ই কঠিন।

একবার পুরীর একটী প্রসিদ্ধ মঠে মালসাভোগ খাইয়া কঠিন উদরাময় ও আমাশা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মুখ বদলান হিসাবে মধ্যে মধ্যে নিজ গৃহে বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত মালসাভোগ আস্বাদন করা যাইতে পারে কিন্তু যাহাদের উপযুক্ত পরিপাকশক্তি নাই তাহাদের উহা না খাওয়াই ভাল। সাদাসিদে সহজ-পাচ্য চিঁড়ে, মুড়কি ইত্যাদির ফলার অন্যতম পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকর আহার।

ইংরাজ ও পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ সাধারণতঃ অধিক মাংসভক্ত বটে কিন্তু মাংসের দোষ নিবারণের জন্য তাহারা শাকসব্জি ও ফল আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে ভোজন করে। এক ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর তথাকার উৎপন্ন ফল ব্যতীত যে অতিরিক্ত ফল বিদেশ হইতে আনীত হয় তাহার মূল্য ৪০।৪৫ কোটি টাকা!

আমাদের দেশে আজকাল যে সকল বিদেশী ফলের চাষ হইতেছে তন্মধ্যে পেঁপে, আতা, নোনা, আনারস, পিয়ারা, সান্তারা লেবু প্রভৃতি প্রধানতঃ পর্টুগিজ বণিকগণ কর্ত্তৃক ১৫৪০ হইতে ১৬১০ খৃষ্টাব্দ এই ৭০ বৎসর কাল মধ্যে ভারতবর্ষে প্রথমে আনীত হইয়াছিল।

ফলভোজন সুস্থ দীর্ঘ জীবন ও যৌবন লাভের উৎকৃষ্ট উপায়। আমাদের দেশের সাধু সন্ন্যাসীগণ বনে বা পর্ব্বতে অন্য আহারীয় অভাবে একমাত্র ফল ভোজন করিয়া সুস্থদেহে জীবন যাপন করে।

কেবল ফল খাইয়া জীবন ধারণ করা সম্ভব। মহাত্মা গান্ধী এক সময়ে লিখিয়াছিলেন—

"আমি বিগত ৬ মাস কেবল ফল খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছি। দুধ ও দই স্পর্শ করি নাই। সাধারণতঃ কলা, চিনাবাদাম, খেজুর ও জলপাইয়ের তেল ও একটু অম্লরস (লেবু) সেবন করি। ইহার ফলে আমি অপরের ন্যায় কোন রোগ ভোগ করি না। ফলাহারে আমার শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। যদিও কোন ভারী জিনিষ তুলিতে পারি না কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকক্ষণ অক্লান্ত দৈহিক পরিশ্রম করিতে পারি, সঙ্গে সঙ্গে মানসিক পরিশ্রমের শক্তি বাড়িয়াছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়তা, একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের সহিত মানসিক শ্রম করিতে সমর্থ। আমার অধ্যয়ন ও নিজ অভিজ্ঞতার ফলে সম্পূর্ণ প্রতীতি হইয়াছে যে ফলাহার মানুষের শ্রেষ্ঠ আহার।"

ফল সম্বন্ধে একটী বিষয় বিশেষ অনুধাবন যোগ্য এই যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে লোকের সাধারণতঃ পিত্তের প্রকোপ বর্দ্ধিত হয়। সেইজন্য প্রাকৃতিক বিধানে ঐ সময়ে নানা পিত্তনাশক ফল সৃষ্ট হয়। অধিকাংশ উৎকৃষ্ট ফল ঐ সময়েই জন্মে। অন্য সময় প্রাকৃতিক নিয়মে ঋতুভেদে নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ ও ফল জন্মে। শরৎকালে বাতাবী লেবু, নালতে ও পলতা বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

ফলে লবণ ঘটিত পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকায় উহা শ্বেতসার বহুল আহারের দোষ নষ্ট করে এবং রক্তের ক্ষারত্ব বজায় রাখে। সুমিষ্ট আম ও কাঁটালের রস সহ্য মত পান করিলে পুষ্টি ও বর্ণের উৎকর্ষতা লাভ হয়। অবশ্য যাহাদের উপযুক্ত পরিপাক শক্তির অভাব তাহাদের পক্ষে কাঁটাল সাধারণতঃ উপযোগী হয় না। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে

আমাদের দেশের লোকের পরিপাক শক্তি এত অধিক ছিল যে জন বিশেষে অনায়াসে একটী গোটা কাঁটাল পরিপাক করিতে পারিত।

বিভিন্ন ফলে বিভিন্ন রোগআরোগ্যকর শক্তি আছে অর্থাৎ ইহা একাধারে আহার ও ঔষধ। বাত ও মেদ বৃদ্ধিতে ফল মাত্রেই বিশেষ উপকার করে। বিভিন্ন ফলের ওষধি গুণ পরে যথা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

কাহারও কাহারও বিশেষতঃ বাত রোগগ্রস্ত লোকের বিশ্বাস ফল ঠাণ্ডা সুতরাং অনিষ্টকর কিন্তু ইহা ভ্রান্তধারণা, বাত ঠাণ্ডায় হয় না। রক্তের দূষিত পদার্থ দেহের বিভিন্ন সন্ধিতে সঞ্চিত হইয়া রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত হইলে বাত জন্মে। সুতরাং ফলের ন্যায় রক্তপরিষ্কারক পদার্থ সেবনে উপকার বই অপকার হইতে পারে না। উহা সেবনে রক্তের ময়লা কাটে বলিয়া দেহের বর্ণ ও লাবণ্য বৃদ্ধি হয়, যৌবন অব্যাহত রাখিবার উহা একটী অন্যতম উৎকৃষ্ট মুষ্টি যোগ।

অন্য ফলাপেক্ষা বর্ণের উৎকর্ষতা সম্পাদন শক্তি লেবুর অধিক। পৃথিবীর যাবতীয় মানব জাতীর মধ্যে স্পেন ও ইটালি দেশের রমণীগণের বর্ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহারা অধিক ফল ভোজন করে। (অবশ্য অন্য বিশেষ কারণ যথা জল বায়ুর প্রভাব ইত্যাদিও আছে)। ঐ দুই দেশের রমণীগণের বর্ণ হস্তি দন্ত সমতুল্য শুভ্র ও পিচ ফলের ন্যায় সাদা ও লাল আভাযুক্ত। সকল দেশের চিকিৎসকগণ বর্ণের উৎকর্ষতা লাভের জন্য ফলের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন করিয়া থাকেন।

একজন পুষ্টিতত্ত্ববিদ লিখিয়াছেন ফলে সাইট্রিক, ম্যালিক ও টারটারিক অ্যাসিড আছে যাহা দেহ পোষণের অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। ফলের বিবিধ লবণ ঘটিত পদার্থ (Minerals) যথা, পটাস,

সোডা, চূণ (Calcium), ফসফরিক অ্যাসিড, গন্ধক ও লৌহাদি পাকযন্ত্রে সত্ত্ব শোষিত হইয়া পাচক-রসের অম্লত্ব নাশ করে এবং পরিপাক ও মলমূত্র নিঃসরণক্রিয়া সম্যক ভাবে সম্পন্ন করে। অন্য কোন আহার্য্যে অত বিভিন্ন প্রকার সত্ত্ব পরিপোষণোপযোগী উপাদান নাই যত ফলে ও দুধে আছে। সেই জন্য এই দুইটী শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ আহার।

যে সকল ক্যালসিয়াম, লৌহ ও ফসফরাস ঘটিত পেটেণ্ট ঔষধ বাজারে বিক্রীত বা বিজ্ঞাপিত হয় তাহা সহজে শরীরে শোষিত (assimilated) হয় না, উহা দেহে কিছু না কিছু সঞ্চিত হয় বলিয়া পরিণামে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। সেই পয়সায় টাটকা ফল অনেক অধিক ফলপ্রদ।

অনেকের ধারণা শিশুদের দুধই শ্রেষ্ঠ আহার। কিন্তু কিছু দুধ ও কিছু পরিমাণ ফলাহারে তাহাদের সমধিক উপকার হয়। বয়োপ্রাপ্ত বালক বালিকাদেরও এই দুইটী অন্যতম আদর্শ আহার। দুধে রোগ বীজাণু মিশ্রিত হইবার খুবই সম্ভাবনা আছে কিন্তু ফল ধুইয়া খাইলে সে ভয় নাই।

ফলের একটী বিশেষত্ব উহাতে (এবং তরকারিতেও) ৭৫ হইতে ৮০ ভাগ পরিস্রুত জলের ন্যায় উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ জল আছে এবং উহা সূর্য্যপক্ক বলিয়া জীবনী শক্তির আকর। ফল ভক্ষণে জল পানের অধিক প্রয়োজন হয় না। ফল আহারে অন্য খাদ্যের লবণজাত উপাদানের অভাব কতক অংশে মিটে এবং মাছ, মাংস, ডাল প্রভৃতির অম্লত্ব দোষ নষ্ট হয়, সেই জন্য রক্ত পরিষ্কৃত হয়।

ফল ভোজনের উপকারীতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মহীশূর ইকনমিক পত্রিকায় যে সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পরপৃষ্ঠায় অনূদিত হইল।

"প্রথমতঃ অম্লরস পাচক সেই জন্য উহা জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত করে। দ্বিতীয়তঃ উহা পাকস্থলীর পরিপাক কার্য্যসাধক রস এবং অম্লের অভাব বিশেষ ভাবে পূর্ণ করে। সুতরাং যাহাদের উপযুক্ত পরিমাণ পাচকরস বা পরিপাকশক্তির অভাব, তাহাদের পক্ষে ফল অসীম হিতকর।"

জঠর রসে যে অম্ল থাকে তাহা পাচকরস সার "পেপসিন" উদ্রিক্ত করিয়া ভুক্তদ্রব্যকে পরিপাক করে। টাটকা ফলে অম্লরসের এই গুণটী অত্যধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। সুতরাং প্রত্যেকবার আহারের সময় কিছু পরিমাণে ফলাহার কর্ত্তব্য।

অনেকের বিশ্বাস বাত ও ইউরিক অ্যাসিড ঘটিত রোগে টক ফল অপকারক কিন্তু ইহা মস্ত ভুল। আহার বিজ্ঞানবিদগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ফলের রসে যে পটাস ও সোডা আছে তাহা দেহের বিষাক্ত পদার্থ বাহির করিয়া দিতে সমর্থ সুতরাং উপরোক্ত রোগে ফল আহারে উপকার বই অপকার হইবে না।"

ফল কোষ্ঠবদ্ধতার একটী মহৌষধ। এ বিষয়ে বেল ও পেঁপে শীর্ষ স্থানীয়। জর্ম্মনী দেশের প্রসিদ্ধ স্বভাবচিকিৎসক ডাঃ জুষ্ট কেবল মাত্র ফল খাওয়াইয়া অনেককে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

"আঁটি শূন্য বা ছোট ছোট বীজযুক্ত সু-গোল ফলে যে অম্ল ও শর্করা আছে তাহা সেবনে পরিপাক যন্ত্রের কার্য্যকারিতা শক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং কোনরূপ প্রদাহ উৎপন্ন হয় না। বৈঁচি, টেঁপারি প্রভৃতির ছোট ছোট বীজ খাইলে অপকার হয় না বরং উহা খাদ্যের কাজ করে, কারণ উহাতে কিছু সার ভাগ (Cellulose) আছে। তবে যে সকল ফলে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও শক্ত বীজ থাকে (যথা কুল ইত্যাদি) তাহা

ফেলিয়া খাওয়া কর্ত্তব্য নচেৎ উহা পাকস্থলী ভারাক্রান্ত এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অন্ত্রের সংযোগ স্থলে সঞ্চিত হইয়া প্রদাহ ও স্ফীতি উৎপাদন করিবে। আঙ্গুরের খোসা ও বীজে কোন পুষ্টিকর পদার্থ নাই, উহা দুষ্পাচ্য বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

কতকগুলি ফল, যথা শশা, পীচ ও আপেলের খোসায় অধিক লবণ ঘটিত পদার্থ থাকে বলিয়া ঐগুলি খোসাসুদ্ধ খাইলে অধিক উপকার হয়।"

কেহ কেহ বলেন ভোজনের শেষে ফল সেবনে ভুক্তবস্তু সহজে পরিপাক হয় কারণ ফলের ভিতর অনেক পাচক বা জীর্ণকর রস আছে। কিন্তু খালি পেটে বা আহার জীর্ণ হইবার শেষ সময়ে কিম্বা দুই আহারের মধ্যবর্ত্তী সময়ে ফল খাইলে অধিক উপকার হয়।

অপকারীতা।

পোকা বা ছাতাধরা, পচা বা বেশী পাকা ফল অহিতকর। শুষ্ক, অশুষ্ক সকল প্রকার ফল ধুইয়া খাওয়া উচিত নচেৎ তৎসংলগ্ন কীট বা বীজাণু উদরে প্রবেশ করিয়া রোগের সৃষ্টি করিতে পারে। বহুক্ষণ পূর্ব্বের কাটা ফল বিশেষতঃ বাজারে বা রাস্তায় বিক্রীত ছাড়ান ফল অনিষ্টকর।

ফলের সহিত দুধ, বিরুদ্ধ ভোজন বলিয়া কথিত হয় কিন্তু মিষ্ট ফল যথা আম, বেল বা কাঁটাল দুধের সহিত খাইলে কোন অনিষ্ট হয় না বরং উহা ভুক্তদ্রব্য পরিপাকে সহায়তা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে। ইহা বার বার পরীক্ষিত।

সংরক্ষিত খাদ্য বিশেষতঃ টিন পাত্রে রক্ষিত ফল ও তরকারী সহজে পরিপাক হয় না কারণ টিনের ও উহার সিসা ঝালের সূক্ষ্ম পরমাণু

উক্ত খাদ্যে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং উহা পরিত্যজ্য। তবে কাঁচ বা প্রস্তর পাত্রে সংরক্ষিত অম্ল ফল যথা লেবু ইত্যাদির আচার বা অন্য ফল বা ফলের রস অনিষ্টকর নয়।

দীর্ঘকাল ফল অবিকৃত রাখিবার উপায়ঃ—

১০০ ভাগ জলে ৩ ভাগ ফরমালিন (Formalin) মিশাইয়া উহাতে পাকা ফল ১৮ মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখিলে ফল বিশেষে ১ হইতে ২ মাস অবিকৃত থাকে বলিয়া কথিত হইয়াছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় মধুতে ফল সংরক্ষণ, উহা অনেক দিন অবিকৃত থাকে।

বিভিন্ন ফলের গুণাগুণ সম্বন্ধে ইহার পরে যে বিবিধ তথ্য গুলি প্রকাশিত হইল তাহার কতকগুলি কৃষি সম্পদ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হলধর বাবু, শ্রী দীনেশ চন্দ্র দেব প্রভৃতি উদ্ভিজতত্ত্ববিদগণের প্রবন্ধ এবং হাকিম মসিহর রহমান কোরায়শী বিরচিত "সহজ হাকিমী দ্রব্য গুণ শিক্ষা পুস্তক" হইতে সঙ্কলিত। সে জন্য গ্রন্থকার বিশেষ ঋণী। আয়ুর্ব্বেদোক্ত বহু তথ্যও দেওয়া হইয়াছে।

আঙ্গুর।

উৎকৃষ্ট জাতীয় সুপক্ব আঙ্গুর "অমৃত ফল" (আঙ্গুরের অন্য নাম)। ইহা স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও দীর্ঘায়ুলাভের প্রকৃতিদত্ত অন্যতম উৎকৃষ্ট আহার্য্য। আঙ্গুরের বিভিন্ন নাম দ্রাক্ষা, রসালা, চারুফল, পিয়ালা, যক্ষ্মঘ্নী, স্বাদু ফল ইত্যাদি উহার রূপ ও গুণ পরিচায়ক।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা হৃদ্য, রতিশক্তি ও স্বরবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, মধুর, শীতল, রক্তপিত্ত, জ্বর, শ্বাস, কাস, শোথ, তৃষ্ণা, পিত্ত, দাহ, প্রমেহ, বাত, কামলা, মদাত্যয়, বমি এবং ক্ষয় নিবারক, মূত্রদোষহর ও বৃষ্য। শুষ্ক দ্রাক্ষা বা কিস্‌মিস্‌ শ্রমনাশক, স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর।

ভাবপ্রকাশ মতে পাকা আঙ্গুর মলমূত্রকারক এবং মুখের তিক্ততা ও শুষ্কতা নাশক। গোস্তনী দ্রাক্ষা যাহা শুষ্ক হইয়া মনাক্কা নামে অভিহিত হয় ও কিস্‌মিসে (শুষ্ক ছোট আঙ্গুরে) উপরোক্ত গুণ অল্প বিস্তর আছে।

আধুনিক মতে কিস্‌মিস্‌ ও মনাক্কা শ্রমহর, স্নিগ্ধ, শীতল ও মৃদুরেচক এবং জ্বরের পিপাসা নাশক। উহা প্রদাহমূলক পীড়া, কোষ্ঠবদ্ধ, চক্ষু ও কামলা রোগে হিতকর। কোষ্ঠবদ্ধে উহা দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। খালি পেটে সহ্যমত কিছু বেশী পরিমাণ আঙ্গুরের রস সেবনে, ক্ষয় ও পৈত্তিক জ্বরাদিতে উপকার করে। বক্ষ ও পাকাশয় রোগে আঙ্গুর সেবনীয়। উদারাময় বা আমাশা রোগে আঙ্গুর বা কিস্‌মিস্‌ অপথ্য।

একজন ইংরাজ পুষ্টিতত্ত্ববিদ্‌ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে আঙ্গুরে পটাস, চুণ, লৌহ, গন্ধক, টারটারিক ও ম্যালিক অ্যাসিড, গ্লুকোজ, যবক্ষার জান এবং পরিস্রুত জল আছে। বাত, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, রক্তের চাপ বৃদ্ধি, চর্ম্মরোগ (Eczema), অম্ল ও মূত্রাশয়ের কতিপয় রোগ এবং আরো অনেক কঠিন ও জটিল রোগ কেবলমাত্র কিস্‌মিস্‌ বা আঙ্গুর বিধিমত সেবনে আরোগ্য হইয়াছে ও হইতেছে। এ সম্বন্ধে ডাক্তার জোসিয়া ওল্ডফিল্ডের পুস্তক দ্রষ্টব্য।

হাকিমী মতে আঙ্গুর আহারে শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট এবং রক্ত পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ রক্ত উৎপন্ন হয়। ইহা মূত্রাশয়, বক্ষঃস্থল ও ফুস্ফুসকে সবল করে। **আঙ্গুর খাইবার পর শীতল জলপান অহিতকর।** উহাতে পাণ্ডুরোগ ও জ্বর হইতে পারে। আঙ্গুরের বীজ বায়ুবৃদ্ধিকর ও কোষ্ঠকাঠিন্য উৎপাদক। কাঁচা ও অম্ল আঙ্গুর রক্তপিত্ত প্রকোপ

নাশক, পিত্তনিঃসারক, পাকস্থলীর কফ নাশক, সঙ্কোচক, যকৃৎ সবল কারক, পিপাসা ও দেহের অলসতা নিবারক। ইহার রস পানে মদ্য পান জনিত মত্ততা নষ্ট হয় এবং উহা পাকস্থলীকে সর্ব্বপ্রকারে সবল করে। ইহাতে "এ", "বি" ও "সি" ভিটামিন আছে।

একজন স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ লিখিয়াছেন, আঙ্গুরের রস (Grape juice) রোগীর উৎকৃষ্ট বলকর পথ্য। যখন তাহার অন্য কোন দ্রব্য ভাল লাগে না বা পেটে তলায় না তখন উহা সেবনে ঐ দোষ জন্মে না। ইহার শর্করা অংশ যাহা গ্রেপ সুগার নামে অভিহিত হয় তাহা সহজে আত্মসাৎ হয়। ইহা রক্তের ক্ষারত্ব বৃদ্ধি করিয়া অম্লত্ব হ্রাস করে এবং অধিক অম্লজনিত দোষ নিবারণ করে। শুধু রোগের সময় নয়, আরোগ্যের পর পুনঃস্বাস্থ্য লাভ করিতে এবং যে স্থলে অন্য শর্করা-জাতীয় খাদ্য সেবনে হজমে বিঘ্ন ঘটে সে সব স্থলে আঙ্গুর অতি উপযোগী।

আঙ্গুর ও ডালিম সর্ব্বজনপ্রিয় ও সুখদর্শন ফল। কোন কোন বরবর্ণিনী রমণীর এই দুই ফলের কোন একটী নামে নামকরণ হইয়া থাকে। যথা—আঙ্গুরবালা, ডালিম কুমারী, বেদানা সুন্দরী ইত্যাদি। পুরুষদের আলু ও পটল প্রিয়তা সূচক নাম যথা আলু বাবু ও পটল বাবু অপেক্ষা রমনীদের উক্ত ফলের নাম গ্রহণ অধিকতর গুণগ্রাহীতার পরিচায়ক। তবে আলু ও পটল ফেল্‌না যায় না, না হ'লে চলে না।

আখরোট।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা বাদামের তুল্য উপকারী কিন্তু কফ ও পিত্তকারক।

ডাক্তারী মতে ইহার শাঁস কামোদ্দীপক। ইহাতে অধিক পরিমাণ স্নেহদ্রব্য আছে বলিয়া বলকর। ইহার তেল অৰ্দ্ধ বা ১ ছটাক মাত্রায় সুস্থ ও নিরাপদ বিরেচক।

হাকিমী মতে ইহা সেবনে কোষ্ঠ পরিষ্কার, মস্তিষ্ক সবল, রতি ও স্মরণশক্তি বৰ্দ্ধিত, উপদংশ রোগ উপশমিত এবং পেটের দুষিতবায়ু ও ক্রিমি বিনষ্ট হয়। ইহার শাঁস ভাজিয়া সেবনে সৰ্দ্দিকাসিতে উপকার হয়। ইহার খোসা জলে সিদ্ধ করিয়া কুলকুচা করিলে দাঁতের মাঢ়ি সবল এবং মাঢ়ি ফুলা দুর হয়। ইহার খোসার সূক্ষ্ম চূর্ণ ক্ষতে দিলে উহা শুষ্ক হয়। রক্ত পরিষ্কার করিবার জন্য উপদংশ রোগেও উহা ব্যবহৃত হয়। ইহার শাঁস সেবনে পেটের ব্যথা ও কামড়ানি দূর হয়।

আখরোটের তেল মৰ্দ্দনে বায়ু ও পিত্তপ্রকোপ দূর এবং রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। ইহা মস্তকে মৰ্দ্দন করিলে চুলের গোড়া শক্ত হয়। ইহা অধিক মাত্রায় সেবনে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং মনের প্রফুল্লতা আনে কিন্তু উহা গুরুপাক। বৃদ্ধের পক্ষে মনাক্কা ও আঞ্জিরের (মিষ্ট ডুমুরের) সহিত আখরোট সেবন হিতকর।

ইহার সোরমা চক্ষে দিলে চক্ষু হইতে জলপড়া নিবারিত হয় এবং চক্ষুর চুলকানি ইত্যাদি সৰ্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ দূর হয়। পিঁয়াজ, লবণ ও মধুর সহিত প্রলেপ দিলে ক্ষিপ্ত কুকুর দংশনের বিষ নষ্ট হয়। ইহা বাটিয়া প্রলেপ দিলে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের দাগ মিলাইয়া যায়। আখরোট চিবাইয়া দাদে লাগাইলে দাদ আরোগ্য হয়। আখরোটের পাতার রস রক্তপরিষ্কারক, দূষিত রস ও ক্লেদ নিঃশেষক।

আতা।

আতা পোষক, বলকর, রক্তবৰ্দ্ধক, মাংসোৎপাদক, শীতল, দাহ, পিত্ত ও বায়ু নাশক এবং কিছু গুরুপাক। ইহাতে অন্য দেশী ফলের

অপেক্ষা ফসফরিক অ্যাসিড অধিক থাকে সেই জন্য উহা মস্তিষ্কের পরিপোষক ও বলকর এবং রোগের পর দুর্ব্বলতায়. আনারসের ন্যায় বিশেষ উপকারী। ইহা সেবনে যকৃতের ক্রিয়া বর্দ্ধিত ও সুনিদ্রা আনীত হয়। ইহা মুখ রোগ নাশক এবং অগ্নিমান্দ্য ও গলরোধ প্রতিষেধক, বায়ু ও পিত্ত নাশক, শ্লেষ্মাজনক, তৃষ্ণানিবারক, বমন ও বিবিমিষাহর, রক্তবর্দ্ধক, বলপ্রদ এবং দাহ ও রক্তপিত্ত নাশক।

ঔষধার্থে আতার মূল, পত্র ও বীজ ব্যবহৃত হয়। আতা বীজ পেষণ করিয়া মাথায় মাখিলে উকুন মরিয়া যায়। আতা পাতার রস দূষিত ঘা, ফোড়া, নালী ঘা প্রভৃতি ক্ষত রোগে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। এমন কি পৃষ্ঠাঘাত রোগে (Carbuncle) ও ক্ষয় রোগ-জনিত হাড়ের পচনে (Tubercular Caries) উহার পাতা বাটিয়া তদুপরি গরম করিয়া পুলটিস দিলে উহা আরোগ্য হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। আতা শৈত্যকারক বলিয়া সর্দ্দি কাসিতে অপথ্য।

আপেল।

বিলাতে আপেল সকল ফলের সেরা বলিয়া কথিত হয়। মার্কিণ দেশের একটী সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে এই ফলে সে দেশের অন্য ফল বা তরকারি অপেক্ষা অধিক ফসফরাস থাকায় উহা মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া দেশে এরূপ প্রবাদ আছে যে, আপেল দেবতাদের আহার তজ্জন্য উহা দেবতাকে উৎসর্গীকৃত করা হয়। যখন তাহাদের দেশের লোক দুর্ব্বল ও অক্ষম হয়, তখন দেহ ও মনের শক্তি লাভার্থ তাহারা এই ফল আহার করে।

যাহারা অলসে জীবন যাপন করে এবং তজ্জন্য বা অন্য কারণে যাহাদের যকৃৎ নিষ্ক্রিয় বা মৃদু ক্রিয়াশীল (Sluggish) হয় তখন তাহারা আপেল সেবন করিলে পাচক রসের গুণ ও ক্রিয়া বর্দ্ধিত হইয়া অধিক পরিমাণে ইউরিক অ্যাসিড বা শরীরের দুষিত পদার্থ সমূহ নিষ্কাসিত হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। আপেলে সামান্য পরিমাণ "এ" ভিটামিন এবং কিছু পরিমাণ "বি" ও "সি" ভিটামিন আছে। একজন ইংরাজ পুষ্টিতত্ত্ববিদ বলিয়াছেন—

"Apple is the friend of both brainworker and the seeker after health".

আপেল মস্তিষ্কজীবী ও স্বাস্থ্যকামী উভয়েরই বন্ধু।

আর একজন বলিয়াছেন—

"An apple a day keeps the Doctor away."

প্রতিদিন একটী আপেল আহার করিলে ডাক্তারকে দূরে রাখা যায়।

আমাদের দেশের জলবায়ুতে উহা জন্মে না, সেই জন্য বিদেশ হইতে অসময়ে আনীত এই ফল সেবনে যে উক্ত উপকার লাভ হইতে পারে তাহা আশা করা যায় না। আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট আম্র ফল উহার স্থান লইতে পারে।

আনারস।

"বন থেকে বেরুল টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।" আনারসের মাথার উপর যে পত্রগুচ্ছ থাকে তাহা টোপরের মতন দেখায়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে পাকা আনারস রুচিকর, শ্রম ও ক্লান্তি নাশক, ক্রিমি নাশক, বলকর, স্নিগ্ধ, সারক, বায়ু ও পিত্ত দোষ নাশক এবং সর্দ্দি গরমি নিবারক। কাঁচা আনারস গুরু এবং কফ ও পিত্তকর। ইহা এবং ইহার পত্র জরায়ুসঙ্কোচক ও গর্ভস্রাবী বলিয়া প্রসূতিদের পক্ষে নিষিদ্ধ। আনারসের পাতার গোড়ার দিকের সাদা অংশের রস সেবনে ভেদ নিবারিত ও ক্রিমি নষ্ট হয়। উহার কোঁড়ের (কচি পাতার) রস চিনির সহিত সেবনে হিক্কা প্রশমিত হয় এবং চুণের জলের সহিত পানে শিশুদের ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

হাকিমী মতে, আনারস সেবনে মন প্রফুল্ল, হৃৎপিণ্ড সবল ও হৃৎস্পন্দন নিবারিত হয়। ইহা বর্ণপ্রসাদক ও কৃশতা নাশক। ইহার রস গোলাপ জল ও মিসরির সহিত মিশাইয়া রাত্রে শিশিরে রাখিয়া সকালে পান করিলে পিত্তজ্বর ও পাথরী বিনষ্ট হয়।

আধুনিক মতে পাকা আনারস তাপনাশক, মূত্রবৃদ্ধি ও ঘর্ম্মকর, পাণ্ডু ও শ্বাসনলীর প্রদাহ নিবারক এবং পাকস্থলীর উত্তেজনা নাশক। ইহাতে 'এ' ও 'সি' ভিটামিন আছে। আনারস পাতার টাটকা রস চিনির সহিত সেবনে উৎকাসি (Hiccough) নিবারিত হয়। পাকা ফলের রস, মূত্র ও ঘর্ম্মকর এবং কামলা ও যকৃত রোগে বিশেষ হিতকর। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের পর বল ও পুষ্টি লাভের জন্য পাকা আনারসের রস পান অসীম হিতকর।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার বেলি সাহেব বলিয়াছেন জ্বরের সময় পাকা আনারসের রস ছাঁকিয়া ২ চামচ মাত্রায় সেবনে পাকস্থলীর প্রদাহ বা উত্তেজনা প্রশমিত হয়।

সম্প্রতি টাইম পত্রিকায় প্রকাশ, এক জন পাশ্চাত্য পুষ্টিতত্ত্ববিদ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে গরম জলে, লবণাক্ত জলে বা

গরম আনারসের রসে মহীলতা (বৃহৎ ক্রিমি) মরে না। কিন্তু ঠাণ্ডা তাজা আনারসের রসে, উহা রাখিলে মরিয়া যায়। আমাদের দেশে আনারসের পাতা ও আনারসের রসের ক্রিমিনাশক গুণ সকলেই জানে কিন্তু দুঃখের বিষয় উহাদের পরিবর্ত্তে আমরা বিষম তিক্ত ক্রিমি সংহারিণী বা ক্রিমি কালান্তক বা ক্রিমি বজ্রানল প্রভৃতি গ্রহণে প্ররোচিত হই।

আম্র।

"ফলের মধ্যে আম, নারীর মধ্যে সুন্দরী, জলের মধ্যে গঙ্গাজল সেরা।"

আম রূপে, গন্ধে, স্বাদে, মধুরতায় সকল বিষয়েই সব ফলের সেরা এরূপ প্রবাদ। রাম-রাবণের যুদ্ধকালে হনুমান আমের অভূতপূর্ব্ব স্বাদ গ্রহণে তৃপ্ত হইয়া ভারতবাসীদের উহার মধুর আস্বাদ গ্রহণ করাইবার জন্য কতকগুলি বীচি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ছড়াইয়া দিয়াছিল। তজ্জন্য ভারতবাসী চিরকৃতজ্ঞ। এই জন্য বোধ হয় হনুমানের জাতভাইগণের অত্যাচার এত দিন সহিয়া আসিতেছি। হয়ত আমের আদি জন্মস্থান সিংহল বলিয়া ঐরূপ প্রবাদ রূপক রূপে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু এবিষয়ে মতভেদ আছে, অনেকে ভারতবর্ষই উহার আদি জন্মস্থান বলেন।

আমের সংস্কৃত নাম আম্র, রসাল, চ্যূত, সহকার, অতি-সৌরভ, কামাঙ্গ, মধুদুত, মাকন্দ ও পিকবল্লভ। আম্র একটী অন্যতম দেবভোগ্য আহারীয়। বাঙ্গলার অনেক প্রদেশে সাধারণ লোকে, বিশেষতঃ রমণীগণ, দেবতাকে আম্র উৎসর্গ না করিয়া উহা আহার করে না।

আয়ুর্ব্বেদ মতে গাছপাকা মিষ্ট আম আয়ু ও শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বলকর, বাতঘ্ন, হৃদ্য, বর্ণপ্রসাদক, শীতবীর্য্য, অগ্নি ও রুচিকর, বায়ুনাশক, চক্ষুর হিতকর কিন্তু কিঞ্চিৎ পিত্তকর। মতান্তরে পিত্তকর নয়। উষিত বা কৃত্রিম পক্ক অর্থাৎ ডাঁসা আম ঘরে পাকিলে অতিশয় রুচিকর, বলপ্রদ, লঘু, শীতবীর্য্য, বাত ও পিত্তনাশক হয়।

আমে সামান্য মাত্রায় "বি" ও "সি" ভিটামিন এবং বেশী পরিমাণে "এ" ভিটামিন আছে যাহা অত অন্য কোন ফলে নাই।

দুধের সহিত ভাল আঁশহীন আমের রস খাইলে শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। ইহাতে দুধের ও আমের উপকার এক সঙ্গে পাওয়া যায়। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন। আম কাটিয়া খাওয়া অপেক্ষা চুষিয়া খাওয়া ভাল কারণ আঁশ গুরুপাক, উহাতে পেট ফাঁপে ও আমাশা রোগ জন্মিতে পারে।

বহুমূত্র রোগে পাকা আম, আহার ও ঔষধ, কেহ কেহ উহা আরোগ্যকরও বলিয়াছেন। এই রোগে চিনি বা মিষ্ট দ্রব্য নিষিদ্ধ কিন্তু যে কোন খাদ্য ব্যবস্থিত হউক না কেন তাহাতে শর্করা কিছু না কিছু আছে। আমে মিষ্টরসের সহিত লবণ জাতীয় পদার্থ এবং কিছু অম্লরস থাকায় উহার মিষ্টের দোষ অনেকাংশে খণ্ডিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে (রাজ বল্লভ) পাকা আম মধুর সহিত ভক্ষণে ক্ষয়রোগ, প্লীহা ও বাতশ্লেষ্মা উপশমিত হয়। উহা ঘৃতের সহিত সেবনে বাত ও পিত্ত নাশ এবং অগ্নি, বল ও বর্ণ বৃদ্ধি করে।

অধিক পাকা আম বিশেষতঃ টক আম অধিক দিন খাইলে অজীর্ণ, উদরাময়, অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, রক্তদুষ্টি ও চক্ষুরোগ জন্মিতে পারে। অতএব উহার সংযত ব্যবহারই উচিত। অধিক পাকা আম খাইবার

দোষ শুঁঠের কাথ (২ তোলা শুঁঠ ½ সের জলে পাক করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ২।৩ বার সেবনে) বা ১ আনা সচল লবণ সহ ১ আনা পরিমাণ জীরা ভক্ষণে নিবারিত হয়। হোমিওপ্যাথি পলসেটিলা ঔষধেও বিশেষ উপকার হয়। অত্যন্ত গ্রীষ্মে আম শীতল বা বরফ জলে ভিজাইয়া খাইলে উহার উষ্ণতা দোষ কাটে। মিষ্ট আম খাইয়া কিছু দুধ খাইলে উহা সহজে জীর্ণ হয়।

আমসত্ব, তৃষ্ণা, বমি, বায়ু ও পিত্ত নাশক, পাচক এবং রুচিকর। তেল মাখাইয়া রাখিলে উহা এক বৎসরকাল ভাল থাকে। মিষ্ট আমসত্ব রোগীর বিশেষতঃ আমাশাগ্রস্ত রোগীর সুপথ্য। উহা দুধের সহিত খাইলে অতিশয় তৃপ্তিকর হয় এবং উহার অম্বল করিলে অতি উপাদেয় হয়।

সকল প্রকার আমের মধ্যে সাধারণতঃ বোম্বাই ও ল্যাংড়া উৎকৃষ্ট। ভিটামিনের দিক দিয়া দেখিলে ফজলী আমে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক 'এ' ও 'বি' ভিটামিন আছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত মহাশয় কৃষি সম্পদ পত্রিকায় লিখিয়াছেন মজঃফরপুরের হাজিপুর মহাকুমায় যে অত্যুৎকৃষ্ট মালদহ আম জন্মে তাহাই ল্যাংড়া নামে পরিচিত। এরূপ প্রবাদ, সেখানকার জনৈক খোঁড়া বাবাজির কুটীরের নিকট একটী আম গাছ ছিল, তিনি সেই গাছের গোড়ায় প্রতিদিন দুধ ও জল সেচন করিতেন। যে কারণেই হউক, ল্যাংড়া বাবাজীর আম অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। উক্ত বৃক্ষের কলম নানা স্থানে আনীত হইয়া ল্যাংড়া নামে অভিহিত হইয়াছে।

পশ্চিমের অনেক প্রদেশে বহু পরিমাণে ল্যাংড়া আম জন্মে, কিন্তু কাশীর ল্যাংড়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, উহার তুলনা নাই। এমনকি ইংরাজেরাও উহার পরম ভক্ত। নাম শুনিলে খাইবার ইচ্ছা হয়।

এই আম খাইয়া এক সময় একজন ভক্ত ঈশ্বরের করুণা ও দান স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল, শোনা গিয়াছে।

আমার কনিষ্ঠ কন্যার কেশবপুর গ্রামস্থিত শ্বশুরালয়ে, এক বৎসর চৈত্র মাসে, একজন সাধু মহাপুরুষ আসিয়া বাটীর আঙ্গিনায় তিন দিন আসন করিয়া অবস্থান করেন। গৃহস্থের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি যাইবার সময় বলিয়া যান "একটী অমৃত ফল দিয়া গেলাম।" ইহার অর্থ তখন কেহ বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী বর্ষাকালে যেখানে তাঁহার আসন ছিল সেই স্থান হইতে একটী আম গাছ স্বতঃ উৎপন্ন হয়। তাহার ফল ল্যাংড়া আম অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। ঐ গাছের কলম আমার মধ্যম গ্রাম উদ্যানে রোপণ করিয়া উক্ত প্রকার ফল পাইতেছি।

বোম্বাই জাতীয় আমগুলি যথা ভুতো বোম্বাই, সুরট বোম্বাই, হিমসাগর, বিরে প্রভৃতি দেশী আম আঁশহীন এবং অতি মিষ্ট ও উপাদেয়। বোম্বায়ের বিখ্যাত অ্যালফান্‌সো আম যাহার প্রশংসায় অনেকে শত মুখ তাহা উপরোক্ত আম্রগুলি অপেক্ষা যে মোটের উপর অধিক ভাল তাহা বলিতে পারা যায় না, তবে অ্যালফান্সো আমের বৈশিষ্ট, ইহা অন্য আম অপেক্ষা অনেক দিন সংরক্ষিত হইতে পারে, সেইজন্য ইউরোপে এখন উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে চালান হইতেছে। হিমসাগর ও ভুতো প্রভৃতি আমাদের দেশীয় আমেরও এই গুণ আছে, চেষ্টা করিলে উহা আমাদের দেশ হইতে বিলাতে রপ্তানী হইতে পারে।

একবার বোম্বাই সহরে গিয়া অ্যালফান্সো আম্রের আস্বাদ গ্রহণ মানসে সেখানকার প্রসিদ্ধ ক্রফোর্ড মার্কেটে গিয়া ১ ঝুড়ি ঐ আম দর করি। উহাতে প্রায় ১০০টী আম ছিল, মূল্য ৩৩ টাকা। আমি দর

শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকি। অবিলম্বে দরদস্তুর না করিয়া একজন শেঠি উক্ত ঝুড়ি ৩৩ টাকা মূল্যে খরিদ করিল। আমি খুচরা কিছু কিনি। কিন্তু উহা আস্বাদন করিয়া বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয় না।

হাকিমী মতে, মিষ্ট আম আহারে পাকাশয়, অন্ত্রমণ্ডল, মূত্রাশয়, শ্বাসযন্ত্র ও পিত্তকোষ সবল হয়; রতিশক্তি ও জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত হয়; শিরোবেদনা, শূলবেদনা ও অর্শ প্রশমিত এবং কর্ণ পরিষ্কৃত হয়; কাসি ও পিত্তপ্রকোপ কমে; দেহ স্থূল হয় এবং অলসতা, প্রস্রাব বৃদ্ধি, কোষ্ঠবদ্ধতা ও পিপাসা দূর হয়। কিন্তু অধিক পাকা আম খাইলে বিশেষতঃ বাসি মুখে খাইলে, উষ্ণ প্রকৃতির লোকের দন্ত মাড়ির অপকার বা যকৃতের দৌর্ব্বল্যাদি হইতে পারে।

উপরোক্ত মতে কাঁচা আম খাইলে মূত্রাধার ও মূত্রস্থলীর পাথরি বিনষ্ট হয় কিন্তু গর্ভস্রাবের আশঙ্কা আছে। কাঁচা আমের আচার পিত্তল ব্যক্তিদের পক্ষে হিতকর। মিষ্ট পাকা আম ও মধু ভোজনে প্লীহা রোগে উপকার হয়। আমের মিষ্ট মোরব্বা পাকস্থলী সবল এবং অর্শ রোগে উপকার করে। খুব কচি আম (যাহাতে আঁটি হয় নাই) ১৪ মাষা মাত্রায় সম পরিমাণ গুড়ের সহিত সেবনে শুক্র-মেহ দুর, বীর্য্য স্তম্ভিত এবং পিপাসা নিবারিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে কাঁচা আম ত্রিদোষজনক। উহা বেশী পরিমাণে খাইলে অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, রক্তদুষ্টি ও চক্ষুরোগ জন্মে। কিন্তু সূর্য্য পক্ক আমসী বা আমচুর ভেদক, কফ ও বায়ুনাশক। অত্যন্ত কচি আম কষায়, রুচিকর এবং বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক। অতিরিক্ত মৎস্য ভক্ষণজনিত অজীর্ণে কাঁচা আম এবং মাংস ভক্ষণ জন্য অজীর্ণে আমের আঁটির শাঁস সেবন হিতকর।

আমের আঁটির শাঁস অত্যন্ত সঙ্কোচক (Astringent)। উহা লবণের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে পাচকক্রিয়া বৃদ্ধি এবং ভাজিয়া খাইলে কোষ্ঠবদ্ধ হয়। আমের আঁটি তিন বৎসরের পুরাতন হইলে উহার বিষনাশক ওষধী গুণ জন্মে। উহার তৈল মর্দ্দনে পাকস্থলী সবল ও পিত্ত নিঃসৃত হয়। উহা বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক এবং সর্ব্ব শরীরকে সবল করে। উহা অগ্নিদগ্ধ স্থানে লাগাইলেও উপকার হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে উহা বমি, অতিসার ও হৃদ্‌প্রদেশের দাহনাশক।

আমের বোল কফ ও রুচিকারক, ধারক ও বায়ুবর্দ্ধক।

আম গাছের ছাল পাণ্ডুরোগে হিতকর। ইহা আমাদের বংশগত স্বপ্নাদ্য ঔষধ, বহু স্থলে পরীক্ষিত। নিম্নলিখিত উপায়ে উহা প্রস্তুত করিতে হয়।

আম গাছের ছাল একটু খয়ের ও গঙ্গা জলের সহিত বাটিয়া দুই হাত ও দুই পায়ের সমগ্র দেশে প্রলেপ দিয়া কিছুক্ষণ রাখিবে পরে গরম জল দিয়া ধুইয়া ফেলিবে। দিনে দুইবার। এইরূপ তিন দিন করিতে হইবে।

আমছাল ও আমপাতা অন্য অনেক রোগে ফলপ্রদ। যথা—

আগুন পোড়া—আমপাতা বাটার প্রলেপে উপকার হয়।

বহুমূত্র রোগ—আমের কচি পাতার গুঁড়া সেবনে উপশমিত হয়।

শোথ, গুল্ম ও অগ্নিমান্দ্য—আম গাছের মূলের ছাল ও শ্বেত-পুনর্ণবার ক্বাথ সেবন।

শিশুদের মুখের ভিতর ঘা—সারযুক্ত আমগাছের ছাল, গেরিমাটি ও রসাঞ্জন সমভাগে মধুর সহিত মিশাইয়া প্রলেপ।

ক্রিমিরোগ—আমের ছাল আধ তোলা ও জল আধ সের, আধ পোয়া থাকিতে পাক হইতে নামাইয়া সেব্য।

বিবিমিষা—নূতন আমের পাতা, ঘৃত ও চন্দনে সিক্ত করিয়া আঘ্রাণ।

সর্দ্দিগর্ম্মি—কাঁচা আম পোড়া ঠাণ্ডা জলের সহিত সেবনে আশু উপকার হয়। ইহা সেবনে পশ্চিমের "লু" লাগাতেও উপকার করে।

গ্রহণী—আম ও জাম গাছের ছালের ক্বাথ খৈ চূর্ণসহ সেবনে গর্ভিণীর গ্রহণী রোগ নষ্ট হয়।

অতিসার—আম গাছের ছাল ২ তোলা পিষিয়া দধির সহিত মিশাইয়া আহারে অতিসার ও উদর বেদনা প্রশমিত হয়।

রক্তাতিসার—আম গাছের ছাল ২ তোলা বাটিয়া আধ পোয়া ছাগল দুধের সহিত দেড় পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া দুধটুকু অবশিষ্ট থাকিলে নামাইয়া একটু চিনির সহিত সেব্য।

অতিসারের পক্কাবস্থায়—আমের কচি পাতা বাটিয়া ও কৎ-বেলের শাঁস সমান অংশ ½ তোলা মাত্রা চাউল ধোয়া জল সহ সেবন।

কানচটা—কান চটকা ঘা বা কানের ঘায়ে আম গাছের সাদা সাদা চটা সরিষার তেলের সহিত ভাজিয়া প্রলেপ।

আমের আঁটি নিম্নলিখিত অন্যান্য রোগে উপশম বা আরাম করে :—

প্রদর—আম্রকুশী বাটা এক পোয়া, চাঁপাকলা ১টা ও গব্য দুধ এক পোয়া চটকাইয়া সেবনে প্রদর প্রশমিত হয়।

নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব—আমের কুশী রৌদ্রে শুখাইয়া গুঁড়া করিয়া উহা নস্যের ন্যায় নাকে টানিলে বন্ধ হয়।

অজীর্ণ—বেশী মাংস খাইয়া অজীর্ণ হইলে আমের কুশী বা কাঁচা আম বাটা খাইলে উহা প্রশমিত হয়।

হিক্কা—আমের কুশী মধুসহ মাড়িয়া চাটিলে ভাল হয়।

মেহ—আমের আঁটির শাঁস সেবনে প্রশমিত হয়।

আমাশা—আমের আঁটির শাঁস জলসহ বাটিয়া নাভীতে প্রলেপ দিলে শিশুদের আমাশা উপশমিত হয়। ইহা পুরাতন আমাশার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বহুমূত্র—আমের আঁটির শাঁস চূর্ণ ২ ভাগ, যজ্ঞডুমুরের বীজ ৩ ভাগ, আমলকী বীজের শাঁস ৪ ভাগ মিশাইয়া ৪ আনা মাত্রায় সেবনে উহা প্রশমিত হয়।

কদলি।

কলার একটী সংস্কৃত নাম বারণবল্লভ (করিপ্রিয়)। কদলির "ক" শব্দের অর্থ বায়ু এবং দল শব্দের অর্থ দলন বা ভেদ করা অর্থাৎ যাহা বায়ু কর্ত্তৃক দলিত হয়।

কাঁচা ও পাকা কলা দুইটিই উৎকৃষ্ট আহার্য্য। আয়ুর্ব্বেদ মতে কাঁচকলা শীতবীর্য্য, রোধক, বলবর্দ্ধক, কফঘ্ন ও স্নিগ্ধকর। অম্ল, রক্তপিত্ত, দাহ, ক্ষত, ক্ষয় ও বায়ুনাশক। কাঁচকলায় লৌহ অধিক থাকায় উহা উদরাময় রোগীর আদর্শ পথ্য।

পাকা কলা শীতবীর্য্য, মধুর বিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, মাংসবর্দ্ধক, বলকারক ও সারক। ইহা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, চক্ষু ও বায়ুরোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং প্রমেহ নাশক।

কদলী পুষ্প বা মোচা শীতল, স্নিগ্ধ, মধুর, কষায়, গুরু, শীতবীর্য্য এবং বহুমূত্র, বায়ু, পিত্ত, রক্তপিত্ত ও ক্ষতনাশক। কদলী কন্দ বা

মূল শীতল, কেশের হিতকর, বলকর, অম্লপিত্তনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহনাশক, মধুর রস ও রুচিকর। কদলী দণ্ড বা থোড় শীতবীর্য্য, রুচিজনক, ধাতু ও অগ্নিবর্দ্ধক, বহুমূত্র, প্রদর ও যোনিদোষ নিবারক। কলাগাছের মোচা জন্মিবার কিছুদিন পূর্ব্বে মাথা বাঁধিয়া দিলে থোড় ও মোচা অতি কোমল হয়।

আধুনিক মতে পাকা কলা চর্ম্ম ও রক্তপিত্ত রোগে হিতকর। ডাঃ এমার্সন লিখিয়াছেন কলাগাছের রস পানে কলেরার পিপাসা নিবৃত্ত হয়। মেজর ডি, আর, থমসন বলিয়াছেন, পাকা মর্ত্তমান কলা উদরাময় ও রক্তামাশায় উপকারী এবং কাঁচকলা সিদ্ধ করিয়া দধির সহিত সেবনে উক্ত দুইটী রোগ আরাম হয়। পাকা কলা, পুরাতন তেঁতুল ও পুরাতন গুড় এক সঙ্গে মিশাইয়া সেবন করিলে রক্তামাশা আরোগ্য হয়। কলার শুষ্ক শিকড়গুলি গুঁড়া করিয়া অল্প মাত্রায় খাইলে পিত্ত দমিত হয়। ইহা রক্তাল্পতা রোগের মহৌষধ। ডাঃ এফ পার্কার বলিয়াছেন যে কলার শিকড়ের রস, ঘৃত ও চিনিসহ সেবনে মেহ আরাম হয়।

পরীক্ষায় প্রকাশিত হইয়াছে যে কলায় যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম্, ম্যাগনেসিয়া, ফসফরাস, লৌহ ও তাম্র আছে। শরীরস্থ অম্ল নিবারণার্থে ইহার বিশেষ ক্ষমতা আছে। রুগ্ন ব্যক্তির কলা ভোজন অবশ্য কর্ত্তব্য।

বীচে কলাগাছের উত্তর-পূর্ব্ব কোণের শিকড় শনি কিম্বা মঙ্গলবারে স্নান করিয়া ডান নাকে নিঃশ্বাস বহিবার সময় তুলিয়া ১ আঙ্গুল পরিমাণ বাটিয়া তুলসী পাতার রসের সহিত ডাননাকে নিঃশ্বাস বহিবার সময় সেবনে এবং একটু শিকড় তাঁবার মাদুলিতে ভরিয়া ৺মা কালীর পূজা মানত করিয়া ধারণে হিষ্টিরিয়া আরোগ্য হয়।

অস্পৃশ্যা স্ত্রী স্পর্শ করা এবং কাহারও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করা নিষেধ। ইহা যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক পরীক্ষিত সুতরাং বিশ্বস্ত।

চাঁপাকলার শিকড় ২ কুঁচ পরিমাণে সেবনে আমাশা আরাম হয়। তাল ও কলা একসঙ্গে খাইলে ক্রিমি জন্মে। কলার সহিত চিনি, গুড় বা বাতাসা ভোজনে ক্রিমি জন্মে।

কলাগাছের মূল হইতে ফল পর্য্যন্ত সকল অংশই আমাদের কাজে লাগে। কলার পাতা শ্রেষ্ঠ ভোজনপাত্র। পাকা কলায় উপযুক্ত পরিমাণ উচ্চদরের শ্বেতসার, যবক্ষারযান এবং "এ", "বি" ও "সি" ভিটামিন থাকায় উহা একটী উৎকৃষ্ট জাতীয় পাচক ও পুষ্টিকর খাদ্য। কলা ভাতের ন্যায় পোষণক্ষম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে দুইটী কলা বিশেষতঃ কাঁটালি কলা সৈন্ধব লবণের সহিত সেবনে স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

পুষ্টিকারীতা হিসাবে সাধারণ শস্যসমূহের শ্বেতসার উপাদান অপেক্ষা কলার ঐ উপাদান সমধিক মূল্যবান। এইজন্য শিশুখাদ্য, বিস্কুট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে গমের আটা বা ময়দার সহিত কলার ময়দা মিশান হয়। মর্ত্তমান বা চাটিমকলা বহুমূত্ররোগেও বিশেষ হিতকর বলিয়া কথিত হইয়াছে।

জ্যামেকা দ্বীপপুঞ্জে কলার ময়দা প্রস্তুতের অনেক বিরাট কারখানা আছে। ফিলিপাইন, কিউবা ও অন্য কতিপয় পাশ্চাত্য দেশেও কলার ময়দা প্রস্তুত হয়।

বিলাত প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে কলা জন্মে না, তথাপি সে সব স্থানে বারমাস কলা কিনিতে পাওয়া যায়। উহা বিদেশ হইতে আনীত হয়। এক জ্যামেকা দ্বীপ হইতে বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকার

কলা চালান যায়, তজ্জন্য প্রায় ১০,০০ কলাবাহী ষ্টিমার ইউরোপ ও মার্কিণ দেশে যাতায়াত করে।

ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলার অমৃতসাগর কলা অতি প্রসিদ্ধ। উহা নিম্ন বঙ্গের চাটিম কলা অপেক্ষা বড় ও অধিক মিষ্ট। কলা ভোজনে ক্ষিপ্রতাশক্তি বৰ্দ্ধিত হয়, হয়ত সেই কারণে সাহেবরা (এবং বাঁদরেরাও) অত কলা ভক্ত।

আমাদের বাঙ্গলা দেশে কলা বেশ জন্মে। উহার বিস্তৃত চাষ করিয়া ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও ভারতবর্ষের বাহিরে কলা চালান দিলে দেশে অর্থাগমের একটী নূতন উপায় হইতে পারে। যদি প্রথম প্রথম জাহাজে করিয়া কলা চালান দিবার সুবিধা না হয় নিম্নলিখিত উপায়ে কলা শুষ্ক করিয়া সহজে রপ্তানি হইতে পারে।

"কলা চটকাইয়া পরে কাপড়ে ছাঁকিয়া আমসত্বের মত রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। কলা ফালি ফালি করিয়া চিরিয়া শুখাইলেও চলিবে। আজকাল বিলাতে ইহার বিশেষ চাহিদা শোনা যায়। উহা বেনানা ফিগ (Banana fig) ও বেনানা চিফ (Banana chief) নামে অভিহিত হয়। উক্ত শুষ্ক কলা হইতে বিলাতে রোগীর জন্য বেনানাইন (Bananine) নামক একটা উৎকৃষ্ট পথ্য প্রস্তুত হইতেছে, উহা বার্লি ও সাগু অপেক্ষা অধিক উপকারী।"

কলার এসেন্স, মল্ট, মদ বা স্পিরিট, কেক, চকোলেট, জ্যাম ও মধু বিদেশে প্রস্তুত হইয়া নানা দেশে চালান যাইতেছে। আমাদের দেশের লোকেও এই ব্যবসায়ে অর্থবান হইতে পারে।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে কলা গাছের শুষ্ক খোলা পোড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা বস্ত্রাদি পরিষ্কৃত করা হইত। এখন সহজলভ্য সোডা ব্যবহার করিয়া লোকে সংসার খরচের মাত্রা বাড়াইয়াছে, সঙ্গে

সঙ্গে স্বাস্থ্যকর কাপড় কাচার পরিশ্রম হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। অধিকন্তু উহাতে কাপড় শীঘ্র ক্ষয়ে যায়, বেশী দিন টিকে না।

কালজাম ও গোলাপজাম।

কালজামের সংস্কৃত নাম ১। জম্বু, ২। মহাজম্বু (সাধারণ কালজাম), ৩। কাকজম্বু (ছোট কালজাম বা বন জাম) এবং ৪। ভূমিজম্বু (ভুঁইজাম)। ইহার অন্য কতকগুলি বিশেষ গুণ জ্ঞাপক নাম সুরভিপত্রা, মহাফলা, নীলফলা, শুকপ্রিয়া, মেঘমোদিনী, শ্যামলা ও ফলেন্দ্র।

বনজামের ফল অতি ক্ষুদ্র, মানুষের অখাদ্য বটে কিন্তু পক্ষীগণের উপাদেয় খাদ্য। ভুঁইজাম গাছ পূর্ব্ববঙ্গে স্থানে স্থানে জন্মে। ইহার নানা অন্তর্জাতি—নালিজাম, বুটিজাম, ফুলজাম প্রভৃতি নামে পরিচিত।

বড় কালজাম উষ্ণ, মধুর, কষায়, শ্রম ও মুখের জড়তা নাশক, রুচিকর, স্বরবর্দ্ধক, রোধক এবং শোথ, অতিসার, শ্বাস, কফ, পিত্ত, কাস, ক্রিমি প্রভৃতি রোগ নাশক। ইহা কিঞ্চিৎ গুরুপাক।

জামের বীজ কষায়, গ্রাহী এবং পুরাতন ক্ষত, মধুমেহ ও বহুমূত্র নাশক (শাঁস প্রত্যহ ৫ গ্রেণ মাত্রায় ৩ বার সেব্য)। পাকা কালজামের রস পাচক, ধারক এবং মূত্র কারক। এই বৃক্ষের ত্বকের কাথ ও ছাগ দুগ্ধ সেবনে শিশুর অতিসার ও রক্তাতিসার এবং অন্য সকল প্রকার উদর পীড়া প্রশমিত হয়।

জামের ছাল ২ তোলা ১½ পোয়া জল ও ½ পোয়া ছাগল দুধের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া একটু চিনি সহ পানে প্রবল অতিসার আরোগ্য হয়। ছালের কাথ দিয়া কুলি

করিলে দন্তমাড়ি হইতে রক্তস্রাব, দন্তক্ষত এবং জিভ্ ফাটা রোগ দূর হয়।

হাকিমী মতে কালজাম সেবনে পিত্তপ্রধান ব্যক্তির পাকস্থলী ও যকৃৎ সবল, পিত্ত ও রক্ত প্রকোপ নিবারিত এবং পিত্তাধিক্য জনিত দাস্ত বন্ধ হয়। সকল প্রকার উদরাময় রোগে উহাতে উপকার পাওয়া যায় এবং পিপাসার শান্তি হয়। ইহা রতিশক্তিবর্দ্ধক। ইহার সরবৎ পানে বিবিমিষা ও অর্শ রোগে উপকার হয়। জামের রস সির্কার সহিত পানে প্লীহা ও যকৃৎ রোগে উপকার এবং পরিপাক শক্তি বর্দ্ধিত করে। পাকা জাম বাটা প্রলেপ দিলে মাথার ঘা শুষ্ক হইয়া সে স্থানে চুল উৎপন্ন হয়। জামের পুরাতন আঁটি ও আমের আঁটি একত্র চূর্ণ করিয়া প্রত্যহ ½ তোলা মাত্রায় সেবনে বীর্য্য গাঢ় ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

জামের আঁটি চূর্ণ ১ তোলা হইতে ২½ তোলা পর্য্যন্ত দিনে ২।৩ বার সেবনে বহুমূত্র (ডায়াবিটিস) রোগে আশ্চর্য্য উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু এই রোগে পাকাজাম সেবন অহিতকর। অগ্নিদগ্ধ স্থান সাদা হইলে জামের পাতা বাটিয়া সেইখানে প্রলেপ দিলে বর্ণ স্বাভাবিক হয়। ছোট জামের শুষ্ক আঁটি চূর্ণ সম পরিমাণ মিসরি সহ এক তোলা মাত্রায় প্রত্যহ সেবনে শুক্রমেহ আরোগ্য হয়। জামের ছাল সিদ্ধ করিয়া কুলি করিলে দাঁত নড়া দূর হয়।

ডাক্তারী মতে ইহার পাতার রস ছাগ দুধ সহ সেবনে রক্ত আমাশা আরোগ্য হয়। ইহাতে "বি" ও "সি" ভিটামিন আছে।

জামের অন্য জাতি গোলাপ জাম। উহা রোধক, মুখরোচক কিন্তু গুরুপাক। অজীর্ণ রোগীর অপথ্য। ইহার শাঁস কাস, বমি ও ব্রণ রোগে হিতকর।

কাঁটাল বা কাঁঠাল।

ইহার অনেক সংস্কৃত নাম আছে তন্মধ্যে, অতি-বৃহৎ ফল, মৃদঙ্গ ফল, রসাল, চম্পকালু, চম্পাকোষ ও পূতফল উহার বিশেষত্ব বা গুণজ্ঞাপক।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে পাকা কাঁটাল শীতবীর্য্য, রুচিকর, মলরোধক, মাংস, বল ও বীর্য্য বর্দ্ধক, শুক্রজনক, পুষ্টিকর, বাতপিত্ত, রক্তপিত্ত, ব্রণ ও ক্ষতনাশক এবং দাহ, শ্রম ও শোষ রোগে হিতকর। উহা কিঞ্চিৎ কফবর্দ্ধক ও দুর্জ্জর তজ্জন্য গুল্ম ও অজীর্ণ রোগে অভক্ষ্য।

কাঁচা কাঁটাল বা এঁচড় বায়ুবর্দ্ধক, বলকর, গুরুপাক, দাহজনক ও রুচিকর। ইহা কফ ও মেহধাতুর বৃদ্ধিকারক। অনেকে ইহাকে গাছপাঁটা বলে। পিঁয়াজ লাঞ্ছিত এঁচড়ের কোর্ম্মা কতকটা মাংসের ন্যায় খাইতে লাগে। তবে যাহাদের উপযুক্ত পরিপাকশক্তি আছে তাহাদের পক্ষেই এঁচড় বা পাকা কাঁটাল উপযোগী। সহরবাসীগণ অনেকেই অজীর্ণ রোগগ্রস্ত বলিয়া এই অমৃত ফল ভোগে বঞ্চিত।

"কিন্তু পাড়াগাঁয়ে গরীব মধ্যস্থ শ্রেণীর গৃহস্থ এখনও ইহাকে জীবনরক্ষক মহাফল জ্ঞান করিয়া অন্নের সহিত কেবলমাত্র উপযুক্ত পরিমাণ কাঁটালের রস ও লবণ মাখিয়া অতি তৃপ্তির সহিত আহার করে এবং কাঁটালের সময় অনটনের হাত হইতে অনেকাংশে রক্ষা পায়। যাহারা অতি দীন তাহারা অতি অল্প অন্নের সহিত অধিক পরিমাণ কাঁটাল খাইয়া জীবনধারণ করে। এরূপ শোনা যায়, পূর্ব্ব-বঙ্গের কৃষকেরা বিশেষতঃ মুসলমান কৃষকেরা অনেকেই মৃত্যুকালে কাঁটালের সময় উহা খাইবার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করে, সে সাধ তাহাদের আত্মীয়েরা পূর্ণ করে।"

কাঁটাল ক্ষারবহুল ফল, সেবনে দেহে ক্ষারের অভাব পূর্ণ হয়। পাকা কাঁটাল ও দুধ গুরুপাক। উহা দধি, ঘোল বা অম্লসহ সেবনে সহজে পরিপাক হয়। কেহ কেহ বলেন উহা পরিপাক করিতে দীর্ঘ সময় এমন কি ৮।১০ ঘণ্টা লাগে। লবণসহ কাঁটাল সেবনে বা কাঁটাল খাইবার পর কলা খাইলে উহা শীঘ্র জীর্ণ হয়।

কাঁটাল বীজ চূর্ণ ১ ছটাক, সবরি কলা চূর্ণ ১ ছটাক, চিনি ১ পোয়া ও দুধ ১ সের পাক করিয়া কিছু ঘৃত ও মধুসহ সেবনে বহুমূত্র আরোগ্য হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

কাঁটালের ভূতির ক্ষার গোরোচনার জল সহ অর্শের বলি ও আঁচিলে দিলে তাহা খসিয়া যায়। কাঁটালের ভুতি রৌদ্রে শুখাইয়া ও পোড়াইয়া লইয়া উহার ছাই একটু চূণের সহিত মিশাইয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে উহা ফাটিয়া যায়।

পাকা কাঁটালের বীচি স্নিগ্ধ, পিত্ত ও বায়ুনাশক (মতান্তরে উপরন্তু কফনাশক), কিঞ্চিৎ গুরুপাক, ত্বকদোষনাশক, মূত্রনিঃসারক, শুক্র-বর্দ্ধক, বলকর, রুচিকর, রক্তপিত্ত ও ক্ষত-ক্ষয় নাশক, মলরোধক এবং পাকা কাঁটাল ভোজন জনিত অজীর্ণ নিবারক। কাঁটাল বীজ বালিতে রাখিলে দীর্ঘকাল ঠিক থাকে। কাঁটাল বীজের ময়দাও উপকারী।

কাঁটালের মজ্জা বা বোন্দা যাহা গরু তৃপ্তির সহিত খায় তাহা শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষ-প্রশমক। ইহার ক্ষার লইয়া একটু চূণের সহিত মিশাইয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। সিদ্ধির নেশা কাঁটাল পাতার রস পানে ছাড়ে। অন্ত্রবৃদ্ধিতে কাঁটালের ভোঁতার রস এবং চর্ম্মরোগে উহার কচি পাতার রস উপকারক। কাঁটালের আঁশ

গুরুপাক, রস ছাকিয়া খাইলে সে দোষ থাকে না। কাঁটালে 'এ' ও 'সি' ভিটামিন আছে।

কুল।

ইহা সাধারণতঃ অপদার্থ বলিয়া গণ্য হয় কিন্তু ইহারও অনেক গুণ। বালকবালিকা ও ললনাদের ইহা অতি আদরের আহার। এখনও ছাতে শুখান কুলচুর ও কুলের আচারের চোর ধরা শক্ত হয়।

কুলের সংস্কৃত নাম বদরী, কুবল, কোলি, সৌবীর ও বদর। ইহা ব্যতীত গূঢ় ফল, ফল শৈশির, স্বাদুফলা ইত্যাদি আরো অনেক নাম আছে। ফলের আকৃতি ভেদে নাম—বড় কুলকে সৌবীর উহা সুমধুর, মধ্যমাকার কুলকে কোল উহা মধুর এবং সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার কুলকে কর্কন্ধু বলে, উহা অম্লাস্বাদের হয়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে দেশী টোপা কুল অম্লমধুর, স্নিগ্ধ, গুরু ও বাতপিত্ত নাশক। বদরী মধুরাম্ল, উষ্ণ, কফকর, বাতপিত্ত নাশক, অতিসার, রক্তদোষ ও শ্রমহারক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

নারিকেলি বড় কুল (রাজ-বদরী) পাকা অবস্থায় সুমধুর, শীতল, ভেদক, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক এবং পিত্ত, দাহ, রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও তৃষ্ণানাশক। মধ্যম আকারের কুল যাহা পাকিলে মিষ্ট হয় তাহা ভেদক, রুচিকর, উষ্ণবীর্য্য, বাতঘ্ন, কফ ও পিত্তজনক, গুরুপাক এবং দাহজনক। ছোট কুল অম্লরসযুক্ত, কষায়, কিঞ্চিৎ মধুর রস বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, তিক্তরস, বাতঘ্ন ও পিত্তনাশক। ছোট পাকা কুল ভেদক, বাতঘ্ন, মধুর ও স্নিগ্ধ। শুষ্ককুল তৃষ্ণা ও ক্লান্তিহর, পিত্তের অবিরোধী, ভেদক, অগ্নিজনক, বায়ুনাশক, লঘুপাক ও রক্তপিত্ত রোগ নাশক।

পুরাতন কুলের আচার লঘুপাক, স্নিগ্ধবীর্য্য, শ্রম ও তৃষ্ণা নিবারক। কুলমজ্জা মধুর, পিত্তনাশক, বমি ও তৃষ্ণা নিবারক। কুল পাতার প্রলেপ জ্বরনাশক, দাহঘ্ন ও বিস্ফোটক নাশক। কুলবীজ চক্ষুরোগ নাশক। কুলপাতার পৃষ্ঠদিক কলি চুণে মাখাইয়া কপালের দুই দিকের শিরার উপর প্রলেপে মাথাধরা আরাম হয়।

শ্রীযুক্ত হলধর বাবু লিখিয়াছেন :—

"মার্কিণ ক্যালিফর্ণিয়ার বিশ্ববিখ্যাত লুথার বুরব্যাঙ্ক সাহেবকে উদ্ভিজ্জ যাদুকর বা কলির বিশ্বামিত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি বিজ্ঞানের সাহায্যে অসংখ্য প্রকার জারজ কুলের সৃষ্টি করিয়াছেন। তন্মধ্যে ঐ দেশের বন্য কুল ও একজাতীয় জাপানী কুলের মিলনে একটী অভিনব জারজ কুল গাছ জন্মাইয়াছেন, উহার ফলের নাম প্লমকট বা কুলভ্রষ্ট কুল। ইহা দেখিতেও যেমন বিচিত্র খাইতেও সেরূপ অপূর্ব্ব। ইহার রসাস্বাদনে মার্কিণের কুলনারীগণ কেহ কুলভ্রষ্ট হইয়াছেন কিনা জানি না কিন্তু অনেক পুরুষও উহার জন্য পাগল। তিনি কুল গাছকে কাঁটাশূন্য করিয়াছেন এবং গাছে ফল ধরিবার সময়ও পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ফলে উহা একটী অন্যতম সুখাদ্য ফলের স্থান অধিকার করিয়াছে।"

তরমুজ।

তরমুজের আদি জন্মস্থান উৎকলের সমুদ্রতীরস্থ কলিঙ্গ প্রদেশ, তাই উহার একটী নাম কলিঙ্গ। কলিঙ্গ দেশে ইহা তরপুজ নামে অভিহিত হয়, ইহারই অপভ্রংশ তরমুজ।

তরমুজের অপর পরিচয়জ্ঞাপক নাম গ্রীষ্ম, মাংসল ফল, বাস্ত, বেনাখ্যা ও স্বেত-প্রতানন। ইহা শ্রেষ্ঠ পিত্তনাশক, যকৃৎ দোষ

নিবারক, পিত্তশিলা ও কিডনি রোগে হিতকর, শীতল, ধারক, শ্রমনাশক, বৃষ্য, তৃপ্তিদায়ক এবং বীর্য্য ও পুষ্টি বর্দ্ধনকর। ইহার বীজ মূত্রকর, পিপাসা নিবারক ও স্নিগ্ধকর। তরমুজের রস চিনি ও জীরার সহিত পানে শরীর স্নিগ্ধ ও পিপাসা নিবারিত হয়। তরমুজে সামান্য পরিমাণ 'এ' ও 'সি' ভিটামিন আছে।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে যথা লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ ও জব্বলপুরের তরমুজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, উহা অতি মিষ্ট ও সুঘ্রাণযুক্ত।

খরমুজ বা খরবুজ।

ইহার আদি জন্মস্থান আরব, পারস্য ও আফগানিস্থান। ইহার গাছ সাধারণতঃ ১০ আঙ্গুলের অধিক উচ্চ হয় না বলিয়া ইহার একটী নাম দশাঙ্গুল। সাধারণতঃ ভারতের পশ্চিমদেশে উৎপন্ন বিশেষতঃ লক্ষ্ণৌয়ের সফেদ নামে অভিহিত খরমুজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা অজীর্ণ রোগে নিষিদ্ধ।

শাস্ত্রমতে ইহা মূত্র-কারক, উষ্ণবীর্য্য, জঠরাগ্নিবৃদ্ধিকর, বলকর, কোষ্ঠশোধক, গুরু, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, পিত্ত, বায়ু, দাহ, শ্রম ও উন্মত্ততা নাশক, বৃষ্য ও তৃপ্তিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক ও পুষ্টিকর, মতান্তরে পিত্তজনক। খরমুজ কচি অবস্থায় তিক্ত, অর্দ্ধপক্কাবস্থায় মধুর কিন্তু বিপাকে ঈষৎ অম্লরস যুক্ত।

নারিকেল।

নারিকেরো সমাকারা দৃশ্যন্তেঽপি সজ্জনাঃ।

শাস্ত্রে সাধু চরিত্রের সহিত নারিকেলের তুলনা করা হইয়াছে। নারিকেলের সংস্কৃত নাম নারিকের। নার (জল) + ষ্ণিক = নারিক

(জল সন্নিহিত স্থান)+ঈর (গমন করা বা বৃদ্ধি পাওয়া)+অ=নারিকের। শাস্ত্রে ইহাকে মহাফল বা বরফল বলে। ইহার অন্য পরিচায়ক ও বিশেষত্ব জ্ঞাপক নাম, সদা ফল (বার মাস ফলে), ত্র্যম্বক (তিনটী চক্ষু বিশিষ্ট), পয়োধর, মাঙ্গল্য, নীলত্বক (অপক্ক অবস্থায়), কূর্চ্চশেখর (মস্তকস্থ গর্ভকোষ পত্র ময়ুর শিখাবৎ অবস্থিত) ইত্যাদি।

কদলী বৃক্ষ অপেক্ষাও নারিকেল বৃক্ষ মানবের বহু উপকারে আসে, যথা উৎকৃষ্ট জলভরা ফল, দড়ি, পাপোস, গালিচা, গদি, তেল, সুরা, শর্করা, ঝাঁটা, পাখা, ব্রুশ, গ্যাসশোষক কয়লা, মালা হইতে বোতামাদি বহু শিল্পদ্রব্য ইত্যাদি। এই জন্য বোধ হয় শাস্ত্রে নারিকেল বৃক্ষ ছেদন করা ব্রহ্মহত্যার ন্যায় মহা পাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। নারিকেল, তাল প্রভৃতি উচ্চশির বৃক্ষ তাড়িত টানিয়া লয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেইজন্য ঐ সকল বৃক্ষ গৃহের কিছুদুরে রোপিত করার নির্দ্দেশ আছে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে পাকা নারিকেল গুরু, কিঞ্চিৎ পিত্তকর, উত্তেজক, শীতবীর্য্য, কোষ্ঠশোধক, পুষ্টি ও বলকর এবং বাত, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহনাশক। কচি বা নেয়াপাতি ডাবের জল শীতল, হৃদয়গ্রাহী, অগ্নিদীপক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, পিপাসা, হিক্কা ও বায়ুনাশক, পিত্তঘ্ন, স্বাদু, কোষ্ঠশোধক এবং পিত্তজ্বর, মূত্রদোষ ও অম্লত্ব নিবারক। কাঁসার পাত্রে ডাবের জল মদের ন্যায় অপেয়, ডাব হইতে সরাসর জল পানই প্রশস্ত। ইহা অন্য নানা রোগে উপকার করে।

আধুনিক মতে ডাবের জল রেচক, শীতল ও স্নিগ্ধ। কচি নেয়াপাতি ডাবের শাঁস পরিপোষক, শীতল ও মূত্রকর। পুরাতন শুষ্ক নারিকেল শস্য কৃমিঘ্ন। ইহা সেবনে ফিতার মত ক্রিমি নিঃসৃত হয়। যাহাদের প্রস্রাবের দোষ আছে তাহাদের ডাবের জল পান পরম হিতকর।

ডাবের জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া আগুন পোড়ার ক্ষতে কিম্বা বসন্তের মেচেতায় পটি দিলে দাগ মিলাইয়া যায়। ডাবের জল গরম করিয়া কুল্লী করিলে দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়া ও মাড়ির স্ফীতি নিবারিত হয়। ১ তোলা ডাবের জলের সহিত ১ তোলা ধনে ভিজান জল ও ১ তোলা মিসরি প্রত্যহ প্রাতে সেবনে স্বপ্নদোষ উপশমিত হয়।

ভাবপ্রকাশ মতে সুপক্ক জলপূর্ণ নারিকেলের ভিতর কিছু সৈন্ধব লবণচূর্ণ প্রবেশ করাইয়া মাটির প্রলেপ দিয়া ঘুঁটের আগুনে পোড়াইয়া শীতল হইলে উহার ভিতরে যে কাল শাঁস পাওয়া যাইবে তাহা ২।৪ আনা মাত্রায় কিছু পিঁপুল চূর্ণের সহিত সেবনে অজীর্ণ ও শূলবেদনা আরোগ্য হয়। নারিকেলের মালা পোড়াইয়া লাল হইলে উহার উপর পাথর বাটি চাপা দিলে যে স্বেদ নির্গত হয় তাহা দাদের উৎকৃষ্ট প্রলেপ।

দধির সহিত নারিকেল ফুল পেষণ করিয়া সেবনে শর্করা রোগ শীঘ্র উপশমিত বা বিনষ্ট হয়। নারিকেল ফুল শীতল ও মলরেচক, রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, প্রমেহ ও সোমরোগে হিতকর। নারিকেল গাছের শিকড়ের ভস্ম প্রলেপে দাঁতের পীড়া উপশমিত হয়। নারিকেল পত্রের ক্ষার (পাতা পোড়ান ছাই) দন্তরোগে হিতকর। নারিকেল ছোবড়া লবণসহ অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া তাহার সূক্ষ্ম চূর্ণ ও লেবুর রস সেবনে অম্লপিত্ত, শূলবেদনাদি প্রশমিত হয়। নারিকেল মালা পোড়াইয়া তাহার কয়লা, সোডা ও মৌরিচূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া সেবনে অম্লপিত্ত ও অম্লশূল নষ্ট হয়।

সাদা ও লাল নারিকেলের জল বিশেষ বিশেষ রোগে হিতকর। উহার শস্য নারিকেল খণ্ড প্রভৃতি কবিরাজী ঔষধের অন্যতম প্রধান

উপাদান। নারিকেল শাঁস, বড়ক্রিমি নাশক, ইহা সেবনের ৩ ঘণ্টা পরে ১ মাত্রা রেড়ির তেল পানে ক্রিমি নির্গত হয়।

দক্ষিণ ভারতে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে লোকে খেজুর রসের ন্যায় নারিকেল রস পান করে। এই রস কিছু কষা কিন্তু উহাতে মিষ্টতা আছে। আমাদের দেশে উহার চলন নাই কিন্তু ঐ রস জ্বাল দিয়া প্রস্তুত নারিকেল পাটালি এবং শাঁস হইতে মনোহরা, রসকরা, চন্দ্রপুলি প্রভৃতি উপাদেয় মিষ্টান্ন এক সময়ে অতি সমাদরে সেবিত হইত। উহাদের উত্তরোত্তর অনাদর আমাদের রুচিবিকৃতির পরিণতি। একথা ভুলিয়া যাই যে ময়রার দোকানের সভ্য কিন্তু অহিতকর খাবার অপেক্ষা ঐ অসভ্য ও অনাদৃত খাবার অধিক স্বাস্থ্যকর ও নির্দ্দোষ। নারিকেলে 'এ', 'বি', 'সি' ও 'ডি' চারিটী ভিটামিন আছে।

কাঁচা নারিকেল শস্য পিষিয়া যে দুধ বাহির হয় তাহাও অতি মূল্যবান পদার্থ। আয়ুর্ব্বেদ মতে উহা স্নিগ্ধ, মধুর, রুচিকর, শুক্রজনক, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, মধুরবিপাক, বল ও বীর্য্যজনক, গুরুপাক এবং বায়ু, শ্লেষ্মা ও কাসরোগে হিতকর।

আধুনিক মতে নারিকেল দুগ্ধ স্নিগ্ধ ও অতি পুষ্টিকর, কিঞ্চিৎ রেচক, মূত্র ও ক্রিমি নিঃসারক। ডাক্তার প্লট লিখিয়াছেন নারিকেল দুগ্ধ দৌর্ব্বল্য ও প্রাথমিক ক্ষয়রোগে হিতকর। অধিক মাত্রায় সেবনে বিরেচক। নারিকেল দুধ জ্বাল দিয়া যে তেল বাহির হয় তাহা পোড়া ঘা ও টাকে উপকারী। সার্জ্জেন বোগ্রা লিখিয়াছেন কচি নারিকেল শাঁসের দুধ কলেরা প্রতিষেধক। নারিকেল দুধ কবল করিলে চূণে মুখ ধরা বা মুখের ঘা ভাল হয়।

নারিকেল ফোঁপল আর একটী সুখাদ্য। বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহা মধুর, শীতল, অতি লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, তৃষ্ণা নিবারক,

বস্তিশোধক ও পিত্তনাশক। নারিকেল মাথি স্নিগ্ধ, গুরুপাক ও পুষ্টিকর।

নারিকেল তেল শীতল, কিঞ্চিৎ গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, মেধাজনক, ক্ষীণধাতুর পুষ্টিকারক, বাতপিত্ত ও ক্ষত নাশক এবং মূত্রাঘাত, প্রমেহ, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগ উপশমকর। অন্য মতে ইহা মস্তিষ্কের স্নিগ্ধকর, কেশবর্দ্ধক, অধিকন্তু শারীরিক সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক এবং অকাল বার্দ্ধক্য নিবারণার্থে প্রশস্ত। জ্বর, কাস ও বিবিধ চর্ম্মরোগে ইহার অভ্যঙ্গ ব্যবস্থিত হয়। দৌর্ব্বল্য ও উরুক্ষতে কডলিভার তেলের পরিবর্ত্তে নারিকেল তেলের প্রলেপ ব্যবস্থিত হয়। নারিকেল তেল গরম করিয়া তাহাতে কিছু কর্পূর মিশাইয়া লেপনে পাঁচড়ার জ্বালা ও টন্‌টনানি নিবৃত্ত হয়। ঈষদুষ্ণ নারিকেল তেলে একটু আফিম মিশাইয়া কানের মধ্যে দিলে কর্ণশূল ও তজ্জনিত যাতনা অবিলম্বে নিবারিত হয়।

পাককার্য্যে নারিকেল তেলের ব্যবহার দক্ষিণ ভারতে মহীশূর ও মাদ্রাস প্রদেশে এবং যশোহরে প্রচলিত আছে। ভেজাল সরিষার তৈলের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র ঐ তেল ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। সহরে নারিকেল-মাখমের রূপান্তর, বিদেশ হইতে আনীত কোকো-জেম, কোকোটাইন প্রভৃতি বিক্রীত হইতেছে, উহা সাধারণতঃ সাহেবেরা ব্যবহার করে। এই সকল দ্রব্য আমাদের দেশ হইতে প্রেরিত নারিকেল শাঁসের মাখম হইতে প্রস্তুত হয়। চেষ্টা করিলে আমরা উহা সুলভে প্রস্তুত করিতে পারি এবং বিষাক্ত ঘৃত ও সরিষার তেলের পরিবর্ত্তে অবস্থা বিশেষে ব্যবহার করিতে পারি, সঙ্গে সঙ্গে অনেকে আর্থিক উন্নতি সাধনও করিতে পারে। অধিকন্তু নারিকেলের শাঁস পেষণ করিয়া তৈল বাহির করিবার পর

অবশিষ্ট খোল যাহা গবাদির পুষ্টিকর আহার তাহা বিদেশের গবাদি না খাইয়া আমাদের দেশের জন্তুগণ খাইতে পারে। নারিকেল গাছের বিস্তৃত আবাদ করিলেও দেশের অন্ন সমস্যা কতকাংশে মিটিতে পারে।

"খাদ্য হিসাবে আমরা আজকাল নারিকেলের বড় একটা কদর করি না। কিন্তু ইহা ভারতের কাম ধেনু বলিয়া বৈদেশিকগণ বহু দিন হইতে জানে। এইরূপ কিম্বদন্তি, জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময় কয়েকজন ইংরাজ কলিকাতায় আসিয়া এই ফল খাইয়া বলিয়াছিল যে বাঙ্গালায় কখনও দুর্ভিক্ষ হইতে পারে না কারণ এই ফলের ভিতর শরীর পোষণোপযোগী দুই খানি কেক বা রুটি এবং এক গ্লাস মিষ্ট পানীয় আছে।"

আমাদের কেহ কেহ (তাহাদের সংখ্যা বড় কম নয়) এখন ডাবের জলের ন্যায় বহু গুণান্বিত সুলভ স্বভাবজাত পানীয়ের পরিবর্ত্তে আপত্তিকর কৃত্রিম শর্করা মিশ্রিত বিলাতী পানীয় পানে কৃতার্থ হন। আবার যাহারা পথে বা দোকানে ডাবের জল পান করে তাহারা উহার শাঁস অপদার্থ বোধে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু ঐ অপচয়ের সমবেত মূল্য যে কত তাহা ধারণাতীত।

পেঁপে।

দক্ষিণ আমেরিকা পেঁপের আদি জন্মস্থান। উড়িষ্যা দেশে পেঁপের নাম অমৃত ভাণ্ড। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা রুচিকর, চক্ষুর হিতকর, পাচক, সারক, কফ, পিত্ত ও রক্তপিত্ত নাশক, জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস, বাতরক্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ, মেহ, শোষ, মদাত্যয়, স্বরভঙ্গ, অর্শ এবং উহার রক্ত নিবারণে বিশেষ উপযোগী। পেঁপেতে 'এ' ও অধিক 'সি' ভিটামিন আছে।

আধুনিক মতে কাঁচা পেঁপের আটা দদ্রু ও অন্য চর্ম্ম বিকার এবং ক্রিমি নাশক। ২০।২৫ ফোঁটা পেঁপের আটা অল্প চিনির সহিত কিছুদিন সেবনে প্লীহা ও গুল্ম রোগে আশ্চর্য্য উপকার হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে একটী কাঁচা পেঁপে থেঁতো করিয়া সমস্ত রাত্রি হিমে ফেলিয়া রাখিয়া প্রাতে কিছু দিন উহা অল্প মাত্রায় সেবনে একজনের প্লীহা সম্পূর্ণ আরাম হইয়াছে। শ্রী দীনেশ চন্দ্র দেব কৃষি সম্পদ পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে আধ-কাঁচা পেঁপের আটা সম পরিমাণ চিনির সহিত প্রত্যহ তিন মাত্রা সেবনে প্লীহার আয়তন ক্রমশঃ কমিয়া যায়। কাঁচা পেঁপের ছাল ছোট ছোট টুকরা করিয়া শির্কায় ডুবাইয়া কাঁচের ঢাকা পাত্রে আচার প্রস্তুত করিয়া উহার ৭।৮ টুকরা প্রত্যহ ২।৩ বার সেবনে একজনের প্লীহা একেবারে সারিয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে একজন সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন, যে কাঁচা পেঁপের ছাল ছাড়াইয়া ছোট ছোট টুকরা করিয়া কাঁচের ঢাকা পাত্রে সির্কায় নিমজ্জিত এবং উহা রৌদ্র কিরণে রক্ষিত করিয়া উক্ত আচার সেবনে তিনি কঠিন প্লীহা রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন।

পেঁপের আটা দিয়া মাংস রন্ধন করিলে উহা শীঘ্র নরম ও সুসিদ্ধ হয় এবং উহার অপকারীতা কথঞ্চিৎ বিনষ্ট হয়। কলিকাতার অনেক হোটেলে কাঁচা পেঁপের আটা সুলভ নয় বলিয়া মাংসের সহিত কাঁচা পেঁপে বাটিয়া দেওয়া হয়। ইহা শুধু যে মাংসকে সহজে সিদ্ধ করে তাহা নয়, পরিপাকেও সহায়তা করে। পেঁপেভাতে খাইলে ঐ দুই প্রকার উপকার হয়।

মাংস কুটিয়া পেঁপে গাছের পাতা ঢাকা দিয়া রাখিয়া কিছুক্ষণ পরে রাঁধিলে শীঘ্র সিদ্ধ হয় এমন কি কেহ কেহ বলিয়াছেন পেঁপে গাছে মাংস ঝুলাইয়া রাখিলে উহা শীঘ্র সিদ্ধ হয়।

পেঁপের আটা হইতে পেঁপেওটিন প্রস্তুত হয় যাহা প্রাণীজ পেপ্‌সিনের সমতুল্য বা অধিক গুণশালী তাহা অজীর্ণে বিশেষ উপকারী। একজন পাশ্চাত্য পুষ্টিতত্ত্ববিদ বলিয়াছেন ৭ গ্রেণ পেপেওটিন এক পাঁইট অর্থাৎ দেড় পোয়া দুধ বা স্বীয় ওজনের ২০০ গুণ টাটকা মাংসের নিষ্পীড়িত রস সহজে পরিপাক করিতে পারে। পেপ্‌সিন সাধারণতঃ শূকরের যকৃৎ হইতে প্রস্তুত হয় যাহা হিন্দুর অভক্ষ্য। উহা অপেক্ষা পেপেওটিন অধিক কার্য্যকারী। সকল ফলের অপেক্ষা পেঁপের জীর্ণকর শক্তি অত্যধিক সেই জন্য অজীর্ণ রোগে উহা বিশেষ হিতকর।

সার্জ্জেন নেহাল সিং লিখিয়াছেন শুষ্ক পেঁপে লবণের সহিত সেবনে দুরারোগ্য প্লীহা সাম্যাবস্থায় আসে। পুরাতন উদরাময় রোগেও ইহা উপকারী।

অন্য এক জনের মতে পেঁপের আটা ১ কিম্বা ২ গুণ মাত্রা চিনি কিম্বা দুগ্ধের সহিত সেবনে অম্ল ও অজীর্ণ রোগে বিশেষ উপকার হয়। কাঁচা পেঁপের তরকারী অর্শ, প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি প্রশমিত করে। প্রসূতিগণ উহা আহার করিলে স্তনদুগ্ধ বৰ্দ্ধিত হয়।

কাঁচা পেঁপের আটার বাহ্যিক প্রলেপে ফোড়ায় পুঁজ সঞ্চার হয়। সার্জ্জেন নোল্যান বলিয়াছেন পেঁপের পাতা ছেঁচিয়া গোদে প্রলেপ দিলে উহা কমিয়া যায় এবং বেদনাযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করিলে বেদনার উপশম হয়।

কাঁচা পেঁপের আটা বা ঐ গাছের গাত্র নিঃসৃত দুগ্ধ পুরাতন অজীর্ণ, অতিসার, গ্রহণী, কোষ্ঠবদ্ধ ও রোহিণী রোগে বিশেষ উপযোগী বলিয়া কথিত হইয়াছে।

রমণীদের ত্বকে জতুর ছাল তুলিতে পেঁপের আটার প্রলেপ দেওয়া হয়। যে কোন স্থানের পোকা নষ্ট করিতে পেঁপের আটা বিশেষ উপকারী। প্লীহা, যকৃৎবৃদ্ধি ও তৎসংযুক্ত জ্বর ও দুর্ব্বলাদির জন্য, আহারের পর পেঁপের আটা ৫।১০ ফোঁটা মাত্রায় সেবনে আশ্চর্য্য উপকার হয়।

ডাঃ কেলপ্ সম্প্রতি বলিয়াছেন যে দশ বৎসরের মধ্যে পেঁপে হইতে প্রস্তুত ঔষধ বড় বড় ডাক্তারের পিল বা বড়ি ও আরকের ব্যবসা বন্ধ করিবে। যে সব শিশু সদাই অসুস্থ বা যাহাদের রোগ লাগিয়াই আছে তাহাদের পেঁপে খাওয়াইলে সমূহ উপকার হইবে। যাহারা যকৃত, অর্শ, অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধে ভুগিতেছে তাহাদের পেঁপের নিত্য ব্যবহার অমৃত স্বরূপ। ঔষধার্থে কাঁচা পেঁপে পাকা অপেক্ষা সমধিক উপকারী।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের পাকা পেঁপে নিষিদ্ধ, উহার শস্য ও বীজ রজঃ ও ভ্রূণ নিঃসারক।

হাকিমী মতে পেঁপের আরো অনেক গুণ আছে। উহা ক্ষুধা-বৃদ্ধিকর, বায়ুনাশক, প্রস্রাব বৃদ্ধি ও পাথরী নির্গত করে। পাকা পেঁপে শোথ, আমাশা, কণ্ঠরোগ, মূত্রাশয়ের দুর্ব্বলতা ও বিলোপী জ্বরে উপকারক এবং শরীরের ক্লেদ, শ্রম ও রুক্ষতা দূর করে। উহা দুই আহারের মধ্যবর্ত্তী সময়ে খাওয়া বিধেয়। পাকা শাঁস জলে সিদ্ধ করিয়া, ঘৃতে ভাজিয়া চিনি ও সুজিসহ হালুয়া প্রস্তুত করিয়া

উহাতে সামান্য পরিমাণ জাফরাণ বা মৃগনাভী এবং গোলাপ জল দিলে অতি উপাদেয় মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত হয়।

পেয়ারা।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা রুচি, পুষ্টি ও বলকর, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, ক্রিমি, বায়ু, তৃষ্ণা, জ্বর, মূর্চ্ছা, শ্রম ও শোষ নাশক। বড় পিয়ারা ছোট পিয়ারা অপেক্ষা অধিক উপকারী। ইহার বীজ ফেলিয়া খাওয়া কর্ত্তব্য নচেৎ গুরুপাক হয়।

হাকিমী মতে পেয়ারা মনের প্রফুল্লতা ও হৃৎপিণ্ড সবল কারক। ইহা সেবনে প্রস্রাব আনীত হয় এবং অর্শের রক্তবন্ধ ও পাথরী নির্গত হয়। পাকা পেয়ারা অধিক খাইলে পেটে বায়ু জন্মে, পেট ফাঁপে ও ভুট ভাট করে কিন্তু লবণ ও গোল মরিচ সহ আহারে উক্ত দোষ ঘটে না। অধিক পেয়ারা সেবনে অন্ত্রমণ্ডলের যে ক্ষতি হয় তাহা জীরক ভক্ষণে নিবারিত হয়। এই ফল সেবনে পিপাসা, মূত্রস্থলীর জ্বালা ও দাস্তের সহিত রক্ত পড়া নিবারিত হয়।

পিয়ারার বীজ ক্রিমি নাশক ও পাতা কোষ্ঠবদ্ধকর। শুষ্ক পিয়ারা পাতা চূর্ণ বা ফুলের রেণু ক্ষতের উপর ছিটাইয়া দিলে উহা শুষ্ক হয়। পেয়ারা গাছের আটা স্ফীতি নিবারক। খুব মিষ্ট সাদা পেয়ারা আহারে আমাশা নিবারিত হয়।

আধুনিক মতে পাকা পেয়ারা কোষ্ঠ পরিষ্কারক। পেয়ারা গাছের ছাল ও মূলের ছাল সঙ্কোচক, উহা শিশুদের উদরাময়ে বিশেষ ফলদায়ক। ½ আউন্স ছাল ৬ আউন্স জল সহ সিদ্ধ করিয়া তিন আউন্স থাকিতে নামাইয়া চা খাইবার চামচের এক চামচ মাত্রায় ব্যবহার্য্য। ইহা কিম্বা পেয়ারা পাতা সিদ্ধ জল দ্বারা মুখ ধৌত করিলে দাঁতের

মাড়ি ফুলা নিবারিত হয়। কলেরা রোগে উহা পানে দাস্ত ও বমন বন্ধ হয়। ইহাতে 'এ' ও 'সি' ভিটামিন আছে।

ফলসা।

আয়ুর্ব্বেদ মতে কাঁচা ফলসা অম্ল-কষায় রস, পিত্তবর্দ্ধক ও লঘু। পাকা ফলসা মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, রোধক, পুষ্টিকর ও হৃদয়গ্রাহী। ইহা পিত্ত, রক্ত দোষ, জ্বর, ক্ষয় ও বায়ু নাশক।

হাকিমী মতে ইহা সেবন করিলে হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলী এবং পিত্ত প্রধান ব্যক্তির যকৃৎ সবল করে। ইহাতে পিত্তজনিত দাস্ত, বমি, হিক্কা, পিপাসাদি দূর হয়, জ্বরের উত্তাপ কমে, বক্ষঃস্থল এবং পাকস্থলীর জ্বালা, প্রস্রাবের ও সর্ব্ব শরীরের জ্বালা নিবারিত হয়। ইহা বিলোপী জ্বরে উপকারী। ফলসার শিকড়ের ছাল সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে প্রস্রাব বন্ধ হওয়া এবং প্রস্রাবের সহিত রক্তস্রাব দোষ নিবারিত হয়। ইহার গাছের ছালের ভিতরের অংশ ৫ তোলা পরিমাণ অল্প কুটিয়া সমস্ত রাত্রি জলে ভিজাইয়া সকালে হাতে চটকাইয়া এবং শেষে ছাঁকিয়া সেবন করিলে বহুমূত্র রোগে বিশেষ উপকার হয়। সকালে এই দ্রব্য পানে প্রমেহ ও মূত্রকালে জ্বালা নিবারিত হয়। ইহার ফলের সরবৎ অতিশয় স্নিগ্ধকর, পানে পিত্ত প্রধান ধাতু বা গরম ধাতের লোকের পাকস্থলী সবল হয় এবং উন্মাদ, হৃৎকম্প ও অন্য বায়ুজনিত রোগ সমূহে উপকার করে।

বাদাম।

বাদাম একটী অন্যতম উৎকৃষ্ট আহারীয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে উহা শুক্রবর্দ্ধক, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক এবং কফকারক। রক্তপিত্ত রোগে বাদাম নিষিদ্ধ।

হাকিমী মতে বাদাম শারীরিক শক্তি ও মস্তিষ্কের সারাংশ রক্ষা করে। ইহা সেবনে কোষ্ঠবদ্ধতা, শূল ব্যথা, অন্ত্রমণ্ডলের ক্ষত আরোগ্য হয়। মিছরির সহিত সেবনে কাসির উপশম হয়, শ্বাস ও নিউমোনিয়া রোগে উপকার করে এবং মুখ দিয়া রক্ত উঠা নিবারিত হয়। আমাশা ও প্রমেহ রোগেও উহা উপকারী। বাদাম সেবনে শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও রতি শক্তি বৃদ্ধি হয়, পাথরী নষ্ট হয়, মূত্রাশয় সংশোধিত ও আভ্যন্তরিক অঙ্গ সমূহ সবল হয় এবং মূত্র ও শুক্রের দোষ দূর হয়।

ভাজা বাদামের শাঁস ধারক, রতিশক্তি বর্দ্ধক ও যকৃতের বেদনা নাশক। সাতটী বাদাম বাটিয়া ১ তোলা মিছরি সহ খাইলে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর হয়; উহা পাথরে ঘসিয়া খাইলে অধিক উপকার হয়। বাদাম বাটিয়া দুধের সরের সহিত মিশাইয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে গা ফাটা দূর এবং ত্বক মসৃণ ও কোমল এবং সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়। শীতকালে ইহার ব্যবহার অধিকতর উপযোগী।

বাদাম তেল মর্দ্দনে মস্তিষ্ক অত্যন্ত স্নিগ্ধ হয়, উহা তিল তেলের ন্যায় শৈত্য আনয়ন করে না, মাথাঘোরা বা শিরঃপীড়া প্রশমিত হয় ও সুনিদ্রা আসে। ইহা পৃষ্ঠে মালিশ করিলে বৃদ্ধের কুব্জতা বিদূরিত হয়। উক্ত উপকারগুলি মিষ্ট বাদামেই হয়। ছাতাধরা বাদাম খাইলে হিক্কা, বমন, মূর্চ্ছা, বেদনা ও ক্ষুধা নাশ হইতে পারে।

তিক্ত বাদাম কোন কোন রোগে উপকার করে কিন্তু আহারার্থে উহা পরিত্যজ্য। মধুর সহিত তিক্ত বাদাম সেবনে প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, চর্ম্ম ও কর্ণ রোগে উপকার করে, চক্ষে লাগাইলে দৃষ্টি শক্তি সতেজ হয়, শরীরের ফুলা নিবারিত এবং লাবণ্য বৃদ্ধি হয়। মধু ও জলের সহিত সেবনে শূল ও পাথরী, জরায়ুর বেদনা এবং মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট

হয়। ইহা মর্দ্দনে মুখের মেচেতা (ছুলি) নষ্ট হয়। সমুদ্র ফেনার সহিত মিশাইয়া গায়ে মাখিলে কাল দাগ ও রুক্ষতা দূর এবং সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। সির্কার সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে দাদ, চুলকনা, খোস ও মেচেতা প্রভৃতি দূর হয়। ইহা বিষাক্ত, ঔষধার্থে ২ রতি হইতে ২॥০ রতি পর্য্যন্ত ব্যবহার বিধেয়।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে বাদামে শ্বেতসার উপাদান শতকরা ১০·৫ ভাগ, স্নেহ জাতীয় ৫৮·৯, আমিষ ২০·৮, লবণ জাতীয় ২·৯ ভাগ ও জলীয় উপাদান ৫·২ ভাগ। ইহা ৪ ঘণ্টায় জীর্ণ হয়। ইহাতে সামান্য 'এ' ও অধিক পরিমাণে 'বি' ভিটামিন আছে।

বেদানা।

ইহার অন্য জাতীয় ফলের দেশ ভেদে নাম—আনার, দাড়িম্ব বা ডালিম। পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও কাবুলের এই ফলকে বেদানা বলে। উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বেদানার উল্লেখ নাই, উহা যে ডালিম অপেক্ষা অধিকতর গুণশালী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জ্বরে বেদানা উৎকৃষ্ট পথ্য।

ডালিম গাছের প্রত্যেক অংশ ঔষধী গুণ সম্পন্ন। বেদানা বা ডালিমের অনেক নাম আছে তন্মধ্যে সুফল, রক্তবীজ, মধুবীজ, ইত্যাদি উহার বিশেষ গুণ বা রূপ পরিচায়ক।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে স্বাদু ডালিম জ্বরঘ্ন, ত্রিদোষ নাশক, তৃষ্ণা ও দাহ নিবারক, শুক্রবর্দ্ধক, হৃদ্রোগ নাশক, লঘুপাক, কণ্ঠরোগ নাশক, মুখরোগঘ্ন, মলভেদক, আগ্নেয়, স্নিগ্ধবীর্য্য, মেদ ও বলবর্দ্ধক, মতান্তরে শুক্র, বল ও মেধাজনক, মুখ পরিষ্কারক, ত্রিদোষ নাশক এবং তৃষ্ণা,

অতিসার ও গ্রহণী রোগে হিতকর। অম্ল ডালিম রুচিকর, কোষ্ঠশোধক, তৃষ্ণা, অরুচি, শ্বাস, কাস ও বাত শান্তিকারক।

যে নারীর প্রায়ই গর্ভস্রাব হয় তাহাকে ডালিমের পাতা পিষিয়া শ্বেত চন্দন, মধু ও দধির সহিত গর্ভের পঞ্চম মাসে পান করাইলে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা থাকে না। সরস কূটজের (কুড়চি) ও ডালিম গাছের ছালের ক্বাথ মধুসহ সেবনে মুমূর্ষু রক্তাতিসারগ্রস্ত রোগীও আরোগ্য লাভ করে।

সরস কূটজের ছাল ৮ তোলা লইয়া ৬৪ তোলা জলে পাক করিয়া ১৬ তোলা থাকিতে নামাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার সহিত ১৬ তোলা ডালিমের রস মিশাইয়া পুনরায় পাক করিবে। গুড়ের ন্যায় গাঢ় হইলে উহা নামাইবে। মাত্রা ১ তোলা। ইহা সেবনে দুঃসাধ্য রক্তাতিসার রোগ আরোগ্য হয়। এমন কি মুমূর্ষুও বাঁচিয়া যায়। মিষ্ট ডালিমের রস গুড়ের সহিত সেবনে আমাজীর্ণ প্রশমিত হয়। ইহা অর্শাদি গুহ্যরোগ ও কোষ্ঠবদ্ধতার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডালিম গাছের মূল হস্তে :ধারণ করিলে অর্শ সারে। রক্তাতিসারে কতকগুলি কচি ডালিম পাতা ছাগ দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেবনে বিশেষ উপকার হয়। "বঙ্গসেন ও ভাব প্রকাশ।"

মহর্ষি চরকের মতে ডালিম ফুলের রস নস্য রূপে গ্রহণ করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব এবং উহার ছালের ক্বাথ শুঁঠের সহিত পানে অর্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

হারীতের মতে দাড়িম্ব ফলের খোসা চূর্ণ করিয়া চিনির সহিত সেবনে মুখ হইতে রক্তস্রাব প্রশমিত হয়।

ডালিম ফলের রস, বিট লবণ ও মধু মুখ মধ্যে ধারণ করিলে অসাধ্য অরুচি প্রশমিত হয়। অন্য মতে ডালিমের বীজ পিষিয়া উহার রস চিনি সহ মুখে ধারণ করিলে জ্বর রোগীর মুখ শুষ্কতা বা বিরসতা বিনষ্ট হয়।

আধুনিক মতে ডালিমের রস গ্রহণী ও জ্বর বিশেষে সেব্য। ডালিমের ফুল ও খোসা, জৈত্রি, দালচিনি, ধনে ও গোলমরিচ সহ সেবনে শিশুদের পুরাতন অতিসার বা রক্তাতিসারে (যদি কুন্থন না থাকে) বিশেষ হিতকর।

দুর্ব্বা ঘাসের রসে ডালিম ফুল পিষিয়া নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। মূলের ত্বকের ক্বাথ ক্রিমিঘ্ন। অন্ত্র হইতে ক্রিমি বিশেষতঃ ফিতার মত ক্রিমি বাহির করিতে হইলে ঐ ক্বাথ সেবনীয়। মাত্রা ৵০ হইতে ।০ আনা। আধ সের জলে ১ ছটাক ডালিমের শিকড়ের ছাল সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিলে উহা ½ ঘণ্টা অন্তর ২।৩ বার সেবনে ক্রিমি নির্গত হইতেই হইবে।

ডালিম গাছের পরগাছার একটী শাখার গাঁট ছিদ্র করিয়া গলায় ধারণে নানা রোগ প্রশমিত হয়। রক্তপ্রদরে ডালিমের রস মধুসহ সেব্য।

হাকিমী মতে মিষ্ট ডালিম লঘুপাক, বিরেচক, হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ সবলকারক। ইহার রস সেবনে পাণ্ডু বা কামলা, হৃৎকম্প, বক্ষবেদনা ও উৎকাসি উপশমিত হয়, কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, শরীর হৃষ্ট পুষ্ট, গাত্র-কণ্ডু নাশ, বর্ণ উজ্জ্বল এবং পিপাসা দূর হয়। উষ্ণ প্রকৃতি অর্থাৎ পৈত্তিক ধাতের লোকের আহারান্তে ডালিম খাওয়া ভাল, ইহাতে আহার শীঘ্র জীর্ণ হয়। ডালিম রতিশক্তি বর্দ্ধক। মিষ্ট ডালিমকে

নিষ্পেষিত করিয়া ঐ রস শিশিতে রাখিয়া রৌদ্রে রাখিবার পর যখন গাঢ় হইবে তখন চক্ষে দিলে চক্ষুর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি এবং নানা চক্ষুরোগ উপশমিত হয়।

অম্লমিষ্ট ডালিম—ইহার ক্রিয়া প্রায় মিষ্ট ডালিমের তুল্য; পিত্ত প্রধান ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহার খোসা নিষ্পেষিত করিয়া রস বাহির করিয়া গুড়ের সহিত সেবনে পিত্তজনিত দাস্ত, বমন, চুলকনা, কামলা, পিত্তজ্বর প্রভৃতিতে উপকার হয় এবং পাকস্থলী সবল ও হিক্কা নিবারিত হয়।

অম্ল ডালিম—সঙ্কোচক ও লঘুপাক; যকৃৎ ও হৃৎপিণ্ডের উত্তাপ, বুক জ্বালা এবং রক্ত ও পিত্ত প্রকোপ নিবারণ করে। ইহা বায়ুনাশক ও জ্বরজনিত বমন ও দাস্ত নিবারক এবং কামলা ও শুষ্ক চুলকনাতে উপকারী। মিষ্ট ডালিম অপেক্ষা ইহা অধিক প্রস্রাব আনয়ন করে। ইহা সেবনে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের মাটি খাইবার ইচ্ছা নিবারিত হয়। ইহার সাতটী কুঁড়ি গিলিয়া খাইলে এক বৎসর পর্য্যন্ত ফোড়া ও ফুসকুড়ি জন্মে না বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ডাক্তারি মতে ডালিমের সকল অংশ সঙ্কোচক, কারণ ইহাতে প্রচুর ট্যানিক অ্যাসিড আছে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে ডালিম ফুলের রস ও শ্বেত দূর্ব্বার রস একত্রে মিশ্রিত করিয়া ২।৩ বার নস্য লইলে উহা আরোগ্য হয়। ইহার মূলের বা ছালের ক্বাথ ক্রিমি নাশক। ডালিমের খোসা চূর্ণ ২ হইতে ৪ আনা. মাত্রায় একটু মধুসহ সেবনে আমাশা, রক্তামাশা ও উদরাময় প্রশমিত হয়। ডালিমে বা বেদানায় সামান্য পরিমাণ 'এ' ও 'সি' ভিটামিন আছে।

লেবু।

লেবুও বহু গুণান্বিত। ইহাতে প্রচুর পরিমাণ পটাস, সোডা, চূণ, ম্যাগনেসিয়া ও ক্লোরিণ আছে। সকল লেবুর মধ্যে কাগজি, বাতাবী ও পাতি সমধিক উপকারক।

আয়ুর্ব্বেদ মতে কাগজি লেবু গুল্ম, আমবাত, কাস, কফ, বমি, তৃষ্ণা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও অম্লপিত্ত নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, পাচক, অত্যন্ত রুচিকর, বাত, অম্ল ও উদরাময় রোগে উপকারী, ক্রিমিনাশক, শূলঘ্ন, বিষঘ্ন, ক্ষয়ঘ্ন, ত্রিদোষ, বায়ু বিকার, অগ্নিমান্দ্য ও বিসূচিকা নাশক। পাতি লেবু পাচক, রুচিকর, বাত, কফ ও বমিনাশক কিন্তু ঈষৎ পিত্তবর্দ্ধক।

কাগজি বা পাতি লেবুর রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে দিলে কর্ণ বেদনা আরাম হয়। ঐ লেবুর রস ঘৃত ও সৈন্ধব লবণের সহিত মুখে ধারণ করিলে জ্বর রোগের অরুচি নিবারিত হয়। লেবুর কেশর কাঁজি বা আমানিতে মিশাইয়া বসন্ত রোগীর ত্বকে প্রলেপ দিলে বসন্তের গুটিকা পাকে ও যন্ত্রণা কমে।

সন্ধ্যার সময় ঐ লেবুর রস পানে অম্লপিত্ত প্রশমিত হয়। প্রাতে আহারের পূর্ব্বে খালিপেটে গরম জলের সহিত ½ খানা বা একটী পাতি লেবুর রস পানে যকৃৎ ও পিত্তদোষ বিনষ্ট হয় এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে। চিনি ও পাতি বা কাগজি লেবুর রস কুলকুচা করিলে স্বরভঙ্গ বা গলার বেদনা সারে। গরম এবং কড়া ১ পেয়ালা চায়ে লেবুর রস দিয়া খাইলে মাথাধরা সারে এবং মনে স্ফূর্ত্তি আনে।

ডাক্তারী মতে কণ্ঠের ঝিল্লীপ্রদাহ, রোহিণী বা (Diptheria) এবং গেঁটে বাত রোগে পাতি লেবুর রস মর্দ্দন বা সেবন বিশেষ

হিতকর। ইহা বহুমূত্র রোগ প্রতিষেধক। রক্তহীনতা (Scurvy) রোগে ইহার টাটকা রস মহৌষধ। রোহিণী রোগে ও মুখক্ষতে যবক্ষার ও মধু সহ লেবুর রস দ্বারা মুখ প্রক্ষালনে বিশেষ উপকার হইতে শোনা যায়।

কয়েক ফোঁটা পাতি লেবুর রস ঠাণ্ডা জলের সহিত সেবনে চক্ষের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়। শীতে হাত-পা জ্বালা কিম্বা কোন ক্ষত হইলে পাতি লেবুর রসে তাহা ভাল হয়।

কাগজি বা পাতি লেবুর রসের সহিত চিনি মিশাইলে শৈত্যগুণ বর্দ্ধিত হয় বটে কিন্তু রোগে উপকার হয় না পরন্তু অম্লজনক। উহা বিনা চিনির সহিত খাইলে ক্ষুধাবৃদ্ধি ও রক্ত পরিষ্কৃত হয়।

কাগজি ও পাতি লেবুর রস উপরন্তু জ্বরের দাহ ও তৃষ্ণা নিবারক। নিম্বু পানক অতি উৎকৃষ্ট পানীয়।" এক ভাগ কাগজি লেবুর রস ও ৬ ভাগ চিনির জল সহ কিঞ্চিৎ লবঙ্গ ও গোলমরিচ চূর্ণ মিশাইয়া উহা প্রস্তুত হয়। সর্ব্ববিধ রোগে কমলা, কাগজি ও পাতি লেবুর রস সুপথ্য। গোঁড়া লেবু বা টক জামির আগ্নেয় ও কফকর এবং গুল্ম, অজীর্ণ, আমদোষ ও বায়ুরোগে হিতকর। একটী গোঁড়া লেবু যতক্ষণ মিষ্ট বা টক লাগিবে ততক্ষণ খাইবে, তেত লাগিলে আর খাইবে না। ইহাতে গরল আরাম হয়।

বাতাবি লেবু কফ, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক, বর্ণ, বীর্য্য, রুচি, পুষ্টি ও তৃপ্তি কারক, বাতশ্লেষ্মা, শূল, প্লীহাবৃদ্ধি ও যকৃতের বিকৃতি নাশক এবং অম্লপিত্ত প্রশমক।

বিছা বা বিষাক্ত পোকার কামড়ে দষ্টস্থানে লেবু ঘসিলে জ্বালা কমে। মধু, ফটকিরি এবং লেবুর রসে শিশুদের গলা ঘড়ঘড়ি ও

কাসি প্রশমিত হয়। শুষ্ক লেবুর খোসা কয়লার উপর দিলে দুর্গন্ধ দূর হয়। দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে একটু কাপড় লেবুর রসে ভিজাইয়া ক্ষতস্থানে জড়াইলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

প্রসবান্তে রক্তস্রাব, কণ্ডু বা অধিক রৌদ্র সেবন জনিত পীড়ায় লেবুর রস বিশেষ উপকারী। অনেকের ধারণা, টক লেবু অম্লজনক কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়। অল্প পরিমাণ সেবনে পাচক রসের অম্লত্ব নষ্ট হইয়া ক্ষারগুণ বর্দ্ধিত হয়। অধিক পরিমাণ সেবন বিষম অনিষ্টকর। লেবুর আর একটী বিশেষত্ব, উহা রোগের জীবাণু বা বীজাণু সংক্রমণ নির্দ্দোষভাবে নিবারণ করে।

আজকাল কলিকাতায় গ্রেপ ফ্রুট নামে, বাতাবী লেবু জাতীয়, এক প্রকার ফল আমদানী হইতেছে। ইহাতে তিনটী রসের সমাবেশ আছে—টক, কষায় ও মিষ্ট। ইহা সাহেবদের অধিক প্রিয়। ডাঃ ওয়েব জনসন লিখিয়াছেন ইহা সারক, সহজে হজম হয় এবং যখন অন্য আহার সহ্য হয় না তখন ইহা দেহে সহজে শোষিত হয়। ইহার ক্ষয়পূরক ও পেশীবর্দ্ধন শক্তি আমিষ জাতীয় খাদ্য দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক। ইহাতে দন্ত ও অস্থি নির্ম্মাণকারী বিবিধ খনিজ লবণ আছে এবং শর্করা ও খাদ্যপ্রাণ 'বি' ও 'সি' থাকায়, রোগের সময় ও পরে বিশেষ উপকারী। যখন অন্য শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাকে বিঘ্ন হয় তখন এই লেবুর শর্করা রস দেহে সহজে গৃহীত হইতে পারে।

কমলা লেবু—ইহা রুচি ও বলবর্দ্ধক, শ্রান্তিনাশক এবং বায়ু, ক্রিমি ও শূলরোগ প্রশমক। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে এক গ্লাস ঘোল ও এক গ্লাস কমলা লেবুর রস উভয়ের তুলনায় শেষোক্ত পদার্থে শতকরা ২৪ ভাগ অধিক পুষ্টিকর পদার্থ থাকে। এক গ্লাস কমলা লেবুর রস পৌনে এক গ্লাস খাঁটি দুধের সমান পুষ্টিকর। জ্বরের

দাহ ও তৃষ্ণা দূর করিতে এবং শরীরের বিষাক্ত পদার্থ বিতাড়িত করিতে উহার অসীম কার্য্যকারীতা জানা গিয়াছে।

অনেকে জ্বরের সময় কমলা লেবুর ঈষৎ টক রসে অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা করেন তাহা অমূলক। কমলা লেবুর রসে অ্যালবুমেন বা অণ্ডলালা না থাকায় (যাহা দুগ্ধে আছে) উহা বৃহৎ অন্ত্রে গিয়া পচিবার সম্ভাবনা থাকে না এবং উহাতে শর্করা ও যে অল্প প্রোটিন অংশ থাকে তাহা সহজেই শরীরে শোষিত হয়। এই হেতু, জ্বরে কমলা লেবুর রস উৎকৃষ্ট আহার বা পথ্য। উহা শিশুদের বৃদ্ধিসাধক এবং ক্ষুধাবর্দ্ধক, সেইজন্য উহাদের আদর্শ আহার। খালিপেটে খাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর ও রক্ত পরিষ্কার হয়। কমলা লেবুতে 'এ', 'বি', 'সি' ও 'ডি' ভিটামিন অধিক পরিমাণে আছে।

পাশ্চাত্য সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিদগণ বলেন রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে প্রত্যহ একটী কমলা লেবু খাইলে দেহের বর্ণ ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়। কমলা লেবু অন্য লেবু অপেক্ষা সমধিক বলকারক।

কমলা লেবুর খোসারও নানা ওষধি গুণ আছে। যকৃৎ বিকৃতিতে প্রত্যহ কিছু খোসা একটু মিছরির গুঁড়ার সহিত খাইলে বিশেষ উপকার হয়। কিছু কমলা লেবুর খোসা বেশ করিয়া বাটিয়া মিছরির গুঁড়া সহ জলে গুলিয়া সরবৎ তৈয়ারী করিয়া পান করিলে হিক্কা বন্ধ এবং শরীর স্নিগ্ধ হয়। অম্লপিত্তে রৌদ্রশুষ্ক ঐ খোসার চূর্ণ চারি আনা, এক আনা সৈন্ধব লবণ সহ একত্রিত করিয়া ঘোলের সহিত পানে বিশেষ উপকার হয়।

শ্রীফল—বেল।

সংস্কৃত সাহিত্যে বেলের অনেকগুলি নাম আছে তন্মধ্যে কতকগুলি বিশেষ ২ গুণ পরিচায়ক যথা—শ্রীফল, অতিমাঙ্গল্য, মহাফল, পত্রশ্রেষ্ঠ,

লক্ষ্মীফল, শিবদ্রুম, সত্যফল, সদাফল, ত্রিশিখ, পূতিমারুত, সুফল, গন্ধফল ইত্যাদি। অন্য কোন ফলের শ্রীফল বা লক্ষ্মীফল সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই। ইহা মহাদেবের অতি প্রিয় বৃক্ষ বলিয়া কথিত হয় তাই উহার একটী নাম শিবদ্রুম, শিব অর্থে কল্যাণপ্রদ বা তমোনাশক। অন্য ফল না পাকিলে গুণযুক্ত হয় না কিন্তু বেল কাঁচা অবস্থায়ও বিশেষ গুণসম্পন্ন। উহা একাধারে সঙ্কোচক ও বিরেচক, এই গুণ অন্য কোন ফলে নাই। বেলবৃক্ষ বাতাসের গন্ধ দূর করে বলিয়া উহার নাম গন্ধমারুত।

পাবনার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথী তত্ত্ববিদ শ্রীপ্রমদা প্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার ভৈষজ্যতত্ত্ব পুস্তকে লিখিয়াছেন—"আমাদের শরীরের সহিত তিনটী প্রধান দেবতার সম্বন্ধ নির্ণয় করণার্থে, শাস্ত্রে ব্রহ্মাকে বায়ুর অধিপতি, বিষ্ণুকে পিত্তের অধিপতি এবং শিবকে কফ বা শ্লেষ্মার অধিপতি বলা হইয়াছে।"

"বিল্বপত্র ত্রিপত্র বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে উহার বিবিধ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এই ত্রিপত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রতীক, আকার, উকার ও মকার রূপ ওম্ বা প্রণব; আমি তুমি ও তিনি এই তিন পুরুষ স্বরূপ; জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিপুটী; কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়া ইহার ব্যঞ্জক এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশ এই তিন লোকের স্বরূপ।"

"মনুষ্যগণ বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া আর্য্যঋষিগণ উঁহাদিগকে সাধারণতঃ সত্ব, রজঃ ও তমগুণযুক্ত এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও কফের সহিত সাদৃশ্য স্থাপন করিয়াছেন। যে কারণেই হউক তমোগুণের আধিক্যে অর্থাৎ শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে উহা বিল্বপত্র রস সেবনে দমিত হয়। তুলসীপত্রের রস নিয়মিত সেবনে যেমন রজঃ ও সত্বগুণের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়া সত্বগুণের আধিক্য হয়,

বিল্বপত্রের ব্যবহারে তমোগুণের আধিক্য নষ্ট হইয়া উহার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় এবং ক্রমে রজঃ ও সত্ত্বগুণের স্ফুরণ হয়। সকল ঋতুর মধ্যে বসন্তকালে, শুক্লপক্ষ অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষে, শরীরে শ্লেষ্মাধিক্য হয় সুতরাং ঐ সময়ে বেলপাতা বা বেল ব্যবহার হিতকর।"

"এইজন্য বসন্তকালের শিব চতুর্দ্দশী ব্রত পালনের ব্যবস্থা আছে। এরূপ কথিত হইয়াছে যে উহাতে ব্রতপালনকারীর শরীরে পর বৎসর শ্লেষ্মার প্রভাব থাকে না। এইরূপ বসন্তকালে অশোকষষ্ঠীতে সংবৎসরের জন্য জরায়ু সংক্রান্ত দোষ প্রতিষেধার্থে রমণীগণের অশোক ফুল সেবনের ব্যবস্থা আছে, উহা এখনও কেহ কেহ পালন করে।

আফুল বেলগাছের শিকড় কোমরে ধারণ করিলে অধিক রক্ত ও জলভাঙ্গা নিবারিত হয়। শরীরে যখন রস বা শ্লেষ্মার আধিক্য হইয়া শোথ ও শ্লেষ্মা জনিত নানা প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয় তখন বিল্বপত্রের আশ্চর্য্য ক্রিয়া দ্বারা উক্ত রোগ সকল সহজে উপশমিত হয়। সেইজন্য শোথরোগীর পানীয় জলে বিল্বপত্র দিবার ব্যবস্থা আছে। শিশুদের চোখ ফুলিলে বেলপাতার রসের প্রলেপ বিশেষ উপকারক।

বেলপত্রের আর একটী বিশেষত্ব আছে। হিন্দু সাধু, সন্ন্যাসীগণ কাম প্রবৃত্তি দমনের জন্য, নিয়মিতভাবে বেলপাতার রস পান করে। শোনা যায়, বেলপাতায় পারদ আছে এবং আমাদের দেশে অনেক অবধূত ও সন্ন্যাসী বেলপাতা হইতে পারদ নিষ্কাশন করিবার কৌশল জানিতেন। পুরাণে পারদের সহিত শিবের একটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে।"

উক্ত চিকিৎসক বেলশুঁঠ হইতে হোমিওপ্যাথি বিধান মতে ঈগল ফোলিয়া নামক একটী ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন, উহা ব্যবহারে শোথ

এবং অন্য নানা রোগে বিশেষ ফল পাইয়াছেন। আমরা পরীক্ষা করিয়া অনেক ক্ষেত্রে উহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছি।

• আয়ুর্ব্বেদ মতে, পাকা বেল গুরুপাক, মধুর, হৃদ্য, পিত্তনাশক, রুচিকর, আগ্নেয়, মৃদুরেচক, মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড ও যকৃতের বলকারক এবং কফ, জ্বর ও অতিসার নাশক। কাঁচাবেল আগ্নেয়, সঙ্কোচক, পাচক, মলরোধক এবং বাত, কফ, উদরাময়, গ্রহণী, আমাশা ও কফাতিসার নাশক। কাঁচা বেল পোড়া ও কাশীর চিনি ধারক, অগ্নিবর্দ্ধক, অতিসার এবং আমরক্তাতিসারের মহৌষধ।

বেলপাতার রস মধুর সহিত সেবনে কোষ্ঠ পরিষ্কার ও জ্বর নাশ হয়। গোল মরিচের সহিত সেবনে কোষ্ঠবদ্ধ ও কামলা রোগ উপশমিত হয়। কাঁচা বেল পাতার রস বা কাঁচা বেলপোড়া আখের গুড়ের সহিত ভক্ষণে রক্তাতিসার, আমাতিসার ও আমশূল বিনষ্ট হয়। বেলপাতার রস কফ, বাত, আম ও শূলরোধক, সংগ্রাহী ও রুচিকর। উহা গায়ে মাখিলে স্থূল ব্যক্তির অতি স্বেদ জনিত দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয়।

অধিক বেল খাইয়া অপকার হইলে নিম বীজ সেবনে উহা নিবৃত্ত হয়।

বেলশুঁঠ ও শুঁঠ চূর্ণ পুরাতন আখের গুড়সহ সেবনের পর ঘোল পান করিলে উৎকট গ্রহণী রোগ আরোগ্য হয়। বেলশুঁঠ গোমূত্রের সহিত পিষিয়া উহার কল্ক সেবন এবং ছাগদুগ্ধ তিল তেলে পাক করিয়া কর্ণপূরণ করিলে বধিরতা প্রশমিত হয়। বেলশুঁঠ লঘুপাক, মলরোধক, পাচক, বলকারক, পিত্তজনক ও শ্লেষ্মা নাশক। বেলফুল অতিসার, তৃষ্ণা ও বমন নাশক। বেলের শিকড় মধুর, লঘু, বমন নিবারক ও ত্রিদোষ নাশক। মতান্তরে অধিকন্তু বমন ও রক্তপিত্তনাশক।

হাকিমী মতে পাকা বেলের শাঁস মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ সবল কারক ও পাচক। কাঁচা বেলের ক্কাথের সরবৎ বা মোরব্বা উদরাময় ও সর্ব্বপ্রকার আমাশা রোগনাশক।

ডাক্তারী মতে পাকা বেল পুষ্টিকর, রসায়ন, মৃদুরেচক এবং শরীরকে সুস্থ, সবল ও প্রকৃতিস্থ করে। উহা মিসরির সহিত সেবনে অর্শের বলি বাড়িতে পারে না এবং গ্রহণী ও কোষ্ঠবদ্ধ রোগে বিশেষ উপকারী। কাঁচা বা আধপাকা বেল ধারক, পাচক এবং আমাশা ও রক্তাতিসার নাশক। যে প্রকার পেটের পীড়ায় পর্য্যায়ক্রমে তরল ও কঠিন ভেদ বর্ত্তমান থাকে তাহাতে উহা বিশেষ উপযোগী।

কাঁচা ও পাকা বেল অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য রোগের মহৌষধ এইজন্য ঐ রোগে উহা নিত্য সেবনীয়। যকৃতের নানা প্রকার রোগে, অম্ল, শূলবেদনা ও ডিসপেপ্সিয়া রোগে বেলপাতার রস গোলমরিচ চূর্ণ সহ ব্যবস্থিত হয়। শ্লেষ্মারোগে বক্ষঃস্থলে বেলপাতার পুলটিস এবং শ্বাসকষ্ট রোগে বেলপাতার ক্কাথ সেবনে সবিশেষ উপকার হয়।

বেলপাতা, তুলসীপাতা, ছোট এলাচ, দালচিনি, ও আদা ফুটং গরম জলে সিদ্ধ করিয়া আবশ্যক মত চিনি ও দুধ মিশাইয়া চায়ের মত পানে, বল বৃদ্ধি ও ম্যালেরিয়া নাশ করে বলিয়া উক্ত হইয়াছে আফুল বেল গাছের শিকড় কোমরে বাঁধিলে রমণীদের অধিক রক্ত ও জলভাঙ্গা নিবারিত হয়। বেলে ভিটামিন "এ," আছে এবং বেশ পরিমাণে ভিটামিন "সি" আছে।

এই ফলে কিছু অম্লরস থাকায় উহা দুগ্ধসহ সেবন বিরুদ্ধ ভোজ পর্য্যায়ে পড়ে কিন্তু (মিষ্ট আম বা) বেলের পানা দুধ বা দধি স আহারের শেষে সেবনে অনিষ্ট হয় না বরং অন্য বিরুদ্ধ আহার দো

খণ্ডন করে। মাংসাদি আহারজনিত কোষ্ঠবদ্ধে অনেকে জোলাপ ব্যবহার করেন কিন্তু তাহা পরিণামে অন্ত্রের অনিষ্ট সাধন করে। উহার পরিবর্ত্তে বেলের পানা নির্দ্দোষ ও কোষ্ঠশুদ্ধিকর। তবে বেলের পানার জন্য পেট কিছু খালি রাখিতে হইবে নচেৎ ভরাপেটে খাইলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হইতে পারে।

বেলের পানায় টক মিশাইয়া খাইলে অম্ল হইতে পারে সেজন্য ওরূপ না খাওয়াই ভাল। বেলের মোরব্বার পূর্ব্বোক্ত গুণ অল্পবিস্তর আছে উহা অনেক দিন রাখিতে হইলে কিছু লেবুর রস মিশাইয়া রাখা উচিত। ঐরূপ মিশ্রণ অধিকতর মুখরোচক হয়।

আমাশয়, পচ্যামাশয়, পক্কাশয়, মূত্রাশয়, হৃদয়, উণ্ডুক ও ফুসফুস এই আটটি দেহ যন্ত্রের আয়ুর্ব্বেদোক্ত নাম কোষ্ঠ। সর্ব্ববিধ কোষ্ঠ শুদ্ধির পক্ষে কাঁচা ও পাকা বেল শ্রেষ্ঠ।

বেলের অন্যান্য গুণ—ইহার আটা ও চুণ মিশ্রিত করিলে ভাল সিমেণ্টের কাজ করে। প্রতিমার বর্ণ উজ্জ্বল করিবার জন্য, রঙে বেলের আটা মিশাইয়া প্রলেপ দেওয়া হয়। মাদ্রাস প্রদেশে সাধুগণ তেলের পরিবর্ত্তে বেলের আটা মাখিয়া স্নান করে, ইহাতে তাহাদের শরীরের ময়লা কাটিয়া যায় এবং শরীর স্নিগ্ধ হয়। অনেক দেশে গরীবেরা বেলের আটা ও চুণ মিশ্রিত করিয়া কাপড় পরিষ্কার করে।

দুগ্ধ ও ঘৃতের ন্যায় বেল আর একটী মর্ত্তের অমৃত, একাধারে আহার ও ঔষধ। দর অল্প বলিয়া লোকে ইহাকে অবহেলা করে কিন্তু ফল খাইবার পয়সা নাই বলিয়া কাঁদিতেও ছাড়ে না।

পূর্ব্বোক্ত ফল ব্যতীত আরও অনেক পুষ্টিকর ফল আছে, তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুলির বিষয় পরে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

কৎবেল—ইহা যদিও সাধারণতঃ সামান্য ফল বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু পুষ্টিকারীতা ও রোগে উপকারীতা হিসাবে মূল্যবান্। ইহাতে শতকরা ৭'৩ আমিষ উপাদান আছে যাহা অত পরিমাণে অন্য কোন ফলে নাই।

ইহা বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু পরীক্ষিত সত্য। ইহাতে লবণ ঘটিত পদার্থ শতকরা ১'৯ যাহা তেঁতুল ও কিসমিস ব্যতীত প্রায় অপর সকল ফলের ঐ পরিমাণ অপেক্ষা অনেক অধিক ; শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় উপাদান শতকরা ১৫'৫ এবং চুণের পরিমাণ তেঁতুল ব্যতীত অন্য সব ফলাপেক্ষা অনেক অধিক। ইহা অরুচির রুচি। কৎবেলের শাঁস সরিষার তেল ও লবণ সহ সেবনে অধিক মুখরোচক ও গুণশালী হয়।

অধিক কৎবেল খাইয়া অজীর্ণ হইলে মৌরী সেবনে নিবৃত্ত হয়। পাকা কৎবেল শীতল, মলরোধক, কণ্ঠশোধক, বায়ু ও পিত্ত নাশক, কফ, ব্রণ, শ্বাস, কাস, হিক্কা, বমি, হৃদ্রোগ, বিষদোষ, শ্রান্তি ও ক্লান্তি নাশক কিন্তু দুষ্পাচ্য বলিয়া অধিক ভোজন অনুচিত। কাঁচা কৎবেল ত্রিদোষজনক। উহা বাটিয়া প্রলেপ দিলে চুলকনা নষ্ট হয়। কৎবেল গাছের কাঠ হুঁকার জলে চন্দনের মত ঘসিয়া পারার ঘায়ে লাগাইয়া তাহার উপর হুঁকার জলে ভিজা নেকড়া বাঁধিয়া রাখিলে উহা আরাম হয়।

খেজুর—আমাদের দেশীখেজুর আঁটিসার, উহার বিশেষ উপকারীতা নাই। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম দেশ হইতে আনীত বাক্স বা ঘড়ার খেজুর সমধিক গুণ সম্পন্ন। ইহাতে আমিষ জাতীয় উপাদান শতকরা ৩ ভাগ আছে ; বাদাম, কৎবেল ও তেঁতুল ব্যতীত অন্য কোন ফলে

এত অধিক নাই। লবণঘটিত পদার্থ ১'৩ যাহা বাদাম ও কৎবেল ব্যতীত অন্য সকল ফলাপেক্ষা অধিক। উহাতে লৌহঘটিত লবণ উপাদানের পরিমাণ সর্ব্বাধিক। শ্বেতসার ৬৭'৩ (এত অধিক শ্বেতসার অধিকাংশ খাদ্যে নাই)। ইহাতে 'এ', 'বি' ও 'সি' ভিটামিন আছে।

উপরোক্ত কারণে ইহা একটী অন্যতম পূর্ণাঙ্গ খাদ্য এবং অন্য অনেক ফলাপেক্ষা পুষ্টিকর। অজীর্ণ ও আমাশা রোগে খেজুর অপথ্য। উহার খোসা অধিক দুষ্পাচ্য সেইজন্য রোগীকে খোসা ছাড়াইয়া খাইতে দেওয়া উচিত। অধিক খেজুর খাইয়া জীর্ণ না হইলে শুঁঠ সেব্য।

আয়ুর্ব্বেদ মতে খেজুর স্নিগ্ধ, রুচিকর, গুরুপাক, তৃপ্তি, পুষ্টি, বল ও শুক্রবর্দ্ধক, রোধক, রক্তপিত্ত, ক্ষত, ক্ষয়, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, বমন, জ্বর, অতিসার, শ্বাস, কাস, মূর্চ্ছা, মদাত্যয়, দাহ, বাতপিত্তাদি রোগে হিতকর।

খেজুর রস শীতল, রুচিকর, অগ্নি, বল, শুক্র ও মূত্রবর্দ্ধক ও বাতশ্লেষ্মানাশক।

আরব দেশে নিম্নশ্রেণীর লোকে বিশেষতঃ মরুপথগামীগণ কেবল মাত্র ডুমুর ও খেজুর খাইয়া জীবন ধারণ করে।

শসা।

কচি—পিপাসা, ক্লান্তি, দাহ, পিত্ত ও রক্তপিত্ত নাশক। খোসা-শুদ্ধ খাওয়া হিতকর।

বীজ—মূত্রকারক, পিত্তদোষ ও মূত্রকৃচ্ছতা নাশক। ইহা ৩০ গ্রেণ সেবনে মূত্ররোধ তিরোহিত হয়।

পাকা—কফ ও বায়ুনাশক কিন্তু পিত্তবৰ্দ্ধক। ইহাতে 'বি' ভিটামিন আছে। শশা খাইয়া অজীর্ণ হইলে উহা গোলাপ জল পানে নিবৃত্ত হয়।

সবেদা।

ইহা অতি মুখরোচক ও মধুর, সাহেবদের অতি প্রিয়। এত মিষ্ট ফল অতি অল্পই আছে। এই বৃক্ষ আবাদ করিলে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে। মধ্যম গ্রামের নিকট একজন মুসলমানের একটী মাত্র বহু পুরাতন অতি বিশাল সবেদা গাছ আছে। কলিকাতায় এই ফলের চাহিদা এত বেশী যে একজন দোকানদার এই গাছটী বার্ষিক ৫০০৲ টাকায় অবধি জমা লইয়াছে।

কাঁকুড় ও ফুটি।

কাকুড় পিত্তঘ্ন, কফনাশক ও ধারক। ফুটি পিত্তবৰ্দ্ধক।

তাল।

পাকা তাল পিত্তবৰ্দ্ধক, কফজনক, রক্তবৰ্দ্ধক, দুষ্পাচ্য, তন্দ্রাজনক ও মূত্রকর। তালশাঁস কফবৰ্দ্ধক কিন্তু বাতঘ্ন, পিত্তনাশক ও সারক। তালে 'সি' ভিটামিন আছে। কচি তালশাঁস হিক্কার অব্যর্থ ঔষধ। তাল আঁটির শাঁস শীতল, মূত্রবৰ্দ্ধক, কফ নাশক কিন্তু দুষ্পাচ্য। তাল খাইয়া অজীর্ণ হইলে কিছু চাল চিবাইয়া খাইলে সারিবে।

কচি—কফকারক কিন্তু মেদ বৰ্দ্ধক। মাঝারি—বাত ও পিত্তনাশক। বৃদ্ধ ইক্ষু বলবৰ্দ্ধক, ক্ষত ও রক্তপিত্ত নাশক। দন্ত নিষ্পীড়িত ইক্ষুরস

চিনি অপেক্ষা বীর্য্যবান কারণ উহাতে মুখের ক্ষার-রস অধিক মিশ্রিত হয়। যন্ত্রনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস গুরুপাক।

শৃঙ্গাটক বা পানিফল।

ইহা শীতবীর্য্য, স্বাদু, কষায়-মধুর রস, গুরু, পুষ্টিকর, শুক্রজনক, বায়ুবর্দ্ধক, কফজনক, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহনাশক। পুরাকালে ভিষকগণ অতিসার ও আমাশা রোগে একমাত্র পানফলের পালোর পথ্য ব্যবস্থা দিতেন। পানফলের শ্বেতসার সহজপাচ্য এবং সুস্বাদু খাদ্য হিসাবেও মূল্যবান। পানফল রোগী ও ভোগীর উৎকৃষ্ট আহার। রাসায়নিক বিশ্লেষণে শুষ্ক সিঙ্গাড়ায় আমিষ উপাদান শতকরা ১৩·৪ পাওয়া গিয়াছে। উহাতে লবণজাতীয় উপাদান ৩·১, শ্বেতসার ৬·৯ এবং ফসফরাস অধিক পরিমাণে আছে।

নোনা।

ইহাতে প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় উপাদান শতকরা ১·৪ ভাগ আছে যাহা কলা প্রভৃতি অনেক ফলের ঐ উপাদান অপেক্ষা অধিক সুতরাং উহা একেবারে হেয় আহার্য্য নয়।

পিচ।

ইহার বৃক্ষ বা বীজ বিদেশ হইতে আনীত হইয়াছিল। বাঙ্গলা দেশে ইহা ভাল ফলে না, বঙ্গের বাহির হইতে ইহা আমদানী করা হয়। কিন্তু আমাদের অনেকেই উহাতে একপ্রকার বিজাতীয় গন্ধ থাকায় উহা ভালবাসে না; সাহেবরাই উহার পরম ভক্ত। গুণ হিসাবে এই ফল অবহেলনীয় নয়, কারণ উহাতে প্রোটিন শতকরা ১·৫ ভাগ এবং লৌহ জাতীয় উপাদান অন্য অনেক উৎকৃষ্ট ফলাপেক্ষা অধিক আছে। ইহাতে ভিটামিন 'এ' ও 'সি' আছে।

লিচু।

ইহার আদি জন্মস্থান চীন দেশ। লিচু মুখরোচক কিন্তু গুরুপাক। অধিক ভক্ষণে উদরাময় হইবার আশঙ্কা আছে। ইহাতে শতকরা ৮৪ ভাগ আমিষ, ৩·০৭ চর্ব্বি ও ১৯ শ্বেতসার এবং 'বি' ও 'সি' ভিটামিন আছে। যদিও ইহা খাদ্যমূল্যে অধিক সমৃদ্ধ নয় তথাপি ফলখাদ্যের মধ্যে লিচুর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নিরামিষ আহার।

খাদ্যশস্য।

(১) ধান্য ও ধান্যজাত দ্রব্য।

আয়ুর্ব্বেদে ধান্য পাঁচ প্রকার বলা হইয়াছে যথা শালি (হেমন্ত জাত), ব্রীহি (বর্ষাজাত), শুক, শিম্বি ও কাঙ্গনী।

শালি ধান—(সাদা হৈমন্তিক ধান) মধুর, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিপ্রদ, বল, শুক্র ও পুষ্টিবর্দ্ধক, লঘুপাক, অল্প মল জনক, মূত্রকারক, মলবদ্ধতানাশক, স্বরপরিষ্কারক, পিত্তনাশক, কিঞ্চিৎ কফ ও বাতবর্দ্ধক। ইহা ২½ ঘণ্টায় জীর্ণ হয়।

রক্তশালি (দাদখানি)—ইহা শীতবীর্য্য, অতি লঘুপাক, বল, শুক্র, স্বর ও মূত্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, সর্ব্বরোগ বিশেষতঃ পিত্ত ও বাতরক্তে বিশেষ উপকারক, ত্রিদোষনাশক, জ্বর, কাস, বিষ, ব্রণ, দাহ ও তৃষ্ণানাশক। ইহা মাত্র এক ঘণ্টায় জীর্ণ হয়, এইজন্য রোগজনিত দুর্ব্বলতা এবং অজীর্ণে আদর্শ পথ্য।

ব্রীহি—বাত ও পিত্তনাশক, গুরুপাক ও মলরোধক। কিন্তু উৎকৃষ্ট জাতীয় ব্রীহি ধান্য লঘুপাক এবং অন্যান্য গুণে শালি ধান্যের সমতুল্য।

বোরো—অগ্নিবর্দ্ধক, মুখরোগে হিতকর, রুচিকর ও ত্রিদোষনাশক।

কাঙ্গনী বা কাওন—ভগ্নসংযোজক, কফনাশক, অতিশয় শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ ও গুরুপাক।

অন্তত: এক বৎসরের পুরাতন না হইলে চাল নির্দোষ হয় না বাটির নীচের তলায় রৌদ্র ও বায়ু চলাচলহীন ঘরের মেজের উপর চাল বস্তাজাত করিয়া রাখিলে দোষস্থ হয়। এক সময় এক পরিবারভুক্ত সকল লোক ঐরূপ চালের ভাত আহার করিয়া প্রবল বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। শুষ্ক, বায়ু চলাচলযুক্ত উচ্চ স্থানে লোহার ডেকে চাল রাখা উচিত। চালের সহিত সামান্য পরিমাণ চুণের গুঁড়া মিশাইয়া রাখিলে চালে পোকা ধরে না।

চিঁড়া (পৃথুক)—স্নিগ্ধ, রোধক, বাতনাশক ও কামবর্দ্ধক। ইহা ৩।৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া লেবুর রসের সহিত সেবনে অজীর্ণ ও আমাশা রোগে উপকার করে, উদরের গরম ভাব নষ্ট এবং শরীর শীতল হয়। ইহা পিত্তনাশক এবং অজীর্ণ রোগে পরম কল্যাণকর পথ্য।

দুগ্ধমিশ্রিত চিঁড়া—পুষ্টিকর, বল ও শুক্রবর্দ্ধক এবং মলভেদক।

মুড়ি ও চালভাজা—লঘুপাক, রুক্ষ, পিত্তবর্দ্ধক ও কফনাশক।

খৈ—অতি লঘুপাক, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, অল্প মূত্রজনক, রুক্ষ কফ ও পিত্ত নাশক, তৃষ্ণা, বমি, অতিসার, দাহ, জ্বর, কাস, মেহ ও মেদরোগে হিতকর এবং ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহার মণ্ড অগ্নিবর্দ্ধক আমদোষ ও জ্বরাতিসারে উপকারক, দাহ ও তৃষ্ণা নিবারক এবং কফবর্দ্ধক। ইহা মন্দাগ্নি, বিষমাগ্নি এবং বালক, বৃদ্ধ ও রমণীদের সুপথ্য।

আচার্য্য পি. সি. রায় লিখিয়াছেন "চিঁড়া, মুড়ি ও খইয়ে ডেক্‌ষ্ট্রিন যাহা শ্বেতসারের সহজপাচ্য রূপান্তর তাহা বিস্কুট অপেক্ষা অনেক অধিক থাকে। উক্ত খাদ্যগুলিতে ভিটামিন "বি" সমধিক পরিমাণে আছে, বিস্কুটে নাই বলিলে চলে। বিস্কুটে শতকরা দশভাগ সোডা থাকে সুতরাং উহা রোগের পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইবার যোগ্য

গরম মুড়ি বিস্কুট অপেক্ষা অধিক মুচমুচে ও মুখরোচক এবং সুলভ। মুড়ি বা চিঁড়া ভিজান জল পানে বমন নিবারিত হয়। কলেরা রোগে বমন প্রতিষেধার্থে ইহা ব্যবস্থিত হয়। ইহা হিক্কা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। চিঁড়া বা মুড়ির সহিত নারিকেল খাইলে অম্ল জন্মে না।"

রাত্রে গরম মুড়ি, নারিকেল বাটা ও মিসরি সহ ভোজনে অম্লপিত্ত, অজীর্ণ (Dyspepsia) ও কোষ্ঠবদ্ধ রোগে আশু উপকার হয়। গাওয়া ঘি মাখা মুড়ি, লবণ ও আদার কুচি খাইলে সত্বই অরুচি ও অজীর্ণাদি প্রশমিত হয়।

পোড়া চাল ভাজা ও চিনি সমভাগে মিশাইয়া সেবন করিলে অধিক প্রস্রাব নিবারিত হয়। কর্ণমূল ফুলিলে আতপ চাল পোঁড়া ৪ তোলা ও আফিম ।০ তোলা ধুঁতরা পাতার রস সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোলা ও বেদনা অবিলম্বে বিদূরিত হয়।

পুরাতন ক্ষতে ভাত পোড়াইয়া তাহার চূর্ণ ও নিমপাতা ঘৃতে ভাজিয়া মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয়।

আতপ চাল ও দুর্ব্বা সমভাগ একত্রে পিষিয়া অল্প মাত্রায় সেবনে ঋতুবন্ধে উপকার হয়।

ধানের কুঁড়া—ইহা সাধারণতঃ গরু ছাগলকে খাওয়ান হয় কিন্তু সম্প্রতি জাপানে সরকারী পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে উহাতে শতকরা ২২ ভাগ তেল আছে এবং এই তেল রন্ধন ও নানা শিল্প কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই জন্য সে দেশে চালের গুঁড়া হইতে তেল (Rice bran oil) নিষ্কাসনের জন্য ৩।৪টী কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

গরম ভাত—শাস্ত্রমতে অগ্নিদীপ্তিকর, লঘু, শ্রান্তিনাশক, শ্বাস, কাস, ক্রিমি, পেটফাঁপা, গুল্ম, দেহের জড়তা ও কফজ কাস রোগে

হিতকর। মদাত্যয়, রক্তপিত্ত, প্রমেহ, মূর্চ্ছা ও অন্যান্য বায়ু বিকারে অহিতকর।

ভাতের মণ্ড—(পোরের ভাত) ক্ষুধাবর্দ্ধক, বস্তিশোধক, বলকারক, রক্তবর্দ্ধক, জ্বর, কফ, পিত্ত ও বায়ু প্রশমক। ৩।৪ ঘণ্টা জলে ভিজান ভাত ও লেবুর রস অজীর্ণ দাস্তে বিশেষ উপকারী পথ্য ও ঔষধ।

পলান্ন—(পোলাউ)—গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক, বল, পুষ্টি, শুক্র ও কান্তিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক কিন্তু কফ ও পিত্ত বর্দ্ধক।

পরমান্ন বা **পায়েস**—গুরুপাক, মলরোধক, বলকর, কফবর্দ্ধক, অগ্নিমান্দ্য ও রক্তপিত্ত জনক কিন্তু বাতপিত্তনাশক।

পিষ্টক (পিঠে)

চালের গুঁড়ার—কফ ও পিত্তনাশক।

ডালের—গুরুপাক, রোধক ও বায়ুর অনুলোমকারক।

মিশ্রিত (গুড়, তিল, দুধ ও চিনির সহিত)—গুরুপাক, বল ও পুষ্টিকারক।

ঘিয়ে ভাজা ময়দার পিঠে—গুরুপাক, রুচি, বল ও পুষ্টিকর।

পুলি পিঠে—উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, রোধক ও পুষ্টিকর।

ধান হইতে প্রস্তুত চাল পৃথিবীর প্রায় ⅔ অংশ লোকের প্রধান খাদ্য। ধান চারি ভাগে বিভক্ত যথা ১। উপরের আবরণ—তুঁষ বা খোসা, ২। উক্ত আবরণের অব্যবহিত নিম্নে লাল বা হরিদ্রা বর্ণের স্তর, এই স্তরে খাদ্যপ্রাণ ও লবণজাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে থাকে। ৩। দ্বিতীয় স্তরের নিম্নবর্ত্তী এই স্তরে আমিষ ও স্নেহজাতীয় উপাদান সমূহ থাকে। ৪। ইহা সর্ব্ব শেষ স্তর, ইহাতে প্রধানতঃ শ্বেতসার উপাদান থাকে।

চালের এক প্রান্তে ভ্রূণ বা অঙ্কুর, ইহাতে অন্য স্থান অপেক্ষা অধিক পরিমাণ আমিষ ও লবণজাতীয় উপাদান এবং খাদ্যপ্রাণ আছে। এক চালেই আমাদের দেশের লোকের শরীর পোষণোপযোগী সকল উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে আছে। চাল আমাদের জাতীয় প্রধান আহারীয়, আমাদের জীবন স্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সমগ্র ভারতের মোট ধান চাষের জমির শতকরা ২৬½ ভাগ এক বাঙ্গালা দেশে অবস্থিত।

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার স্বাস্থ্য পুস্তকে লিখিয়াছেন ভাত অপদার্থ। তিনি গমের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু চালই আমাদের দেশোপযোগী প্রধান আহারীয়, গম নয়। বাঙ্গালায় কিছু ২ গম জন্মে বটে কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে চালই অনেক অধিক উৎপন্ন হয়। জলবায়ুই প্রধানতঃ খাদ্য ও পরিপাক শক্তি নিয়ন্ত্রিত করে। আমাদের গম হজম করিবার উপযুক্ত শক্তি নাই সেইজন্য সাধারণতঃ সহজপাচ্য চাল গমের স্থান লইয়াছে। চাল ও গমের তুলনামূলক বিভেদের কোনই সার্থকতা নাই। প্রাকৃতিক ব্যবস্থা কোন মতে ভ্রান্ত বা অবৈজ্ঞানিক হইতে পারে না। পুনশ্চ চাল যে একেবারে অপদার্থ ইহা যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞান সম্মত নয়।

খাদ্য হিসাবে চালের স্থান যে অতি উচ্চে তাহা পরোক্ত বিবরণগুলি হইতে অনুমিত হইবে এবং উহা যে বিশেষ সম্মানযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না।

(১) সম্প্রতি বাঙ্গালোর ভারত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সুদীর্ঘ গবেষণায় স্থিরীকৃত হইয়াছে সে যদি চাল মাজা না হয় এবং রাঁধিবার পূর্ব্বে বেশী ধোয়া ও পরে ফেনগালা না হয় তাহা হইলে উহা প্রায় গমের ন্যায় পুষ্টিকর। মোটা এবং রঙীন চাল অন্য প্রকার চাল অপেক্ষা অধিক উপকারী এবং ঢেঁকি ছাঁটা চাল কলের চাল অপেক্ষা অধিক দিন অবিকৃত থাকে।

(২) ক্লাইভ যখন ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশস্থ অর্কট নগরে ইংরাজ ও ভারতীয় সৈন্যসহ অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন তখন শেষোক্তগণ কিছুকাল কেবলমাত্র ভাতের ফেন খাইয়া এবং ইংরাজগণ ফেনগালা ভাত ও অন্যান্য সুলভ দ্রব্য খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল।

(৩) যখন চীনদেশের সহিত পাশ্চাত্য দেশের ক্ষমতা সমূহের সংঘর্ষ হয় তখন রুশিয়া, জর্ম্মণী, ইংলণ্ড, মার্কিণ প্রভৃতি দেশের সৈন্য-গণকে অনেকদিন ফেন ভাত খাইয়া জীবনধারণ করিতে হইয়াছিল। এই বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছিল যে আমাজা চালের ফেনশুদ্ধ ভাতের মাংস পেশী গঠন করিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। কিন্তু সৌখিন মাজা চাল খাইলে স্বাস্থ্যের অবনতি অনিবার্য্য।

বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে পায়রা, হাঁস ও অন্যান্য জন্তুদের ছাঁটা বা মাজা চাল খাইতে দেওয়ায় তাহারা বালাস্থিগ্রহ (Ricket মাথা বড় ও হাড়গোড় বাঁকা), শোথ, বেরিবেরি ও স্কার্ভি রোগে (এক প্রকার কঠিন চর্ম্মরোগে) আক্রান্ত এবং তাহাদের শরীরের বাড় বৃদ্ধি কমিয়া ক্রমে খর্ব্বাকৃতি হইয়াছিল, অধিকাংশ অকালে মরিয়া গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটীকে ধান বা আকাঁড়া চাল খাইতে দেওয়ায় তাহারা পুনঃ স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিল।

অন্য একটী পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, ঢেঁকিছাটা আকাঁড়া চালের ফেন শুদ্ধ ভাতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আউস অপেক্ষা আমন চালে 'বি' ভিটামিন অধিক থাকে। আমাদের দেশে অনেক কৃষক আছাঁটা বা আকাঁড়া চালের ফেনভাত ও উহার সহিত কিছু শাক বা মাছ খাইয়া আদর্শ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছে বা করিয়া থাকে।

যদিও চাল আমাদের অন্যতম উৎকৃষ্ট খাদ্য তথাপি দুঃখের বিষয় উহা প্রস্তুত করিবার এবং রাঁধিবার দোষে উহার উপকারীতা অনেক

নষ্ট হয় এবং ঐ প্রকার অন্ন যাহাকে 'অপদার্থ' বলা যাইতে পারে তাহা সেবনে স্বাস্থ্যের ক্রমবর্দ্ধনশীল দুর্দ্দশা সূচিত হয়। আজকাল অনেকে বিশেষতঃ সহরবাসীগণ পরিপাকশক্তির হীনতা, সৌখিন খাদ্যাভিলাষ বা রুচিবিকার বশতঃ ছাঁটা বা কলের মাজা চালের ফেনগালা ভাত সেবন করে। উহাতে চালের অধিকাংশ লবণঘটিত পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয়। সেইজন্য উহা অম্লবহুল হয়, যাহা অম্ল, অজীর্ণ, বেরিবেরি প্রভৃতি রোগের অন্যতম প্রধান কারণ।

একজন পুষ্টিতত্ত্ববিদ সত্য সত্যই বলিয়াছেন—"আমরা সৌখিনতার মোহে যে কলের ছাঁটা চালের ফেনগালা ভাত খাইতে আকৃষ্ট হই, তাহার পরিত্যক্ত অংশই বিশেষ মূল্যবান। সুতরাং আমরা যে অংশ (ছিবড়ে) গ্রহণ করি তাতে বাস করে মৃত্যু। কে না জানে ভাতের ফেনের সঙ্গে বাঙ্গালীর প্রাণশক্তির ধারা প্রতিদিন গড়িয়ে চলে যাচ্চে রান্নাঘরের নর্দ্দমায়।"

এই সম্বন্ধে আর একটী তথ্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, গলাভাত অপেক্ষা কিছু শক্ত ভাত শীঘ্র হজম হয়। শক্ত ভাতে ফেনের সহিত অধিক সার পদার্থ বাহির হইয়া যায় না আর ইহা দাঁতের কার্য্যের সহায়তা করে এবং মুখের লালার সহিত অধিক মিশ্রিত হয়।

সংসারে এক হাঁড়ীতে সকলের ভাত একসঙ্গে রান্না এবং ফেন গালান হয়। যাহাদের যথেষ্ট পাচকশক্তি আছে তাহাদেরও বাধ্য হইয়া উহা খাইতে হয়, ফলে সকলেরই সমুচিত পুষ্টি হয় না তজ্জন্য তাহাদের পরিপাকশক্তি ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সুস্থ বালক বালিকা বা যুবক যুবতীদের পাচকশক্তি ঐ জন্য চিরতরে হ্রাস হয়। সহমত উপযুক্ত পরিমাণ ফেনভাত বা ফেন শুখান ভাত খাইয়া হজম করিতে পারা যায় নচেৎ আনুষ্ঠানিক হিন্দুগণ বা হিন্দুবিধবাগণ যাহারা এক

সময়ে ফেনগালা ভাত খাইয়াছে তাহারা ধর্ম্মের অনুশাসনে হবিষ্য বা আতপ চালের ফেন ভাত খাইয়া কিরূপে হজম করে? বিধবাগণ সাধারণতঃ সধবাদের অপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যবতী ও দীর্ঘজীবী।

আর রোগীদের রোগ সারিবার পর যে পোরের ভাত খাওয়ান হয় তাহার ফেন ত গালান হয় না। সেই ভাত তাহারা কিরূপে হজম করিয়া পুষ্টি ও পুনঃশক্তি লাভ করে? শোনা যায় পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রসূতিদিগকে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য ঢেঁকি ছাঁটা আতপ চালের ভাত খাইতে দেওয়া হইত। যখন কলিকাতায় প্রথম বেরিবেরির প্রবল প্রকোপ হইয়াছিল তখন অনেকে দীর্ঘকাল ফেন শুখান আতপ চালের ভাত খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

উপরোক্ত কারণে ফেন ভাত কাহারও পক্ষে অসুবিধাজনক হইতে পারে না। অবশ্য উহা আকণ্ঠ আহার করিয়া হজম করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে পরিমাণ ফেন গালা ভাত খাইতে লোকে অভ্যস্ত তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ ফেন সুদ্ধ ভাত খাইলে অধিকতর পুষ্টিলাভ সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও সাশ্রয় যে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এটী সব চেয়ে বড় কথা।

যদি একান্তই ফেন ভাতের উপর রাগ বা বিদ্বেষ থাকে তবে স্বতন্ত্রভাবে ফেনে কিছু লেবুর রস, লবণ ও চিনি দিয়া সরবৎ প্রস্তুত করিয়া সেবন করা যাইতে পারে, অথবা ফেন গালিয়া না ফেলিয়া উহা হাঁড়ীর মধ্যে শুখাইয়া লইলে ঝর ঝরে ভাত প্রস্তুত হইতে পারে। গুজরাট ও অন্য পশ্চিমোত্তর প্রদেশে উক্ত ফেন শুখান ভাত সেবিত হয়।

অবশ্য অনেক দিনের অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা অসুবিধাজনক। কোনরূপ অভ্যাসের পরিবর্ত্তনে মনে অতৃপ্তি বা অরুচি জন্মে কিন্তু কিছুদিন পরে উহা নূতন অভ্যাসে পরিণত হয়।

আমাদের সংরক্ষণশীলা রমণীগণ সাধারণতঃ আহার প্রস্তুতের মামুলি প্রথার কোনরূপ পরিবর্ত্তন মোটেই পছন্দ করে না। কিন্তু তাহাদিগকে বর্ত্তমান প্রথার দোষ বা কুফল পুনঃপুনঃ উপলব্ধি করাইলে মন ফিরিতে পারে, তবে তারা যদি বলে—

"মার আর ধর, আমি পিটে বেঁধেছি কুলো।
বক আর ঝক, আমি কাণে দিয়েছি তুলো॥"

তাহা হইলে প্রবল পুরুষকার দ্বারা ঐ বিদ্রোহ প্রশমিত করা কর্ত্তব্য।

গম।

কেহ কেহ বলেন গমও একটী অন্যতম পূর্ণ খাদ্য অর্থাৎ ইহাতে জীবনধারণোপযোগী যাবতীয় আবশ্যকীয় উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে আছে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে গম মধুর, বায়ু ও পিত্তনাশক, গুরুপাক, শুক্রপ্রদ, স্নিগ্ধ, বলপ্রদ, ভগ্নসংযোজক, সারক, দেহের দৃঢ়তাসম্পাদক, বর্ণপ্রসাদক ও রুচিকর। নূতন গম কিছু কফজনক ও গুরুপাক।

লুচি—গুরু কিন্তু রুটি অপেক্ষা লঘুপাক, স্নিগ্ধ, ধাতুবর্দ্ধক ও বাতপিত্তনাশক। বাসি বা ঠাণ্ডা লুচি দুষ্পাচ্য।

কচুরি, ঘৃতপক্ক—স্নিগ্ধ ও বলকর **কিন্তু তৈলপক্ক হইলে রক্তপিত্ত প্রকোপক ও চক্ষুর তেজ নাশক।**

পাতলা রুটি—লঘুপাক, মলরোধক, বল ও পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং ত্রিদোষঘ্ন। লাল আটার রুটি উপরন্তু কোষ্ঠপরিষ্কারক।

মোটা রুটি—গুরুপাক, পুষ্টি, বল, ধাতু ও কফবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক। সুজি বা ময়দা জলে মাখিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া পরে অল্প

সিদ্ধ করিয়া রুটি প্রস্তুত করিলে অম্লদোষ নিবারিত এবং অধিকতর পুষ্টিকর ও সুপাচ্য হয়। অবস্থা বিশেষে উহা রোগীর হিতকর পথ্য।

আমাদের দেশে হাতে গড়া রুটি প্রস্তুত করিবার প্রচলিত প্রণালীর দোষে উহা সম্যক উপকারী হয় না। ভারতের উত্তর পশ্চিম দেশবাসীগণ কিছু অধিক জলে ময়দা মাখিয়া উহা কিছুক্ষণ রাখে। ইহাতে উহার মধ্যস্থ বিবিধ জীর্ণকের (Enzymes) কথঞ্চিৎ প্রাথমিক পরিপাকক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ব্যবস্থার পর তাহারা ঐ ময়দাপিণ্ড উত্তমরূপে ঠাসিয়া, সেঁকিয়া ও পোড়াইয়া লয়। ইহাতে রুটি কোমল, রুচিকর ও সহজপাচ্য হয়।

পাঁউরুটি—হিন্দুধর্ম্মে ম্লেচ্ছের জলপান দূরে থাকুক উহার স্পর্শ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। কিন্তু এখন অনেক হিন্দু তাহাদের জলে ও ময়লা হাত পায়ের চাপে প্রস্তুত মিলের ময়দায় প্রস্তুত আপত্তিকর পাঁউরুটি যাহা সাধারণতঃ পচা তাড়ি ইত্যাদি সংযোগে প্রস্তুত হয় তাহা অম্লানবদনে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। যদি পাঁউরুটি না হলে চলে না তা হলে টাটকা অপেক্ষা বাসি রুটির টোষ্ট অধিকতর নির্দ্দোষ।

জাতা বা হাতকলে ভাঙ্গা লাল আটাই অধিক গুণশালী। মিলের সাদা ময়দা বা আটার এবং উহা হইতে প্রস্তুত রুটি, পাঁউরুটি, বিস্কুট প্রভৃতিতে অতি অল্প গুণ আছে, ভিটামিন মোটেই নাই। কলের ময়দায় একটী শরীর বৃদ্ধি সাধক মূল্যবান ম্যাঙ্গানিজ লবণের অপচয় ঘটে উপরন্তু উহা অম্লজনক ও কোষ্ঠবদ্ধকর। লাল আটা কোষ্ঠশুদ্ধিকর।

প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাঃ রডক বলিয়াছেন কলের সাদা মিহি ময়দা ও মাজা চালে শতকরা ১ ভাগ মাত্র পুষ্টিকর উপাদান থাকে। মোটা আটায় ৩ হইতে ৪ ভাগ, অধিক মোটা আটায় ৫ ভাগ এবং গমের ভুষিতে ৭ ভাগ থাকে।

অনেক কয়েদী জেলখানায় মোটা চাল বা লাল আটা খাইবার পর, যখন কারামুক্ত হয় তখন বেশ পুষ্ট ও সুস্থ দেহে গৃহে ফিরিয়া আসে। কলের আটা বা ময়দাতে অধিকন্তু নানা প্রকার আপত্তিকর ভেজাল মিশ্রিত করা হয় বলিয়া শোনা যায়।

ডাঃ রডক বলিয়াছেন, সমুদ্রের জলের সহিত ময়দা মাখিয়া ও ঠাসিয়া পাঁউরুটি প্রস্তুত করিলে ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি উদ্দীপিত এবং রুচি বর্দ্ধিত হয়। অজীর্ণ, ক্ষয়কাস ও গণ্ডমালা রোগে উহা উৎকৃষ্ট পথ্য। সাগর যাত্রা কালে ঐ প্রকার রুটি সেবনে আরোহীগণের স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে শোনা গিয়াছে।

যাহাদের সাদা আটা বা ময়দা খাওয়া অনেক দিনের অভ্যাস তাহারা প্রথম প্রথম উহার সহিত লাল আটা মিশাইয়া রুটি বা লুচী প্রস্তুত করাইলে এবং ক্রমে লাল 'আটার মাত্রা বাড়াইলে সহ্য হইবে এবং গম আহারের পূর্ণ উপকারীতা লাভ হইবে।

আমাদের দেশের কোন কোন পুষ্টিতত্ত্ববিদ চালের পুষ্টিকারীতা গম অপেক্ষা অল্প বলিয়া এক বেলা চাল ও আর এক বেলা ময়দা আহার সুপারিস করেন। অনেক বাঙ্গালী পরিবারে এই প্রথা অল্প বিস্তর প্রচলিত আছে। কিন্তু উহা যে মোটের উপর আমাদের স্বাস্থ্যানুকুল তাহা বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চালই আমাদের দেশের জলবায়ুর উপযোগী প্রাকৃতিক সুপাচ্য প্রধান আহার্য্য। সুতরাং অন্ততঃ এক বৎসরের পুরাতন ঢেঁকি ছাটা চালের ফেন শুখান ভাতই আমাদের পক্ষে সাধারণতঃ সর্ব্বাংশে হিতকর ও নিরাপদ। এজন্য যদি অপর প্রদেশের লোক আমাদিগকে ভেতো বাঙ্গালী বলে আমরা ঐ বিদ্রুপ বা অপমান মাথায় পাতিয়া লইব।

তবে লুচি সৌখিন বা মজলিসি খাদ্য হিসাবে অনেকদিন হইতে

সামাজিক ভোজ ও উৎসবাদিতে প্রচলিত আছে। ভোজের বাটীতে লুচির গন্ধে মন মসগুল হয়। লুচির সহিত দধি মণ্ডার মিলন আরো সুমধুর সুতরাং উহার লোভ কয়জন সম্বরণ করিতে পারে?

আমরা পশ্চিমের ছাতু বা রুটি খোরের ন্যায় নামজাদা লুচিখোর হইয়া পড়িয়াছি। আপত্তি সত্ত্বেও কেহই লুচি, পাঁউরুটি, টোষ্ট ইত্যাদি ময়দাজাত সভ্য আহার্য্য গ্রহণে বিরত হইবে না, হয়ত উহাদের নিন্দা বা অখ্যাতি পাঠে কেহবা এই স্বাস্থ্য পুস্তকের বহ্নি ক্রিয়া সমাধানে প্ররোচিত হইবে। সেইজন্য আমরা উহার সুখ আস্বাদনে কাহাকেও একেবারে বিরত করিবার অপরাধে অপরাধী হইতে ইচ্ছা করি না। মধ্যে মধ্যে বা জলখাবার হিসাবে বিশুদ্ধ ঘৃতাদি উপকরণে প্রস্তুত ঐ সকল দ্রব্য সহমত ও বিধিমত সেবন অনিষ্টকর নয় বলা যাইতে পারে।

যব।

ইহার আয়ুর্ব্বেদোক্ত গুণ—

যবের মণ্ড—লঘুপাক, মলরোধক, শূল ও ত্রিদোষনাশক।

যবের রুটি—লঘুপাক, বল, শুক্র, বায়ু ও মলবর্দ্ধক এবং কফ বিনাশক।

যবের ছাতু—জলের সহিত পাতলা করিয়া খাইলে শীতল, লঘুপাক, সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকর, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্রান্তি, দাহ, ঘর্ম্ম, কফ ও পিত্তনাশক এবং বায়ুর অনুলোমকারক। অল্প জলে উহা ডেলা করিয়া খাইলে অজীর্ণাদি রোগ জন্মিতে পারে।

যব বা বার্লি চাল অপেক্ষা সহজে জীর্ণ হয়। এইজন্য রোগের পথ্য হিসাবে উহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। যবে ভিটামিন "এ"

নাই কিন্তু চালের দ্বিগুণ ভিটামিন 'বি২' আছে। ইহার আমিষ জাতীয় উপাদান চাল অপেক্ষা শতকরা ৪০ ভাগ অধিক! সুতরাং শুধু পথ্য হিসাবে নয়, খাদ্য হিসাবেও যব বিশেষ গুণবান।

নিম্নে যব, চাল ও রবিনসন বার্লির বিভিন্ন উপাদানের শতকরা অংশ তুলিত হইল। তুলনায় উপলব্ধি হইবে যে আমাদের দেশী জাঁতায় ভাঙ্গা যব, শুধু আমিষ জাতীয় উপাদানে নয়, অন্য তিনটী উপাদানে চাল ও রবিনসন বার্লি অপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধ, তবে শেষোক্ত দ্রব্যটিতে বিশুদ্ধি করণের জন্য যদিও আমিষ, স্নেহ ও লবণ উপাদানের পরিমাণের হ্রাস হয় তথাপি উহা অধিকতর সুপাচ্য এবং সেইজন্য রোগী ও শিশুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ্য।

	আমিষ	স্নেহ	লবণ	শ্বেতসার বা শর্করা
যব	১১.৫	১.৩	১.৫	৬৯.৩
ঢেঁকি ছাঁটা চাল	৮.৫	০.৬	০.৯	৭৭.৪
রবিনসন বার্লি	৫.১	০.৯	১.১০	৮২

ডাল।

ভাত শ্বেতসারবহুল, ডাল আমিষবহুল। ডালের আমিষ উপাদানের পরিমাণ মাছ মাংসের প্রায় কাছাকাছি। কোন কোন ডালের আমিষ উপাদানের পরিমাণ মাছ মাংসের ঐ উপাদান অপেক্ষা অধিক। ডালে গড়ে শতকরা ২৪ ভাগ উক্ত উপাদান আছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাজা মুগের ডালে শতকরা ২৬, মসুর ২৫, খেসারী, সোনামুগ ও ছোলা ২৪। ছাগ মাংসে ২৪, অন্যান্য মাংসে অনেক কম।

ডালের আমিষ অন্য খাদ্য শস্যবীজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সুতরাং ডাল ভাত বা ডাল রুটির ব্যবহারে মাংসাদি প্রাণীজ আমিষ

খাদ্যের প্রয়োজন নাই। তবে বেশী পরিমাণে ডাল খাওয়া উচিত নয়। ইংরাজ পুষ্টিতত্ত্ববিদগণের মতে প্রত্যেকবার অন্য আহারের সহিত ৪ আউন্স সাধারণতঃ যথেষ্ট।

ডালে 'এ' ও 'বি' ভিটামিন এবং লবণ জাতীয় পদার্থ চাল বা গম অপেক্ষা অনেক অধিক। এইজন্য চাল বা ময়দার উক্ত পদার্থগুলির অভাব ডাল মিটাইতে সক্ষম।

অনেক সময় ডাল রাঁধিবার দোষে উহা সহজপাচ্য হয় না। একজন পুষ্টিতত্ত্ববিদ বলিয়াছেন, ডাল কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিবার পর যদি উহা পিষিয়া পুনরায় রন্ধন করা হয় তাহা হইলে কাঁচা ডালের মাত্র শতকরা ৮ ভাগ আমিষ উপাদান নষ্ট হয়। রাঁধিবার সময় ডাল ক্রমাগত ঘুঁটিতে হইবে যেন ডেলা না বাঁধে। ডাল না পিষিয়া সিদ্ধ করিলে এবং কেবল নরম হইবামাত্র উনান হইতে নামাইলে উহার প্রোটিনের শতকরা ৪০ ভাগ নষ্ট হয়। একথা মনে রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য।

পাঁচ রকম ডাল এক সঙ্গে রাঁধিলে উহা মিশ্রাহার পর্য্যায়ে পড়ে সুতরাং উহাতে মিশ্রাহার ও বিরুদ্ধ ভোজনের দোষ জন্মে; উপরন্তু কোন একটি ডালের নিজস্ব স্বাদ থাকে না। পুরাতন ডালে আমিষ উপাদান ও ভিটামিনের মাত্রা অনেক কম থাকে, উহা সুসিদ্ধ হয় না। সুতরাং নূতন ডাল ব্যবহার করাই সমীচীন। ডালের খোসা দুষ্পাচ্য, সেইজন্য উহা পরিত্যজ্য।

ডাল চালের খিচুড়ী পুষ্টিকর খাদ্য, ইহাতে ভাতের ফেন নষ্ট হয় না এবং ডাল সুসিদ্ধ হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে কৃশরা (খিচুড়ী) শুক্রজনক, বলকারক, বুদ্ধিপ্রদ, গুরুপাক, মলমূত্রপ্রবর্ত্তক, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক এবং দুর্জ্জর। অতএব ইহা মুখ বদলান হিসাবে সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে মধ্যে সহমত খাওয়া চলিতে পারে।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানবিদ ডাঃ হেগ বলিয়াছেন যে (১) চা, কফি, মিষ্ট রুটি, (২) সব ডাল বা ডালজাতীয় খাদ্য, (৩) মাছ, মাংস, (৪) চকোলেট ও ডিমের পীতাংশ, (৫) ব্যাঙের ছাতা (Mushroom) ও অ্যাসপারেগাস (বিলাতী শাক), (৬) দুগ্ধ, ঘৃত ও মিষ্টান্ন, (৭) ওটমিল ও লাল আটা এবং (৮) কড়াইশুঁটী, সিম ইত্যাদি খাদ্যে গুরুত্ব হিসাবে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে ইউরিক অ্যাসিড আছে। তিনি বহু পুরাতনরোগগ্রস্ত লোককে উক্ত বিষমুক্ত আহার সেবন করাইয়া আরাম করিয়াছেন।

অপর দুইজন পরীক্ষকের মতে (Basin & Smidt), গুগলি, কাঁকড়া, পালং শাক, ফুলকপি, গোল আলু, বাঁধাকপি প্রভৃতিতেও উক্ত বিষ আছে, **কিন্তু রুটি, ডিম, চাল, বার্লি, দুধ, মাখম ও পনিরে নাই।** অপর একজন বিশেষজ্ঞ (ডাঃ এবার্ড) বলিয়াছেন যে ঐ দোষ পালম শাক, স্যাভয় কপি, ব্রুসেলস স্প্রাউট (এক প্রকার বিলাতী সব্জি) ও টাটকা মটর সেবনে নিরাকৃত হয়।

এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই। উপরোক্ত মতে এক কথায় অধিকাংশ আমিষ বহুল খাদ্যে ঐ দোষ আছে। উহাদের বর্জ্জন রোগীর পক্ষে প্রয়োজ্য বুঝিতে হইবে, সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে ঐ ঐ দ্রব্যের সংযত ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত।

অনেক খাদ্যে কিছু না কিছু অনিষ্টকর পদার্থ থাকে বা অবস্থা বিশেষে উহা দোষস্থ হয়। অন্যত্র দেখান হইয়াছে যে কোন কোন খাদ্যে সেঁকো বিষও আছে। কিন্তু সেই সকল খাদ্যে বিষের মাত্রা অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে আছে। সেইজন্য ভয়ের বিশেষ কারণ নাই বলিয়া মনে হয়।

কিরূপে ডালের ইউরিক বিষ হজম করিয়া সুস্থ ও সবল দেহ ধারণ করা সম্ভব তাহা ডাল রুটী ভোজী ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রদেশের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য ও শক্তির উৎকর্ষতা উজ্জ্বল নিদর্শন। উহাদের সহিত হেগ সাহেবের সাক্ষাৎ লাভ করাইয়া দিতে বড়ই ইচ্ছা হয়।

বিভিন্ন প্রকার ডালের আয়ুর্ব্বেদোক্ত গুণ নিম্নে বিবৃত হইল।

মুগ (কাঁচা মুগ)—ত্রিদোষ নাশক, রুচিকর, তাপ ও পিত্ত বিকারে কল্যাণকর। সৈন্ধব লবণযুক্ত হইলে উহা সর্ব্বরোগ প্রশমক।

ভাজা মুগে উপরোক্ত গুণ আছে এবং উহা কিঞ্চিৎ সারক।

মসুর কাঁচা—পুষ্টিকর, মলরোধক ও প্রমেহনাশক।

ঐ ভাজা—লঘুপাক, বর্ণপ্রসাধক ও মলরোধক। কফ, রক্তপিত্ত ও বিষম জ্বরে হিতকর। ইহা কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর অপথ্য।

রোগ সারিবার পর দুর্ব্বলতা নাশ করিতে বার্লির সহিত মসুরের ক্বাথ মাংসের যুষের ন্যায় উৎকৃষ্ট বলকর পথ্য। মসুর ডালের গুঁড়া জলসহ মুখে মাখিয়া উহা শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত রাখিলে মেচেতা ভাল, এবং কান্তি উজ্জ্বল হয়। ইহা বিলাতী পাউডার অপেক্ষা অধিক উপকারী ও কার্য্যকরী। মসুর ডাল ঘৃতে ভাজিয়া দুধের সহিত বাটিয়া লেপনে ছুলি ভাল হয়।

বৈশাখ মাসে একটী মসুর কলাই দুইটি নিম পাতার সহিত প্রত্যহ সেবনে এক বৎসর কাল সর্প ভয় থাকে না বলিয়া কথিত হইয়াছে।

আঘাত লাগিয়া দেহের কোন স্থানে রক্ত জমিলে মসুর ডাল জলসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে ঐ দোষ নিবারিত হয়। বসন্ত রোগীর ঘায়ে কাঁচা মসুর বাটিয়া প্রলেপ দিলে উহা শীঘ্র শুষ্ক হয়।

কোন কোন গ্রন্থকার এই ডাল নিরামিষ ভোজীদের নিষিদ্ধ আহার বলিয়াছেন, হয়ত উহা মাংসাদি অন্য জন্তুজ আমিষ খাদ্যের ন্যায় উত্তেজক বলিয়া কিন্তু ইহা উত্তেজক খাদ্য নয়।

মটর—লঘু, শীতবীর্য্য, মলরোধক ও রুচিকর। রক্তদোষ, পিত্ত বিকৃতি ও কফরোগে হিতকর। ইহা অজীর্ণ ও উন্মাদ রোগে অভক্ষ্য। মটর ডাল তেঁতুল, লবণ ও দুগ্ধসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া শীঘ্র ফাটে। মটর ডাল ভিজান জল পানে বমি নিবারিত হয়।

ছোলা—লঘু, উষ্ণবীর্য্য, বল ও বায়ুবর্দ্ধক। শ্বাস, কাস, কফ ও রক্তপিত্তে হিতকর।

ভিজা ছোলার জল বা অঙ্কুরিত ছোলা আদা ও সৈন্ধব লবণসহ প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিলে পিত্ত বিকৃতি ও পৈত্তিক জ্বর আরোগ্য হয়। শুষ্ক ছোলা ভাজা রুক্ষ, বায়ুপ্রকোপক, কফ ও শৈত্য নাশক কাঁচা ছোলা ভাজা, গুরুপাক ও বলবর্দ্ধক।

ছোলা গাছের উপর রাত্রে সাদা পরিষ্কার কাপড় বিছাইয়া দিলে, উহার উপর যে শিশির পড়ে তাহা অম্লাক্ত হয়। প্রাচীন বৈদ্যশাস্ত্রে এই রস অম্ল নিবারক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ডাক্তার ওয়াকার বলিয়াছেন যে তাজা ছোলার গাছ গরম জলে ফেলিয়া উহার ভাব্‌রা লইলে বাধক রোগ আরাম হয়।

কলাই (কাঁচা মাসকলাই)—শীতল, গুরুপাক, শুক্র, পিত্ত, বায়ু ও মলবর্দ্ধক এবং পুষ্টিকর। ইহার ঝোল খাইলে জ্বরের প্রকোপ কমিয়া যায়। সাঁওতালগণ এই গাছের শিকড় অস্থি বেদনায় ব্যবহার করে। ইহা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ছুল্লি, মেচেতাদি ভাল হয়।

ভাজা কলাই—উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকর, বল ও শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক।

খেঁসারি—রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, অম্ল ও শূল উৎপাদক কিন্তু কফ, পিত্ত, অরুচি ও বমন নাশক এবং মলসংগ্রাহক। পথ্য ও খাদ্য হিসাবে ইহা সকল ডালের মধ্যে নিকৃষ্ট। তথাপি উত্তর বঙ্গে উহা নিত্য খাদ্য। পশ্চিম বঙ্গে কলাই ডাল নিত্য আহার্য্য কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গে কলাই অল্পই ব্যবহৃত হয়। ইহা সম্ভবতঃ জলবায়ুর অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থা।

মূলাযুক্ত খেঁসারি ডাল—অরুচি, কাস, কফ, গলগ্রহ ও মেদ রোগ প্রশমক।

অড়হর ডাল—ইহা কষায়-মধুর রস, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, মলসংগ্রাহক, বায়ুজনক ও বর্ণপ্রসাদক। ইহা পিত্ত, কফ ও রক্তদুষ্টি নাশক।

ডাক্তারী মতে ইহা সহজে পরিপাক হয় বলিয়া রোগীর পথ্যের উপযোগী কিন্তু ইহা কোষ্ঠবদ্ধতাজনক। এই ডাল ও ইহার পাতা স্তনে প্রলেপ দিলে স্ফীতি দূর হয়।

হাকিমী মতে এই ডাল বিষনাশক ও পাতা অর্শরোগ নাশক। ইহা উদরাধ্মানজনক ও বায়ু উৎপাদক। ইহা পিত্তজনিত দাস্ত বন্ধ করে, কফ ও রক্তের দোষ এবং বিষক্রিয়া নষ্ট করে। ইহা পোড়াইয়া ২ মাষা পরিমাণে লইয়া মধুর সহিত সেবন করিলে বীর্য্য স্তম্ভিত হয়। ইহার পাতার সহিত অল্প নিমপাতা সেবনে অর্শরোগে উপকার হয়। ইহাতে ক্ষুধা বর্দ্ধিত হয়। ইহা মূত্ররোগেও হিতকর। আহারান্তে বমনে ইহা উপকারী।

ইহা সেবনে শ্রবণ শক্তির দোষ দূর হয় এবং পিপাসা ও সর্ব্ব শরীরে জ্বালা নিবারিত হয়। দুগ্ধ বা দধির সহিত রন্ধনে উহার রুক্ষতা নষ্ট হয়। অড়হর ডাল জলে পিষিয়া ২।৩ বার টাকে প্রলেপ দিবার পর ঘুঁটে দ্বারা উক্ত স্থান ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া ঘৃত দিয়া

পরে রৌদ্র লাগাইবে। এইরূপ কয়েক দিন করিলে টাকে চুল গজাইতে পারে।

অড়হর ডাল জলে পিষিয়া একশিরা রোগে প্রলেপ দিলে এবং পুরাতন অড়হর গাছের শিকড় ঘসিয়া ছানির উপর দিলে উপকার হয়। ইহার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া কুল্লি করিলে দাঁতের বেদনা উপশমিত হয়। এই ডাল অধিক পরিমাণে খাইলে চক্ষুর জ্যোতিঃ হ্রাস ও বুক জ্বালা করে এবং পাকস্থলী ও মস্তিষ্কের পক্ষে অপকারী; অড়হর গাছের কয়লাতে অত্যুৎকৃষ্ট বারুদ ও টিকা প্রস্তুত হয় এবং ছাই সাজি মাটির কাজ করে।

ডালজাত দ্রব্য।

ডালপুরী—আয়ুর্ব্বেদ মতে উষ্ণবীর্য্য, বল ও পুষ্টিকর, শুক্র ও স্তন্যবর্দ্ধক, মলমূত্রভেদক, বায়ুনাশক, কফ, পিত্ত ও মেদবর্দ্ধক এবং অর্শ, শ্বাস ও শূল রোগে উপকার করে।

ঘুগনীদানা—গুরুপাক, রুক্ষ, বাতবর্দ্ধক ও মলভেদক। ডালের প্রকারান্তর বড়ী, পাঁপড় ও সরু চাকলি অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ ও সহজ-পাচ্য আহার্য্য। অনেক প্রকার মিষ্টান্ন যথা লাড্ডু, জিলেপি, বোঁদে, দরবেশ প্রভৃতি ডাল হইতে প্রস্তুত হয়। ইহাতে ডাল ভক্ষণের কার্য্য অনেকাংশে সিদ্ধ হয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নিরামিষ আহার।

তরকারি বা শাক-সব্জি।

সবুজ তরি-তরকারি বা শাক-সব্জিতে শ্বেতসার ও স্নেহ জাতী উপাদান অধিকাংশ স্থলে চাল, ডাল, গম প্রভৃতি খাদ্য অপেক্ষ অল্প থাকে কিন্তু শরীর পোষণে উহাদের অন্য বিশিষ্ট উপকারীত আছে।

উহাতে যে প্রচুর পরিমাণ পরিস্রুত জল বা রস এবং লবণ ও ভিটামিন থাকে তাহা রক্তকে ক্ষারবহুল করিতে বিশেষ সহায়তা করে সকল সুস্থ ব্যক্তির উহা অপরিহার্য্য আহার্য্য। যাহাদের পরিপা শক্তি দুর্ব্বল তাহাদেরও সহ্যমত উক্ত খাদ্য বিধিমত প্রস্তুত করিয় সেবন বিধেয়।

টাটকা বা তাজা শাক-সবজি বাসি বা শুষ্ক অপেক্ষা অধি গুণশালী। প্রথমোক্তটীতে অধিক ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ থাকে গৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানে শাক-সবজির চাষ করিলে তাজা পাওয় যাইতে পারে। হয়ত কেহ মনে করিতে পারেন যে অল্প জমিতে কিরূপে উহার অভাব মিটিবে। ইহার উত্তর ডাক্তার এইচ, ভি, টেলা (H. V. Taylor) একটী পত্রিকায় (Hortcultural Society' Journal) দিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন যে বিলাতে মাত্র ৩০০ বর্গ গজ অর্থাৎ প্রায় চার কাঠা জমিখণ্ড হইতে উৎপন্ন ফসলে একটী পরিবারের, কর্ত্তা, গৃহিণী এবং তিনটী সন্তানের উপযোগী ঐ খাদ্য বৎসরে প্রায় আট মাস পাওয়া যায়। বিলাতের মত ক্ষুদ্র দেশে ঐরূপ বাস্তু কৃষি-উদ্যান কম্‌সে কম ৪০ লক্ষ আছে।

যাহাদের জমির সুবিধা নাই, বিশেষতঃ যাহারা সহরবাসী, তারাও নিজ নিজ ভবনে ৩।৪টী বড় কাঠের বাক্সে শাক ও তরকারীর বীজ প্রতি দুই মাস অন্তর পুঁতিয়া বৎসর ভোর উহার ডগ বা কচি পাতা যাহা অতি মূল্যবান, তাহা মধ্যে মধ্যে কাটিয়া লইয়া থাকে। এই প্রথার প্রচলন আমাদের দেশেও বাঞ্ছনীয়। ইহাতে আর্থিক ও স্বাস্থ্যিক উন্নতি যুগপৎ লাভ হয়।

শাস্ত্রে যে তিথিতে, বা বারে, যে তরকারী বা শাক ভোজন নিষিদ্ধ তাহা নিম্নে উক্ত হইল।

তিথি বা বার	নিষিদ্ধ খাদ্য	ভক্ষণে কি দোষ জন্মে
প্রতিপদ	ছাঁচি কুমড়া	ব্রণাদি ও ক্লেদরোগ, অর্থহানি।
দ্বিতীয়া	বেগুন	অর্ব্বুদ রোগ (Tumour)।
তৃতীয়া	পটোল	রক্তবাত, শত্রুবৃদ্ধি।
চতুর্থী	মূলা	আমব্যাধি, ধনহানি।
পঞ্চমী	বিল্ব	পিত্তসম্বন্ধীয় ব্যাধি, কলঙ্ক।
ষষ্ঠী	নিমপাতা	জলবৃদ্ধি, কোষবৃদ্ধি।
সপ্তমী	তাল	রক্তপিত্ত, শরীরনাশ।
অষ্টমী	নারিকেল	অজীর্ণ, মূর্খতাপ্রাপ্তি।
নবমী	লাউ	বাতশ্লেষ্মা, গোমাংস তুল্য।
দশমী	কলমিশাক	অম্লপিত্ত।

তিথি বা বার	নিষিদ্ধ খাদ্য	ভক্ষণে কি দোষ জন্মে
একাদশী	সিম জাতীয়	জ্বর।
দ্বাদশী	পুঁইশাক	যক্ষ্মা, কাস।
ত্রয়োদশী	কাঁচকলা	কণ্ডুরোগ।
চতুর্দ্দশী	মাষকলাই	অতিসার, উদরি, চিররোগযুক্ত।
অমাবস্যা বা পূর্ণিমা	মাছ, মাংস, লবণ, তৈল মর্দ্দন ও প্রসাধন	শ্লৈষ্মিক পীড়া, মহাপাপকর।
রবিবার	মাছ, মাংস, মসুর, নিম, আদা, মধু, বেল ও কাঁজি	অস্বাস্থ্যকর।
শনি ও মঙ্গলবার	মোচা	অস্বাস্থ্যকর।

একদিনে দুই তিথি পড়িলে উভয় তিথিতে যাহা নিষিদ্ধ তাহা বর্জ্জন করাই শ্রেয়; নচেৎ পাঁজি হাঁটকাইয়া কোন্ দিন কোন্ তিথি কতক্ষণ থাকে তাহা নিরূপণ করিয়া আহার বর্জ্জন কার্য্যতঃ সম্ভবপর নয়। উপরোক্ত নিষেধ বাক্যের যুক্তি বা কারণ শাস্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই, অধিকাংশ আপ্তবাক্য। সম্প্রতি উহাদের মধ্যে তিনটীর তিথি বিশেষে আপত্তির কারণ জানা গিয়াছে।

(১) **দেশী কুমড়া**—প্রসিদ্ধ কৃষিতত্ত্ববিদ ৺হলধর বাবু লিখিয়াছেন —ইহা প্রধানতঃ ক্ষার (লবণ) রসাত্মক এবং উহাতে কিছু মধুর ও অম্লরসও আছে। শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় প্রতিপদ তিথিতে শ্লৈষ্মিক ধাতু স্বভাবতঃ লবণাশ্রিত হয়। শ্লেষ্মা স্বভাবতঃ লবণরসাত্মক। লবণের আধিক্যে ব্রণাদি ক্লেদ রোগ জন্মে। দেশী কুমড়া যদিও স্বাস্থ্যকর আহার্য্য কিন্তু উহা প্রতিপদ তিথিতে ভোজন করিলে উহাতে

তিথিসঞ্জাত লবণরসের পরিমাণ সমধিক বর্দ্ধিত হয় বলিয়া উক্ত রোগ জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য উহা প্রতিপদে নিষিদ্ধ।

(২) **সিম**—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দেব লিখিয়াছেন একাদশী তিথিতে মানুষের নাড়ীতে শ্লৈষ্মিক ও বাতশৈষ্মিক জ্বরকারক রসের সঞ্চার হয়। ঐ সময় রস ও জ্বরকারক সিম ভক্ষণ করিলে তিথি সম্ভূত ঐ রস সমধিক প্রবল হয় এবং সেইজন্য জ্বর উৎপন্ন হইতে পারে।

(৩) **বেগুন**—একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক দ্বিতীয়া তিথিতে বেগুন কাটিয়া দুরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে উহাতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট (জীবাণু) থাকিতে দেখিয়াছিলেন।

মাস হিসাবেও কোন কোন তরকারির ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, যথা, কার্ত্তিক মাসে ওল, ভাদ্র ও চৈত্র মাসে লাউ, মাঘ মাসে মূলা ইত্যাদি। সকল তরকারি শেষের দিকে বিষাক্ত হয়।

পূর্ব্বোক্ত দিন, মাস বা তিথি বিশেষে আহার্য্য দ্রব্যাদি বর্জ্জন ব্যবস্থা কাগজে মুদ্রিত করিয়া, ফ্রেমে ছবির ন্যায় বাঁধাইয়া উহা পাকগৃহে টাঙ্গাইয়া রাখিলে নিষেধ বাণীগুলি বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার তরিতরকারি জন্মে। যে সময় যেটি জন্মে সে সময় তাহাই আমাদের স্বাস্থ্যানুকূল। এইজন্য ভিন্ন দেশ হইতে আনীত ফল ও সবজি যথা কপি, কড়াইসুঁটি ইত্যাদি অসময়ে সেবন অকর্ত্তব্য। কিন্তু যে বিদেশী জিনিষ যে সময় আমাদের দেশে জন্মে সে সময় বিদেশ হইতে আনীত সেই সকল দ্রব্য যদি তাজা হয় তাহা সেবনে দোষ হয় না। কেহ কেহ তরকারির সহিত ফল ভক্ষণ নিষিদ্ধ বলিয়াছেন।

আমড়া দেশী—ইহার সংস্কৃত নাম আম্রাতক। পাকা ফল মধুর স্নিগ্ধ এবং পিত্ত ও কফনাশক। উহার সরবৎ সেবনে আহারে রুচি হয়, উদরে বায়ু প্রকোপ কমে এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। ইহা বলকর, দাহ ও ক্ষয় নিবারক এবং পিত্ত প্রশমক। বাতপিত্ত জনিত অজীর্ণে অসীম হিতকর। দধির সহিত আমড়া গাছের ছাল সিদ্ধ সেবনে রক্তামাশা ভাল হয়। এই ফলের আঁটির শাঁস ৪।৫ রতি মাত্রায় প্রাতে একবার সেবনে মধুমেহ রোগে বিশেষ উপকার হয়। শ্লেষ্মা-জনিত রোগে ইহা নিষিদ্ধ।

আলু

১৮২০ খৃষ্টাব্দে স্বনামপ্রসিদ্ধ উইলিয়াম কেরি সাহেব লিভারপুল নগর হইতে নানা জাতীয় আধুনিক প্রচলিত সর্ব্বজনপ্রিয় তরকারি যথা—আলু, বাঁধাকপি, ব্রকোলি, ফুলকপি, শালগম ও বিলাতী মটরশুঁটি আনাইয়া উহাদের চাষ প্রথম বাঙ্গালা দেশে প্রবর্ত্তিত করেন।

আলু বলিতে সাধারণতঃ বিলাতী গোল আলু বুঝায়। ইহাতে শ্বেতসার, পটাশ প্রভৃতি ক্ষারজ লবণ অধিক থাকায় ইহা অন্যতম পুষ্টিকর আহার্য্য। যদিও বিদেশ ইহার আদি জন্মস্থান, তথাপি ইহা আমাদের দেশের জলবায়ুতে উত্তমরূপে জন্মে, তজ্জন্য উহা স্বদেশী খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। আলুর প্রাণ অতি উদার, উহা ডালে, ঝোলে ও অন্ন ব্যঞ্জনে মিশিয়া স্বাদ বৃদ্ধি করে। আলুর সহিত পটোলের সাহচর্য্য বেশী হয়। প্রায়ই একটী আর একটীর দোসর।

আলু (এবং লেবু, পিঁয়াজ ও কপি ইত্যাদি), তাজা উদ্ভিজ্জ আহারাভাব জনিত চর্ম্মরোগ (Scurvy) প্রতিষেধ করে। এই রোগে

দন্ত মূলের কোমলতা, দন্ত হইতে রক্তপাত, চর্ম্মে বেগুনি বর্ণের পীড়কা, কালিমা ইত্যাদি জন্মে।

ডেনমার্কের প্রসিদ্ধ পুষ্টিতত্ত্ববিদ ডাক্তার হাইণ্ডহাইড নানা পরীক্ষার ফলে জানাইয়াছেন যে কেবলমাত্র আলু ও তাহার সহিত কিছু মাখম বা উদ্ভিজ্জজাত ঘৃত সেবনে দেহ ধারণ সম্ভবপর।

আর একজন পুষ্টিতত্ত্ববিদ লিখিয়াছেন যে আলুতে শরীর রক্ষণোপযোগী প্রায় সমুদায় উপাদান আছে। এবং উহার আমিষ উপাদান অন্যান্য উদ্ভিজ্জ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন।

বিলাত ও মার্কিণদেশে আলু এখন অন্যতম প্রধান আহারীয় রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। শেষোক্ত দেশে মোট খাদ্যের আলুর পরিমাণ শতকরা ২৫ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ইউরোপে জন প্রতি ২৫ বুসেল আলু বৎসরে বৎসরে আহার করে। আয়র্লণ্ড দেশবাসীগণের আলুই প্রধান আহারীয়।

আলুর শ্বেতসার হইতে নানা শিল্পদ্রব্য, মোটরকার ও উড়োজাহাজের অবয়ব এবং পেট্রল প্রস্তুত হইতেছে। "এখন যুদ্ধে আলু খেকো লোক আলুর গাড়ী বা উড়োজাহাজে চড়িয়া আলু হইতে উৎপন্ন মোটর তেল সাহায্যে চালাইয়া আলুর প্রতি মহা সন্মান প্রদর্শন করিতেছে।"

আলুর খোসা ছাড়াইয়া রন্ধন করিলে উহার গুণের অপচয় হয় কারণ অন্য তরকারীর ন্যায় খোসাতে অনেক মূল্যবান খনিজ লবণ আছে। এই জন্য আস্ত আলু সিদ্ধ করিয়া ব্যঞ্জন রন্ধন করা কর্ত্তব্য। খোসা শুদ্ধ বাষ্পে সিদ্ধ অথবা সেঁকা বা রোষ্ট করা পোড়া আলু উপরোক্ত কারণে সুপাচ্য ও অধিকতর পুষ্টিকর। ভাজা আলু দুষ্পাচ্য। খোসা ছাড়ান আলু সেবনে পরিপাক ক্রিয়া বিলম্বিত হয়।

ডাক্তার লিসবি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে যদি আলুর খোসা ছাড়ান হয়, তাহা হইলে লাবণিক পদার্থের শতকরা ১৪ ভাগ বিনষ্ট হয়। খোসা শুদ্ধ আলু ব্যবহারে উহার তিন ভাগ মাত্র নষ্ট হয়। এই নিয়ম অল্প বিস্তর অন্য তরকারির সম্বন্ধেও খাটে। নব অঙ্কুরিত ও বহু পুরাতন আলু অনিষ্টকর কারণ উহাতে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ থাকে। যে আলুর খোসা হলুদবর্ণ তাহাও পরিত্যজ্য।

আয়ুর্ব্বেদ মতে আলু শীতবীর্য্য, মধুর রস, গুরু, মূত্র নিঃসারক রুক্ষ, দুষ্পাচ্য, রক্তপিত্তনাশক, কফ ও বায়ুবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক ও স্তন্যবর্দ্ধক।

ডাক্তারী মতে আলুগাছের মূল পুষ্টিকর ও পত্র মাদক গুণবিশিষ্ট। দাহ ও বহুমূত্র রোগে এবং আয়োডিন দ্বারা বিষাক্ত হইলে ইহা ব্যবস্থিত হয়। আলুগাছের পাতার ক্বাথ শূল ও বাতবেদনাদিতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। দেহের কোন স্থান পুড়িয়া গেলে আলু বাটিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা নিবারিত হয় ও ফোস্কা পড়ে না।

বহুমূত্র রোগে আলু অপথ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মতান্তরে আলুর শ্বেতসার চাল বা গম অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া ঐ রোগে অল্প আলু সেবনে দোষ হয় না।

আমাদের দেশে আরো অনেক প্রকার আলু জন্মে, যথা—

চুবড়ী বা খাম আলু—ইহা অগ্নি, শুক্র, বল ও পিত্তবর্দ্ধক। ক্রিমি, কুষ্ঠ, মেহ, অর্শ, বাত, গুল্ম ও বাতশ্লেষ্মায় হিতকর এবং রসায়ন। যখন বিলাতী আলু দুর্ম্মূল্য হয় তখন এই আলু উহার স্থান লইতে পারে। ইহা অতি সুলভ, গাছ লতাইলে বেড়া কিম্বা অন্য বড় গাছের

উপরে উঠাইয়া দিলে চাষের ব্যয় কিছুই হয় না। ইহা মাটির ভিতর অনেক দিন সংরক্ষিত থাকে। এই আলু মাটি হইতে তুলিয়া কিছুদিন রৌদ্রে দিতে হয় নচেৎ উহাতে আটাবৎ রস থাকে।

মুখআলু—পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা ও শোথনাশক, বায়ুবর্দ্ধক।

হাতীখোজা—শীতল, গুরু, দাহ, শোষ, মেহ ও মূত্রকৃচ্ছে হিতকর কিন্তু শ্লেষ্মাজনক।

শকরকন্দ আলু—ইহার আমিষ অংশ গোলআলু অপেক্ষা কিছু কম থাকিলেও শর্করার অংশ অধিক আছে, প্রায় শতকরা ২০ ভাগ। এই আলুর উপরের বর্ণ শ্বেত হইলে শকরকন্দ বা চীনে আলু বলিয়া অভিহিত হয়। ইহার অন্য জাতি রক্তকন্দ 'আলু যাহার বাহিরের ত্বক লালবর্ণ তাহাকে দেশভেদে লালআলু, রাঙাআলু বা মৌআলু বলে। ইহা অধিকতর কোমল ও মিষ্ট। সংস্কৃত ভাষায় শকরকন্দ আলুকে "আলুকী" বলে। আয়ুর্ব্বেদ মতে উহা বলকারক, স্নিগ্ধ, গুরুপাক ও কফনাশক। ইহা অতিশয় পুষ্টিকর, কাঁচা খাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন ভাত অপেক্ষা উহা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়।

আধুনিক মতে চীনা আলু আহারে মস্তিষ্কের স্নায়ুশক্তি বর্দ্ধিত হয়। ইহার বীজ বিষ গুণ সম্পন্ন।

ক্যাসাভা আলু—এই আলু বিদেশ হইতে আনীত হইয়া স্থানে ২ চাষ করা হইতেছে। দুর্ভিক্ষের সময় অনেকে এই আলু খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছে। ইহা আলুর মত তরকারিতে খাওয়া যায়। শ্রীহলধর বাবু লিখিয়াছেন ইহা হইতে প্রস্তুত হালুয়া চমৎকার।

উচ্ছে

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা জ্বর, পিত্ত, ক্রিমি ও কফ নাশক, উষ্ণবীর্য্য, আগ্নেয়, মলভেদক, অরুচি ও শুক্রনাশক, কফ, পিত্ত, বায়ু,

রক্তদোষ, কামলা; পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমি রোগে হিতকর। জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্য নিবারণার্থে ইহা উপযোগী। বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে উচ্ছের বীজ খাইলে বসন্ত আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। ইহার ফুল ধারক ও রক্তপিত্তনাশক।

ডাক্তারী মতে ইহা উষ্ণ ও রসায়ন। ইহার লতা পাতা ও বীজের শাঁস কৃমি নাশক। পাতার রস লবণের সহিত ১ ছটাক মাত্রায় সেব্য। ফল—বলকারক, বিবিধ বাত, প্লীহা, ও যকৃৎ পীড়ায় পথ্য। ইহার পাতা জ্বরঘ্ন। শুষ্ক পাতার প্রলেপে ক্ষত আরোগ্য হয়।

করোলা—আয়ুর্ব্বেদ মতে করোলা উচ্ছের ন্যায় গুণবিশিষ্ঠ। হাকিমী মতে ইহা বায়ু ও কফ নাশক, রতিশক্তিবর্দ্ধক ও স্নায়ুমণ্ডল সবলকারক, ক্রিমিহর, বীর্য্যপ্রদ; শুক্রমেহ, বাত, গেঁটে বাত, পাণ্ডু, প্লীহা, যকৃৎ, কামলা প্রভৃতি রোগে হিতকর। পাথর নিঃসারক, পাকস্থলী সবল ও সঙ্কুচিতকারক। করোলা পাতার রস ও হলুদের রস, একত্র সেবনে হামজ্বর, স্ফোটক ও বসন্ত ভাল হয়।

ওল ও কচু

"ভাদ্র মাসে যে না খায় ওল।
শত্রুরা তার বাজায় ঢোল॥"

ওল—অগ্নিদীপক, রুচিকর, পিত্ত ও কোষ্ঠবদ্ধতা নাশক এবং রক্তপরিষ্কারক। ইহা অর্শ রোগীর প্রধান পথ্য। ইহার ডগার আটা বোলতা বা ভীমরুল দংশনজনিত যন্ত্রণা দূর করে। ইহা ক্রিমি, বমি, গ্রহণী, প্লীহা ও গুল্মরোগ নাশক।

উদ্ভিদবেত্তাগণ ওলকে কচুজাতীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ওল লাল ও সাদা ভেদে দ্বিবিধ। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সাঁতরাগাছি গ্রামে যে ওল উৎপন্ন হয় তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, মুখে লাগে না।

আধুনিক মতে, ওল পাচক ও বলকারক এবং অর্শ, গ্রহণী ও দুর্ব্বলতা নাশক। ইহার মূলও সুখাদ্য। পুরাতন ওল সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু। ইহার ডাঁটা ও কোমল পাতা দিয়া রুচিকর ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়।

বুনো ওল বা ছায়ায় উৎপন্ন ওল নিকৃষ্ট এবং খাইলে মুখ চুলকায়। কিন্তু উহা সিদ্ধ করিয়া একটু অম্লের সহিত ব্যঞ্জন রন্ধন করিলে উক্ত দোষ অনেকাংশে নিবারিত হয়।

ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ।
কিন্তু তাতে নাহিক দুখ॥

খনার বচন।

বুনো ওলেরও অনেক ওষধী গুণ আছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতে উহা শ্লীপদ, বল্মীক, গোদ, অর্ব্বুদ, মন্দাগ্নি, শূল ও দন্তশূল রোগের মহৌষধ।

কচু—দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে কচু ডাঁটার আটা তথায় দিলে রক্তস্রাব এবং তজ্জনিত ক্ষত ভাল হয়। উহা কাণের পূঁজেও উপকারী। কচু ডাঁটার রস লবণসহ মিশাইয়া কুঁচকী কিম্বা ফুলায় লাগাইলে অতি শীঘ্র উপশমিত হয়। কচুর ডাঁটা ছেঁচিয়া রস প্রলেপে অর্শ ও অন্য স্থানের রক্ত জমা আরাম হয়।

কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, দদ্রু, উদরাময়, আমাশা প্রভৃতি রোগে কচু নিষিদ্ধ।

কচুর কোন অংশ অখাদ্য বা অব্যবহার্য্য নয়। আমাদের দেশে সভ্য গোল আলুর অধিক প্রচলন হওয়ায় অসভ্য কচুর ব্যবহার ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। তথাপি এখনও উহা গরীবদের অন্যতম সুলভ স্বাস্থ্যকর আহার। অনেক বাবুদের কচু শাক বা কচু খাইতে প্রবৃত্তি হয় না, বোধ হয় মুখ চুলকাইবার কিম্বা "কচু পোড়া খাও" এই গালি খাইবার ভয়ে। কিন্তু কচু কোনমতে অপদার্থ নয়। রৌদ্রজাত কচু

শাক বা কচু ভক্ষণে মুখ বা গলা ধরে না। মুখী কচু যদি মুখে লাগে তবে উহা সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া আহার করা কর্ত্তব্য।

যদি কচু খাইতে একান্ত ভয় হয়, রৌদ্রে কচু শুষ্ক করিয়া তেঁতুল বা লেবুর রস বা চূণ মিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিয়া রাঁধিলে ঐ দোষ থাকে না। উহার সহিত নারিকেলকোরা, কাঁচা কড়াইসুঁটি বা ভিজা ছোলা দিলে ব্যঞ্জন অধিকতর রুচিকর হয়। অজীর্ণরোগে কচু অপথ্য।

গরীবেরা কচুপাতা কলাপাতায় জড়াইয়া দগ্ধ করে এবং উহাতে পিঁয়াজ, লঙ্কা, তেল ও লবণ মিশাইয়া তৃপ্তির সহিত ভোজন করে। কচুর ডাঁটার ব্যঞ্জন রুচিকর, উহা বর্ষা কালে আহারে সে সময়ের অনেক দোষ নষ্ট হয়। যে সময় যাহা জন্মে সে সময় তাহার কিছু না কিছু সার্থকতা আছে।

কচু মলভেদক। কচু অনেক জাতীয় আছে তন্মধ্যে কতকগুলি অতিশয় পুষ্টিকর, কতকগুলি অনিষ্টকর এবং কতকগুলি আহার ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

হাতে সিংঙ্গী মাছের কাঁটা বিঁধিলে কালকচুর রস মাখিলে যন্ত্রণা শীঘ্র প্রশমিত হয়। অপর যে কোন কাটায় কালকচুর ডাঁটা বিনা জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ভাল হয়।

দুর্গোৎসবের সময়, দুর্গামূর্ত্তির পার্শ্বে যে নব পত্রিকা স্থাপন করা হয় তাহা কলা, ডালিম, ধান, হরিদ্রা, মানকচু, বেল, অশোক, জয়ন্তী ও ও কচু এই নয়টী গাছের পাতা। ইহাদের সহিত যে মানবস্বাস্থ্যের অতি হিতকর গোপন সম্বন্ধ রহিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বর্ষাকালে যখন আলু দুর্ম্মূল্য হয় তখন সুলভ মূল্যের কচু ও ওল উহার স্থান লইতে পারে, কারণ এগুলি ঐ সময়ের প্রকৃতিজাত অন্যতম

উপকারী আহার্য্য। উহাদের কোন অংশই অখাদ্য নয়। দুর্ভিক্ষের সময় কেবলমাত্র ওল খাইয়া অনেকে জীবনধারণ করিয়াছে শোনা যায়। অনেক গরিব গৃহস্থেরা ওল চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুখাইয়া সংরক্ষিত করে উহা অন্য সময়ে তরকারীর অভাব মিটায়।

মানকচু—সকল প্রকার কচুর মধ্যে ইহা অধিকতর উপাদেয় ও পুষ্টিকর। ইহা মৃদুবিরেচক (মতান্তরে ধারক), মূত্রকারক, শোথহারক, শীতবীর্য্য, লঘু, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক। মানের পাতা সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দিয়া উহার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা উচিত।

মানের শিকড়ের কঠিন উপরাংশ পরিত্যজ্য। সিদ্ধ মানকন্দ কাটিয়া ভাজিলে অতি মুখরোচক হয়। মানের শিকড়ের একাংশ পচা বা নালী ঘায়ে প্রবেশ করাইলে শীঘ্র পুঁজ, রক্ত ও রস নির্গত হইয়া ৩।৪ দিনে ঘা পুরিয়া আসে।

পরিপুষ্ট মানকচু কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া যে শুঁঠ প্রস্তুত হয় তাহা এবং মানমণ্ড, উদরী ও শোথ রোগে মহোপকারী। মানের শুঁঠ চূর্ণ এক তোলা মাত্রায় কিছু দুধের সহিত সেবনে জ্বর, উদরাময় ও প্লীহা রোগ প্রশমিত হয়।

পুরাতন মানচূর্ণ ৮ তোলা, ঈষৎ কুট্টিত চাল ১৬ তোলা, ১ সের দুধ ও কিছু জলের সহিত প্রস্তুত পায়েস উদরাময় রোগীর উৎকৃষ্ট পথ্য। ½ তোলা পুরাতন মানচূর্ণ ½ সের ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনে প্লীহা ও শোথ প্রশমিত হয়।

মানের ডাঁটা আগুনে সেঁকিয়া উহার রস শিশুদের কানপাকা রোগে বিশেষ উপকারী। মানের পচা ডাঁটার রস ও ঘুঁটের ছাই পদশোথে প্রলেপ দিলে উহা কমিয়া যায়। স্ফোটকে প্রথমে তোকমারীর পুলটিস দিয়া মুখ না হইলে মানকচু গাছের পচা ডাঁটা

জল না দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিবে এবং সমস্ত পুঁজ-রক্তাদি বাহির হইবে, ক্রমে শুষ্ক হইবে এবং শোষ হইবার ভয় থাকিবে না।

মানের সরু সরু টুকরা কাপড়ে বাঁধিয়া সহ্যমত গরম করিয়া উহার স্বেদ বাতাক্রান্ত অঙ্গে দিলে উপকার হয়। মধুর সহিত মানভস্ম মুখক্ষতের ঔষধ। মানকচু অর্শ ও কোষ্ঠবদ্ধ রোগে হিতকর। রোগীর পক্ষে উহা সাগু বা এরারুট অপেক্ষা উপকারী। মানের শিকড়ের ছাই মধুর সহিত মিশাইয়া প্রলেপে চক্ষুরোগ প্রশমিত হয়।

কুষ্মাণ্ড

ইহার দুই জাতি, দেশী ও বিলাতী। দেশী কুষ্মাণ্ড, দেশী কুমড়া, ছাঁচি কুমড়া, সাঁচি কুমড়া বা চাল কুমড়া নামে অভিহিত হয়। বিদেশ হইতে আনীত বীজ দ্বারা এদেশে বিলাতী কুমড়ার চাষ প্রথমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

উক্ত দুই প্রকার কুমড়ার মধ্যে ছাঁচি কুমড়া অধিক গুণসম্পন্ন। আয়ুর্ব্বেদ মতে উহা বল্লীফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ত্রিদোষনাশক। উহা লঘুপাক, মলমূত্র নিঃসারক, কচি অবস্থায় পিত্তনাশক, মধ্যাবস্থায় কফনাশক এবং পক্কাবস্থায় অধিক ক্ষারযুক্ত, অগ্নিবর্দ্ধক, কোষ্ঠশোধক, ত্রিদোষনাশক, বৃষ্য, হৃদ্য, মনোবিকার, তৃষ্ণা ও অরুচিনাশক, পুরুষত্ব-বর্দ্ধক, বাত ও রক্তপিত্ত নাশক এবং প্রমেহ ও অশ্মরী (পাথরী) নাশক। ইহার বীজের তেল পিত্তনাশক, কেশের হিতকর, শ্লেষ্মাকারক, গুরু ও শীতল। ইহার লতাপাতা ক্ষাররস, মধুর, গুরু, রুক্ষ, রুচিকর ও মধুর এবং শর্করা ও অশ্মরী নাশক।

আধুনিক মতে ইহা পুষ্টিকর, বৃষ্য, মূত্রকারক এবং প্রমেহ, অশ্মরী ও শর্করাদি রোগে হিতকর। এই কুষ্মাণ্ড বীজ জাত তেলেরও উক্ত

গুণগুলি আছে। মৃগী, উন্মাদ, বহুমূত্র এবং অন্য বহু রোগে উহার রস চিনি ও জাফরাণের সহিত পিষিয়া সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

সার্জ্জেন কে, ডি, ঘোষ বলিয়াছেন, উরুক্ষত ও যক্ষ্মা (Pulmonary Tuberculosis) রোগে ছাঁচি কুমড়া সেবন অতি হিতকর। ডাঃ ওয়াট সাহেব বলিয়াছেন উহা গ্রহণী ও অর্শ রোগে এবং পিত্তপ্রশমক খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। উপদংশ পীড়ায় যে সকল দ্রব্যের ভাপরা দেওয়া হয় তন্মধ্যে উক্ত কুষ্মাণ্ডশস্য সর্ব্বোত্তম। ক্ষয়রোগে উহা উৎকৃষ্ট বলপ্রদ পথ্য। পারদ সেবনে উৎপন্ন বহুবিধ দোষ উহার রস পানে বিদূরিত হয়।

পাকা দেশী কুমড়ার বীজ, বিরেচক। পাকা দেশী কুমড়া হইতে নানাপ্রকার নির্দ্দোষ ও স্বাস্থ্যকর মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়।

বিলাতী কুমড়া দেশী অপেক্ষা গুণে নিকৃষ্ট। কিন্তু উহার দ্বারা প্রস্তুত উপাদেয় মধুর ব্যঞ্জন বিশেষতঃ সর্ব্বজনবাঞ্ছিত কুমড়ার ছক্কা বা কুমড়ার ঘাঁট আমাদের, বিশেষতঃ রমণীগণের, আদরের আহার। আহার-বিলাসিতার দিক দিয়া উহা সৌখিন খাদ্যের অন্যতম স্থান লইয়াছে।

চীনাবাদাম

ইহার নামকরণ হইতে মনে হইবে ইহা চীন দেশ হইতে আনীত উদ্ভিজ্জ কিন্তু অনেকের মতে চীনাবাদাম দক্ষিণ আমেরিকা হইতে প্রথমে চীন পরে শেষোক্ত দেশ হইতে আনীত হইয়া গত ১০০ বৎসর যাবত আমাদের দেশে চাষ হইতেছে। দক্ষিণ ভারতে বিশেষতঃ মাদ্রাস প্রদেশে উহার সমধিক চাষ হয়। এখান হইতে উত্তর ভারত এবং ইউরোপ প্রভৃতি দেশে বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকার চীনাবাদাম রপ্তানী হয়।

ইহার তেলেরই অধিক চাহিদা। একজন হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন পৃথিবীতে যত পরিমাণ চীনাবাদাম জন্মে তাহার শতকরা ৯০ ভাগ তেলের জন্য এবং বাকি ১০ ভাগ আহার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। চীনাবাদামের তৈলাংশ পেস্তা ও আখরোট ব্যতীত প্রায় অন্য সকল খাদ্য অপেক্ষা সমধিক। পেস্তায় স্নেহজাতীয় উপাদান শতকরা ৫৩'৫, আখরোটে ৬৪'৫। কিন্তু এই দুইটী দুর্ম্মূল্য। সেইজন্য সহজলভ্য চীনাবাদামের তেলের চাহিদা অধিক।

চীনাবাদামের তেলে রন্ধিত আহার্য্য সরিষার তেল অপেক্ষা অধিক রুচিকর ও পুষ্টিপ্রদ কিন্তু পরিপাক করিতে অধিক সময় লাগে। যাহাদের সহ্য হয় তাহাদের পক্ষেই উহা উপযোগী। শুনিতে পাওয়া যায় ঘৃতে ইহা ভেজাল দেওয়া হয় কিন্তু উপরোক্ত কারণে উহা দোষের নয়।

চীনাবাদামের তেল সাবান, কেশতৈল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে প্রয়োজন হয়। চামড়া পাক়াইতে এবং কলকব্জায় দিতে ইহার যথেষ্ট চাহিদা আছে। ইহার খোল গাছের উৎকৃষ্ট সার এবং গবাদি পশুর পুষ্টিকর আহার।

চীনাবাদামের আমিষ অংশ শতকরা ২৬'৭। সুতরাং সংযত ব্যবহারে উহা মাছ মাংসের স্থান লইতে পারে। তবে মাছ মাংস অধিকতর রুচিকর। বিলাতে ও মার্কিণ দেশে চীনাবাদাম হইতে কেক, বিস্কুট, মিঠাই, চাটনি ইত্যাদি বহু মুখরোচক আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে ঘুগনিদানা বা সখের নকলদানার চিনাবাদাম প্রধান উপাদান।

ফিরিওয়ালারা উক্ত খাদ্যগুলি যাহা বিক্রয় করে, বিশেষতঃ আপত্তিকর মাংস ও ডিম্ব মিশ্রিত ঘুগনি, যদিও অতি পুষ্টিকর, তথাপি সাধারণতঃ অস্বাস্থ্যকর। ছেলেমেয়েরা এবং অনেক বয়স্কেরা উহা খাইয়া

পাকাশয়ের বিশৃঙ্খলা রোগে প্রায়ই ভোগে। এইজন্য প্রয়োজন মত ঘরে ঘুগনি বা নকলদানা প্রস্তুত করিলে ঐ দোষ ঘটে না।

প্রতি বৎসর প্রায় ১৫ হাজার মণ চীনাবাদাম বাহির হইতে বাঙ্গলায় আনীত হয়। সুতরাং অর্থকরী ও পুষ্টিকর ফসল হিসাবে আমাদের দেশে উহার বহুল বিস্তৃত চাষ বাঞ্ছনীয়। এদেশে ইহা উত্তমরূপে জন্মিতে পারে। ইহা শিম্বীজাতীয় উদ্ভিজ্জ বলিয়া জমিতে চাষ করিলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

ঝিঙ্গা

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা অগ্নিদীপক, পিত্ত, জ্বর, শ্বাস, কাস ও ক্রিমি-নাশক কিন্তু কফ ও বাতকারক। তিক্ত ঝিঙ্গা ক্রিমি ও শ্লেষ্মানাশক; শূল, গুল্ম ও অর্শরোগে হিতকর। লতা, তিক্ত; উহা কফ, অর্শ, শোথ, পাণ্ডু, বমন, ক্ষয়, হিক্কা, ক্রিমি ও জ্বরনাশক।

ডাক্তারী মতে ইহার কচি পাতার রস শিশুদের চোখের রোগে ব্যবহার্য্য। তিক্ত ফল বিরেচক, বমনকারক, ক্রিমি ও শ্লেষ্মানাশক এবং শূল, গুল্ম ও অর্শরোগে হিতকর। ইহা মূত্রকারক। ইহার শুষ্ক ফলচূর্ণ প্রবল শিরঃপীড়ায় নস্যরূপে ব্যবহার করিলে উপকার হয়। ডাক্তার ডিকিনসন্ ইহাকে প্লীহা ও জ্বররোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়াছেন। ইহা উদরী ও অর্শরোগেও ব্যবস্থিত হয়।

হাকিমী মতে ইহা বিরেচক, পিত্তপ্রকোপ ও প্রমেহ নাশক। যাহাদের শরীর রুক্ষ তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহার লতা ও পাতা কফনাশক, শোথ, পাণ্ডু, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বর, কুষ্ঠ ও অর্শ-রোগে হিতকর। তিক্তফল শরীরের ফুলা নিবারক; সর্ব্বাঙ্গ হরিদ্রাবর্ণ হইলে উহা বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়। ইহার রস নালী ঘায়ে দিলে উহা শুষ্ক হয়। ইহার বীজ বমনকারক।

ডুমুর

ইহা দুই প্রকার এক প্রকার গোল ডুমুর যাহা সচরাচর ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়, আর এক প্রকার যজ্ঞ ডুমুর, পাতা ডুমুরের চেয়ে বড় এবং অত্যন্ত খসখসে বলিয়া শাস্ত্রে ইহাকে খরপত্রী বলা হইয়াছে।

ডুমুর পিত্ত ও আম দোষ নিবারক। ইহাতে যথেষ্ঠ পরিমাণে লৌহ থাকায় রক্তপিত্ত, রক্তপ্রদর, রক্তার্শ, রক্তমেহ, রক্তমূত্র ও রক্তহীনতা ইত্যাদি রোগে এবং জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্যের বিশেষ উপকারক।

রক্তপ্রদর রোগে কচি ডুমুরের রস মধুর সহিত সেবন করিলে বা দুধ ও চিনির রসের সহিত ভোজন করিলে দুঃসাধ্য রক্তপ্রদর প্রশমিত হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে কচি ডুমুরের রস ২ তোলা ও মিসরি ১ তোলা মিশাইয়া দিনে ২ বেলা, এরূপ তিনদিন সেব্য। উক্ত রস ও মধু পানে রক্তপিত্তের শোণিত নির্গমন নিবৃত্ত হয়।

মেহ বা গণোরিয়া ও পুরাতন জীর্ণ রোগে প্রত্যহ ডুমুর ভক্ষণ, আহার ও ঔষধ। কোষ্ঠবদ্ধতা ব্যতীত অন্য রোগে উৎকৃষ্ট পথ্য। আমাশা রোগে ডুমুর পাতার কুঁড়ি ১টী আতপ চাল সহ চিবাইয়া খাইতে হয়। এইরূপ তিনদিন সেব্য।

২ তোলা ডুমুরগাছের কুট্টিত ছাল ও আধ পোয়া মিসরির পানা একত্রে উত্তমরূপে চটকাইয়া ছাঁকিয়া প্রত্যহ ২ বেলা ২ ছটাক পরিমাণ কিঞ্চিৎ চিনি সহ পানে সাদা ও রক্ত আমাশা ভাল হয়।

মাথাঘোরায়, ভাত খাইবার কালে প্রথমে কচি দুর্ব্বাঘাস ভাজা ১ তোলা খাইয়া পরে বীজ বাদ দিয়া ডুমুরভাজা খাইলে বিশেষ উপকার হয়।

হিক্কারোগে ডুমুর চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া জলে ভিজাইয়া কিছুক্ষণ রাখিবার পর আধ ছটাক মাত্রায় আধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে ৪।৫ বার সেবনের পর হিক্কা নিবৃত্ত হয়।

বহুমূত্র রোগে যজ্ঞ ডুমুর বৃক্ষের মূলের রস অব্যর্থ উপকার করে তবে দীর্ঘদিন সেবন করিতে হয়। ইহা Insulin অপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী।

যজ্ঞ ডুমুরের রস মধুর সহিত পানে প্রদর প্রশমিত হয়। ভাল দাদখানি চালের সহিত যজ্ঞ ডুমুর দিয়া ভাতে ভাত খাইলে বহুমূত্রে উপকার হয়।

ঢেঁড়স

ইহা বিদেশ হইতে আনীত। ইহার ইংরাজী নাম 'Ladies' Finger' ললনাঙ্গুলিকা। ইহা বিকৃত উপমা। উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমাদের ভাষায় ঐ নামে উক্ত তরকারি অভিহিত হইলে ললনাগণের করাঙ্গুলি ভোজন অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। তবে যে ইহার অতি কর্কশ ঢেঁড়স নাম দিয়াছিল, সেও নিশ্চয় ভীষণ কর্কশ।

আধুনিক আয়ুর্ব্বেদাভিধানে উহার সংস্কৃত নাম যথা ভিণ্ডিশ, তিন্দিশ ও টিণ্ডিস, এগুলিও অতি উৎকট। যাহা হউক নামে কি আসিয়া যায়। ভেষজতত্ত্ব পুস্তক মতে ইহা রুচিকর, ভেদক, শীতবীর্য্য, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও পাথর নিঃসারক, মূত্রকর, কিন্তু বাতকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহাতে "এ", "বি১" ও "বি২" এবং "সি" ভিটামিন আছে। ইহা বহুমূত্র ও মেহ রোগে উপকারক।

তেঁতুল

ইহা একটী ললনাপ্রিয় ফল। ইহার আচার দর্শনে মুখে জল আসে। উপকারিতা হিসাবে পাকা তেঁতুলে শতকরা ৩·৯ আমিষ

উপাদান আছে যাহা কৎবেল ব্যতীত অন্য কোন ফলে অত পরিমাণে নাই। উহার লবণজাতীয় উপাদান শতকরা ২'৯। ইহার মধ্যে চূণ ও লৌহের পরিমাণ অন্য সকল ফলাপেক্ষা অনেক অধিক। ইহাতে 'এ' ও 'সি' ভিটামিন আছে।

ইহার নানা ওষধী গুণ আছে। সামান্য তেঁতুল যাহা আধুনিক প্রগতিশীল ব্যক্তিগণ দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করে তাহা যে কত গুণময় তাহা অনেকেই জানে না।

পাকা তেঁতুল কফ ও বায়ুনাশক আগ্নেয়, সারক ও উষ্ণবীর্য্য।

ডাক্তারী মতে পাকা তেঁতুল মৃদুবিরেচক ও শৈত্যকারক। ইহা চিনির সহিত সেবনে পিপাসা নাশ ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বর, প্রদাহ প্রভৃতি রোগে উহা পানীয় রূপে ব্যবস্থিত হয়। ইহার বীজের শাঁস অতিসার ও উদরাময় রোগে উপকারী। ইহার পাতার কাথ ক্রিমিনাশক, চোখউঠা রোগে ইহা দ্বারা চক্ষু ধুইলে উপকার পাওয়া যায়। তেঁতুলের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে প্রদাহ নষ্ট হয়।

পাকা তেঁতুলের শাঁস স্কার্ভি রোগের (চর্ম্মরোগ বিশেষের) প্রতিষেধক। ইহা জ্বর, তৃষ্ণা, সর্দ্দিগর্ম্মি এবং পিত্তপ্রধান বমন রোগে ব্যবস্থিত হয়। ইহার কবল মুখক্ষতে উপকারী। স্বয়ং শুষ্ক তেঁতুল গাছের ছালের ক্ষার, মুত্রের কটুত্বে ও প্রমেহ রোগে ব্যবস্থিত হয়।

হাকিমী মতে তেঁতুল লঘুপাক, হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলী সবলকারক, পিত্ত ও বিকৃত ধাতুসমূহকে দাস্ত দ্বারা বাহির করে এবং মৃদু বিরেচক। বিবিমিষা ও পিত্তজনিত বমনে, পিপাসায়, পিত্তাধিক্য জনিত জ্বর, দাহ, মূর্চ্ছা ও সর্ব্বপ্রকার চুলকানি রোগে হিতকর। ইহা রক্তের প্রকোপ দমন করে এবং বুক ধড়ফড় ও মাথাঘোরাতে উপকারী। ইহা বিষাক্ত বায়ু ও ম্যালেরিয়া দূষিত বায়ু শোধিত করে। ইহার কবল

করিলে মুখআসা নিবারিত হয়। তেঁতুল জলে ভিজাইয়া অধিক চর্ব্বণ করা উচিত নয় কারণ তাহাতে উহার গাঢ় গুরুপাক অংশ জলের সহিত মিশে অতএব ঔষধার্থে তেঁতুল ভিজাইয়া ছাঁকিয়া পরিষ্কার জল গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

কাঁচা তেঁতুল গুরু ও বায়ুনাশক এবং পিত্ত, কফ ও রক্তদুষ্টিকর। এইজন্য খাদ্যহিসাবে উহার সংযত ব্যবহারই প্রার্থনীয়। কাঁচা তেঁতুল আমানি ও তিল তেলের সহিত পিষিয়া উষ্ণ করিয়া আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। কাঁচা তেঁতুল পোড়াইয়া উহার শাঁসের সহিত সোরা বা লবণ মিশাইয়া হাড়ের ব্যথা, বাত বেদনা ও স্ফীতিতে প্রলেপ দিলে উহা উপশমিত হয়।

বাইসিকেল হইতে পড়িয়া গিয়া একজনের ডান পায়ের হাঁটুতে বিষম চোট লাগে ও প্রদাহ উৎপন্ন হয় এবং তজ্জন্য বহুদিন চলৎশক্তি হীন হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। নানা প্রকার চিকিৎসায় কোন উপকার না পাইয়া একজন বৃদ্ধার উপদেশানুযায়ী সে আহত অঙ্গে গরম কাঁচা তেতুল পোড়ার শাঁস লাগাইয়া তদুপরি কিছু লবণ ছড়াইয়া দেয়। ২।৩ ঘণ্টা পরে বেদনা বার আনা কমিয়া যায় এবং ক্রমে হাঁটিতে সক্ষম হয়। একবার প্রলেপে সম্পূর্ণ উপকার না হইলে উহা গরম জলের সহিত পুনর্বার প্রলেপ দিতে হইবে। এই বৃত্তান্তটী পল্লীমঙ্গল সমিতির পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে, বিশ্বস্ত বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে।

তেঁতুল গাছের ছাল। ইহার /০ আনা পরিমাণ ভস্ম শীতল জল সহ সেবনে অম্লপিত্ত ও তজ্জনিত শূল প্রশমিত হয়। তেঁতুল গাছের শুষ্ক ছাল চূর্ণ করিয়া ক্ষতের উপর প্রলেপ দিলে উহা শুষ্ক হয়।

তেঁতুল গাছের ফুল। ইহা সঙ্কোচক ও স্নিগ্ধকারক এবং অর্শের রক্তস্রাব নিঃসারক।

পুরাতন তেঁতুল। ইহা ক্ষেত্র বিশেষে কাঁচা তেঁতুল অপেক্ষা অধিক গুণসম্পন্ন। পুরাতন তেঁতুল ও মিসরি ভিজান জল আমাশা, কোষ্ঠবদ্ধ ও পেট গরমে আশু উপকারক। মাত্রা ১½ ছটাক। হুপ-কাসিতে ২ তোলা শুষ্ক পুরাতন তেঁতুল ও ৪ তোলা আখের গুড় আধ পোয়া জলসহ পাথর বাটিতে গুলিয়া প্রত্যহ ২ ছটাক মাত্রায় সেব্য। শিশুদের অর্দ্ধ মাত্রা।

ক্ষয়কাস ব্যতীত অন্য সর্ব্ববিধ কাস রোগে খানিক পুরাতন তেঁতুলের কাথ রৌদ্রে গরম করিয়া, একটু চুষিয়া খাইলে বিশেষ উপকার হয়। শ্বেতচন্দন ও পুরাতন তেঁতুল বাটা গায়ে ঘষিলে চুলকনা সারে। জ্বর, দাহ, বমি ও পিপাসায় একটি পাথরবাটিতে সামান্য পরিমাণ পুরাতন তেঁতুল একটু জলের সহিত গুলিয়া তাহাতে একটু মিসরি ও পাতি বা কাগজি লেবুর রস দিয়া সেব্য।

জ্বর বিকারে ২ তোলা ঐ তেঁতুল আধপোয়া জলের সহিত পাথরবাটিতে গুলিয়া তাহাতে সামান্য পরিমাণ লবণ ও একটি কাঁচা লঙ্কা বেশ করিয়া রগড়াইয়া উহার বিচি ও খোলা ফেলিয়া দিবে। এই সরবত ৵০ আনা মাত্রায় খাওয়াইবে। এক মাত্রায় উপকার না হইলে ৩।৪ ঘণ্টা পরে আর একবার দিবে। ইহাতে সর্দ্দিকাসিও সারে। এই মুষ্টিযোগ শ্রীশ্রীযোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক বিশেষ পরীক্ষিত।

তেঁতুলের বীচি। ইহারও নানা রোগনাশক শক্তি আছে যথা, তেঁতুলের বীজসুদ্ধ বা আফুলো ছোট চারা তুলিয়া প্রসূতির মাথার চুলে বাঁধিয়া কপালের উপর ঝুলাইয়া দিলে সন্তান প্রসূত হয়। প্রসবান্তে উহা খুলিয়া লইবে নচেৎ অনিষ্ট হইতে পারে। কতকগুলি তেঁতুল বীজ মাটিতে পুঁতিয়া চারা উদ্গম হইবার অনতিপূর্ব্বে অর্থাৎ বীজ কিছু নরম হইলে উহা উঠাইয়া শিলায় পিষিয়া ।০ হইতে ॥০ আনা

লইয়া ধারোষ্ণ দুগ্ধসহ পানে দেহের পুষ্টি বৃদ্ধি এবং তরল শুক্র গাঢ় হয়।

তেঁতুল বীজ সঙ্কোচক। উহা বাটিয়া ঘৃতের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে কোন অঙ্গের মচকানি, ফুলা ইত্যাদিতে উপকার হয়। তেঁতুল বীজ বাটিয়া গাওয়া ঘৃতে ভাজিয়া কিছু দুধ দিয়া সিদ্ধ করিয়া আবশ্যক মত চিনি, ছোটএলাচ, ডালচিনি ও তেজপাতার গুঁড়া মিশাইয়া হালুয়া প্রস্তুত করিয়া নিত্য সেবনে বল ও শুক্র বৃদ্ধি হয়।

ঐ বীজের খোসা কুটিয়া ছোলা পরিমাণ বটিকা করিয়া ৩।৪ দিন প্রত্যহ একটি করিয়া বটিকা সেবনে অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ হয়। ইহা সেবন কালীন অম্লদ্রব্য ও সহবাস নিষিদ্ধ। তেঁতুল বীজ চূর্ণ চারি আনা এবং মাজু ফল চূর্ণ চারি আনা একটু মিসরির গুঁড়াসহ জলে গুলিয়া সেবনে শ্বেত প্রদর আরাম হয়।

তেঁতুলের পাতা। কচি তেঁতুল পাতা সিদ্ধ জল পানে গ্রহণী প্রশমিত হয়। কচি তেঁতুল পাতা বাটা জলের সহিত সেবনে আমাশা, পিত্তজনিত জ্বর ও প্রমেহ রোগ উপশমিত হয়। উহা প্রলেপ দিলে শরীরের যে কোন স্থানের জ্বালা ও ফুলা নিবারিত হয়। মাকড়সার বিষজনিত ঘায়ে তেঁতুল পাতা ও গোলমরিচ বাটা প্রলেপে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কাঁচা তেঁতুল পাতা পুঁটলি করিয়া চোখের উপর বুলাইলে চোখ ওঠা ভাল হয়।

পটোল

ইহা কটু-তিক্ত-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, হৃদ্য, বৃষ্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, সারক, রুচিকর, বাতহর, শুক্রবর্দ্ধক, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, বিসর্প, জ্বর, দাহ, ক্রিমি, কফ, পিত্ত, রক্ত দোষ ও চক্ষু রোগে উপকারী এবং ত্রিদোষ নাশক। পটোল পাতা (পলতা) পিত্তনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক,

পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, উষ্ণবীর্য্য, জ্বর, শোথ, কাস, ক্রিমি ও বিষদোষ নাশক। পটোল মূল অতি বিষাক্ত ; নাল বা ডাঁটা শ্লেষ্মা নাশক।

তিক্ত পটোলের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া সেবনে রক্তপিত্ত রোগ প্রশমিত হয়। শোথ রোগে তিক্ত পটোলের শাক উপকারক। সর্ব্বপ্রকার বিষ দোষ নিবারণের জন্য তিক্ত পটোল ব্যবহার্য্য। নিম পাতা ও পলতার যুষ পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরে বিশেষ উপকারক। পিত্ত জ্বরে পলতা ও যবের ক্বাথ শীতল হইলে উহার সহিত মধু মিশাইয়া রোগীকে পান করাইলে তৃষ্ণা ও দাহ নিবারিত হয়। পটলের যুষ বাত নাশক। পটোল পাতার রস মর্দ্দন করিলে, ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) বিনষ্ট হয়।

ডাক্তারী মতে ইহার মূল উগ্র বিবেচক। ইহার পাতা জ্বরনাশক, বলকারক ও ক্রিমি নাশক। কাঁচা ফলের রস ঈষৎ বিরেচক ও শীতল। পটোলের পাতা ও ডগা রোগান্তে দুর্ব্বলতা নাশক।

হাকিমী মতে পটোল ক্ষুধাবৃদ্ধিকর, হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলী সবল কারক, কাস, রক্তদোষ, কফ ও পিত্তদোষ বিনাশক এবং জ্বর, ফোড়া, ফুস্কুড়ি, উদরের ও গুহ্য দ্বারের ক্রিমি নাশক। ইহা অর্শ নিবারক, রতিবর্দ্ধক এবং কফজনিত বিকার নাশক। ইহার পাতা পিত্তনাশক ও শীতল, পাতার পাঁচন জ্বরনাশক। মূল তিক্ত ও বিরেচক। ফুল ত্রিদোষ নাশক।

পিঁয়াজ

পিঁয়াজ বা প্যাঁজ শব্দটী পারসিক। এই জন্য উহার একটী নাম যবনেষ্ট। হিন্দু শাস্ত্র মতে পিঁয়াজ ও রশুন যবন খাদ্য বা ম্লেচ্ছাহার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং উহা হিন্দুর পক্ষে সাধারণতঃ অভক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। মনুর অনুশাসন মতে যে দ্বিজ জানিয়া শুনিয়া

কোঁড় (Mushroom), গ্রাম্য শূকর, মোরগ, রসুন ও পিঁয়াজ আহার করে সে জাতিভ্রষ্ট হয়।

অপর একজন শাস্ত্রকার বলিয়াছেন হিন্দু **ব্রাহ্মণের** বহু বার গোমাংস ভক্ষণে যে পাপ হয় তাহা একবার মাত্র পিঁয়াজ ভক্ষণে হয়। তজ্জন্য মহাপাতকীর যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে তাহা পালন করিয়া পুনরায় উপনয়ন ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

পিঁয়াজ ও রসুন সেবন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আহারবিলাস। এই জন্য বোধ হয় ঐগুলি সাত্ত্বিক আহার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয় না এবং যতি, ব্রহ্মচারী, যোগী বা অন্য আনুষ্ঠানিক হিন্দুর পক্ষে উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু অন্য সকলের পক্ষে উহা কি কারণে নিষিদ্ধ হইতে পারে, তাহার কোন কারণ, যুক্তি বা প্রমাণ কেহ দেন নাই। সুতরাং পিঁয়াজ ও রসুন বর্জ্জন বিধি, ব্যক্তি বিশেষের ভ্রান্ত স্বমত প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট প্রয়াস। উহা প্রত্যক্ষ ভাবে অন্য সকল ব্রাহ্মণ এবং পরোক্ষভাবে সকল ব্রাহ্মণেতর হিন্দুকে উহা বর্জ্জনে প্রণোদিত করিয়াছে।

হিন্দু ব্যতীত অন্য সকল জাতি পিঁয়াজ বা রসুন খাইয়া পাপে বা নরকে ডুবিতেছে, ইহা ধারণায় আসে না, বিশ্বাস ত দূরের কথা। এই দুইটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রুচিকর আহার্য্য ও নানা ঔষধি গুণ সম্পন্ন। আমাদের দেশে এখন অধিকাংশ লোক এমন কি অনেক ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও পুরোহিত উহার পরম ভক্ত। সুতরাং উক্ত অর্ব্বাচীন ও অযৌক্তিক নিষেধাজ্ঞা পুঁথির পাতায় নিবদ্ধ হইয়া কীট দষ্ট বা উপেক্ষিত হইতেছে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঐ দুইটী দ্রব্যের নানা উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে এবং ঐগুলির আহার নিষিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদকার ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণের মতই প্রবল বলিয়া গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

আয়ুর্ব্বেদ মতে বড় পিঁয়াজ উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুচি, বল, পুষ্টি ও শুক্রবর্দ্ধক এবং **ত্রিদোষনাশক**। উহা জ্বর (অবস্থা বিশেষে), গুল্ম, শূল, সঞ্চিত শ্লেষ্মা, কাস, রক্তপিত্ত ও কর্ণশূলে হিতকর।

ছোট পিঁয়াজ, শীতবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, পুষ্টিকর, স্বর-পরিষ্কারক, শ্লেষ্মা, পিত্ত, বমন, কফ ও শোথ নিবারক।

গ্রীস দেশের হেরোডোটাস বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে তৎকালে কুলী ও শ্রমিক প্রভৃতি, যাহাদের শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইত, তাহাদের পিঁয়াজ অপরিহার্য্য আহার ছিল। সৈনিকদের বল ও সাহস বৃদ্ধির জন্য তাহাদিগকে বিধিমত পেঁয়াজ সেবন করিতে দেওয়া হইত।

সম্প্রতি একটী সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে পুরাকালের প্রামাণ্য লিপি বা সঠিক ইতিবৃত্ত হইতে জানা গিয়াছে যে পিরামিড নির্ম্মাণ কালে মজুরগণের জন্য নয় টন ২৪৫ মণ! সুবর্ণের মূল্যে—এখনকার হিসাবে প্রায় তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার-পিঁয়াজ কেনা হইয়াছিল।

বিলাতে সে দেশের প্রয়োজনের দশমাংশ মাত্র পিঁয়াজ উৎপন্ন হয়। সেইজন্য বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর এক মিলিয়ান পাউণ্ডের অধিক মূল্যের পিঁয়াজ আমদানী করা হয়।

পেঁয়াজ ও রসুন কদর্য্য বা অরুচিজনক আহারকে সুতার বা তৃপ্তিজনক করে। এই জন্য এইগুলি সকলের, বিশেষতঃ গরীবদের, সুলভ খাদ্যবিলাস। যদি দুর্ম্মূল্য হইত তাহা হইলে সমর্থবান লোকে জাফ্রাণেরও অধিক মূল্যে উহা ক্রয় করিত।

পিঁয়াজে 'বি' ও 'সি' ভিটামিন আছে। ছোট পিঁয়াজে অধিকন্তু এ' ভিটামিন আছে।

অপকারিতা

পিঁয়াজে গন্ধক আছে যাহা উদরাধ্মানজনক।* যাহাদের পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল, পৈত্তিক বা পেটগরমের ধাত, বা যাহারা অজীর্ণ ও যকৃৎগ্রস্ত রোগী তাহাদের পক্ষে উহা সাধারণতঃ হিতকর নয়।

শ্রীশ্রী যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন পিঁয়াজ ও হাঁসের ডিম রাঁধিয়া খাইলে, বহুমূত্র রোগ সূচিত হয়। সুস্থ ব্যক্তিগণ অধিক পিঁয়াজ বিশেষতঃ কাঁচা পিঁয়াজ আহার করিলে মুখে, হাতে, চর্ম্মে ও মূত্রে একপ্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়, সেজন্য পরের ঘৃণাস্পদ হইতে হয়। রাঁধিলে ঐ দোষ অনেক নষ্ট হয়।

পিঁয়াজ বাতাসের দূষিত পদার্থ আকর্ষণ করে। এই জন্য উহা কুটিয়া অবিলম্বে রন্ধন করা কর্ত্তব্য। নাসিকা দিয়া রক্তপাতে ছোট পিঁয়াজের (বা দূর্ব্বাঘাস বাটার) নস্য বিশেষ উপকারক।

রসুন বা রসোন

ইহার মূলে কটু (ঝাল), পত্রে তিক্ত, নালে কষায়, নালাগ্রে লবণ এবং বীজে মধুর রস আছে। ছয় রসের মধ্যে একটি মাত্র রস অম্ল উন বলিয়া ইহার রসোন নামকরণ হইয়াছে। ইহার অন্য কতকগুলি নাম আছে, যথা, উগ্রগন্ধ, শীতবর্দ্ধক, বাতারি, অরিষ্ট, ভূতঘ্ন ও মহৌষধ।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে রসুন রসায়ন। ইহা স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বৃষ্য, কটু ও গুরু। ইহা শুক্র ও স্বরবর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক, উত্তেজক, সারক ও সুগন্ধি সংযোজক, রুচিকর, বলকর, পুষ্টিকর, মেধাকর ও চক্ষুর হিতকর। ইহা অজীর্ণ, হৃদ্‌রোগ, অরুচি, গুল্ম, জীর্ণজ্বর, বাতশ্লেষ্মা, শূল, শোথ, অর্শ, ক্রিমি, অগ্নিমান্দ্য, অনিদ্রা, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, শ্বাস, কাস, মলমূত্রের বিবদ্ধতা ও বায়ুরোগে হিতকর।

রস্থনে 'সি'. ভিটামিন আছে। রস্থন পেঁয়াজ অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর কারণ ইহাতে শতকরা ৬·৩ আমিষ উপাদান আছে যাহা অতি অল্প আনাজেই আছে। পিঁয়াজে ঐ উপাদান মাত্র গড়ে ১·৫ ভাগ। রস্থনে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ৩·০০ যাহা অত পরিমাণ অপর কোন আহার্য্যে নাই।

মানভূম রামচন্দ্রপুরের শ্রীযুত অন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় জানাইয়াছেন, প্রতিদিন প্রাতে একতোলা গাওয়া ঘিয়ে কয়েক ফোঁটা রস্থনের রস ভাজিয়া ৭ দিন সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর সারে। তিনি পাঁচ শতাধিক রোগীকে এই ঔষধ দ্বারা নিরাময় করিয়াছেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পিঁয়াজ ও রস্থনের খাদ্যমূল্য এবং পূর্ব্বোক্ত গুণব্যতীত অন্য বহু-রোগ উপশম ও আরোগ্যকর শক্তি আছে। পিঁয়াজের অন্য নাম পলাণ্ডু। পল্ পীড়া হইতে রক্ষা করা, অণ্ডু নিপাতন। ইহা উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। ইহাদের নানা ওষধী গুণ পরে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ দুইটীর রোগ উপশম বা আরোগ্যকর প্রাথমিক ক্রিয়া অনেক সময় সেবনান্তে সূচিত হয়, যথা দেহ হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয় যদ্দ্বারা রক্তের দূষিত পদার্থ সমূহ নিষ্কাশিত হয়। কোন কোন রোগ যথা সর্দ্দিজ্বর ইত্যাদি, অবস্থা বিশেষে, ঘর্ম্ম নিরোধের ফলে উদ্ভূত হয়।

গ্রীষ্মকালে পশ্চিমে "লু" বা গরম বাতাস বহিলে তথাকার নিম্ন-শ্রেণীর লোকে মাথায় পিঁয়াজের তেল মাখে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে সংক্রামক রোগের সময় প্রসূত শিশুকে সূতিকাগারে প্রতিষেধকরূপে প্রত্যহ পিঁয়াজের ধূম দেওয়া হইত। এখনও এ প্রথা স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে।

সমুদ্রযাত্রা কালে শৈত্যজনিত রোগের প্রতিষেধার্থ অনেকে পিঁয়াজ ও রস্থন সেবন করে। একজন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, পিঁয়াজের

কোষা গলায় ঝুলাইলে কলেরা রোগ এবং উহা মরিচ সহ সেবনে ম্যালেরিয়া প্রতিষেধ করে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মস্তক রোগ।

কেশের অল্পতা, অকালপক্কতা, বা বৃদ্ধি স্থগিত হইলে মধুসহ পিঁয়াজের রস মর্দ্দন।

মাথাধরা—পিঁয়াজ বা রসুনের কোষা ছেঁচিয়া কপালে বা মাথায় লেপন বা সেবন।

সর্দ্দি কাসি।

কাঁচা সর্দ্দি—রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে কাঁচা বা ভাজা পিঁয়াজ সেবন।

ঘুংড়ি কাসি—রসুনের কোষ গলায় ঝুলান।

তড়কা—রসুনের রস মর্দ্দন।

যক্ষ্মা—রসুন সেবন।

কর্ণশূল—কানে পিঁয়াজ অথবা রসুনের মধ্যস্থ কোষ বা ২।৩ ফোঁটা গরম রস প্রক্ষেপ।

জ্বর ও হাঁপানি—পিঁয়াজ বা রসুনের রস সেবন। জ্বরে বিশেষতঃ পালাজ্বরে পিঁয়াজের উপকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে। রসুনের রস গরম জলসহ সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হয়।

বাতজ্বর—তিল তৈলে রসুন বাটিয়া সামান্য পরিমাণে সেবন।

স্নায়বিক রোগ।

স্নায়ুদৌর্ব্বল্য বা স্নায়ুবিকার—পিঁয়াজ বা রসুন ভক্ষণ বা আঘ্রাণ।

মানসিক বিকৃতি—দুগ্ধে রসুন রস সিদ্ধ করিয়া সেবন। পুরাকালে রোমানগণ উন্মাদ রোগে রসুন ব্যবহার করিত।

হিক্কা—পিঁয়াজ ছেঁচিয়া নস্য গ্রহণ।

মৃগী রোগ—রসুন সেবন।

স্ত্রীলোকের মূর্চ্ছা—পিঁয়াজের রস আঘ্রাণ।

চোয়াল ধরা (Lock Jaw)—মেরুদণ্ডে রসুনের রস মালিস।

অনিদ্রা—পিঁয়াজ ও রসুন সেবন।

হটাৎ বাক্‌হীন বা বোবা হওয়া—পিঁয়াজের রস সেবন।

চর্ম্মরোগ।

ক্ষত, খোস, পাঁচড়া ইত্যাদি—নারিকেল কিম্বা সরিষার তেলে রসুন সিদ্ধ করিয়া সেই তেলের প্রলেপ।

মূত্রস্থলীর পীড়া ও উদরী।

এই দুইটী রোগ পিঁয়াজ সেবনে উপশমিত হয়।

উদর রোগ।

অজীর্ণ, ডিসপেপসিয়া—এই রোগে পিঁয়াজ বা রসুন ক্ষুদ্র মাত্রায় সেবন করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি, পাকাশয়ের সর্দ্দি ও বায়ু নাশ এবং পাকস্থলীর বিভিন্ন যন্ত্রের অবস্থা উন্নত করে। মাত্রা পরীক্ষা সাপেক্ষ।

কামলা বা যণ্ডিস্—মদের সহিত রসুনের রস সেবন।

অর্শ—দধির সহিত পিঁয়াজ কুচি সেবন।

বাত।

এই রোগে পিঁয়াজ ও রসুন প্রসিদ্ধ ঔষধ। উহা বিধিমত সেবনে বাত উপশমিত হয়। **কোন স্থান মচকাইয়া গেলে** রসুনের

রস কিম্বা একটী গোটা কোয়া বাটা লবণের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে উহা এবং বাতজনিত ব্যথা প্রশমিত হয়। গেঁটে বা সন্ধিস্থলের ফুলা বাতে পেঁয়াজ বা রসুন মধুর সহিত ঘুঁটিয়া প্রলেপ দিলে আশু উপকার হয়।

টিউমার, গ্লাণ্ড প্রদাহ বা স্ফীতিতে ভাজা পিঁয়াজের সহিত মধু মাড়িয়া প্রলেপ।

অন্য উপকারিতা।

ঘরের মেজেতে পিঁয়াজ বা রসুন কুঁচাইয়া রাখিলে সাপ পালায়। সাপ, বিছা, বোলতা, মৌমাছি ও ক্ষিপ্ত কুকুর দংশনে পেঁয়াজ ছেঁচিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা উপশমিত হয়।

বেগুন (দেশী)

সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম বৃত্তফলা (গোল বলিয়া), মাংসল ফলা (শাঁস বেশী থাকে বলিয়া), সদাফলা (দীর্ঘদিন গাছে ফল থাকে বলিয়া), নীলা, বাতিঙ্গা (বাত রোগে উপকারী), বার্ত্তাকু, নৃপপ্রিয় ফলা (অতি সুস্বাদু বলিয়া), নিদ্রালু ইত্যাদি।

ইহার গঠন অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীর দেশীয় নাম—লম্বা বা কুলী আণ্ডা, সিঙ্গে (শৃঙ্গাকার) ইত্যাদি।

ভাবপ্রকাশ মতে বেগুন স্বাদু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটুবিপাক, অপিত্তকর, জ্বর, বাত ও কফনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক এবং লঘুপাক।

কচি—কফ ও পিত্তনাশক। **পাকা**—পিত্তবর্দ্ধক ও গুরুপাক। **পোড়া**—কিঞ্চিৎ পিত্তকর কিন্তু কফ, মেদ, বাত ও আমদোষ নিবারক এবং অতি লঘু ও আগ্নেয়।

মুরগীর ডিমের মত সাদা বেগুন অপর জাতীয় বেগুনগুলি অপেক্ষা গুণহীন হইলেও অর্শরোগে উহা বিশেষ হিতকর।

বারমেসে বেগুন ত্রিদোষনাশক কিন্তু রক্তপিত্ত প্রকোপক। চুলকনা ও পাঁচড়ায় কোন প্রকার বেগুনই অপথ্য।

মহর্ষি চরক বলিয়াছেন বেগুনের রস মধুসহ সেবনে কফজ রোগ নিবারিত হয়। চক্রদত্ত বলিয়াছেন বেগুন জরঘ্ন বলিয়া উহা জ্বর রোগীর পথ্য। সিদ্ধ বেগুন রেড়ির তেলে ভাজিয়া খাইলে কটি বাতগ্রস্ত রোগী হাঁটিয়া যাইতে সমর্থ হয়।

ঘোষালতা ভস্ম সহ প্রস্তুত ক্ষার সিদ্ধ বেগুন ঘৃতে ভাজিয়া ও গুড়ের সহিত মিশাইয়া অতৃপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ভোজন করিবার পর ঘোল পান করিলে অতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্শরোগ অচিরে বিনষ্ট হয়, এমন কি জন্মগত অর্শও এক সপ্তাহে আরাম হয়। পোড়া বেগুনের ধোঁয়া কানে দিলে কর্ণজাত ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

বঙ্গসেন বলিয়াছেন পূর্ব্বদিনের সন্ধ্যাকালে বেগুন সুসিদ্ধ করিয়া উহা পরদিন মধুসহ সেবনে জ্বর রোগীর অনিদ্রা দূর হয়। বেগুন পোড়াইয়া যে ভস্ম বা ক্ষার পাওয়া যায় তাহা গাত্রে মাখিলে খুজলি বা চুলকনা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ বিনষ্ট হয়।

কিন্তু যখন পুরাতন গাছের ফসল প্রায় শেষ হইয়া যায় এবং যখন উহা অধিক বীজান্বিত হয় তখন আহার করিলে উক্ত চর্ম্মরোগ জন্মিতে পারে। ইহা পরীক্ষিত সত্য।

বেগুন বীজ উত্তেজক, অম্লকারক ও কোষ্ঠশোধক। উহার পাতায় তামাকের গুণ কিছু আছে। বেগুনের বীজ গুঁড়া করিয়া শুঁঠের গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া নাকে ফুঁক দিলে হাঁচি হয় এবং মূর্চ্ছা রোগী চৈতন্য লাভ করে।

বেগুন পাতার রস সেবনে রক্তওঠা রোগ তদ্দণ্ডেই নিবারিত হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। খড়ের ঘরের খুব পুরাতন খড় পোড়াইয়া সেই ভস্মের সহিত বেগুন পাতা চূর্ণ ও মধু মিশাইয়া পোড়া ঘায়ে দিলে জ্বালা দূর হয় এবং ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয়।

আঙ্গুলহাড়া রোগের প্রথম অবস্থায় যখন বেদনা ও টনটনানি সবে আরম্ভ হয় তখন একটী সরু কুলী বা লম্বা বেগুনের ভিতরের শাঁস কিছু ফেলিয়া দিয়া তাহার ভিতর ব্যথিত অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলে অচিরে সকল যন্ত্রণা বিদূরিত হয়।

বেগুন পাতার রস সেবনে সর্ব্বপ্রকার বিষদোষ প্রশমিত হয়। উহা আধপোয়া মাত্রায় খাইলে আফিমের বিষদোষও নিবারিত হয়।

বিলাতী বেগুন (টোম্যাটো)

ইহার আদি জন্মস্থান দক্ষিণ অ্যামেরিকা। ১০০ বৎসর পূর্ব্বে বিদেশ হইতে আনীত বীজ হইতে ইহার চাষ আমাদের দেশে প্রথমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

পরীক্ষায় ইহাতে খাদ্য প্রাণ (Vitamins) অত্যধিক আছে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আজকাল অনেকে এই ফলের প্রশংসায় শত মুখ। কিন্তু উহাতে আমিষ উপাদান অতি অল্পই আছে। যতই গুণময় বলিয়া কীর্ত্তিত হউক না কেন, উহা আমাদের বেগুন জাতীয় সব্জী বই আর কিছু নয়।

উভয়ের বিভিন্ন উপাদানগুলির শতকরা পরিমাণ পর পৃষ্ঠায় তুলিত হইল।

	দেশী বেগুন	বিলাতী বেগুন কাঁচা	বিলাতী বেগুন পাকা
আমিষ	১·৩	১·৯	১·০
স্নেহ	০·৩	০·১	০·১
লবণ	০·৫	০·৭	০·৫
শ্বেতসার	৬·৪	৪·৫	৩.৯
ভিটামিন	(এ,বি১,বি২ ও সি)	(এ, বি১ ও সি)	(এ, বি১ ও সি)

এই তালিকা কুন্নুর গবেষণাগারের পরীক্ষার ফল। উহাতে ভিটামিন "ডি" সম্বন্ধে ফলাফল প্রকাশিত হয় নাই।

কাঁচা বিলাতী বেগুনের আমিষ ও লবণ উপাদান দেশী বেগুন অপেক্ষা কিছু বেশী। কিন্তু শেষোক্তের স্নেহ ও শ্বেতসার সমধিক। যদিও কাঁচা বিলাতী বেগুনে, দেশী বেগুন অপেক্ষা ভিটামিন অধিক পরিমাণে থাকে কিন্তু উহাতে বি২ ভিটামিন মোটেই নাই যাহা দেশী বেগুনে আছে। কাঁচা টোম্যাটো অনেকেই ব্যবহার করে না সুতরাং ভিটামিনের তথাকথিত আধিক্য ব্যতীত অন্য সব বিষয়ে পাকা টোম্যাটো দেশী বেগুন অপেক্ষা যে নিকৃষ্ট ইহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় বিজ্ঞাপিত ও প্রমাণিত করিতেছে। আর ভিটামিনের দিক দিয়া বিচার করিলে কমলালেবুর সহিত টোম্যাটোর তুলনাই হয় না।

টোম্যাটো যকৃৎ দোষ নিবারক বলিয়া উক্ত হইয়াছে কিন্তু উহা টক রসের একটী সাধারণ গুণ। লেবুর ঐ গুণ সমধিক। আমাদের দেশী বেগুনের নানা রোগ আরোগ্যকারী শক্তি আছে তাহা পরে ব্যক্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ লোকে শুধু টোম্যাটো খাইয়া উহার ফলাফল উপলব্ধি করে না। উহার সহিত অন্য পুষ্টিকর আহার গ্রহণ করিয়া

থাকে। সুতরাং অধিকাংশ স্থলে উহার সমবেত সুফল শুধু টোম্যাটোর উপর নির্ভর করে না।

আমার নিন্দুকে স্বভাব নয় কিন্তু মাঝে মাঝে যে দেশব্যাপী হুজুগ উঠে তাহাতে প্রায়ই অযথা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এই জন্য ঐ সকল বিষয়ের প্রকৃত সত্য জানা প্রয়োজন। টোম্যাটো প্রভৃতির অযথা বা অযৌক্তিক অনুরাগের বিশেষ কারণ দেখা যায় না।

আমি ২০ বৎসর যাবত টোম্যাটো আহার করিয়াছি কিন্তু উহাতে কিছু উপকার লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বরং যতদিন উহা ব্যবহার করিয়াছি, চর্ম্মরোগ প্রায় প্রতিদিন লাগিয়াই ছিল, হয়ত অন্য কারণও ছিল। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অবস্থা বিশেষে বেগুন চর্ম্ম রোগ প্রকোপক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহা বিশেষ অনুধাবন যোগ্য।

লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ছাড়িয়া দিলেও নিম্নোক্ত পাশ্চাত্য দেশীয় পুষ্টিতত্ত্ববিদগণের টোম্যাটোর কুখ্যাতি উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

একজন প্রসিদ্ধ পুষ্টিতত্ত্ববিদ (ডাক্তার লুইস) বলিয়াছেন—"বিলাতী বেগুন সর্ব্বোৎকৃষ্ট সব্‌জি নয়। যদি উহা একান্ত খাইতে হয় কাঁচা না খাইয়া রন্ধন করিয়া অতি পরিমিত পরিমাণে আহার করা কর্ত্তব্য। আমি জানি অনেক লোক উহার আহার অভ্যাস করিয়া মাড়ীর কোমলতা, রক্তস্রাব এবং দন্তের শিথিলতা রোগে ভুগিয়াছে। আমার সহযোগী বা সমব্যবসায়ী সকলে এই কথা সমর্থন করিয়াছেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি আমার একজন রোগিণী এক সময় চিকিৎসার্থে আসিয়া তাহার ২০টী দাঁত যাহা পর পর পড়িয়াছিল তাহা দেখাইয়াছিল। সে তাহার রোগের ইতিহাস বর্ণনা কালে জানাইয়াছিল

যে পূর্ব্ব বৎসরের গ্রীষ্মকালে সে অসুখে পড়ে এবং পল্লীগ্রামে যাইতে আদিষ্ট হইয়া সহরের বাহিরে তাহার এক আত্মীয়ের গৃহে তিন মাস অবস্থান করে। তথায় যাইবার অল্পদিন পরে তাহার আত্মীয়গণ জানাইল যে টোম্যাটো অতি স্বাস্থ্যকর খাদ্য উহা প্রত্যহ আহার করা উচিত।

কিন্তু কিছুদিন উহা সেবন করিবার পর তাহার মুখের ভিতর ঘা হইল এবং দাঁতের মাড়ি হইতে রক্ত নিঃসৃত হইতে লাগিল। সকলে রোগিনীকে জানাইল উহা পাকাশয়ের রোগ মুখে প্রসারিত হইয়াছে। উহা যে টোম্যাটো জনিত তাহা কেহই সন্দেহ করে নাই। যখন সে তাহার সহরের বাটীতে ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে করিয়া প্রচুর টোম্যাটো আনিয়া যত দিন উহা ভাল অবস্থায় ছিল তত দিন আহার করিয়াছিল। ইহার পরেই তাহার দাঁতগুলি আল্‌গা হইয়া একে একে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস টোম্যাটোই উহার প্রধান কারণ।

অবশ্য এক বা দুই চামচ রাঁধা টোম্যাটোর যুস খাইলে দোষ না জন্মিতে পারে। কিন্তু উহাতে ওষধী গুণ থাকায় সুস্থ দেহীরও অধিক পরিমাণে আহার কখনই বিহিত নয়।”

অন্য একজন পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যবিদ বলিয়াছেন উহা সেবনে ক্যান্‌সার ও অন্যান্য দোষ জন্মিতে পারে। এখন বল মা ‘তারা’ দাঁড়াই কোথা ?

মূলা

এই অতি সহজলভ্য তরকারী তুচ্ছ বলিয়া লোকে জানে কিন্তু উহার অসামান্য গুণরাজি বাস্তবিক বিস্ময়কর। মৎস্য, কড়াইশুঁটি, আদা, হিং ও হলুদ সহযোগে মূলার ঘণ্ট অতি উপাদেয় ব্যঞ্জন। ছোট

জাতীয় কচি মূলাই অধিক উপকারী। শাকসহ মূলায় 'এ', 'বি' ও অধিক পরিমাণে 'সি' ভিটামিন আছে।

মূলার আয়ুর্ব্বেদোক্ত সাধারণ গুণ উষ্ণবীর্য্য, রেচক, পাচক, রুচিকর, লঘু, স্বরপ্রসাদক ও ত্রিদোষনাশক। ইহা জ্বর ও শ্বাসাদি রোগে হিতকর। শুষ্ক মূলা সিদ্ধ যুষ অর্শ রোগে হিতকর; এই যুষ ছাগ মাংসের যুষের সহিত সেবনে অধিক উপকার হয়। কফ জনিত শোথ রোগে মূলার রস পীড়িত অঙ্গে লেপনে উপকার হয় এবং সেবনে হিক্কাশ্বাস নিবারিত হয়। শুষ্ক মূলা চূর্ণ মধুর সহিত সেবনে মেদ বৃদ্ধি রোগ প্রশমিত হয়। মূলার বীজ আপাংমূলের রসের সহিত পেষণ করিয়া ছুলিতে প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয়।

ডাক্তারী মতে মূলার বীজ ও পাতা মূত্রকারক ও মৃদু বিরেচক। মূলা গাছের মূল, পত্র ও বীজ পাথরী রোগ নিবারক এবং সর্ব্বপ্রকার মূত্ররোগে হিতকর।

হাকিমী মতে মূলা পাচক, কফ ও বায়ুনাশক, বিরেচক, মূত্রকর এবং প্লীহা ও যকৃৎ রোগে হিতকর। সাদা আঁশহীন মিষ্ট মূলা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অক্ষুধায় লবণ ও গোলমরিচ সহ মূলা খাইলে অতি শীঘ্র ক্ষুধা হয়। আহারের প্রথমে উহা খাইলে ভুক্ত দ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক হয় না, অম্লোদ্গার হয় বা বায়ু জন্মে কিন্তু আহারের শেষ ভাগে সেবন করিলে ভুক্ত দ্রব্য সমূহ শীঘ্র পরিপাক হয়। এই কারণে আহারের অগ্রে মূলাভাতে খাইলে সাধারণতঃ অম্ল ঢেঁকুর উঠে।

ঐ মতে মূলা সিদ্ধ জল পানে কাসি উপশমিত হয়। মূলার রসে পারদ ও অভ্র জারিত হয়। মূলার রস পানে বক্ষঃস্থল, পাকস্থলী, যকৃৎ, মূত্রাশয়, মূত্রস্থলী প্রভৃতির অসার রস বাহির হইয়া উহাদের শক্তি বিবর্দ্ধিত এবং প্রস্রাব ও রমণীগণের ঋতু পরিষ্কার করে। উহা

শিরার বদ্ধ মল বাহির করিয়া দেয়। পাণ্ডু রোগে উহা ব্যবহারে শরীর হইতে বিকৃত রস নিষ্কাসিত হয়। প্লীহা, প্রমেহ, মূত্রাশয়ের পাথরী প্রভৃতি রোগে চিনি কিম্বা অন্য কোন মিষ্ট সরবতের সহিত মূলার রস সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহা রমণীর স্তন্য দুগ্ধ বর্দ্ধক। কচি মূলা পাতার রস চোখে দিলে চোখের জ্যোতিঃ বর্দ্ধিত হয়। উহা পদ্ম মধুর সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ছানি রোগে বিশেষ উপকার হয়।

মূলার রস বৃশ্চিকের গাত্রে ঢালিয়া দিলে উহা মরিয়া যায়। এইজন্য যে বার মাস মূলা খায়, বিছা কামড়াইলে তাহার কষ্ট হয় না বলিয়া কথিত হইয়াছে। মাঝারী দুইটী মূলার রস মিসরির সহিত ২১ দিন সেবনে অর্শের রক্ত পড়া বন্ধ হয়। গেঁটে বাত ও উদরাময় রোগে মূলা নিষিদ্ধ।

মূলার বীজ—পাচক, বায়ুনাশক, মূত্রকর ও ঋতু পরিষ্কারক। ইহা পিঁয়াজের রসের সহিত মিশাইয়া শ্বেতকুষ্ঠে লাগাইলে উপকার হয়। ইহা বাটিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া মুখমণ্ডলে লেপন করিলে কাল দাগ, ছুলি ইত্যাদি দূর হয় ও মুখের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, মাথায় ঘসিলে কেশ বর্দ্ধিত হয়। বীজের তেল ঈষৎ গরম করিয়া কানে দিলে কানের বেদনা ও বধিরতা দোষ নিবারিত হয়। ইহা ঠাণ্ডাজনিত সর্ব্বপ্রকার বেদনাতে উপকারী। বাতের বেদনা, পক্ষাঘাত, জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী। মদের সহিত মূলার বীজ বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিষাক্ত জন্তুর দংশনে উপকার হয় এবং দীর্ঘকাল টাকে দিলে নূতন কেশ উৎপন্ন হয়।

মূলার ক্ষার—আহারের পর মূলার ক্ষার বা লবণ ১ মাষা মাত্রায় সেবন করিলে পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি এবং বায়ুনাশ হয়। মূলার রস

অপেক্ষা ক্ষার অধিক উপকারী। ক্ষার প্রস্তুত করিবার নিয়ম—মূলা বা মূলার পাতা শুখাইয়া আগুনে পোড়াইয়া উহার ছাই লইয়া কয়েক দিবস জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে উহার পরিস্রুত জল লইয়া মাটির হাঁড়িতে জ্বাল দিলে জল নিঃশেষ হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই মূলার ক্ষার বা লবণ। ইহা শিশিতে পুরিয়া রাখিবে। পাঁচ ছটাক মূলার ছাই হইতে ১৪ তোলা এবং ১৵০ পাতার ছাই হইতে এক পোয়া লবণ পাওয়া যাইবে।

লাউ

ইহার অন্য নাম অলাবু, তুম্বী বা তুম্বীকা, কুম্ভ তুম্বী (গোল লাউ), ক্ষীর তুম্বী (লম্বা লাউ)। বড় গোল ল্যাউ হইতে সেতার, তানপুরা, একতারা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য যন্ত্রের খোল প্রস্তুত হয় এবং ছোট লাউ হইতে ভিখারীর ভোজনপাত্র ও ভিক্ষা পাত্র প্রস্তুত হয়।

একজন বলিয়াছেন, লাউ তিনটী উদ্দেশ্য সাধন করে। একটী আহার, একটী সংগীত আর একটী দরিদ্রতা কিন্তু লাউ সেবন দরিদ্রতা বিজ্ঞাপক নয়। তবে স্থলবিশেষে সংগীতের সহিত দরিদ্রতার নিবিড় সম্বন্ধ আছে। এইজন্য হয়ত সংগীত অনুশীলনকারীগণ ভয়ে লাউ ভোজন পরিত্যাগ করিতে পারেন কিন্তু উক্ত বাদ্যযন্ত্রগুলির সংস্রব কিরূপে এড়াইবেন?

উপকারী খাদ্য হিসাবে লাউ আহার ত্যাগ করা যাইতে পারে না। লাউচিংড়ী অন্যতম উপাদেয় ব্যঞ্জন, বাঙ্গালীরাই উহার কদর বুঝে এবং অপর জাতীর অর্ব্বাচীন বিদ্রুপোক্তি "বাঙ্গালী চিংড়ী মাছের কাঙ্গালী" গ্রাহ্য করে না। লাউয়ের আর একটী নাম তুষ্টি। কচি লাউয়ের পায়েস রসনা তৃপ্তিকর উপাদেয় আহার্য্য।

লাউ মধুর রস, শীতল, পিত্তনাশক, রুচিকর, বল, বীর্য্য ও পুষ্টি প্রদায়ক ও ধাতুবর্দ্ধক। সুতরাং উহা একাধারে উৎকৃষ্ট আহারদাতা এবং কতকগুলি ব্যঞ্জনার শ্রেষ্ঠ আধার দাতা বলিয়া হৃদ্য বা আনন্দদায়ক।

অন্য তরকারির উপরোক্ত সার্থকতা নাই। তবে আমের আঁটি হইতে বালকদের বাঁশী ও প্রাণখোলা হাঁসি পাওয়া যায়। কিন্তু এমনযে লাউ, উহা জন্মিবার ঋতুর শেষ ভাগে বিষম তিক্ত ও বিষাক্ত হয়। মিষ্টির কি শোচনীয় পরিণাম! এইজন্য শুধু লাউ কেন, অন্য তরিতরকারি ঐ সময়ে দোষদুষ্ট হয় সুতরাং তখন উহা সেবন করা অবিধেয়।

শাস্ত্রে তৃতীয়া তিথিতে এবং ভাদ্র মাসে অলাবু ভক্ষণ নিষিদ্ধ, ইহা হয়ত অনেকে মানিয়া চলে না কিন্তু ঐ নিষেধ বাক্য বিজ্ঞানসম্মত। বেশ মনে আছে একবার তিত লাউ খাইয়া আমাদের পরিবারবর্গের সকলের কঠিন উদরাময় রোগে প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল। তবে ঔষধার্থে তিত লাউ উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে দোষ জন্মে না।

কৃষিতত্ত্ববিদ শ্রী যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন যে আধুনিক চিকিৎসকগণের মতে গোল লাউয়ের যক্ষ্মার বীজাণু নাশক শক্তি আছে। আধ পোয়া কাঁচা লাউ আধ সের দুধে সিদ্ধ করিয়া ক্ষীরবৎ হইলে উহা ৩।৪ দিন সেবনে দারুণ প্রমেহ রোগ উপশমিত হয়।

সিম ও সয়াবিন

আয়ুর্ব্বেদ মতে সিম গুরুপাক, শৈত্যগুণসম্পন্ন, পিত্তনাশক, কোষ্ঠ-বায়ুপ্রকোপক, কটু ও মধুররসাত্মিকা, অগ্নি, বল ও শুক্রক্ষয়কর এবং ব্রণ, জ্বর ও শ্বাস রোগকর। যাহাদের পরিপাকশক্তি দুর্ব্বল কিম্বা যাহারা অজীর্ণরোগগ্রস্ত তাহাদের উহা বিষবৎ পরিত্যজ্য।

কাল বা গাঢ় সবুজ রঙের সিম অপেক্ষা সাদা সিম অপেক্ষাকৃত সুপথ্য। উহা শ্লেষ্মা, বাত, পিত্ত ও ব্রণদোষ নাশক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। চুণ ও সিম পাতার রসের প্রলেপে কর্ণমূল ফোলা কিম্বা গলার বেদনা প্রশমিত হয়।

"সয়াবিন, সিম বা শিম্বী জাতীয় উদ্ভিজ্জ। ইহাকে বাঙ্গলায় গাড়ী কলাই এবং হিন্দীতে রামকুর্ত্তি কড়াই বলে। ইহার আদি জন্মস্থান চীনদেশ; তথায় উহা ৩০০০ বৎসর যাবত নানা ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার চাষ চীনদেশ হইতে ক্রমে জাপান, মাঞ্চুরিয়া এবং মার্কিণ প্রভৃতি দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, মাঞ্চুরিয়ায় সর্ব্বাধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সেখান হইতে (এবং চীন ও জাপান হইতে) প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ মণ সয়াবিন বিভিন্ন আকারে, দেশ দেশান্তরে রপ্তানি হইতেছে।

চীন ও জাপান দেশে উহা হইতে পাঁচ প্রকার খাদ্য প্রস্তুত হয়। যথা নাটো, তোকু, মিসো, য়ুব ও সোয়া। জাপান দেশে এই সকল খাদ্য মাংসের পরিবর্ত্তে খাদিত হয়। সয়াবিন হইতে প্রস্তুত বিস্কুট, ময়দার বিস্কুট অপেক্ষা অনেক গুণে উপকারী। উহার তৈল খাদ্যরন্ধনে এবং খাদ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়। গরিবেরা উহার খোল খায়। এই খোল গাভীকে খাওয়াইলে দুধের পরিমাণ বাড়ে। উহা গাছের উৎকৃষ্ট সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

চীন, জাপান ও মার্কিণ দেশে সয়াবিনের দুধ (নিষ্কাশিত রস) বা গুঁড়া কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাণীজ দুগ্ধের স্থান লইয়াছে, উহা নানা বিপণীতে বিক্রীত হয়।

বর্ত্তমানে সুইজারল্যাণ্ড, মার্কিণ প্রভৃতি দেশে সয়াবিন হইতে চাট্‌নি, মিঠাই, মাখম, পনির ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। সয়াবিনজাত অন্য বিভিন্ন দ্রব্য নানাবিধ শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে।"

"ভারতের স্থানে স্থানে যথা, হিমালয়ের পাদপ্রদেশে, উত্তর বঙ্গের স্থানে স্থানে, মণিপুর ও ব্রহ্মদেশে ইহার চাষ হইতেছে। অন্যত্র অতি অল্পই হইতেছে। ছোটনাগপুরে অনেকে সয়াবিনের ছাতু বা আটা আহার করে। ইহার চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ায় মাঞ্চুরিয়া দেশ হইতে অধুনা বোম্বাই নগরে বীজ আমদানি হইতেছে। নাদির সাহ প্রিণ্টার কোম্পানী ইহার সরবরাহকারক।"

পুষ্টিকারিতা হিসাবে সয়াবিন সকল প্রকার খাদ্যের শীর্ষস্থানীয়। ইহাতে 'এ', 'বি', 'ডি' ও 'ই' ভিটামিন যথেষ্ঠ পরিমাণে আছে।

নিম্নে সয়াবিন, মাংস ও চীনাবাদামের বিভিন্ন উপাদানগুলির শতকরা পরিমাণ প্রদত্ত হইল।

	সয়াবিন	মাংস	চীনাবাদাম
জলীয় পদার্থ	৮.১	৭১.৫	৭.৯
প্রোটিন বা আমিষ	৪৩.২	১৮.৫	২৬.৭
স্নেহ বা চর্ব্বি	১৯.৫	১৩.৩	৪০.১
লবণঘটিত দ্রব্য	৪.৬	১.৩	১.৯
শ্বেতসার	২০.৯	—	২০.৩
কর্কশাংশ (fibre)	৩.৭	—	৩.১

উক্ত তালিকা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে সয়াবিনের আমিষ উপাদান মাংসের প্রায় ২½ গুণ এবং চীনাবাদামের ঐ উপাদানের ১½ গুণেরও অধিক। মাংসের প্রোটিন অতি উচ্চ দরের বলিয়া কথিত হয় কিন্তু বিলাতে একটি পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সয়াবিনের প্রোটিনও উচ্চশ্রেণীভুক্ত। দেশী সিম ভক্ষণে অম্ল জন্মে কিন্তু সয়াবিন আহারে ঐ দোষ হয় না বলিয়া কথিত হইয়াছে।

সয়াবিন বহুমূত্র রোগের মহৌষধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ফরাসী-দেশে ঐ রোগে উহার রুটি খাইতে দেওয়া হয়। সয়াবিন যদিও সর্ব্বোত্তম পুষ্টিকর পদার্থ কিন্তু দুষ্পাচ্য সুতরাং উহা প্রধান আহারীয় রূপে আমাদের দেশে ব্যবহৃত হইতে পারে না। তবে মহার্ঘ মাছ, মাংস ও দুগ্ধের পরিবর্ত্তে সুলভ সহকারী বা প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে।

"সয়াবিনের উচ্চ খাদ্যমূল্য ব্যতীত উহার প্রতি কণা অর্থকরী। সয়াবিন হইতে নানাবিধ লাভজনক শিল্প দ্রব্য, মোটরকার ও উড়ো জাহাজের অঙ্গ ও রং প্রস্তুত হইতেছে এবং উহার চাহিদা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।"

ইহার বিস্তৃত চাষে আমাদের দেশে একটী নূতন আয়ের পথ সুগম হইতে পারে।

অন্যান্য তরকারির গুণাগুণ।

কপি—ইহার চাষ বিদেশ হইতে এ দেশে প্রবর্ত্তিত। ইহা প্রথম শ্রেণীর সৌখিন তরকারি। পুষ্টিতত্ত্ববিদগণ বাঁধাকপি ও ফুলকপির উচ্চ প্রশংসা করেন। এই দুইটাতেই 'এ', 'বি' ও 'সি' ভিটামিন আছে। বাঁধাকপিতে 'এ' ভিটামিন ফুলকপি অপেক্ষা বেশী। দুইজন ইংরাজ পুষ্টিবিজ্ঞানবিদ্ লিখিয়াছেন যে বহুমূত্ররোগে সামান্য বাঁধাকপির রস "ইনসুলিন" (Insulin) অনুক্ষেপের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিলে অধিকতর উপকার লাভ হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ফুলকপি কিঞ্চিৎ দুষ্পাচ্য। উহাতে এক প্রকার উদ্বায়ী তেল আছে যাহা পরিপাকে ব্যাঘাত করে। তবে উহা সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দিয়া রন্ধন করিলে উক্ত দোষ অনেকাংশে কাটিয়া যায়।

কড়াইশুঁটি—মধুর রস ও রুচিকর।

শালগম—রক্ত ও বর্ণ পরিষ্কারক। ইহাতে "বি" ও সামান্ত "সি" ভিটামিন আছে।

ক্যারট—ইহা অন্যতম উৎকৃষ্ট বিলাতী সব্জি। ইহাতে ভিটামিন "এ" এবং সামান্য পরিমাণে "বি" ও "সি" আছে।

লেটুস—ইহাতে 'এ', 'বি', 'সি' তিনটী ভিটামিন আছে। ইহা রক্তপরিষ্কারক, অনিদ্রা নাশক, রুচিকর, বলকর ও স্বাস্থ্যকর।

বিট—ইহা শর্করা বহুল। ইহা হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। ইহাতে 'এ', 'বি' ও 'সি' ভিটামিন আছে। ইহা পরিপাক করিতে পারিলে দেহ স্থূল হয় ও উত্তাপ বৃদ্ধি করে। ইহা বৃদ্ধদের বিশেষ উপযোগী।

কাঁকুড়, কাঁচা—মলসংগ্রাহক, গুরু, রুচিপ্রদ ও পিত্তনাশক। **পাকা**—তৃষ্ণা ও পিত্তনাশক এবং আগ্নেয়।

কাঁকরোল—ঈষৎ তিক্ত। হিন্দুস্থানীরাই ইহা অধিক ব্যবহার করে। এক মতে ইহা মল, কুষ্ঠ, অরুচি, শ্বাস, কাস ও জ্বরনাশক। অপর মতে উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, কফনাশক, ব্রণশোষক ও সর্পভয় নিবারক।

চিচিঙ্গে—বল ও রুচিকর এবং শোথ ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

চৈ—উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, কফ ও মলবদ্ধতা নাশক এবং শ্বাস, কাস ও শূলরোগে হিতকর।

হাকিমীমতে ইহা কৃশতা দূর করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে কিন্তু পেটে বায়ু জন্মায় ও গুরুপাক। উষ্ণ প্রকৃতির লোকের পক্ষে অপকারী। ইহা পাচক ও পিপাসা নিবারক। ইহার মূল সেবনে দাস্ত হয় এবং বীজ বমনকারক ও ক্রিমি নিঃসারক।

ধুঁধুল—স্নিগ্ধ, বল ও রুচিকর, বায়ুনাশক, রক্তপিত্ত ও বাতপিত্ত প্রশমক, অগ্নিবর্দ্ধক, জ্বর, শোথ, শ্বাস, কাস ও ক্রিমি রোগে হিতকর।

বাঁশের কোঁড়—শীতল, রুচিকর, এবং দাহ, রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ রোগে হিতকর।

বেতের আগা—রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ, দাহ, রক্তপিত্ত, শোথ, অর্শ, মূত্রকৃচ্ছ, পাথরী, বিবর্ণ ও যোনী রোগে হিতকর।

সুপারী গাছের মাথা—বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্ররোগ নাশক, মলভেদক ও মত্ততাকারক।

সজিনা ফুল—উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, তীব্র, কফ ও বায়ুনাশক এবং ক্রিমি, গুল্ম ও প্লীহাদি রোগে উপকারক।

লাল সজিনার ফুল চক্ষু ও রক্তপিত্ত রোগে হিতকর।

সজিনা ডাঁটা—উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, শুক্র ও অগ্নিবর্দ্ধক, ধারক, ক্ষারগুণযুক্ত, বাতশ্লেষ্মা নাশক, চক্ষুর হিতকর, মুখের জড়তা নাশক, গোদ, বেদনা, কাস, মেদদোষ, গুল্ম, প্লীহা, গলগণ্ড এবং রক্তপিত্ত রোগে হিতকর

গাজর—ইহা রুচিকর, লঘুপাক, কফ ও পিত্তনাশক, ক্রিমি, শূল, আধ্মান, দাহ ও তৃষ্ণায় হিতকর। ইহাতে 'এ' 'বি' ও 'সি' ভিটামিন আছে। ইহা সেবনে মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি অর্থাৎ রং ফরসা হয় কারণ ইহার রক্তপরিষ্কারক গুণ আছে। যাহারা অধিক মস্তিষ্ক চালনা করেন তাহাদের পক্ষে ইহা অতিশয় হিতকর কারণ ইহাতে ফসফরাস আছে। মাছ মাংসে অধিক ফসফরাস আছে কিন্তু এগুলি সেবনে শরীরে অম্ল ও ইউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়, গাজরে তাহা হয় না। ইহা বিশেষ অবধানযোগ্য। গাজরের কচি পাতা বা শাকে গাজর অপেক্ষা তিন গুণ ফসফরাস আছে। ইহা গ্রহণী ও অর্শ রোগে সুপথ্য।

শাকবর্গ।

শাকের ছা ও মাছের মা। শাকের কচি ডগা বা পাতা এবং বড় মাছ সমধিক পুষ্টিকর।

শাক অতি অপদার্থ বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হয়। কথায় বলে "শাকে বাড়ে মল", ইহা বৈদ্য শাস্ত্রের উক্তি। কিন্তু ঐ শাস্ত্রে আবার উহার নানা প্রকার উপকারিতা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। দুইটী শাক সুষনি ও থানকুনিকে রসায়ন শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

শাকে সমধিক পরিমাণে লবণজাতীয় উপদানগুলি বিশেষতঃ ক্যালসিয়াম, সোডা ও ক্লোরিণ আছে। উহাতে ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে আছে। উহা আহার করিলে অন্য খাদ্যের উক্ত উপাদানগুলির অভাব অনেকাংশে মিটে সুতরাং শাক একটী অপরিবর্জ্জনীয় আহার্য্য।

পালম শাক—ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। বিলাতী পালম (Spinach) ও দেশী পালম ঠিক এক জিনিষ নয়, উভয়ের গুণের পার্থক্য আছে। দেশী পালম শাকের অন্বর্থ সংজ্ঞা মধুর, সুপত্র, স্নিগ্ধপত্রা, দুরিতা, চিরিতচ্ছদা ইত্যাদি। ইহা মধুর, পথ্য, শীতল, বাত, রক্তপিত্ত ও বিষদোষ নাশক, সংগ্রাহী (মতান্তরে ভেদক) ও ত্রিদোষ নাশক। কেহ কেহ উহা বাত রোগে অপথ্য বলিয়াছেন।

আধুনিক মতে উহা অতি পুষ্টিকর, এইজন্য রোগের পর ব্যবস্থিত হয়। ঘিয়ে ভাজা পালম শাকের শিকড় খাইলে রাতকাণা রোগ প্রশমিত হয়। দগ্ধজনিত ক্ষতে, দুষ্ট ব্রণে অথবা কালশিরা পড়িলে উহার টাটকা রস প্রলেপ বিশেষ উপকারক। পালম বীজ ঘর্ম্মোৎপাদক, স্নিগ্ধ, উদরাময় ও অতিসার নাশক। পালম শাকে 'এ',

'বি' ও 'সি' ভিটামিন অধিক পরিমাণে আছে। ইহা রক্তপরিষ্কারক, রক্তবৃদ্ধিকর এবং চোখ ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধিকর।

চুকো পালম—পালম শাকের অন্য জাতি। ইহার সংস্কৃত নাম চুক্র, চুক্রিকা, চুক্রক, (চুক্ তৃপ্তিকর)। চলিত ভাষায় ইহাকে টক পালম বলে। ইহা বাতঘ্ন, কফ ও পিত্ত নাশক, রুচিকর, লঘুপাক, উষ্ণ, গুল্মনাশক, পথ্য, রোধক এবং বিষনাশক।

ইহার রস চিনির সহিত সেবনে পিত্তাধিক্য প্রশামত এবং সমধিক গুণসম্পন্ন হয়, দাঁত বেদনা উপশমিত হয়, বমন প্রভৃতি দুর এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। বিছার কামড়ের বিষ ও বেদনা চুকো পালমের রস প্রলেপে নিবারিত হয়। কিছু গরম রস কাণে বিন্দু ২ দিলে কানের শূল বেদনা ভাল হয়। ভাজা চুকোপালমের বীজ আমাশার মহৌষধ।

আমরুল—রুচিকর, অগ্নি ও পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ, বায়ু, গ্রহণী, কুষ্ঠ, অর্শ ও অতিসার বোগে হিতকর।

কলমী—শুক্র ও স্তন্যবর্দ্ধক, গুরুপাক, কফকারক, রক্তপরিষ্কারক এবং উপদংশ রোগে বিশেষ কল্যাণকর। ইহার ডাঁটার ও পাতার রস আধ পোয়া মাত্রায় সেবনে বিষদোষ বিদুরিত হয়। ফোড়া পাকাইতে, বসন্ত রোগের প্রথম অবস্থায়, গুটি উঠিবার সময় এবং মস্তিষ্কবিকার ও হিষ্টিরিয়া রোগে উহা বিশেষ উপকারক। ফোড়া, ক্ষতাদি হইতে পুঁয পড়িলে কলমীশাক সেবন নিষিদ্ধ।

হিঞ্চে শাক—পিত্তনাশক। যাহাদের বিকালে হাত পা জ্বালা করে কিম্বা যকৃতদোষ আছে তাহারা প্রাতে এই শাক ছেঁচিয়া রস

সুষনি—নিদ্রাজনক, অগ্নিদীপক, মেধাজনক ও রসায়ন।

পুদিনা—আমাদের দেশে অনেকে পুদিনার বিবিধ গুণ জ্ঞাত নহে বলিয়া উহার আদর করে না। পশ্চিমে হিন্দু মুসলমান সকলেরই উহা প্রিয়। উহার অন্বর্থ সংজ্ঞা অজীর্ণহর, শাকশোভন ও সুগন্ধিপত্র। *নির্ঘণ্ট রত্নাকর ও আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান* মতে ইহা গুরু, স্বাদু, রুচিকর, আগ্নেয়, বল্য, হৃদ্য, সুখাবহ, মলমূত্র স্তম্ভকর এবং কফ ও বাতহর। কাস, মত্ততা, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, সংগ্রহ গ্রহণী, অতিসার, জীর্ণজ্বর ও ক্রিমিনাশক, মুখের জড়তা বা অরুচি ও বমন নিবারক। ইহার চাটনি বেশ হজমী।

আধুনিক মতে পুদিনা বায়ুনাশক ও উদর বায়ু নিঃসারক এবং অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও সর্ব্ববিধ শূলবেদনা বিশেষতঃ যন্ত্রণাদায়ক অম্ল শূল নাশক। কফহর, বিরেচক ও জীবনী শক্তির ক্রিয়াবর্দ্ধক। ইহা ডিসপেপসিয়া রোগে অসীম হিতকর এবং পাকস্থলী স্নিগ্ধ রাখিতে বিশেষ উপযোগী।

আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান বলিয়া আমাদের ধাত পিত্তপ্রধান। এইজন্য চা ইত্যাদি যকৃতের ক্ষতিকর পানীয় সেবনে এবং অন্য নানা কারণে যকৃত বিকৃতি, অম্ল ও অজীর্ণতা প্রায় ঘরে ঘরে দেখা যায়। পুদিনা উহার আদর্শ প্রতিষেধক।

কৃষিতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র দেব কৃষিসম্পদ পত্রিকায় বলিয়াছেন, চায়ের পরিবর্ত্তে উহার প্রতিনিধি স্বরূপ পুদিনা চা ব্যবহার করিলে অপকারের পরিবর্ত্তে মহোপকার সাধিত হইতে পারে। ইহাতে ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি বর্দ্ধিত হয়। মৌরি, গোলমরিচ, দুধ ও চিনি সহযোগে পুদিনার চা সুস্বাদু ও রসনাতৃপ্তিকর, তুষ্টি ও পুষ্টিকর পানীয়। শরীরের পক্ষে বিশেষ স্নিগ্ধকর ও হিতকর এবং স্বাস্থ্যরক্ষক। ইহার বিস্তৃত ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

হাকিমী মতে ইহা ব্যবহারে শরীরের উত্তাপ বর্দ্ধিত, দূষিত পদার্থ দাস্ত দ্বারা নির্গত, পাকস্থলী, বক্ষঃস্থল ও মূত্রাশয়ের ক্লেদ দূর এবং বমন ও হিক্কা নিবারিত হয়। ইহা অপরিপাক ও বিবিমিষার বিশেষ পরীক্ষিত মহৌষধ। পুদিনা দূষিত বায়ু বিলীন করে, কামলা ও পাণ্ডু রোগ দূর করে, মূত্র ও ঘর্ম্ম আনয়ন করে এবং রমণীদের ঋতু পরিষ্কার করে। *ইহা যোনীতে প্রয়োগ করিলে গর্ভস্থ সন্তান নির্গত হয়।* ইহা বিষাক্ত জন্তুর বিষ নষ্ট করে। ইহা পোড়াইয়া দাঁত মাজিলে মাড়ী শক্ত হয়। ইহার আঘ্রাণে মূর্চ্ছারোগে উপকার হয়, মধুর সহিত সেবনে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়।

পুদিনা সিদ্ধ করিয়া মধুর সহিত সেবনে পায়ের গোদে উপকার হয়। উহা কফ, সর্দ্দি জ্বর ও কুষ্ঠ রোগে উপকারী। মদের সহিত সেবনে বিষ দোষ নষ্ট হয় এবং বিসূচিকা রোগে উপকার করে। মধু ও লবণের সহিত সেবনে পেটের ক্রিমি নষ্ট হয়, গন্ধে বিষাক্ত জীব পলায়। ইহা সির্কার সহিত বাটিয়া কফজনিত স্ফীতিতে প্রলেপ দিলে উহা শুষ্ক ও বিলীন হয়। জংলি পুদিনা ব্যবহারে মুখের ঘা আরোগ্য হয়। এই পুদিনার রস কাণে দিলে পোকা বিনষ্ট হয়। পাহাড়ে পুদিনা ব্যবহারে সর্দ্দি বা শ্লেষ্মা, দাস্ত ও প্রস্রাব দ্বারা বাহির হয়, উহা কাপড়ে রাখিলে পোকা ধরে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

আমিষাহার—মৎস্য।

বাঙ্গলা নদী মাতৃক দেশ বলিয়া এখানে মৎস্যাহার আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মাছ, ভোজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আহার্য্য। আমাদের সামাজিক অন্ন যজ্ঞে মৎস্যের আয়োজন অপরিহার্য্য। বিবাহে অধিবাস ও গাত্র হরিদ্রা ইত্যাদিতে উহা একটী অন্যতম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হয়। এয়োদের মৎস্যাহার না করা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন যে পূর্ব্ব বঙ্গে নব পরিণীতার হাতে মাছের খলুই দেওয়া হয়। সেই খলুইতে রয়না মাছ দেওয়াই বিধি। এই মাছের স্বভাব, সাত চড়েও 'রা' নাই। সেইজন্য ঐ দেশের রমণীগণ উক্ত মাছের সংস্রবে নব বধুর ঐ স্বভাব বর্ত্তিবে বলিয়া বিশ্বাস করে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া হয়ত ঐ প্রথার কিছু মূল্য আছে। হিন্দুর শ্রাদ্ধে প্রেতোদ্দেশে দগ্ধ মাংস উৎসর্গীকৃত হয় এবং নিয়ম ভঙ্গের দিন মৎস্যাহার বিশেষ বিধি বলিয়া পালিত হয়।

পুরাণে বাঙ্গলা দেশকে মৎস্য দেশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এক সময় এ দেশের নৃপতিগণ মৎস্যরাজ বলিয়া অভিহিত হইত। অর্দ্ধমানব ও অর্দ্ধমৎস্যদেহধারী মৎস্যাবতার বিষ্ণুর প্রথম অবতার।

"নাভ্যাধারোহিত সম আকণ্ঠশ্চ নরাকৃতিঃ।
ঘনশ্যামশ্চতুর্ব্বাহুঃ শঙ্খ চক্র গদাধরং॥

শৃঙ্গীমৎস্যনিভোমূর্দ্ধা লক্ষ্মী বক্ষো বিরাজিতঃ।
পদচিহ্নিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরশ্চারুলোচনঃ॥

আমাদের জাতীয় গানে ও সাধক সঙ্গীতে মাছের অনেক উপমা আছে। ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দ রায় প্রমুখ কবিগণ তাঁহাদের কাব্য সাহিত্যে নানা প্রকার মৎস্যের ব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়াছেন। অনেক ছড়া ও প্রবাদে মাছের গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে, যথা—

লিখিব পড়িব মরিব দুঃখে।
মৎস্য ধরিব খাইব সুখে॥

অনেক বালক ইহা আবৃত্তি করিতে আনন্দ বোধ করে। লেখাপড়া করিলে যে দুঃখে মরিতে হয় তাহা এখনকার দিনে একেবারে নিরর্থক নয়। অধুনা উহার দ্বারা অন্ন মেলা ভার হইয়াছে।

"বাঙ্গলাদেশে মৎস্য রত্নস্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অন্য ফসল উৎপাদনের জন্য জমি চাষ করিতে হয় কিন্তু জলের ফসল মাছ স্বতঃ উৎপন্ন হয়, কেবল সংগ্রহ করিবার পরিশ্রম প্রয়োজন। উহার ব্যয় জমির চাষের অপেক্ষা অনেক কম, অর্থাৎ মৎস্য চাষে অধিক লাভ সম্ভবপর।"

আমাদের দেশের অন্নহীন বেকারগণ যদি দুর্ল্লভ চাকরির মোহ বা মরীচিকা ত্যাগ করিয়া, দেশে ফিরিয়া গিয়া মৎস্য চাষে বা মৎস্য ব্যবসায়ে এবং ঐ সঙ্গে পুষ্করিণীর চারি পার্শ্বের জমিতে তরকারি ও নারিকেল ফলের চাষে আত্মনিয়োগ করে, তাহা হইলে অনেকে মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের সংস্থান এবং পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা লাভ করিতে পারে। অর্থাৎ মাছ ধরিয়া সুখে থাকিতে পারে এবং দেশের জঙ্গল যাহা ম্যালেরিয়ার একটী অন্যতম প্রধান কারণ তাহা পরিষ্কৃত হইয়া বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে।

যাহাদের জমি ও পুষ্করিণী নাই তাহারা স্বল্প খাজনায় উহা জমা লইতে পারে। কেবলমাত্র ৫০০ নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিলে ৭।৮ বৎসর পরে মাসিক ৫০৲ আয় হইতে পারে।

যাহাদের মূলধনের একান্ত অভাব, তাহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বৃহৎ মৎস্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের অন্ন সমস্যা অনেকাংশে সমাধিত হইতে পারে। ইহা অকার্য্যকরী সস্তা উপদেশ নয়। বিলাতে লঞ্চ বা মোটর বোট সাহায্যে বৎসরে কোটি কোটি টাকার মৎস্য ধৃত হইতেছে। জাপানে জেলেরা বহুদিন যাবত উক্ত প্রণালীতে মাছ ধরিতেছে। মাছ ধরিবার উপলক্ষ করিয়া কেহ কেহ মণিমুক্তা বা নূতন দেশের সন্ধান পাইয়াছে।

আমাদের দেশে উহাদের কথা দূরে থাক, অধিকাংশ মৎসজীবীদের উদরান্ন জুটিতেছে না। পুরীর ধীবরগণ মামুলি প্রথায় কেবল কতকগুলি কাষ্ঠ খণ্ড একত্রিত করিয়া সাগরে ভাসাইয়া জল ও ঝড়ের সহিত নিয়ত ঘোর যুদ্ধ করিয়া এখনও মাছ ধরে কিন্তু তাহাতে উদরান্নের সংস্থান সম্পূর্ণভাবে হয় না। এই জন্য তাহাদের রমণীগণ কুলির কার্য্য করিয়া কোন গতিকে সংসারের অভাব মিটায়।

চীন, জাপান ও কোরিয়া হইতে লাল বা সোনালি মাছ অন্যত্র বিশেষতঃ অ্যামেরিকায় প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইতেছে। এই ব্যবসাও আমাদের দেশে চলিতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া দেশে, বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকার স্যামন (Salmon) মাছ টিনে সংরক্ষিত হইয়া দেশ বিদেশে চালান যাইতেছে। বাঙ্গলা দেশে যে সময় মাছ প্রচুর পাওয়া যায়, সে সময় উহা টিনে সংরক্ষিত করিলে একটী অতিরিক্ত অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে।

মামুলি প্রথায় পদ্মা প্রভৃতি নদীতে যে মাছ ধৃত হয় তাহার অধিকাংশ বরফে সংরক্ষিত হইয়া সহরে সহরে চালান দেওয়া হয়, তাহাতে গ্রামের লোক খুব অল্পই মাছ খাইতে পায়। সেই জন্য উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে অধিক মৎস্য ধৃত হইলে সকলের আমিষ খাদ্যাভাব পূর্ণ এবং আর্থিক উন্নতি সম্ভব হইতে পারে।

স্বাস্থ্য চর্চ্চা করিতে করিতে কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু দেহরক্ষার্থে উপযুক্ত পরিমাণ আমিষ খাদ্য প্রয়োজন এবং উহা চাহিদামত উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে আহরণ করিতে কায়িক পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও কার্য্যকরী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া উপরোক্ত আলোচনা, আশা করি, অবান্তর ও নিরর্থক নয়।

পূর্ব্বে বাস্তু কৃষি হিসাবে পল্লীগ্রামে ঘরে ঘরে মাছ ও তরিতরকারির যথেষ্ট চাষ হইত। যতই উহার অভাব হইতেছে, দেশে অনটন ও দরিদ্রতা বা পরনির্ভরতা বা দাস্যবৃত্তি ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং উহাদের যত বেশী চাষ হয় ততই দেশের কল্যাণকর, ইহা বলাই বাহুল্য।

মৎস্যের (আয়ুর্ব্বোদোক্ত) সাধারণ গুণ স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর, বল ও শুক্রবর্দ্ধক, মধুর, উষ্ণ, আগ্নেয়, কফ ও পিত্তকর এবং বাতরোগহর।

আধুনিক পুষ্টিতত্ত্ববিদগণের মতে যতগুলি আহার্য্য দ্রব্য দেহে অতি সহজে শোষিত হয় তন্মধ্যে মাছ অন্যতম। মাছে ফসফরাস যাহা সমগ্র স্নায়ুমণ্ডল বিশেষতঃ চক্ষু ও মস্তিষ্কের প্রধান খাদ্য তাহা অধিক পরিমাণে থাকায় প্রায় সকলের বিশেষতঃ মস্তিষ্কসেবী, বৃদ্ধ, বালক ও শিশুদের উহা বিশেষ উপযোগী।

প্রসিদ্ধ হোমিয়োপ্যাথী গ্রন্থকার ও চিকিৎসক ডাঃ রডক লিখিয়াছেন, মাছ, মাংস অপেক্ষা অল্প উত্তেজক কিন্তু অধিক পুষ্টিকর

এবং সহজে পরিপাক হয়। এইজন্য আমাদের দেশে রোগের পর শরীর সারিতে এবং দুর্ব্বল ক্ষীণদেহীর দুর্ব্বলতায় বিশেষতঃ মস্তিষ্ক ও স্নায়ু দুর্ব্বল হইলে, উহা বিশেষ উপযোগী। রোগের পর দুর্ব্বলতা নিবারণার্থে অল্প পরিমাণ ঝিনুক, গুগলি বা সামুক অথবা কচ্ছপের মাংসাহার আশু ফলদায়ক, উহা সদ্য বলকারক এবং দুর্ব্বল পাকাশয়ে সহজে হজম হয়। টাটকা ঐ সব দ্রব্য অধিকতর গুণসম্পন্ন। উহা পুরাতন অজীর্ণ, যক্ষ্মা, উদরাময়, শিশুদের অঙ্গবিকৃতি ইত্যাদিতেও বিশেষ উপকার করে। স্তন্যদায়িনী রমণীগণ উহা আহার করিলে তাহাদের এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশুদেরও বিশেষ উপকার হয়।

অন্য একজন বলিয়াছেন ঝিনুক বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বিশেষ গুণসম্পন্ন হয়। অজীর্ণ, কাস ও আমাশা রোগে ঝিনুক এবং ছোট গুগলি বিশেষ উপকারক। রক্তাল্পতায় কিম্বা অসুখের পর শরীর সারিতে উহা ব্যবস্থিত হয়। উহা আহারে প্রসূতির স্তনদুগ্ধ বর্দ্ধিত হয়।

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ পুস্তকে উক্ত হইয়াছে, যে মৎস্যের গন্ধে আমাদের শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া সহজ ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক বহুদর্শী বৈদ্য শ্বাস রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে "মেছো" হাটায় কিছুকাল পরিভ্রমণ করিয়া সেখানকার হাওয়া গায়ে লাগাইতে এবং শ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে ব্যবস্থা দেন।

রক্তহীনতায় সিঙ্গি মাছের কাথ (broth), স্মরণশক্তি হ্রাস ও মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতায় রোহিত মৎস্যের মস্তক, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণতায় মৌরলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল ও ভেটকি মাছের পোঁটা সিদ্ধ, ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যে ঘৃতে ভর্জ্জিত পুঁটি মাছ, গ্রহণী রোগে শঙ্কর মাছের কাথ এবং সর্ব্ববিধ দৌর্ব্বল্যে কৈ ও মাগুর মাছের কাথ বা ঝোল ব্যবস্থিত হয়।

যকৃৎঘটিত রোগ নিবারণের জন্য রুই মাছের পিত্ত ও কালবোস মাছের অন্ত্র লইয়া অনেক আয়ুর্ব্বেদিক ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। আউস মৎস্যের ভস্ম প্রয়োগে কাউর ঘা আরোগ্য হয়। করকটে মাছ খাইলে ছেলেমেয়েদের নিদ্রাবস্থায় দাঁত কড়মড় রোগ সারে। ভেটকি মাছের পটকা রসুন সহ ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে দুগ্ধহীন প্রসূতির স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়।

মুষ্টিযোগ হিসাবে রুই মাছের দাঁত ছেলেদের গলায় সূতা দিয়া বাঁধিয়া দিলে "নজর" লাগে না। বোয়াল মাছের দাঁত চিরুণির ন্যায় ব্যবহার করিলে টাকে চুল গজায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। মৃগেল মাছের পিটের কাঁটা কোমরে বাঁধিলে বাত বেদনা সারে, শুনিতে পাওয়া যায়। আধুনিক ডাক্তারগণ ক্ষয়িষ্ণু রোগীকে সাধারণতঃ বৈদেশিক কডলিভার বা হেলিবাট তৈল মর্দ্দন বা সেবন ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

কিন্তু সর্ব্বভারত স্বাস্থ্য গবেষণাগারের পরীক্ষায় প্রকাশিত হইয়াছে যে বাঙ্গালা দেশের বোয়াল মৎস্যে বিশুদ্ধ নরউইজিয়ান কড লিভার তেলের ২৫ গুণ খাদ্যপ্রাণ "এ" বর্ত্তমান এবং ধাঁই ও শোল মৎস্যে বোয়াল ও আড় টেংরার দ্বিগুণ ঐ খাদ্যপ্রাণ আছে। সুতরাং আমাদের দেশের উক্ত মাছগুলি হইতে ব্যবসা হিসাবে লিভার তেল প্রস্তুত হইলে রোগীর অর্থের সাশ্রয় ও অনেক লোকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে।

যে দেশে মাছ ব্যতীত অন্য আহার মিলে না, যথা সাইবিরিয়া, সেখানকার অধিবাসীগণ মাছ শুষ্ক করিয়া রুটি প্রস্তুত করে এবং উহা আহার করিয়া তুষ্টি ও পুষ্টি লাভ করে। মাছ যদিও পুষ্টিকর আহার তথাপি বিচার করিয়া কোন মাছ কাহার পক্ষে উপকারক তাহা নির্ব্বাচন

করা কর্ত্তব্য। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রোক্ত বিভিন্ন মৎস্যের গুণাগুণ পরে দেওয়া হইয়াছে।

নিঃশল্ক মৎস্য সাধারণতঃ অহিতকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু রোগের পর দুর্ব্বলতা নষ্ট করিয়া পুনঃস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠায় কতিপয় নিঃশল্ক মৎস্য যথা কই, সিঙ্গি, বিশেষতঃ মাগুর ব্যবস্থিত হয়।

স্বাস্থ্য বৈজ্ঞানিক রুবোঁ (Rouband) একটী রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন যে এসিয়ার ফরাসী উপনিবেশ সমূহের আদিম অধিবাসীগণ উপযুক্ত আমিষ খাদ্যের অভাবে ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হইতেছে। এখনও সেখানকার কতকগুলি প্রদেশে (French Gaboon & Indo China) যাহা জলের ধারে অবস্থিত এবং যেখানে মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সেখানকার অধিবাসীগণ নিকটবর্ত্তী অন্য উচ্চভূমির বাসিন্দা অপেক্ষা অধিক পুষ্ট ও বলশালী।

মৎস্য—অপকারিতা।

মৎস্যের এত গুণ সত্ত্বেও উহা স্বাত্বিক আহার বলিয়া শাস্ত্রে পরিগণিত হয় না। মনু প্রভৃতি কোন কোন শাস্ত্রকার মৎস্যকে নিষিদ্ধ আহার পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন কারণ উহা সকল প্রাণীর মাংস খায়। বৈদ্যনাথ ধামের সিদ্ধ মহাপুরুষ বালানন্দ ব্রহ্মচারী মাছ মাংস সম্বন্ধে তাঁহার একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন :—

"মীনং সর্ব্বভক্ষামি।" মীন যেত্না খারাব দ্রব্য খায় লেতা—মড়া, বিষ্ঠা, সড়া, পচা আদি, ওহি কুৎসিত বীজানু উসকো বিচমে রহতা হ্যায়। যো ব্যক্তি মছলি খাতা উস্ আদ্‌মি মছলিকে সাথ সব কুছ অখাদ্য খায় লেতা। মাছ মাংস আদি খানেসে রজো তমো ভাব বৃদ্ধি হোতা, যাস্তি বেমারী হোতা। হাম দেখ্‌তা হ্যায় বঙ্গদেশমে এত্‌না কঠিন কঠিন

রোগ ভাগ্‌দার লোক বাতায় দেতা, যো হাম লোক উস্ রোগকা নামভি নেহি শুনা হ্যায়। ইসকা কারণ কেয়া? বঙ্গদেশমে এত্‌না বেমারী কাহে হোতা? হামারা মনমে তো এহি ধারণা হুয়া, যো মছলি খাতা হ্যায় ইসওয়াস্তে বঙ্গদেশমে এতনা কঠিন বেমারী হোতা। * * কোই কোই আদমি হামকো বোলা, মহারাজ, মাছ মাংস নেহি খানেসে আদমি দুর্ব্বল হো যাতা। হাম বোলা কোভি নেহি, এহি বাৎ হাম নেহি মানেগা; হাতী জানোয়ার, ঘোঁড়া জানোয়ার, মাংস নেহি খাতা, উসকা বল কুছ কম হ্যায়! পশ্চিমা লোক মাছ মাংস নেহি খাতা, ডাল রুটি খাতা, ওহি লোককো যো বল হ্যায়, ওহি বল কাঁহা মিলেগা?"

উপরোক্ত মতবাদের কিছু মূল্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্গদেশে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে মৎস্যাহার প্রথা আবহমানকাল হইতে প্রচলিত। আমাদের বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে বিশেষতঃ অন্নযজ্ঞে মাছ একটী প্রধান উপকরণ। ইহা দেশগত, জাতিগত, সমাজগত ও বংশগত চিরাচরিত সংস্কার বা অভ্যাস। আমরা কি এতকাল ভুল করিয়া আসিতেছি? আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি এতই নির্ব্বোধ ও দায়িত্বজ্ঞান হীন ছিলেন? কখনই নয়।

মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস অনেকদিন স্বয়ং মৎস্য ভোজন করিয়াছিলেন। তাঁহার একজন প্রিয় শিষ্য মাছ ও পান ত্যাগ করিয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"সে কিরে! পান মাছে কি হ'য়েছে? ওতে কিছু দোষ হয় না। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ।

আবার ভিন্ন দেশে ভিন্ন রীতি প্রচলিত আছে যথা—

পূরবে মীন ভক্ষামি, পশ্চিমে চর্ম্মজল,
দক্ষিণে মাতুলি কন্যা, উত্তরে মাংসাহারী।

পূর্ব্বদেশের লোকের মৎস্যাহার পশ্চিম দেশীয়ের পক্ষে বিসদৃশ বা আপত্তিকর বোধ হয়। পশ্চিমদেশের চর্ম্মজল বা মুসলমান ভিস্তির মশকের জলে কুসংসর্গ জনিত দোষ আছে বলিয়া পূর্ব্বদেশীয় লোকেরা উহা ঘোর আপত্তিকর মনে করে।

আমরা মৎস্যাহার ত্যাগ করিয়া মুসলমান ভিস্তির মশকের জলপান কিম্বা নিজ মাতুল কন্যা বিবাহ করিতে প্রস্তুত নই। উত্তর পার্ব্বত্য প্রদেশে মাংসাহার প্রথার বিশেষ কারণ আছে, তাহা পর অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

মৎস্য পুরাণ মতে বিন্ধ্যপর্ব্বতের পশ্চিমে মৎস্যাহার নিষিদ্ধ। সুতরাং উক্ত মতে ঐ পর্ব্বতের পূর্ব্ব দেশভাগে উহা নিষিদ্ধ নয় বুঝায়। মৎস্যাহারের প্রধান আপত্তি উহা সর্ব্বভূক। আমাদের অন্য আহার্য্য যথা শস্য, শাক, তরিতরকারি উৎপাদনার্থে জমিতে অর্দ্ধগলিত ক্রিমি কীট সমাকুল সার, জন্তুর হাড় ও বিষ্ঠাদি ঘৃণিত পদার্থ মিশ্রিত হয়। তাহা তুল্য কারণে মৎস্যাপেক্ষা অনেক গুণে আপত্তিকর বলিতে হইবে। কিন্তু ঐ সকল দূষিত পদার্থের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভিজ্জ হৃষ্ট ও পুষ্ট হয় এবং নির্দ্দোষ দেহ ধারণ করে। সেইরূপ মৎস্য ভুক্ত পদার্থ আহার করিলেও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উহা দোষস্থ হয় না বরং উহার গুণ বিবর্দ্ধিত হয়।

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের "আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ" পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে ফলবৃক্ষের মূলদেশে আঁশহীন মৎস্য পুঁতিলে ফলের আকার ও স্বাদ বর্দ্ধিত হয়। আঙ্গুর গাছের গোড়ায় ছোট পুটি মাছ পুঁতিলে উহার ফলের অম্লাস্বাদ বিদূরিত হয়। পচা মাছে লবণ মিশাইলে যে জল নিঃসৃত হয় তাহা নারিকেল গাছের গোড়ায় দিলে উহা সবিশেষ তেজস্কর হয়।

মাছ পুষ্করিণীর অনেক পচা জিনিষ খাইয়া ফেলে। ডাক্তার বেণ্টলি তাঁহার সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছেন, পুষ্করিণীতে মৎস্য বিশেষতঃ আমিষভোজী মৎস্য পালন করিলে উহা ম্যালেরিয়াবাহী মশকের ডিম্ব ভক্ষণ করিয়া মানুষকে ম্যালেরিয়া মুক্ত হইতে সহায়তা করিবে।

কোন কোন মাছ যথা ট্যাংরা মনুষ্য বিষ্ঠা ভক্ষণ করে, এই মৎস্য কাটিবার সময় উহা অনেকবার দেখা গিয়াছে। এই জন্য অনেকে উহা খায় না। আবার সকল মাছ যখন ডিম ছাড়ে তখন প্রায়ই বিষাক্ত বা দোষস্থ হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব এ সকল বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। আধুনিক মতে মৎস্য ও মাংসে দূষিত পদার্থ (Purin bodies) আছে কিন্তু ডাল এমন কি দুগ্ধেও উহা আছে কেহ কেহ প্রমাণ করিয়াছেন। কোন খাদ্যই একেবারে বিশুদ্ধ নয় সুতরাং মাছ বেচারী একা দোষী নয়। শরীরের কিছু দোষ হজম করিবার শক্তি আছে, একথা অনেক স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ স্বীকার করিয়াছেন।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে মাছের দোষ অপেক্ষা গুণ অধিক এবং উহার সংযত ও বিধিমত সেবনে স্বাস্থ্যের উপচয় সম্ভবপর। তবে মৎস্যাহার ভিন্ন যে দেহ রক্ষা সম্ভবপর নয়, একথাও ঠিক নয়। কারণ খাদ্যের উপযুক্ত পরিমাণ আমিষ উপাদান উদ্ভিজ্জ ও শস্য হইতে পাওয়া যাইতে পারে যদ্দারা সুস্থ এবং সাত্বিক জীবন ধারণ সম্ভবপর, অবশ্য যদি অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধিগুলি প্রতিপালিত হয়।

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার মৎস্যের আয়ুর্ব্বেদোক্ত গুণাগুণ উল্লিখিত হইল।

১। **আড়**—স্নিগ্ধ, বলপ্রদ, শুক্রবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক, মেধাজনক কিন্তু গুরুপাক এবং বায়ু ও কফ প্রকোপক।

২। **ইলিস**—অতিশয় মুখরোচক, স্নিগ্ধ, শুক্র ও অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, বলপ্রদ কিন্তু কফ ও পিত্তকর। যাহাদের পরিপাকশক্তি দুর্ব্বল তাহাদের পক্ষে অহিতকর। কাঁচা ইলিসের ঝোল বা তরকারি অধিকতর উপভোগ্য, ইহাতে ভিটামিন নষ্ট হয় না।

৩। **কই**—লঘুপাক, রুচিকর, কফপ্রশমক, বায়ুনাশক ও আগ্নেয়।

৪। **কাঁকড়া**—শুক্র, রক্ত ও বলবর্দ্ধক, মলমূত্র নিঃসারক, আশু রক্তস্রাব নিবারক, বাতপিত্ত নাশক, ভগ্নসংযোজক, পাণ্ডু, শোথ ও গ্রহণী রোগে হিতকর।

৫। **কাতলা**—ত্রিদোষনাশক, উষ্ণবীর্য্য ও গুরুপাক।

৬। **কালবোস**—পুষ্টিকর কিন্তু বায়ুবর্দ্ধক।

৭। **খয়রা**—বাতপিত্ত নাশক, বলবর্দ্ধক কিন্তু শ্লেষ্মাকর।

৮। **খলিসা**—লঘুপাক, বলবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক, শূল ও আম বিনাশক, মলরোধক কিন্তু বায়ু প্রকোপক।

৯। **চাঁদা**—বলকর, কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মাকর ও গুরুপাক।

১০। **চিংড়ী**—গুরুপাক, বল ও রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, মলরোধক, মেদ, পিত্ত ও রক্তদোষ নিবারক, কিন্তু কফ ও বায়ুকর।

১১। **চিতল বা চেতল**—বলপ্রদ, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক।

১২। **চ্যাং**—লঘু, রুক্ষ, বায়ু ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক।

১৩। **ট্যাংরা**—লঘু, আগ্নেয়, কফ ও পিত্তনাশক।

১৪। **ডিম** (মাছের)—গুরুপাক, স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর, অতিশয় শুক্রবর্দ্ধক, কফ, মেদ ও বলবর্দ্ধক এবং প্রমেহ নাশক। কোন কোন পুষ্টিবিজ্ঞানবিদ বলেন ইহা বাতরোগে অহিতকর।

১৫। **নোনা মাছ**—সারক, কফ ও পিত্ত বর্দ্ধক।

১৬। **পাঁকাল**—শ্লেষ্মা প্রকোপক ও অজীর্ণকারক।

১৭। **পাবদা**—বায়ুনাশক, বলকর, স্নিগ্ধ ও শুক্রবর্দ্ধক।

১৮। **পুঁটি** (বড়)—শুক্রবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক, মুখ ও কণ্ঠ-রোগে হিতকর।

ঐ—সরল, শীতল, রুচিকর ও বলবর্দ্ধক।

ঐ—ছোট, লঘু, কফ ও বায়ু নাশক, শীতল, রুচিকর ও বলবর্দ্ধক।

১৯। **ফলুই**—স্নিগ্ধ, শুক্র ও বলবর্দ্ধক এবং গুরুপাক।

২০। **বাইন**—বল ও রুচিকর, গুরুপাক, রক্তপিত্তে হিতকর, বায়ু, পিত্ত, মাংস ও রক্তের হিতকর।

২১। **বাউস**—পুষ্টিকর কিন্তু গুরুপাক।

২২। **বাচা**—গুরুপাক, বাতপিত্তনাশক, স্নিগ্ধ ও শ্লেষ্মাজনক।

২৩। **বেলে**—আগ্নেয়, বলকর, লঘু, মলসংগ্রাহক, বায়ুরোগে হিতকর। মতান্তরে বায়ুজনক।

২৪। **বোয়াল**—বলবর্দ্ধক কিন্তু কফজনক। অধিক সেবনে রক্ত ও পিত্ত দূষিত হয় এবং কুষ্ঠরোগের আশঙ্কা আছে।

২৫। **ভাঙ্গড়**—শীতবীর্য্য, রোধক, শুক্রজনক, রক্তপিত্তে হিতকর ও গুরুপাক।

২৬। **ভাঙ্গন**—গুরুপাক, শীতল ও শ্লেষ্মাজনক।

২৭। **ভেটকি**—গুরুপাক, রুচিকর, বাতপিত্তনাশক কিন্তু অধিক আহারে আমবাত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ হইতে পারে।

২৮। **মাগুর**—লঘুপাক, স্নিগ্ধ, বলকর, রক্ত ও শুক্রজনক। অজীর্ণ, অতিসার, জ্বর, প্লীহা, যকৃত, পাণ্ডু, কামলা ও বাতরোগে হিতকর।

২৯। **মৌরলা**—লঘু, বায়ুনাশক, পুষ্টি, বল, শুক্র, স্তন্য ও শ্লেষ্মা-বৰ্দ্ধক।

৩০। **রুই**—উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বল, বীর্য্য ও শুক্রবর্দ্ধক, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক। বাত, কফ, চক্ষু ও কর্ণরোগে হিতকর। রুইমাছের মুড়ো শিরোরোগ, নাসারোগ প্রভৃতি ঊর্দ্ধ যন্ত্রগত রোগে পরম হিতকর। ইহাকে মৎস্যরাজ বলে।

৩১। **শাল**—গুরু, রুচিকর ও মলরোধক।

৩২। **শোল**—গুরু, রুক্ষ, মলরোধক, রক্ত ও পিত্তের হিতকর।

৩৩। **শুঁটকি**—দুর্জ্জর ও রোধক।

৩৪। **শিলোন**—গুরু, বল ও রুচিকর, বাতপিত্তনাশক, শ্লেষ্মা ও আমবাতজনক।

৩৫। **সিঙ্গি**—বল ও রুচিকর, স্নিগ্ধ, কফ ও বায়ুনাশক।

বৃহৎ মৎস্য—গুরু, শুক্রকর, মলবর্দ্ধক। **ক্ষুদ্র মৎস্য**—লঘু, রুচিকর, গ্রহণীরোগে হিতকর, ত্রিদোষনাশক।

লবণভাবিত মৎস্য—কফ, পিত্তকর ও সারক। **সমুদ্র মৎস্য**—লঘু, বৃষ্য, মধুর ও স্বল্প মলকর। মতান্তরে গুরু, শুক্রকর, স্নিগ্ধ ও বাতনাশক।

দগ্ধ মৎস্য—গুরু, শুক্র, পুষ্টি ও বলকর।

তৈল ও লবণযুক্ত দগ্ধ মৎস্য—ক্ষীণতেজ, ক্ষীণশুক্র, ভগ্ন, জর্জ্জরিত দেহ ও নিত্য স্ত্রী সেবীর হিতকর।

তৃণ বেষ্টিত তৈলে সন্তোলিত সলবণ দগ্ধ মৎস্য,—স্বাদু, কফবাতহর, শুক্র ও বলবর্দ্ধক।

হেমন্ত ব্যতীত অপর ঋতুর কূপ জলের মৎস্য শুক্র, মূত্র, কুষ্ঠ ও কফবর্দ্ধক। পুষ্করিণীর মাছ সাধারণতঃ বলকর ও বায়ুপিত্তনাশক। নদীজাত মাছ অপেক্ষাকৃত গুরুপাক, বাতহর, রক্তপিত্তজনক, শুক্র-বর্দ্ধক ও মলের অল্পতাকারক। নির্ঝরিণীর মৎস্য শুক্র, মূত্র, বল, পরমায়ু, বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক। হেমন্তকালের কূপজ মৎস্য, শীতকালের সরোবরজাত, বসন্তকালের নদীজাত, বর্ষায় তড়াগজাত ও শরৎকালে ঝরণার মৎস্য বিশিষ্ট উপকারক।

ষোড়শ অধ্যায়।

আমিষ আহার।

মাংস।

মাছ, মাংস ও ডিম্ব সাধারণতঃ আমিষ খাদ্য বলিয়া অভিহিত হয়। কেহ কেহ দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত প্রাণীজ খাদ্যকে ঐ পর্য্যায়ভুক্ত করেন কিন্তু তাহা ঠিক নয়। হতজন্তুর মাংসকেই সাধারণতঃ আমিষ সংজ্ঞা দেওয়া হয়। অভিধানে আমিষের অর্থ—অম = রুগ্ন হওয়া + ইষ (টিষ্‌চ)। আমিষের আর একটী অর্থ লোভ আর একটী কাম। লেখকের একজন আত্মীয় উহার একটী নূতন সংজ্ঞা দিয়াছেন। মাংস বিপরীত দিকে পড়িলে সমাং হয়, স মানে 'সে' অর্থাৎ মাংস, মাং মানে আমাকে, খায় (উহ্য)।

দোষের কথা ছাড়িয়া দিলে, আহার জনিত তৃপ্তির হিসাবে মাংসের স্থান সর্ব্বোচ্চে, উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রুচিকর আহার্য্য। জীবন্ত ও মৃত উভয় মাংসই মানুষকে যেমন পরম তৃপ্তি দেয় তেমনি চরম দুঃখ দেয়। জীবন্ত মাংসের অর্থ পরিবার, সন্তানাদি নিজ জন। ইহারা জীবনে অনেক সুখের কারণ হয় কিন্তু যদি অবাধ্য হয় বা অসৎ ব্যবহার করে অথবা কঠিন রোগে পড়ে তাহা হইলে প্রতিপালকের মনকষ্টের সীমা থাকে না। সেইরূপ মৃতজন্তু আহারে পরম তৃপ্তিলাভ হয় কিন্তু উহা অতিসেবনে রোগের জ্বালায় জ্বলিতে হয়। মদের ন্যায় মাংসেরও অতিসেবন স্পৃহা হয়।

ফ্লেচার সাহেব লিখিয়াছেন, আমিষ খাদ্য যে মদিরার মত একরূপ বা সমান উত্তেজক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অসংযমের এই দুইটী শ্রেষ্ঠ এজেণ্ট বা প্রতিনিধি অতিশয় উত্তেজনা বা প্রদাহজনক পাপচক্রের আবর্ত্তন বৃদ্ধিসাধক। ফলে অন্ততঃ একটী দোষ জন্মে যদ্দ্বারা পেশী-তন্তুগুলির স্বচ্ছন্দতা ও কার্য্যকারিতা বিপর্য্যস্ত ও মন অবসন্ন হয় এবং অধিক চালনা বা উত্তেজনার জন্য উহাদের বল ও কার্য্যকারিতা হ্রাস পায়।

মাংস হজম করিতে অন্ততঃ ৪ ঘণ্টা সময় লাগে। অন্য আমিষ বহুল উদ্ভিজ্জ জাতীয় খাদ্য যথা ডাল হজম করিতে উহার অর্দ্ধেক সময় লাগে। দুধ ১৫।২০ মিনিটে হজম হয়। মাংস রন্ধন করিতেও অনেক অধিক সময় লাগে। নিত্য নিয়মিত মাংস সেবনে বিশেষতঃ উহা অধিক পরিমাণে সেবনে পাকযন্ত্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ডাক্তার এইচ, সি, ব্রুয়ার (Dr. H. C. Brewer) লিখিয়াছেন যে অত্যধিক মাংসাহারীদের শিরা ও ধমনী রুদ্ধ বা সম্প্রসারিত হয় এবং দেহের তাপ অস্বাভাবিক ভাবে বর্দ্ধিত হয়, যেন জ্বর সদাই লাগিয়া আছে তজ্জন্য তাহাদের জীবনীশক্তির ক্ষয় হয়। ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র লিখিয়াছেন একজন অতিক্ষুধার সময় অতিরিক্ত পরিমাণে মাংস আহার করিয়া মারা গিয়াছিল।

অধিক মাংসাহারে দন্তপীড়া, বাত, ক্রিমি, চর্ম্মরোগ, যকৃৎ ও মূত্রাশয়ের বিকৃতি, অজীর্ণ, শূলবেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা, মাথাধরা, ক্যানসার বা দুষ্টক্ষত, মৃগী, অত্যধিক রক্তের চাপ (Blood pressure), অন্ত্রপ্রদাহ (Appendicitis), ধমনীর বিকৃতি বা কাঠিন্য, অকালবার্দ্ধক্য ইত্যাদি দোষ বা রোগ জন্মে।

সহরে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত বিকলিতাঙ্গ ভিখারীদের সংখ্যা বড় কম নয়। উহা গোমাংস ভক্ষণের শোচনীয় কুফল।

প্রসিদ্ধ পুষ্টিতত্ত্ববিদ ডাক্তার হেগ বলিয়াছেন যে মাংস ও অন্য কতকগুলি খাদ্যে একটী বিশিষ্ট দূষিত পদার্থ (Purin bodies or Uric acid) থাকে যাহা দেহে সঞ্চিত হইয়া নানা রোগের সৃষ্টি করে। মাংসে ঐ পদার্থ অত্যধিক। প্রভাতকালে ইউরিক অ্যাসিড দেহযন্ত্রে অত্যধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকে বলিয়া সে সময় প্রচুর মাংসাহারীদের প্রায়ই বদমেজাজী দেখা যায়। উহাদের দাঁতের রোগ লাগিয়াই থাকে। সহরে অসংখ্য দন্তচিকিৎসালয় তাহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে।

দারুণ দন্তকষ্ট নিবারণার্থ দাঁত সকল অনর্থের মূল ভাবিয়া, অনেকে অসময়ে উহার উপর রাগ করিয়া তুলিয়া ফেলেন কিন্তু তজ্জন্য দাঁত কখনই দায়ী নয়, পরিপাক যন্ত্রও নয়। আহারে অসংযম, অবিধি পূর্ব্বক আহার, অতিরিক্ত গুরুপাক দ্রব্য বিশেষতঃ মাংস আহার, এ সকলই দায়ী। অধিকাংশ স্থলে হোমিওপ্যাথী ঔষধ সেবনে অতি কষ্টকর দাঁত বেদনা দূর হইতে পারে। ইহা বার বার পরীক্ষিত।

হাতের একটী অঙ্গুলের পর্ব্বে ঘা বা বেদনা হইলে উহা কাটিয়া ফেলা যেমন অতি নির্ব্বোধের কাজ, কাঁচা দাঁত ওপড়ানও তেমনি কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ। কেহ কেহ প্রচলিত ফ্যাসান অনুযায়ী দন্তের শোভাবর্দ্ধনার্থ কৃত্রিম দাঁত সোনায় মুড়িয়া বা বাঁধাইয়া লয়, কিন্তু তাহার কার্য্যকারিতা স্বভাবজাত দাঁত অপেক্ষা অনেক কম। অতএব দাঁত থাকতে সকলের দাঁতের মর্য্যাদা রাখা কর্ত্তব্য।

মাংস সাধারণতঃ অশুচিকর বা অপবিত্র আহার বলিয়া গণ্য হয়। কারণ উহাতে জন্তুর ক্লেদ, মলমূত্রাদি নানা আপত্তিকর পদার্থ মিশ্রিত

থাকে। মাংস বিস্বাদ হইবার ভয়ে কেহ উহা ধুইয়া খায় না এবং রন্ধনেও সব ময়লা যায় না। জিনিষটীতে অপবিত্রতা অন্তর্নিহিত থাকে বলিয়া সংস্কারে অর্থাৎ রন্ধনে উহাতে কিছু না কিছু দোষ থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং উহা যে শুধু আপত্তিকর তাহা নয়, অনিষ্টকরও বটে। আবার আহারার্থে যে সকল জন্তু জবাই বা বধ করা হয় তাহাদের মধ্যে রুগ্ন জন্তু কম বেশী থাকে, ইহাও আপত্তিকর।

হত্যার সময় জন্তুদের ভয়ে রক্ত বিষাক্ত হয়। ইহা বিজ্ঞানসম্মত সত্য। এ কারণেও হতজন্তুর মাংস অনিষ্টকর হয়। সুতরাং পাকস্থলীকে দূষিত জন্তুর শব সমাধি গহ্বরে পরিণত করা স্বেচ্ছাকৃত আত্মাপরাধ।

যদিও মাংস বিশুদ্ধ হয় তথাপি উহা তামসিক আহার বলিয়া পরিগণিত হয়। উহা সেবনে একটী বিশেষ দোষ জন্মে। দেহ খাদ্যের পরিণতি সুতরাং খাদ্যের প্রকৃতি অনুসারে খাদকের প্রকৃতি প্রভাবিত হয়, অর্থাৎ মাংস খাইলে মানুষের মনে পাশবিক প্রবৃত্তি জাগে তজ্জন্য শরীরে অস্বাভাবিক উত্তেজনা অনুভূত হয় এবং কাম ক্রোধাদি রিপু উদ্দীপিত হয়, ইহা সর্ব্বজন অনুভূত সত্য।

অবশ্য নিরামিষ আহার্য্যের মধ্যেও কতকগুলি দ্রব্য কামোত্তেজক কিন্তু তত নয় যত মাংস। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন, মৎস্য, মাংস, অধিক লঙ্কা বা অম্ল, মিষ্ট, মধু, ক্ষীর ইত্যাদি, মসুর ডাল ও মাষকলাই, এ সকল কামোদ্দীপক।

বাফন্ (Buffon) বলিয়াছেন দুর্দ্দান্ত নরহন্তাগণ জন্তুর রক্ত পান করিয়া মন ও হৃদয় কঠিন করে। মার্কিণ দেশে কসাইকে জুরীর আসনে বসান হয় না। কুকুরকে মাংস খাওয়াইতে অভ্যাস করাইলে

সে অত্যন্ত হিংস্র হয়। অত্যধিক মাংসাহারী লোকের প্রকৃতি সাধারণতঃ অধিক উগ্র, নিষ্ঠুর ও হিংস্র। এই উক্তির দৃষ্টান্ত স্বরূপ ডাক্তার সিসিল ওয়েব জনসন বলিয়াছেন, এক সময়ে তাঁহার নিকট একজন রুগ্না ভদ্র রমণী চিকিৎসার্থে আসিয়া জানাইয়াছিল যে তাহার স্বামী তাহাকে প্রায়ই নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাহার স্বামী দিনে তিন বার মাংস আহার করে। তাহার স্ত্রীর জন্য কোনরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিয়া তাহার স্বামীকে অতি অল্প মাংস আহার করিতে অনুরোধ করেন। ক্রমে মাংস ত্যাগ করিয়া তাহার মন শান্ত হয়, পূর্ব্বের ন্যায় আর তাহার ক্রোধের প্রচণ্ড আবেগ হইত না এবং স্ত্রীকে মারধর করিত না।

নিরামিষ ভোজীদের প্রকৃতি সাধারণতঃ কোমল ও অক্রোধনশীল। মাংসাহারী জীব যে অধিক কামপ্রবণ তাহা শাশ্বত সত্য। গো-মহিষাদি উদ্ভিজ্জাহারী জন্তুদের স্বতন্ত্র সঙ্গিনী নাই, তাহাদের বৎসরে একবার যৌন মিলন হয়। এক দল মৃগের একটী মাত্র দলপতি পুং মৃগ থাকে, এক দল বানরের একটী মাত্র নর বানর দলপতি থাকে কিন্তু সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সঙ্গিনী আছে। ইহার দ্বারা উপরোক্ত সত্য নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে।

"শারীরিক বলের বিচার করিলে হস্তির সহিত কোন জন্তুর তুলনা হয় না। একটী গণ্ডার একটী সিংহকে অনায়াসে জখম করিতে পারে। সিংহ ও ব্যাঘ্রাপেক্ষা মৃগ ও অশ্ব অধিক ত্বরিতপদ। উষ্ট্র, অশ্ব, গো ও মহিষ অধিক পরিশ্রম করিতে পারে। তাহারা মানুষের উদরান্নের সংস্থানে চাষ ও ভার বহনের কার্য্যে সহায়তা করে এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা অধিক সহ্য করিতে পারে। বাঘ, সিংহ মানুষের কোন কাজেই আসে না বরং অনিষ্ট ও ভীতি সাধন করে।"

অনেক আহারতত্ত্ববিদ আপেক্ষিক শরীর সংস্থান বিশেষতঃ নখের, দন্তের ও পাকস্থলির গঠন ও সংস্থান বিচার দ্বারা নিঃসন্দেহ হইয়াছেন যে মানবদেহ ফল, মূল, শস্য, তরিতরকারি দ্বারা সুপুষ্ট হইবার বিশেষ উপযোগী, মাংসাহারের দ্বারায় নয়। (এ বিষয়ে কিছু মতভেদ আছে কিন্তু অধিকাংশের উক্ত মতই গ্রাহ্য করিতে হইবে।)

প্রমাণ স্বরূপ একজন বলিয়াছেন যে মাংসভূক জন্তুগণের পায়ের নখ সূচাগ্র, কঠিন ও তীক্ষ্ণ, উহার দ্বারা তাহারা অপর জন্তুকে ছিঁড়িয়া খাইতে পারে কিন্তু উদ্ভিজ্জভোজী জন্তুগণের পায়ে খুর বা আঙ্গুল আছে এবং নখ থাকিলেও উহা তীক্ষ্ণ ও সূচাগ্র নয়। যদি মানুষের মাংস উপযোগী আহার হইত তাহা হইলে প্রাকৃতিক বিধানে তাহাদের মাংসাশীদের ন্যায় ঐরূপ নখ থাকিত। মানুষ হিংস্র কুকুরের ও বন্দুকের সাহায্যে বন্যজন্তু শিকার করে, নিজের আক্রমণ করিবার ক্ষমতা নাই কারণ সে হিংস্র জন্তু পর্য্যায়ভুক্ত নয়।

আর একজন বলিয়াছেন (Dr. H. S. Brown) কুকুর, শূকর (এবং কাক) সর্ব্বভূক কিন্তু মানুষ এই শ্রেণীভুক্ত নিশ্চয়ই নয়। মানুষের দেহে ঘাম নিঃসৃত হয়, হিংস্র জন্তুদের দেহে ঘাম হয় না।

ডাক্তার হেগ্ বলিয়াছেন -

"আমি বহু গবেষণার দ্বারা প্রমাণ পাইয়াছি যে উপযুক্ত উদ্ভিজ্জাহার দ্বারা মানুষের দেহরক্ষা ত হয়ই উপরন্তু উহা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেয়স্কর যেহেতু উহাতে দেহ ও মনের উচ্চ শক্তি স্ফুর্ত্ত বা বিকশিত হয়।"

জন্তুদের দেহ উদ্ভিজ্জের রাসায়নিক পরিণাম। মাংস আহার করিলে উহার দ্বিতীয় বার রাসায়নিক পরিণতি ঘটে অর্থাৎ দুইবার চর্ব্বণ ও হজম করা খাদ্য হইতে রক্ত উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ব্বোক্ত কারণে অধিক

দোষস্থ হয়। রাঁধা তরকারি বা ব্যঞ্জন একবার পাক করিয়া দ্বিতীয় বার পাক করিলে অনেক সময়ে দোষস্থ হয় সুতরাং মাংসের আদিজনক অধিক পবিত্র উদ্ভিজ্জাহারই শ্রেয়ঃস্কর।

একজন ইংরাজ স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ লিখিয়াছেন—

"ফল, শস্য ও শাকসব্জিভোজীগণ তাহাদের আহারের সকল পবিত্রতা আদি উৎস হইতে পায় এবং তাহা হজম হইয়া মাংস ও রক্তে পরিণত হয়, আর মাংসাশীগণ যাহা একবার চর্ব্বিত, পশুর লালার সহিত মিশ্রিত ও গিলিবার পর জীর্ণ ও প্রাণীজ খাদ্যে পরিণত হয় অর্থাৎ মাংস তাহা পুনঃ চর্ব্বণ ও পুনঃ পরিপাক করে।"

মাংস মানুষের সাধারণতঃ অস্বাভাবিক আহার। উদ্ভিজ্জ পঞ্চভূতের সমীকরণ বা রাসায়নিক পরিণতি। জন্তুগণ উহা খাইলে উহার দ্বিতীয় সমীকরণ হয়। যখন মানুষ জন্তুর মাংস খায় তখন উহার তৃতীয় সমীকরণ হয়, অর্থাৎ প্রকৃতির রসায়নাগারে মাংস তিন দফা রাঁধা খাদ্য সুতরাং দোষ ও অপবিত্রতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায়।

আহার নির্ব্বাচনে উদ্ভিজ্জভোজী ইতর জন্তুদের সহজাত প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি জ্ঞান অস্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত সভ্যমানবের অপেক্ষা অনেক অধিক। মানুষের রসনা অনেক সময় বঞ্চনা করে।

অধুনা শীতপ্রধান দেশেও অনেক পরীক্ষায় নিরামিষ খাদ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। বিখ্যাত পুষ্টিতত্ত্ববিদ সার হেনরী থমসন লিখিয়াছেন যে তিনি চর্ম্মের কর্কশতা ও অস্বাস্থ্যভাব, মুখে দুর্গন্ধ প্রভৃতি রোগে কিছুকাল আমিষাহার ত্যাগ করাইয়া তৎপরিবর্ত্তে সবুজ আনাজ, পরিমিত পরিমাণ দুগ্ধজাত খাদ্য ইত্যাদি আহার

করাইয়া অনেককে আরাম করিয়াছেন এবং ঐ প্রকার খাদ্য কিছুদিন গ্রহণ করিবার পর তাহাদের বর্ণেরও উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে।

ডাক্তার ল্যাম্ব নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানাইয়াছেন যে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ নিরামিষ আহার গ্রহণে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি বা বোধ শক্তি বর্দ্ধিত হয়, উহাদের ক্রিয়াশীলতা বা কর্ম্মপরতা অধিক হয়; শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া অধিকতর স্বচ্ছন্দের সহিত সম্পন্ন হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি সমধিক প্রখর হয়।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—A simple vegetarian diet if persevered on, induces a religious ard devout spirit.

সাদাসিদে নিরামিষ আহার নিয়ত অধ্যবসায়ের সহিত গ্রহণে সাধু ও পবিত্র জীবন প্রবর্ত্তিত হয়।

এইজন্য প্রায় সকল আনুষ্ঠানিক হিন্দু নিরামিষাহারী। বৈষ্টবদের শারীরিক গঠনের লালিত্য বা হৃষ্টপুষ্টতা নিরামিষ ভোজনের বৈশিষ্ট। হিন্দু বিধবাগণ যদিও তাহাদিগকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেষ্টনীর মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, তথাপি তাহারা সাধারণতঃ সধবা অপেক্ষা স্বাস্থ্যবতী। হস্তি, গো, মহিষাদি জন্তুর শরীরের গঠনের লালিত্য বা সুষমা হিংস্র জন্তুদের অপেক্ষা অধিক।

সম্প্রতি স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য (Health and Beauty) পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে বর্ত্তমান যুগের অন্যতম অতিমানব মুসোলিনী মাংস খান না এবং তামাক, চা, কফি ও মদ স্পর্শ করেন না। তিনি প্রতিদিন গৃহে ৩০ হইতে ৪৫ মিনিট কাল শরীরচর্চ্চা করেন। এতদ্ব্যতীত অশ্বারোহণ, গ্রীষ্মে সন্তরণ, শীতে কাষ্ঠ পাদুকা দ্বারা ধাবন বা লম্ফন করিতে ভালবাসেন। প্রত্যহ ১২ হইতে ১৪ ঘণ্টা

দেশের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন এবং গ্রাম্য কৃষকের সাদাসিদে আহার ও যথেষ্ট পরিমাণ ফল ভোজন করেন; দিনে নিদ্রা যান না। গত ২৬ বৎসর তাঁহাকে কোন রোগে ভুগিতে হয় নাই।

বিলাতে কতকগুলি পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে মাংসাহারে অভ্যস্ত বিদ্যালয়ের বালকদের কিছুদিন নিরামিষ আহার দেওয়ার পর তাহাদের স্বাস্থ্যের, শারীরিক বল, মানসিক স্ফূর্ত্তি ও দেহের ওজন বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ইউরোপে বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে নিরামিষভোজীগণ মাংসভোজী অপেক্ষা সাধারণতঃ অধিক পরিশ্রম করিতে, দৌড়াইতে বা ভার বহন করিতে সক্ষম। নিম্নে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

একবার প্যারী নগরীতে ৭০ মাইল ভ্রমণ প্রতিযোগীতায় ২২ জনের মধ্যে ৮ জন নিরামিষাহারী, বাকি আমিষাহারী ছিল। ৬ জন নিরামিষাহারী সর্ব্বাগ্রে গিয়াছিল।

বিলাতে একটী বাইসিকেল প্রতিযোগিতায় তিন দল লোক ছিল। একদল নিরামিষভোজী প্রথম হয়, বাকি দুই দল আমিষভোজী হারিয়া যায়।

বার্লিন হইতে ভিয়েনা ৩৬০ মাইল ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় তিন জন নিরামিষভোজীর মধ্যে ২ জন এবং অন্য ১৩ জন আমিষভোজীদের মধ্যে মাত্র ১ জন ২০ ঘণ্টা পূর্ব্বে লক্ষ্যস্থলে পৌছিয়াছিল।

আর একটী ৬ দিন ব্যাপী ২০০০ মাইল বাইসিকেল প্রতিযোগীতায় একজন নিরামিষভোজী প্রথম হয়। ২০০০ মাইল আসিবার পর তাহার আরও ১ দিন বাইসিকেল চালাইবার শক্তি ছিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে স্বাস্থ্য সমাচার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল—

(১) আরবেরা কষ্টসহিষ্ণু, দীর্ঘজীবী ও অধ্যবসায়ী, তাহারা 'প্রধানতঃ খেজুর ও দুধ আহার করে।

(২) বলিভিয়া দেশের সৈনিকগণ কেবলমাত্র ভুট্টা, নারিকেল ও অন্য ফলমূল খায়। তাহারা ২০।২৫ দিন ধরিয়া দীর্ঘ পথ অক্লান্তভাবে হাঁটিতে পারে।

(৩) ঈজিপ্ট দেশবাসীগণ সাধারণতঃ গম, ভুট্টা, কলাই, লাউ, কুমড়া, ফুটি ও খেজুর খায়। তাহাদের ন্যায় পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু জাতি অতি অল্পই আছে।

(৪) আয়ার্ল্যাণ্ড দেশবাসীদের প্রধান খাদ্য আলু ও ওটমিল। কিন্তু তাহারা মাংসভোজী ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড দেশের অধিবাসীগণ অপেক্ষা বল, বীর্য্য, শৌর্য্য ও দৈহিক গুরুত্বে কম নয়।

(৫) জাপানীরা প্রধানতঃ ভাত ও মাছ খায়, তাই খাইয়া আমিষ-ভোজী দুর্দ্ধর্ষ রুসিয়ানদের এক সময় জলে স্থলে হটাইয়া দিয়াছে।

(৬) এসিয়া মাইনর ভূমিখণ্ডে স্মির্ণা প্রদেশের বাসিন্দাগণ ৬০০ হইতে ৮০০ পাউণ্ড অবধি বোঝা সমস্ত দিন ধরিয়া বহন করে। তাহারা প্রধানতঃ আঙুর, ডুমুর, শুষ্করুটি, খেজুর এবং জলপাই আহার করে।

(৭) চীনদেশে ক্যানটন সহরে ভারবাহক চীনা যাহারা প্রধানতঃ মাছ ও ভাত খায় তাহারা দিনে ১৬ ঘণ্টা সিডান চেয়ার স্কন্ধে বহন করে।

(৮) ইউরোপের অধিকাংশ সুইস ও স্কটল্যাণ্ড দেশবাসী দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ, তাহারা কদাচিৎ মাংসাহার করে।

আহার

একজন ইংরাজ বিজ্ঞানবিদ আর একটী বিস্ময়কর তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন মাংসাহারে কণ্ঠনলীতে অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করে। ব্রিটিশজাতি ইউরোপের অন্য জাতিদের অপেক্ষা অধিক মাংসাহার করে, সেইজন্য তাহাদের মধ্যে ভাল গাহক ও বাদক দুর্ল্লভ। ইটালিয়ানেরা অতি অল্প মাংস আহার করে, সেইজন্য তাহাদের দেশে অনেক সুকণ্ঠ গায়ক ও বাদক আছে। তিনি প্রমাণ স্বরূপ বলিয়াছেন মাংসাশী পক্ষীগণ যথা কাক, শকুনি, ঈগলপক্ষী প্রভৃতির কণ্ঠস্বর অতি কর্কশ।

গৃহপালিত জন্তুগণ যাহারা জীবনভোর গৃহস্থের চাষে প্রধান সহায়, ভারবহনে প্রাণপাত করে বা দুগ্ধ পীযুষ ধারা ঢালিয়া আমাদের দেহ ও প্রাণ সঞ্জীবিত করে তাহাদিগকে হত্যা করা বিশেষতঃ তাহারা যখন অকর্ম্মণ্য হয়, তখন হননার্থে কসাইকে বিক্রয় করা ঘোর অকৃতজ্ঞতা। উহা পশুত্বের পরিচয়, মনুষত্বের নয়। মানুষ নিজে অকর্ম্মণ্য হইলে পেনসন ভোগ বা অবসর গ্রহণ করে কিন্তু নিজ পরিবারভুক্ত জন্তুদের বার্দ্ধক্যে বিপরীত ব্যবস্থা করে। ইহা ঘোর স্বার্থপরতার পরিচয়।

"যে নয়নরঞ্জন হরিণের নর্ত্তন, কুর্দ্দন ও পশ্চাতবীক্ষণ (ফিরে ফিরে চাওয়া), যে শশকের সচকিত উল্লম্ফন ও ধাবন তৃপ্তি ও আনন্দজনক তাহাদিগকে হত্যা করিয়া মানব জঠরজাত করিবে এই জন্যই কি তাহারা সৃষ্ট হইয়াছিল? মানুষ নিজের মাংস কাহাকেও খাইতে দেয় না, সে অন্য জন্তুর মাংস খাইবে এ বিসদৃশ ব্যবস্থা কি বিধাতার অভিপ্রেত?"

পাখীদের স্বরলহরী যাহাতে শ্রবণ জুড়ায় তাহাদিগকে নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করিয়া তাহার মাংস খাইবার অধিকার মানুষকে কে

দিয়াছে? তাহারা বিধাতার বিধানে মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিবার জন্য সৃষ্ট, রসনা উপভোগের জন্য নয়।

প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্ট ভূতানামপি তে তথা।
আত্মোপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ॥

মানুষের নিজ প্রাণ যেমন নিজের নিকট প্রিয়, অন্য জীবগণের প্রাণ তাহাদের নিকট তেমনই প্রিয়। সাধুগণ নিজ প্রাণের সহিত তুলনা করিয়া অপর প্রাণীর প্রতি দয়া করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলির মাংস পরম পবিত্র জ্ঞানে ভোজন করিয়া কৃতার্থ হন। কিন্তু ছাগাদি মাংস যদি তিক্ত হইত তাহা হইলে উহা কেহই মানত করিত না। অনেক স্থলে পশুবলি মানসিক করিবার প্রধান উদ্দেশ্য মাংস খাইবার ইচ্ছা, উহা দেবতার প্রতি ভক্তি নিবেদন নয়—মাংসের প্রতি অতিভক্তির নিদর্শন।

পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব তাঁহার একজন ভক্তকে (৺ শ্যামলাল বসুকে) বলিয়াছিলেন—

আর দেখ দাঁতেও সব পড়ে গেছে, আর দুর্গা পূজা কেন? এক জন আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আর দুর্গা পূজা কর না কেন?" সে উত্তর দিয়াছিল, "আর দাঁত নাই ভাই।"

বলিদান ব্যাপারে অনেক গলদ আছে। প্রথমতঃ 'মা' কখনই ঘুস চান না, তিনি অহেতুক ভক্তি ও ভালবাসা চান। মনস্কামনা সিদ্ধার্থে জোড়া পাটা মানসিক করিয়া অত অল্প খরচে, বড় জোর ৫।৭ টাকা, অত বেশী উপকার যথা মোটা মাহিনার চাকরি, বেতন বৃদ্ধি, মকদ্দমায় জিত, কঠিন রোগমুক্তি ইত্যাদির আশা দুরাশা মাত্র। আবার মজার কথা, ঐ বলির মাংস মহাপ্রসাদ স্বরূপ ভোজন করিয়া একরূপ বিনামূল্যে ঈপ্সিত বরলাভ প্রত্যাশা করা হয়। 'মা' হাসেন, মানুষ ভারী চালাক!

—১৫

জীবের প্রাণস্বরূপা জগজ্জননী কি সুসন্তানের রক্ত পান করিতে চান, না অসুরের রক্ত পানে প্রেম ও অপ্রেমের সমতা সাধন করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতে চান ? অন্য অর্থে, আমাদের মনে দেবাসুরের দ্বন্দ্ব সদাই বিদ্যমান, সেইজন্য যখন আসুরিক প্রবৃত্তিগুলি প্রবল হয় সেইগুলির বলিদানই তাঁহার অভিপ্রেত।

দ্বিতীয়তঃ তন্ত্র মতে পশু বলিদানের বিধি আছে বলিয়া আমরা সকলেই তান্ত্রিক সাজিয়া বসি কি করিয়া ? আবার ঐ বলির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদও আছে।

নিম্নোক্ত বাণী জগজ্জননীর মুখ নিঃসৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে—

"যে আপনার বাসনা তৃপ্তির জন্য ছাগ হত্যা করিয়া খায় তাহার পাপ খণ্ডন সম্ভবপর, কিন্তু যে আমার নামে উহা উৎসর্গীকৃত করিয়া খায় তাহার পাপ কিছুতেই খণ্ডন করি না।"

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

বলিদানেন বিপ্রেন্দ্র দুর্গা প্রীতি ভবের্নৃণাং।
হিংসাজন্যঞ্চ পাপ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
উৎসর্গ কর্ত্তা, দাতা চ, ছেত্তা, পোষ্টা চ রক্ষকং।
অগ্রপশ্চানিবোদ্ধা চ সপ্তৈতি বধ ভাগিনঃ ॥

অর্থাৎ পশুবলির দ্বারা মানবগণের দুর্গাপ্রীতি সম্ভব হইলেও উহাতে হিংসাজনিত পাপ জন্মে, ইহাতে সংশয় নাই। উৎসর্গকর্ত্তা, বলিদাতা, হননকারী, বলির পশু পোষণকারী, রক্ষক এবং যূপকাষ্ঠের অগ্র পশ্চাৎ ধারণকারী এই সাত জনকে পাপের ভাগী হইতে হয়।'

কোন কোন ইংরাজ স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ বলেন যে মাংসাহারী মানব এ যাবত নিরামিষভোজী জাতিদের উপর প্রভুত্ব বা একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে, কারণ তাহারা অধিকতর বলবান ও সাহসী

কিন্তু তাহারা যে দুর্দ্ধর্ষ, নিষ্ঠুর, পরস্বাপহরণ পরায়ণ, অধর্ম্ম পরায়ণ, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির ন্যায় মারামারি, কাটাকাটি ও লুটপাটে যে তাদের জীবন কাটে, উহা যে পশুত্বের পরিচয় এবং কত দুর্দ্দশা ও অধোগতি সূচিত করে তাহা উল্লেখ করেন না।

উপরোক্ত কারণেই কি ইউরোপের এক একটী দেশ এক একটী পশুর প্রতীক স্বরূপ চিহ্নিত হইয়াছে, যথা ব্রিটিশ সিংহ, রুশ ভল্লুক ইত্যাদি। জর্ম্মণ জাতি এখন তাহাদের জাতীয় প্রতীক ঈগল ছাড়িয়া উহার স্থলে সৌভাগ্য আনয়নকারী স্বস্তিকা চিহ্ন বসাইয়াছে।

'জোর যার মুল্লুক তার' এই কিম্বদন্তী অসত্য নয় কিন্তু জোর মাংসাশীর একচেটিয়া নয়।' জাপানীরা যাহারা বাঙ্গালীদিগের ন্যায় মাছ ভাত ভোজী তাহারা কিরূপে এক সময় রুশিয়ান ভল্লুককে জলে স্থলে পরাজিত করিয়াছে। তিন চার শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায় ও কেদার রায় কিরূপে দুর্দ্ধর্ষ মোগল, পাঠান ও আরাকান মগদিগকে বার বার শোচনীয়ভাবে পরাজিত এবং বহুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে পারিয়াছে। প্রতাপাদিত্য সুদুর রাজমহল, পাটনা এমন কি বারাণসী পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার গৃহ-শত্রুর জন্য শেষ রক্ষা হয় নাই।

যদি একমাত্র মাংসাহারের উপর প্রভুত্ব নির্ভর করিত তাহা হইলে ভারতবর্ষের কোটী কোটী মুসলমান যাহারা সকলে অল্পাধিক মাংস ভোজন করে তাহারা কেন পরাধীন?

গত মহাযুদ্ধে এবং বর্ত্তমান যুদ্ধেও ইংরাজ সেনাপতিগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে ভারত সৈনিকগণ যাহারা প্রধানতঃ নিরামিষভোজী তাহারা শৌর্য্য ও বীর্য্যে এবং ক্লেশসহিষ্ণুতায় ইংরাজ সৈনিকগণ অপেক্ষা কোন মতে হীন নয়। সুতরাং মাংসাহার স্বাধীনতার মূল কারণ নয়।

মহর্ষি চরক মাংসের অনেক গুণের কথা বলিয়াছেন, যথা উহার রস সর্ব্বজীবের প্রীতিজনক ও হৃদয়গ্রাহী। ক্ষয়রোগী, ব্যাধিমুক্ত ব্যক্তি, কৃশ এবং ক্ষীণশুক্র ব্যক্তি এবং বল ও বর্ণকামী ব্যক্তির পক্ষে উহা অমৃততুল্য। উহা যথাযথ ব্যবহার করিলে সকল রোগ প্রশমিত হয়। উহা বয়স, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, চৈতন্য, স্বর ও আয়ুর্বৃদ্ধিকর। যাহারা নিত্য ব্যায়াম, স্ত্রীসেবা ও মদ্যপান করে তাহারা যদি নিত্য মাংসের রস সেবন করে তাহা হইলে কখনও আতুর বা দুর্ব্বল হয় না।

উক্ত উপকারিতাগুলি প্রধানতঃ ভোগীর অপেক্ষা রোগীর পক্ষে প্রয়োজ্য বুঝিতে হইবে। যাহারা যুদ্ধ ব্যবসায়ী বা বলকামী তাহাদের পক্ষে ব্যতিরেক হিসাবে মাংস সেবন প্রয়োজন হইতে পারে, নচেৎ নিম্নোক্ত অন্যান্য মহাজনগণের নিষেধ বাণীর মর্য্যাদা থাকে না। যথা—

১। যদি দীর্ঘ জীবন বা স্বর্গ কামনা কর মাংসাহার ত্যাগ করিবে

২। অহিংসা পরমোধর্ম্ম।

৩। লোভাৎ স্বভক্ষণার্থায় জীবনং হন্তি যো নরঃ।
মহাকুণ্ডে বসেৎ সোহপি তদ্ভোজী লক্ষ বর্ষকম্॥

৪। প্রাণীহত্যা মহা পাপ। ইত্যাদি—

স্বামী বিবেকানন্দ অধিকারী ভেদে আমিষ খাদ্যের উপযোগিত আছে বলিয়াছেন।

কেহ বলিতে পারেন, আমরা অহরহ শ্বাস-প্রশ্বাসে কত সূক্ষ্মাণু সূক্ষ্ম দৃশ্য বা অদৃশ্য জীব উদরস্থ করিতেছি, কত জীব পদদলিত করিয়া হত্যা করিতেছি, ইহাতেওত পাপ হইতেছে। কিন্তু আণুবীক্ষণিক ব অতি ক্ষুদ্র জীবের প্রাণশক্তি এত ক্ষীণ যে তাহাদের মরণে তং কষ্টবোধ হয় না। সেইজন্য ক্ষীণজীবী মাছের মায়ের পুত্রশোক নাই

যে সব জন্তু যত বেশী প্রাণ ও স্নায়ুশক্তি সম্পন্ন তাহাদের ভয়, মৃত্যুযন্ত্রণা ও শোক তত বেশী হয়। এইজন্য উহাদের কাতর চীৎকার পরিণামে প্রতিহিংসার রূপ পরিগ্রহ করিয়া মাংসাহারীকে নানাপ্রকার কষ্ট দিয়া কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া এই প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। কাহারও মনে দারুণ কষ্ট দিলে তাহার অভিশাপ অনেক স্থলে ফলে।

উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধে কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন উহারা জীব-শ্রেণীভুক্ত বা প্রাণশক্তি সম্পন্ন। উহাদের আহার করিলেত জীবহত্যা পাপ হইতে পারে কিন্তু উপরোক্ত কারণে উহা পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বিধাতার বিধানে উদ্ভিজ্জ অধিকাংশ জীবের খাদ্য। "উদ্ভিজ্জের জীবনব্যাপার জন্তুদের হইতে অনেক পৃথক। উদ্ভিজ্জের শাখা বা প্রশাখা কাটিলে উহা আবার গজায়। উহার অনুভূতির শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মস্তিষ্ক নাই ইত্যাদি।"

উদ্ভিজ্জভোজীদের অতিবৃদ্ধি নিবারণার্থ বা ভীতি প্রদর্শনার্থ অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণে হিংস্র জন্তুদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহাদের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু মানুষ ও অপর নিরীহ জন্তুগণ নানা কারণে, যাহা অন্যত্র ব্যক্ত হইয়াছে, নিষ্ঠুর হিংস্র জন্তুর পর্য্যায়ে পড়ে না, বা উহাদের দলভুক্ত হইতে পারে না। বিধাতা কখনই মানুষকে অন্য জন্তু আহার করিবার অজুহাতে তাহাদের সহিত ঐ সম্বন্ধ পাতাইতে কিম্বা তাঁহার সৃষ্টি রক্ষার্থ তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিতে বলেন নাই। তাঁহার কখনই এ অভিপ্রায় নয় যে, সকল জীব পরস্পর পরস্পরকে খাইবে।

মানুষের হিতার্থেই ইতর জন্তুদের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত হিংস্র ও অন্য জন্তুদের অবাধ বৃদ্ধি যাহাতে না ঘটে বিধাতা তাহার একটী সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি সাপ

তাহার ডিম না খাইত তাহা হইলে পৃথিবী সর্প-সমাকুল এবং মানবের বাসের অযোগ্য হইত। যদি মাছ ডিম বা অন্য মাছ না খাইত তাহা হইলে মাছে জল বুজিয়া যাইত। হিংস্র জন্তুদের প্রজননের হার উদ্ভিজ্জভোজী জন্তুগণের অপেক্ষা বিলম্বিত ও অল্প। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন, সিংহ ১২ বৎসর অন্তর মৈথুন করে। মানুষের কি সাধ্য জন্তুদের জন্ম নিয়ন্ত্রন করে।

ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিদের ও মনীষীদের মতে মানবগণের "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, পরম দান, পরম তপ, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরম মিত্র, পরম সুখ, পরম সত্য ও পরম জ্ঞান।"

আমিষ বনাম নিরামিষ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নিরামিষভোজী অপেক্ষা আমিষভোজী রোগে অধিক ভোগে। তাহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা সহ্য করিবার ও রোগপ্রতিষেধক শক্তি অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। মাংস রসায়ন নয়। উহা সেবনে পরমায়ু ক্ষয় হয়। ইহা অনেক মনীষীদের সিদ্ধান্ত। মাংসে যে পরিমাণ আমিষজাতীয় উপাদান আছে তাহা ছানা, ডাল প্রভৃতি নিরামিষ খাদ্যেও আছে।

মাংস মানুষের অস্বাভাবিক খাদ্য। কাঁচা মাংস খাইতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ফল, মূল ও নানা প্রকার খাদ্য রন্ধন না করিয়া খাওয়া যায়। রাঁধা মাংস যদিও অতি রুচিকর কিন্তু দুষ্পাচ্য। মাংস রন্ধন করিতে ও হজম করিতে অনেক অধিক সময় লাগে। রন্ধনে উহার আমিষ উপাদানগুলি ঘনীভূত হয় বা জমাট বাঁধে কিন্তু শস্যাদি পাক করিলে উহার শ্বেতসার উপাদান বিশ্লেষিত বা বিচ্ছিন্ন হয় (দানা ফাটিয়া যায়), এইজন্য উহা অধিকতর সুপাচ্য।

মাংসাহারীদের দেহের গঠন, ওজন, বল ও সহশক্তি এবং সুষমা উদ্ভিজ্জভোজীদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। শেষোক্তদের প্রকৃতি সাধারণতঃ কোমল, মাংসাহারীদের হিংস্র।

"দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ফলমূলভোজী গিবন, লিমুর, সিম্পাজ, ওরেংওটাং ও গরিলা বা বনমানুষ জাতীয় জন্তু, যাহারা মনুষ্যতুল্য জীব এবং যাহাদের কেহ কেহ মানুষের আদি পুরুষ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা বিশালকায় ও অতি বলবান। সিংহ গরিলাকে দেখিলে ভয়ে পলাইয়া যায়। একটী গরিলার ওজন তিনজন বলিষ্ঠ মানুষের ওজনের সমান। পরীক্ষায় উহার রক্তে বা পাকস্থলীতে কোন প্রকার দূষিত পদার্থ বা বীজাণু পাওয়া যায় নাই।"

মাংসাহারে রিপু বা পাশবিক প্রবৃত্তি যত উত্তেজিত হয় নিরামিষ খাদ্যে তত হয় না। মাংস নানা কারণে গ্রীষ্ম প্রধান দেশবাসীর উপযুক্ত আহার নয়। একজন হিসাব করিয়াছেন পৃথিবীর জনসংখ্যা ২০০ কোটী তাহার মধ্যে ৬০ কোটী মাংসভোজী। ইহাঁরা সাধারণতঃ বরফান বা শীত প্রধান দেশের বাসিন্দা। শেষোক্ত কোন কোন দেশে মাছ মাংস ভিন্ন অন্য খাদ্য পাওয়া যায় না সুতরাং সেখানকার লোকে উহা না খাইলে দেহ রক্ষা হয় না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দেহাভ্যন্তরে তাপ সমধিক সঞ্চিত হয় কিন্তু শীতপ্রধান দেশে দেহমধ্যস্থ তাপ বিকিরিত হয় বলিয়া ঐ প্রকার খাদ্য না খাইলে যথেষ্ঠ পরিমাণ তাপ সঞ্চিত হয় না।

বৈদ্যনাথধামের মহাপুরুষ বালানন্দ ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন—

"আপত্তি বিপত্তি কো বিচমে কুছ বিচার নেহি হ্যায়; আপত্তি কালে মর্য্যাদা নাস্তি। প্রাণধারণকা ওয়াস্তে মাংস খানে হোতা। পুরাণমে যে, মাংস খানেকা বাত উল্লেখ হ্যায় উয়ো ঐসি প্রকার হ্যায়।"

অতএব উহা ব্যতিক্রম হিসাবে অবস্থা বিশেষে ব্যবহার্য্য। সাধারণ নিয়ম বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

একজন ইংরাজ পুষ্টিতত্ত্ববিদ তিব্বত দেশে গিয়া সেখানকার লামা বা ধর্ম্মযাজকদিগের দৈনিক আহারের একটী তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন—

চাল	১৮ হইতে	২২ আউন্স
মাংস	১৪ "	২৮ "
তরকারি	৬ "	১০ "
ছাতু	৬ "	৮ "
মদ	১ হইতে	২ পাঁইট

অবস্থাভেদে ধর্ম্মের অনুশাসন শিথিল হয়।

বিচারের মানদণ্ডে মাংসের গুণ ও অগুণ, উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা ওজন করিলে দোষের পাল্লা অনেক নীচে নামিয়া যায়। উহা যে অপ্রাকৃতিক আহার বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীগণের পক্ষে অযোগ্য তাহা সুনিশ্চয়। অধিকাংশ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আহারতত্ত্ববিদ ও মনীষীগণ একবাক্যে মাংস ভোজন অহিতকর বলিয়াছেন সুতরাং তাদের মতই প্রবল ও গ্রাহ্য।

"সৃষ্টিবিধান, পুষ্টিবিজ্ঞান, ইষ্টাপূর্ত্তিবাদ, কল্যাণবাদ, নীতিবাদ, আধ্যাত্মিকবাদ সর্ব্বোপরি মানবত্ববাদের দিক দিয়া দেখিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে মাংসাহার মানবের সাধারণতঃ উপযোগী নয়।" কিন্তু মাংস এত প্রিয় আহার যে তাহা বর্জ্জন করা সুকঠিন, তাই মনে হয় হয়ত বৃথা অরণ্যে রোদন করিলাম।

সপ্তদশ অধ্যায়।

আহার বিভ্রাট।

(অহিত আহার)

অহিত আহার চার প্রকার। (১) অহিতকর দ্রব্য আহার। (২) হিতাহার অবিধিপূর্ব্বক প্রস্তুত ও সেবন। (৩) অত্যাহার এবং (৪) অতি অল্প আহার।

(১) অহিতকর দ্রব্য আহার।

আয়ুর্ব্বেদ মতে অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীব্র, রুক্ষ ও বিদাহী প্রভৃতি রাজসিক আহার এবং শীতল, নীরস, বাসি, উচ্ছিষ্ট, গলিত বা পচা ফল, তরকারি ও অন্য অখাদ্য বা কুখাদ্যাদি তামসিক আহার, ঐ শ্রেণীভুক্ত।

রসুন ও পিঁয়াজ, গাজর, পাতাল কোঁড় (Mushroom) ও বৃথা-মাংস এবং বৈষ্ণবদের পক্ষে বেগুণ অখাদ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অপরাপর অহিতকর খাদ্য অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে।

(২) হিতখাদ্য অবিধিপূর্ব্বক প্রস্তুত ও সেবন।

হিতকর খাদ্য অক্ষুধায় গ্রহণ কিম্বা উপযুক্তভাবে চর্ব্বণ না করিয়া গলাধিকরণ, মিশ্রাহার এবং বিরুদ্ধভোজন এই শ্রেণীভুক্ত। এ সকল বিষয় পূর্ব্বে অল্লাধিক আলোচিত হইয়াছে। আহারবিধি ও রন্ধন-শিল্পাধ্যায় দ্রষ্টব্য। মিশ্রাহার বা বিরুদ্ধভোজন সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলিবার আছে। বহুকাল পূর্ব্বে প্লুটার্চ লিখিয়াছিলেন—

All species of the lower animals according to their kind feed upon one sort of food which is proper to their nature (which they know by instinct), some upon grass, some roots and other fruits—neither do they mix the kinds of their nourishment. But man such is his voracity falls upon all to supply the pleasure of his appetite, tries all things, tastes all things, and as if he were yet to see what were the more proper diet and most agreeable to his nature, among all animals, is the only all-devourer.

নিম্নশ্রেণীর সর্ব্ববিধ জন্তুগণ নিজ নিজ জাতীয়তা হিসাবে, মাত্র একপ্রকার খাদ্য যাহা তাহাদের স্বভাবানুযায়ী বা আত্মানুকুল এবং যাহা তাহাদের সহজাত-জ্ঞান প্রভাবে উপলব্ধি হয় তাহা গ্রহণ করে। কোন জাতি ঘাস, কোন জাতি উদ্ভিজ্জ বা মূল, কাহারাও বা ফল খাইয়া জীবন ধারণ করে। তাহারা বিভিন্ন পুষ্টিকর খাদ্য মিশ্রিত করিয়া খায় না। কিন্তু মানুষের ঔদরিকতা এতই প্রবল যে তাহার ভোজন-সুখ-স্পৃহা মিটাইতে সকলপ্রকার আহার্য্য (কি উদ্ভিজ্জ কি প্রাণীজ) সেবনোপযোগী মনে করিয়া আস্বাদন করে যেন কি যে তাহার অধিকতর উপযোগী প্রকৃত আহার্য্য তাহা আবিষ্কার করিতে চায়। সকল জীবের মধ্যে কেবল মানুষই সর্ব্বভূক।

তাই মানুষ সদাই কি খাই কি খাই করে এবং নানা অখাদ্য ও কুখাদ্য গ্রহণে প্ররোচিত হইয়া অতৃপ্তির দাবানলে পুড়িয়া মরে। ভোগের সীমা নাই, শেষ নাই, উদরের ভিতর মহাশ্মশান। ইহা ক্ষুধার মহা অপমান।

মিশ্রাহার।

দুই বা ততোধিক বিভিন্ন জাতীয় আহার্য্যের মিশ্রণকে মিশ্রাহার বলে। আয়ুর্ব্বেদে ইহাকে সর্ব্বগ্রহ এবং প্রত্যেক দ্রব্য পৃথক পৃথক ভোজন করাকে পরিগ্রহ বলে।

কোন কোন দ্রব্য যাহা পূর্ণ খাদ্য বলিয়া অভিহিত হয় যথা, দুধ, ফল ইত্যাদি, অন্য খাদ্যের সহিত মিশ্রিত না করিয়া খাইলে জীবন রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু ঐগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুলভ বা সহজ প্রাপ্য নয় এবং যথেষ্ট পরিমাণেও উৎপন্ন হয় না। এই জন্য অধিকাংশ লোকে তরকারি প্রভৃতি অন্য আহার্য্য হইতে শরীর পোষণোপযোগী বিভিন্ন জাতীয় উপাদানগুলি সংগ্রহ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং মিশ্রাহার অনিবার্য্য।

খিচুড়ী, ফলার ও ব্যঞ্জনাদির উপাদানগুলি যদি রস, বীর্য্য বা সংযোগ বিরুদ্ধ না হয় বিশেষতঃ উহাতে যদি অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষিত হয় তাহাতে সাধারণতঃ বিশেষ অপকার হয় না। আমাদের দেশে ব্যঞ্জনে তরিতরকারির অতিরিক্ত মিশ্রণ করা হয় এবং অনেক ব্যঞ্জনে অযথা লঙ্কা ও মিষ্ট যোগ করা হয়। অন্য কোন দেশে তরকারির এত অধিক মিশ্রণে জগা খিচুড়ি (Hodge podge) প্রস্তুত হয় না। ইহাতে অন্য দোষ ব্যতীত এক এক প্রকার তরকারির নিজস্ব স্বাদ থাকে না।

আমাদের বিবিধ ব্যঞ্জনের বিভিন্ন স্বাদ বা পার্থক্য প্রধানতঃ ভিন্ন ভিন্ন মসলার দ্বারা সংঘটিত হয়। রকমারি মিশ্রিত ব্যঞ্জন গ্রহণে এক ঘেয়ে ভাব ঘোচে বটে কিন্তু মোটের উপর উহা স্বাস্থ্যজনক হয় না কারণ উহাতে বীর্য্যবিরুদ্ধ, সংযোগবিরুদ্ধ বা গুণবিরুদ্ধ দোষ জন্মিবার প্রবল সম্ভাবনা।

এক বার লাহোরে একটী পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের গৃহে অতিথি হই। একদিন কড়াইশুঁটি খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় এক ডিস কেবল মাত্র কড়াইশুঁটির ব্যঞ্জন স্বতন্ত্র পরিবেশিত হইয়াছিল। গৃহস্বামী বলিয়া ছিলেন তাঁহাদের দেশে ঐ প্রথা প্রচলিত আছে। যদি তাঁহাদের শাক বা ঢেঁড়স খাইবার ইচ্ছা হয় কেবল শাক বা ঢেঁড়সের তরকারি প্রস্তুত হয়।

আর একবার চন্দ্রনাথ তীর্থে গিয়া সেখানকার একজন পাণ্ডার গৃহে আহার গ্রহণ করিয়াছিলাম। ভাতের পর ডাল আসিল কিন্তু ভাজি বা অন্য তরকারি আসে নাই বলিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। পাণ্ডা আসিলে উহাদের অভাব জ্ঞাপন করিলাম। সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "ডালই ত ভাতের একটী প্রধান তরকারি।" উহা মন্দ ব্যবস্থা নয়। আমাদের দেশে অত্যধিক মিশ্রাহারে রসনা পরিতৃপ্ত হইলেও সময় সময় উদর মহাশয় বড় ব্যতিব্যস্ত বা ব্যথিত হন।

আধুনিক মতে অযথা আহার মিশ্রণে বিরুদ্ধ ভোজনাদি দোষ ব্যতীত অন্য একটী বিশিষ্ট দোষ জন্মে, ইহাকে পরিপাকবিভ্রাট বলা যাইতে পারে।

প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাঃ রডক তাঁহার চিকিৎসা পুস্তকে লিখিয়াছেন, বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য পরিপাকের জন্য বিভিন্ন প্রকার পাচক রস বিভিন্ন পাকযন্ত্র হইতে ক্ষরিত বা নিঃসৃত হয়। সেইজন্য মিশ্রখাদ্যের পরিপাকক্রিয়া জটিলভাবে সম্পন্ন হয়। যখনই অধিকাংশ মিশ্রখাদ্য পরিপাক হয় তখনই সবটুকু অন্ত্রে প্রবিষ্ট হয়। যে সব খাদ্যের প্রাথমিক পরিপাক ক্রিয়া মুখে ও পাকাশয়ে উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না তাহাও অন্ত্রে প্রবেশ করিয়া উদরাধ্মান, অম্ল ও অজীর্ণাদি রোগ সৃষ্টি করে।

রুটি বা চাপাটি, লুচি, আলু, চিনি, মিষ্টান্ন এবং শ্বেতসারবহুল খাদ্যগুলি ক্ষার রসে জীর্ণ হয়। মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি প্রাণীজ আমিষ খাদ্য অম্লধর্ম্মী হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে পরিপাক হয়।

অন্য কয়েক জন আধুনিক ইংরাজ পুষ্টিতত্ত্ববিদগণের মতে শ্বেতসার ও আমিষ জাতীয় খাদ্য একত্র সেবন করিলে উহা বিরুদ্ধভোজন পর্য্যায়ে পড়ে, সেইজন্য ঐগুলি পৃথকভাবে গ্রহণ করা উচিত। কারণ তাহাহইলে এক এক প্রকার পাচক রস দ্বারা এক এক প্রকার খাদ্য পরিপাক হইতে পারে এবং বিভিন্নধর্ম্মী পাচক রসগুলিকে একযোগে ক্রিয়া করিতে সুযোগ দেওয়া হয় না।

আবার ডাক্তার মেন্‌কেল বলিয়াছেন, বিভিন্ন প্রকার শ্বেতসার খাদ্য বিভিন্নধর্ম্মী। তাহাদের সংযোগও বাঞ্ছনীয় নয়। উক্ত এক প্রকার খাদ্য গ্রহণে পরিপাকক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে।

অপর এক জনের মতে ভাত, রুটি ও শর্করাবহুল খাদ্যের সহিত অম্লরসাত্মক ফলাদি সেবন অহিতকর। যে পাচক রস সমূহ দ্বারা আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয় (হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইত্যাদি) তাহার দ্বারা শ্বেতসার জীর্ণ হয় না। আবার শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য আমিষজীর্ণক পাকাশয়িক রসে জীর্ণ হয় না। কোন্ খাদ্য কোন্ পাচকরস দ্বারা জীর্ণ হয় তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

শ্বেতসার জীর্ণক—মুখের লালা এবং ক্লোম রস (Pancreative Juice), তবে শ্বেতসার পরিপাকের শেষ পরিণতি অন্ত্রের পাচকরস সাহায্যে হয়। সর্ব্বপ্রকার শর্করা ও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য পরিণামে দ্রাক্ষা শর্করায় পরিণত হইয়া যকৃতের সাহায্যে রক্তে গৃহীত হয়।

স্নেহ জীর্ণক—আমাশয়ের পাচক রস ও ক্লোম রস।

প্রোটিন জীর্ণক—আমাশয়ের পাচকরস, ক্লোমরস এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের বিবিধ জীর্ণকর রস।

কোন্ খাদ্য পরিপাক করিতে কত সময় লাগে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। ইহা চাক্ষুস পরীক্ষায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অ্যালেক্সিস সেণ্ট মার্টিন নামক একজন ক্যানাডাবাসীর কোন কারণে দেহের এক পার্শ্ব হইতে অভ্যন্তরে পাকাশয় অবধি একটী বৃহৎ ছিদ্র হয় এবং উহার চারিদিকে ক্রমে কিছু মাংস গজায় কিন্তু কতক অংশ খোলা থাকে। প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় বিভিন্ন আহার্য্য দ্রব্য পরিপাক হইতে কত সময় লাগে তাহা নোট করিবার সুবিধা হইয়াছিল।

এই সঙ্গে আমাদের দেশের প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যের পরিপাকের সময় যাহা অন্য ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে জানিয়াছেন তাহাও দেওয়া হইল।

অন্ন	ঘণ্টা	ফল	ঘণ্টা
ভাত	১	আম	২
দাদখানি চালের ভাত বা মণ্ড	১	কাঁটাল	৩
পাতলা রুটি	২½	আপেল	১½
পাঁউরুটি	৩½	আনারস	২
খই	১½	ঝুনা নারিকেল	৩
খইয়ের মণ্ড	১	বেল	২
মুড়ি	১½	তরমুজ, কলা ও আতা	১¾
চিঁড়া ও যবের মণ্ড	১—২	ডালিম	১
যবের ছাতু	৩	ফুটি	১½
সাগু, বার্লি ও এরারুট	১—২	পেস্তা ও বাদাম	৪
ডাল	৩—৪	মনাক্কা ও কিসমিস	২½

অন্ন	ঘণ্টা	মিশ্রিত	ঘণ্টা
মুগের যুস	১	মিছরি ও বাতাসা	২
খিচুড়ী	৩—৪	গুড়, সন্দেশ ও চিনি	৩
পায়েস	২—৩	লুচি ও কচুরি	৩
পোলাও	৫	অন্য মিঠাই	৩
তরকারি		**আমিষ**	
গোলআলু, ফুলকপি ও বাঁধাকপি	৩½	ডিম কাঁচা	২½
		ঐ অর্দ্ধ সিদ্ধ	১½
খোসাসহ আলু পোড়া	২½	ঐ রোষ্ট	২¼
সাদা বা মিষ্ট আলু	৩৷০	ঐ সুসিদ্ধ	৩½
কাঁচকলা, পটোল ও বেগুন	২½	দুধ জ্বাল দেওয়া	২
সিম, মূলা ও গাজর	৩	ঐ কাঁচা	২৷০
কুমড়া	২৷০	মাছ সিদ্ধ	২৷০
কাঁচা ছোলা, মটর	২¾	রুই, ইলিস ও চিংড়ী	৩
মক্কা	৩	মাগুর, খলসে ও ছোট মাছ	২
ক্যারট	৩¼	ছাগ, মেষ ও হরিণ মাংস	৩
বিট	৩¾	ঐ ভাজা, চপ ও কাটলেট	৪
কাঁচা বাঁধাকপি ভিনিগার সহ	২		

এই তালিকা মতে পোলাও, পায়েস, খিচুড়ী, মাংসের চপ, কাটলেট কপি, আলু, বিট পালম, ডাল, পাঁউরুটি, লুচি, কচুরি ও অধিক সিদ্ধ ডিম সর্ব্বাধিক দুষ্পাচ্য। ভাত, খই, মুড়ী, সাগু, বার্লি, এরারুট, কাঁচা বাঁধাকপি, আপেল ও মুগের যুস ইত্যাদি অতি সহজপাচ্য। সুখাদ্য বা হিতকর খাদ্য নির্ব্বাচনে এই তালিকা বিশেষ সহায়তা করিবে।

বিরুদ্ধ ভোজন।

বিরুদ্ধভোজন মিশ্রাহারের কুফল। চরক বলিয়াছেন বিবিধ আহার্য্য দ্রব্যের মিশ্রণে কতকগুলি পরস্পর গুণবিরুদ্ধ, কতকগুলি সংযোগ ও সংস্কার বিরুদ্ধ, কতকগুলি স্বভাববিরুদ্ধ আবার অন্য কতকগুলি দেশ, কাল ও পাত্রবিরুদ্ধ হয় বলিয়া দেহস্থ ধাতু, রস ও বাতাদি দূষিত হয়। বিরুদ্ধভোজনশীল ও অজীর্ণের উপর আহারশীল ব্যক্তির পরিণামে আমদোষ জন্মে—উহা বিষের ন্যায় কার্য্যকর।

মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন—বিরুদ্ধ ভোজনে শরীরের ধাতু সমূহ দূষিত হইয়া ক্লীবত্ব, অন্ধত্ব, বিসর্গ, জলোদরী, বিস্ফোটক, উন্মাদ, ভগন্দর, মূর্চ্ছা, মত্ততা, আধ্মান, গলগহ, পাণ্ডু; আমবাত, গ্রহণী, শোথ, অম্লপিত্ত, জ্বর প্রভৃতি দোষ বা রোগ এমনকি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। অতএব সকলের এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য।

সাধারণতঃ যে খাদ্যের সহিত যে খাদ্যের সংযোগ, রস বা বীর্য্য-বিরুদ্ধ তাহা নিম্নে উক্ত হইল।

কাঁসারপাত্রে ডাব নারিকেলের জল পান। তাঁবার পাত্রে দুধ, মধু চিনি বা গুড় সেবন। কাঁসা ও পিতল পাত্রে অম্ল ভোজন। লৌহ পাত্রে দুগ্ধ পান।

জলের সহিত বা জল পানের পরে কুল বা পাকা কলা সেবন। দুগ্ধের সহিত বা উহা সেবনের অব্যবহিত পরেই লবণ, মূলা, রসুন, সাজনা শাক, মৎস্য, মাংস বা মেটুলি, সর্ব্বপ্রকার অম্ল ফল বা খাদ্য ও কুলত্থ কলাই, দধি বা ক্ষীর, ছাতু, পাকা মাদার, কেওড়া, গাব, আখরোট, ডালিম, কাঁটাল, নারিকেল শস্য ইত্যাদি ভক্ষণ।

দধির সহিত উষ্ণ দ্রব্য, মধু, ফল, কলা, তাল ও ঠাণ্ডা ভাত। ঘোলের সহিত কমলাগুঁড়ি।

ঘৃতের সহিত মধু, গুড়, তেল বা চর্ব্বি। মাখনের সহিত শাক। ঘৃত, দুগ্ধ ও মধু সমভাগে মিলিত করিয়া সেবন।

দুধ ক্ষীর বা ছানার সহিত মৎস্য ও মাংস। মধুর সহিত পদ্মবীজ, অঙ্কুরিত শস্য, মদ ও মাংস। ঘৃত বা সরিষার তেলে প্রস্তুত ছানার ডালনা বা কালিয়া। গুড়ের সহিত মৎস্য ও মাষকলাই।

পুরাতন চাল বা ডালের সহিত নূতন ঐ দ্রব্য। গরম ভাতের সহিত বাসি গরম করা ব্যঞ্জন। কলাইয়ের ডালের সহিত লাউ। পুঁই শাক ও তিল বাটা। মাস কলাই ও মূলা। ঝাল ও অম্ল। পরমান্নের সহিত খিচুড়ী। মৎস্য, মাংস এবং দধির মাথ। জলে গোলা ছাতু। খিচুড়ীর সহিত বা পরে ক্ষীর বা পায়েস।

ঘৃতে মৎস্য ভর্জ্জন। তৈলে রন্ধিত মাংস বিশেষতঃ পায়রার মাংস। বিভিন্ন জাতীয় মাংস একত্রে রন্ধন। মাংসের সহিত মাসকলাই, মধু, গুড়, চিনি, অঙ্কুরিত শস্য, মৃণাল ও মূলা। পিঁয়াজ ও ডিম। মাছ মাংসের সহিত অম্ল সেবন বিরুদ্ধভোজন নয়।

আহারের পর চা পান বিশেষতঃ অম্লধর্ম্মী চা পানের পূর্ব্বে বা পরে মাছ, মাংস ও ডিম্বাদি বিরুদ্ধ ভোজন এবং অতি অনিষ্টকর।

'স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহ'

আহার সম্বন্ধে এই কথা আমাদের বেশ খাটে। আমরা স্বদেশী সহজলভ্য সুলভ খাদ্য ত্যাগ করিয়া মাংসাদি বিদেশী খাদ্য গ্রহণে নিজ ধর্ম্ম অর্থাৎ আমাদের উপযুক্ত আহার পরিত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছাদির আহারে অভ্যস্ত হইতেছি এবং গীতার উপরোক্ত নিষেধ বাক্য পদে পদে প্রত্যাহার এবং স্বাস্থ্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছি।

মিশ্রাহারের দোষ গুণ বিচার করিলে অনেক ক্ষেত্রে দোষের আশঙ্কা প্রবল। কিন্তু কার্য্যতঃ শাস্ত্র বা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্মত আহার বিধি

অনুসারে রসাদি বিচার করিয়া ও নানা মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া উপযুক্ত খাদ্য নির্ব্বাচন ও নিক্তির ওজনে উহার মিশ্রণ অসম্ভব।

আহার্য্যদ্রব্য ও উহাদের রস একার্থক সুতরাং মিশ্র আহারের দোষগুণ ভুক্তদ্রব্যের রসের বিপাক বা পরিণতির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। মোটামুটী ৬টী রস পর পর কিরূপ সেবন করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে শাস্ত্র নির্দ্দেশিত বিধি পালন করিলে মিশ্রাহারের দোষ অনেকাংশে নিবারিত হইতে পারে। রস বিজ্ঞান অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মহর্ষি চরক বলিয়াছেন দুই বা ততোধিক রস মিশ্রণে যে রস অধিক হয় তাহা অন্য রসের প্রভাব অতিক্রম করিয়া নিজ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করে। শুধু এই কথা মনে রাখিলে অতি সহজেই ক্ষার ও অম্লবহুল খাদ্যের সমতা রক্ষা করা যাইতে পারা যায়। মোট কথা কোন প্রকার মিশ্র ভোজনে যদি অম্ল উদ্গারাদি অনিষ্টকর উপসর্গ উপস্থিত না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহা অহিতকর নয়। ইহাই মিশ্রাহার বিভ্রাটের সহজ ও সরল সমাধান।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অমিত আহার।

এবারনেথি (Abernethy) বলিয়াছেন—আমি তোমাকে অকপট ভাবে বলিতেছি যে আমার বিবেচনায় মানবজাতির জড়িত বা জটিল ব্যাধির কারণ, উৎকট পেটুকতা বা আকণ্ঠ আহার প্রবৃত্তি যদ্দারা তাহাদের পরিপাকযন্ত্র অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া স্নায়বিক অবসন্নতা বা প্রদাহ উৎপন্ন হয়। তাহাদের (বিকৃত) মনের অবস্থা বা প্রবৃত্তি অন্যতম প্রধান কারণ। যাহা অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে বিচলিত বা চঞ্চলিত হইলে এবং রিপু বিশেষতঃ অনিষ্টপ্রবর্ণ রিপু ও সাংসারিক দুশ্চিন্তা মনে প্রভাব বিস্তার করিলে, মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীলতা বিশৃঙ্খলিত হয় তজ্জন্য আমাদের অনেক অনিষ্ট সাধিত হয়।

মনু বলিয়াছেন, অতিভোজন অনুচিত কারণ উহা অজীর্ণ ও জ্বরাদি রোগের নিদান, অল্পায়ুর কারণ, ধর্ম্মকর্ম্মের প্রতিবন্ধক, দুর্ভাগ্য ও দরিদ্রতার লক্ষণ এবং তিরস্কারযোগ্য। চরক বলিয়াছেন, অত্যাহারে ত্রিদোষ কুপিত হয়। অপর একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারের মতে অতি ভোজনশীল ব্যক্তির আম কুপিত বা দূষিত হয়, শরীরে অত্যধিক মেদ জন্মে তজ্জন্য নানা দোষ বা রোগ উদ্ভূত হয়। এই আমদোষকে আম বিষ বলিয়া উক্ত হয়। বিষের ন্যায় উহা অতিমারক ও বিরুদ্ধচিকিৎস্য সুতরাং অসাধ্য।

কলহ, চুলকানি, মৈথুন ও নিদ্রার ন্যায় আহারের যত সেবা হইবে ততই উহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে। পেট ভোরে আকণ্ঠ আহার উদরপরায়ণতার চরম। অত আহার জীর্ণ করিবার পাচকরস অনেকেরই নাই। ভোজগৃহের কর্ম্মকর্ত্তা অনেকস্থলে নিমন্ত্রিতদের

বলিয়া থাকেন "মশায় পেটটা ভরেছে ত।" ইহার জন্ত যেন ে বড়ই চিন্তিত হন। কিন্তু অত্যাহারের কি কষ্ট তাহা প্রায়ই ভু যান। সুতরাং উক্তরূপ শুষ্ক আদর বা আপ্যায়ন বিড়ম্বনা মাত্র।

ইংরাজগণ যাহাদের অনেক বিষয় আমরা অনুকরণ করি তাহ যাহার যতটুকু যে প্রকার খাদ্যে অভিরুচি তাহা গ্রহণ করে।

লোভই অত্যাহারের মূল, উহাতে স্নায়ুশক্তি অত্যধিক উত্তে ও ব্যয়িত হয়। স্নায়ুই প্রাণশক্তির প্রধান পরিচালক। "আত্মরক্ষণ ক্ষয়পূরক ও রোগপ্রতিষেধক প্রাকৃতিক জীবনীশক্তি আহারজ নানাবিধ দোষের প্রকোপ অনেক সহ্য করে কিন্তু যখন তাহার স সীমা অতিক্রান্ত হয় তখন জীবনীশক্তি বিপর্য্যস্ত হয়।" ফলে রোগ ডাকিয়া বসে এবং পরমায়ু ক্ষয় হয়।

পাকস্থলীর স্নায়ুমণ্ডল সর্ব্বাধিক আক্রান্ত হয় বলিয়া উদরকে স রোগের জননী বলিয়া অভিহিত করা হয়। যারা "খেটে খেটে ম বলে তাহারা মরে না। পাকযন্ত্রের অত্যধিক চালনা বড় কম খা নয়, উহাতেই অনেক বেশী লোক মরে। একথা অবধানযোগ্য আহারের পরিমাণ পাচকশক্তি সাপেক্ষ। সহ্যমত মিত আহারে অ পুষ্টিলাভ হয়। সাধারণতঃ লোকে না খাইয়া যত মরে তার ঢের ে খেয়ে মরে।

"Satiety has killed far more than *famine.*" বেশী খাবি কম খা, কম খাবিত বেশী খা" এই প্রবাদ বাক্যটী হাড়ে হাড়ে সত্য।

পেটুকতায় দরিদ্রতাও আনে। পরিতৃপ্ত আহার বা অ আহারের আর একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য দোষ, উহাতে ইন্দ্রিয়বৃ বিশেষতঃ কামপ্রবৃত্তি সমধিক উত্তেজিত হয়। একজন স্বাস্থ্যতত্ত্ব হাকিম বলিয়াছেন যদি কেহ এক বৎসর ধরিয়া ব্যঞ্জনহীন অন্ন অভ

পরিমাণের অর্দ্ধেক আহার করে তবে তাহার হৃদয় হইতে রমণীচিন্তা বিদুরিত হইবে।

"Gluttony leads to licentiousness." ঔদরিকতা লম্পটতার অগ্রদূত। কতকগুলি খাদ্য যথা, মদ্য, মাংস, মসলা, বেঙের ছাতা ইত্যাদি ঘোর কামোত্তেজক। অত্যাহারে নিদ্রাও প্রবল এবং স্বপ্নদোষ হয় যাহা এক প্রকার শাস্তি।

ইউষ্টেস মাইলস সাহেব (Eustace Miles) লিখিয়াছেন, অপর অপকার ব্যতীত অধিক আহারে জীবনের গতি বা ছন্দ বিপর্য্যস্ত হয়। তিনি দেখিয়াছেন যে সুনির্ব্বাচিত সহজপাচ্য খাদ্য মিত পরিমাণ সেবন করিয়া ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিলে যত অবসাদ আসে তাহা অপেক্ষা কুনির্ব্বাচিত বা অধিক আমিষবহুল আহার গ্রহণ করিলে মাত্র ১ ঘণ্টা পরিশ্রমে অনেক অধিক অবসন্ন ভাব আসে। কল যদি ময়লার দ্বারা ভারাক্রান্ত হয় তাহা চালাইতে অধিক সময় ও শক্তি প্রয়োজন। ঐরূপ অধিক দিন চলিলে উহা অকর্ম্মণ্য হয়। সেইরূপ দেহযন্ত্রও অমিত বা অহিতাহারে অধিক চালিত হইলে অনেক ময়লা জমে এবং ক্রমে বিপর্য্যস্ত হয়।

বৃদ্ধ ও দুর্ব্বলব্যক্তি একবারের আহার ৩।৪ বারে অন্ততঃ ৩ ঘণ্টা অন্তর গ্রহণে অনিষ্ট হয় না। দিনে ও রাতে বার বার ঘন ঘন আহার গ্রহণে মোট আহারের পরিমাণ অযথা বাড়িয়া যায়। ইহাও অমিত আহার পর্য্যায়ে পড়ে। অনেকে দিনে ও রাতে ৪।৫ বার রুটিন মত ঘড়ি ধরিয়া আহার গ্রহণ করে। বহু পাশ্চাত্য পুষ্টিতত্ত্ববিদগণের মতে দিনে দুইবার আহারই যথেষ্ঠ।

প্রমাণ স্বরূপ ডাক্তার এইচ সি মেন্‌কেল লিখিয়াছেন যে সাধারণতঃ একবারের আহার মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া পাকাশয় ও অন্ত্রে সম্পূর্ণভাবে জীর্ণ হইতে অন্ততঃ ১৪ ঘণ্টা সময় লাগে। যাহারা দুর্ব্বল বা রুগ্ন

তাহাদের ঐ সময়েরও অধিক লাগে। এইজন্য দিনে ও রাতে বড় জোর ২ বার আহার প্রাকৃতিক নিয়মে সঙ্গত। অর্দ্ধ পরিপাকগ্রস্ত খাদ্যের সহিত নূতন খাদ্যের মিলনে পরিপাক যন্ত্রাদির বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। উহাদের কতক সময়ের জন্য পূর্ণবিশ্রাম আবশ্যক। দুই বারের অধিক আহারে উহারা সতত চালিত হয়। বিশ্রাম, মেরামত এবং জীবনীশক্তির প্রধান কেন্দ্রগুলির পুনঃশক্তি লাভ কার্য্য স্থগিত থাকে. তজ্জন্য উহা বিকারগ্রস্ত, দুর্ব্বল বা পীড়িত হয় এবং রোগ প্রতিষেধক শক্তি থাকে না। এতদ্ব্যতীত অধিক খাদ্য আহরণ এবং পরিপাক ও আনুসঙ্গিক ক্রিয়াদির জন্য আর কিছু না হউক, সময়ের, অর্থের ও পরিপাক শক্তির অপচয় ঘটে।

দিন ভোর টুকটাক মুখ চার খাওয়া উপরোক্ত কারণে যে অনিষ্টকর তাহা সহজে অনুমিত হইবে। যদি তিনবার খাওয়া না হলে চলে না, তবে দুই প্রধান আহারের মাঝের আহারে ফল বা অরন্ধিত খাদ্য সেবন বিহিত। অনেক লোক দিনে ৪।৫ বার আহারের কুফলে রোগাক্রান্ত হইয়া দিনে দুই বার খাদ্য গ্রহণে রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। ইহার অনেক বিশ্বস্ত বিবরণ আছে।

শিশুদেরও অনেক সময় অত্যধিক আহার সেবন করান হয়। তাহারা যখনই কাঁদিয়া উঠে, কোন কোন প্রসূতি তাহাদিগকে ক্ষুধার্ত্ত মনে করিয়া বার বার দুধ খাওয়ায়। মাইপোষে খাওয়াইলে সাধারণতঃ অধিক দুগ্ধ সেবিত হয়। হয়ত তারা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বা অন্য কারণে কাঁদে। ইহা উপলব্ধি না করিয়া অধিক দুধ আহার করাইয়া তাহাদের ক্রন্দন এবং প্রসূতির নিদ্রার বিঘ্ন নিবারণ করিবার অভ্যাস অতি অনিষ্টকর।

আবার কাহারও সন্তানকে মোটা করিবার বাতিক আছে। কিন্তু তাহাকে 'কেঁদো বাঘ' করিলে যে তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে এ

ধারণাও ঠিক নয়। ইহাতে কোন কোন সময় কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণ সাধিত হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মেদ বৃদ্ধি একটী রোগ বিশেষ। শরীর যে পরিমাণে স্থূল হয় তাহা অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণে হৃৎপিণ্ড বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং স্থূলকায় হইলে একটু পরিশ্রমে লোক হাঁপাইয়া পড়ে, নানা রোগ জন্মে এবং মৃত্যু এগিয়ে আসে।

কোন কোন সন্তানের সারাদিন ক্ষুধা লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়। কিছু না কিছু বার বার তাহাদের খাইতে না দিলে তাহারা কাঁদিয়া অস্থির হয়। ইহাও অধিকাংশ স্থলে দুষ্ট ক্ষুধা বা রোগ বিশেষ অথবা কুঅভ্যাসের দরুণ হয়। বায়না করিলেই যে খাইতে দিতে হইবে তাহার মানে নাই।

কোন কোন লোক প্রচণ্ড পাচক শক্তিপ্রভাবে অত্যধিক এমন কি আধ মণ পর্য্যন্ত আহার গ্রহণ করিত শোনা গিয়াছে। কিন্তু এই সাময়িক আহার উল্লাস বা বিলাস, ব্যতিরেক হিসাবে গ্রহণযোগ্য। অনেক অমিতাহারী ব্যক্তি পরিণামে অতি ব্যায়ামীদের ন্যায় নানা রোগে ভুগিয়া অকালে মারা গিয়াছে তাহা জানা আছে। এ সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয়, প্রকৃতি অনেক সহ্য করে। স্বভাবতঃ বয়স্কের পাকস্থলির ভিতরে বড় জোর ৴১।০, ৴১৷৷০ মাত্র আহার গৃহীত হইতে পারে কিন্তু ক্রমাগত অত্যাহারে, রবারের থলির ন্যায় পাকস্থলীর চামড়ার আবরণ স্থিতিস্থাপকতা গুণে ১০।১৫ গুণ বাড়িয়া যায়।

অনশন বা অতি অল্পাহার।

আহারের অতি হীন মাত্রাও অহিতকর আহার পর্য্যায়ভুক্ত। শাস্ত্র মতে ইহাতে বল, বর্ণ, পুষ্টি ও পরমায়ু ক্ষয় হয়। ইহা অতৃপ্তি ও শ্রীভ্রষ্টকর, ওজঃ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির ক্ষতিকর এবং ৮০ প্রকার বায়ু রোগের কারণ এবং সর্ব্বদোষের বা রোগের আকর।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বাঙ্গালীর আহার বিভ্রাট।

বাঙ্গালীর আহার সম্বন্ধে কয়েক জন পাশ্চাত্য পুষ্টিতত্ত্ববিদ অনেক গবেষণা ও পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন যে আমিষ ও লবণ জাতীয় উপাদান ও খাদ্যপ্রাণের স্বল্পতা এবং শ্বেতসার বহুল খাদ্যের প্রাচুর্য্য বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহীনতার প্রধান কারণ।

পুনশ্চ শুধু যে বাঙ্গালীর দেহের উচ্চতা, বক্ষের বিস্তৃতি ও ওজন ইউরোপীয়দের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট তাহা নয়, তাহাদের আভ্যন্তরিক বিভিন্ন যন্ত্রের ওজনও অপেক্ষাকৃত অনেক কম। যথা—

	ইউরোপীয় পুরুষ	বঙ্গীয় পুরুষ
	আউন্স	আউন্স
মস্তিষ্ক	৪৯	৪৪
দক্ষিণ ফুসফুস	২৪	১৬
বাম „	২১	১৪॥০
হৃৎপিণ্ড	১১	৭॥০
যকৃৎ	৬০	৪৪

বাঙ্গালীদের প্লীহার ওজন অত্যধিক। ইউরোপীয়দের ৫ হইতে ৭ আউন্স, বাঙ্গালীদের ১০॥০ আউন্স। এ বিষয়ে আমাদের উৎকর্ষতা আছে জানিয়া হয়ত কিছু সান্ত্বনা লাভ করা যাইতে পারে।

অন্যান্য পরীক্ষায় প্রকাশিত হইয়াছে যে ভারতের বিভিন্ন দেশ-বাসীদের মধ্যে পাঞ্জাবীদের খাদ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, উহাতে সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক আমিষ ও খাদ্যপ্রাণ আছে। ইহার পর বেহার দেশবাসীদের খাদ্য। বাঙ্গালী ও উড়িষ্যা দেশবাসীদের খাদ্য সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

অন্য একটী পরীক্ষায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, বেহার দেশবাসীগণ বাঙ্গালীদের অপেক্ষা গড়ে শতকরা ২০ ভাগ অধিক আমিষবহুল খাদ্য (ডাল, ঘৃত, ক্ষীর ইত্যাদি) গ্রহণ করে সেইজন্য তাহাদের স্বাস্থ্য বাঙ্গালীদের অপেক্ষা সমধিক উন্নত। তাহারা অধিক সজীব, তেজস্বী, ভারবহনক্ষম, ক্ষিপ্রকর্ম্মা ইত্যাদি।

ডাক্তার যে, নিল, রিচ সাহেব তাঁহার গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীর খাদ্যতত্ত্ব পুস্তকে (Dietetics in warm climates) লিখিয়াছেন, বাঙ্গালীদের খাদ্যে যে আমিষ জাতীয় উপাদান থাকে তাহা বিলাত-বাসীদের ঐ উপাদান অপেক্ষা গড়পড়তায় শতকরা ৭০ ভাগ কম! এই কারণেই তাহাদের দেহের স্বাস্থ্য ও ওজন শোচনীয়। তিনি আরও বলিয়াছেন, বাঙ্গলাদেশের মাত্র ৫০ মাইল উত্তরে ভুটিয়া, নেপালি প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি অধিক পরিমাণে মাংসাদি আমিষ প্রধান খাদ্য গ্রহণ করে বলিয়া তাহারা সমধিক তেজস্বী (এক একজন ২।৩ মণ ভার লইয়া পাহাড়ে উঠিতে পারে), তাহাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কত স্ফূর্ত্ত ও আমুদে, তাহাদের প্রাণ কত হালকা, সর্ব্বদা মুখে হাঁসি লাগিয়া আছে এবং খেলা, নাচ ও গানে কত আনন্দে (প্রায় ইউরোপীয়দের ন্যায়) জীবনযাপন করে। ইহা বাঙ্গালা দেশে একান্ত অভাব।

পুষ্টিবিজ্ঞানবিদ সার রবার্ট ম্যাকক্যারিসন একটী বিশিষ্ট পরীক্ষার ফলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে দেহের উৎকর্ষতার প্রধান কারণ উপযুক্ত আহার—মানুষ তাহাই যাহা সে খায়। "Man is what he eats". তিনি এক পিতামাতার সন্তান পাঁচটী ক্ষুদ্রজাতীয় শ্বেত মূষিককে যথাক্রমে এক এক দেশের লোকের অভ্যস্ত আহার সেবন করাইয়া

দেখিয়াছেন, যে ইঁদুরকে ফরাসী জাতীয় আহার সেবন করান হইয়াছিল তাহার বৃদ্ধি বেশী হয় নাই কিন্তু তাহার লোম তৈলাক্ত হইয়াছিল। যে ইঁদুরকে জাপানী খাদ্য যথা, মাজা চালের ভাত, মাছ, এবং মধ্যে মধ্যে একটী কাঁকড়া দেওয়া হইয়াছিল, যদিও সে খর্ব্বকায় হইয়াছিল তথাপি তাহাকে অধিক উদ্যমশীল, ব্যস্ত ও দ্রুতগমনশীল দেখা গিয়াছিল।

মাদ্রাসি জাতির খাদ্যে পুষ্ট ইঁদুরটি ঐ দেশীয় খাদ্য যথা, ভাত, লঙ্কা, তেঁতুল, শুকনা মাছ এবং ভাত ভিজান জল (আমানি) খাইয়া যদিও তাহার দেহের ওজন অধিক বর্দ্ধিত হয় নাই কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল ছিল। পাঠান খাদ্যে পুষ্ট ইঁদুরটী পাঠান দেশের খাদ্য যথা, টক দই, কিছু মাংস, লাল আটার রুটি, আলু ও প্রচুর তরকারি খাইয়া বৃহদাকার, কোমল ও মসৃণ লোম যুক্ত হইয়াছিল এবং গোলমাল সত্ত্বেও স্থির বা অচঞ্চল থাকিত। অন্য একটী ইংরাজদের আহার, সাদা পাঁউরুটি, চা, সিদ্ধ মাংস, মাছ ও তরিতরকারি খাইয়া অপর ইঁদুরগুলি অপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছিল। আর একজন পরীক্ষক একটী ইঁদুরকে বাঙ্গালীর আহার গ্রহণ করাইয়া স্বাস্থ্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্গতি হইতে দেখিয়াছেন।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কতক পরস্পর বিরোধী এবং কতকগুলির সত্যতা সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ আছে। সবগুলি একপার্শ্বিক বিচারফল তাহা পরোক্ত মন্তব্যগুলি হইতে প্রতীয়মান হইবে।

প্রথমতঃ ডাক্তার লিচ্ সাহেব তাঁহার উক্ত পুস্তকের অন্য একস্থানে পরপৃষ্ঠায় লিখিত সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন যদ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত আনুমানিক উপপত্তি যথা উপযুক্ত পরিমাণ আমিষ আহার অভাবে বাঙ্গালীদের স্বাস্থ্যের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহা খণ্ডিত হইয়াছে।

"আধুনিক গবেষণার ফলে ইহা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইতে পারে যে গ্রীষ্মমণ্ডলে আমিষজাতীয় খাদ্যের উত্তেজক ক্রিয়া কিম্বা স্নেহ বা চর্বিজাতীয় অর্থাৎ অধিক উত্তাপজনক খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা নাই। কারণ সেখানে রবিকর প্রখর বলিয়া দেহ মধ্যে যথেষ্ট পাচকাগ্নি খাদ্য পরিপাকার্থে সঞ্চিত হয়। এই অবস্থায় গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শ্রমিকদের পক্ষে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি (ও পুষ্টি) প্রদান করে এবং চাউল হইতে যাহা তাহারা প্রাপ্ত হয় তাহা সর্ব্বোত্তম সুলভ হিতকর আহার।"

অন্য একজন পরীক্ষক ইঁদুরের ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর অধিক আমিষাহারের প্রভাব দীর্ঘকাল লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যদিও উহাতে দেহের দ্রুত বাড় বৃদ্ধি হয় কিন্তু পরমায়ুশক্তি হ্রাস হয়।

মানবদেহের পরিপোষণ ক্রিয়া ও জীবনযাত্রা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিন্নতা, বংশগত অনিষ্টকর প্রভাব, অসুস্থতা প্রভৃতি বহু কারণে তাহাদের স্বাস্থ্য প্রভাবিত হয়। সুতরাং সুস্থদেহ মূষিকের উপর পরীক্ষার ফল মানুষের পক্ষে প্রয়োজ্য হইতে পারে না। ইহা একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ স্বীকার করিয়াছেন।

যদি উচ্চতা বা দেহের দৈর্ঘ্য, স্বাস্থ্য, বিক্রম ও বলের মাপকাটি হয় তবে অধিক আমিষাহারী দুর্দ্ধর্ষ ও সমরনিপুণ গুরখা জাতি যাহারা বল, বিক্রম ও সাহসে ইউরোপ দেশবাসী অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয় তাহারা খর্ব্বকায় কেন? বাঙ্গালীদের ন্যায় ভাত মাছ ভোজী ক্ষুদ্রকায় জাপানী সৈনিকগণ ইউরোপীয়দের অপেক্ষা হীন বল নয়।

যদি স্বাস্থ্য কেবলমাত্র উপযুক্ত আহার গ্রহণের উপর নির্ভর করে তাহা হইলে ভোজপুরী পালোয়ানদের খাদ্য বাঙ্গালীকে খাওয়াইয়া

ভোজপুরী পালোয়ানে পরিণত করা যাইতে পারিত। ভগলপুরের গাই আর বাঙ্গালার গাই প্রায় একরূপ এক জিনিষ আহার গ্রহণ করে, কেহই প্রচুর প্রোটিন খাদ্য আহার করিতে পায় না। তবে তাহাদের গঠন ও স্বাস্থ্য এবং দুগ্ধ প্রজনন শক্তির অত প্রভেদ কেন?

জলবায়ুর ভিন্নতা যে বিভিন্ন দেশবাসীগণের স্বাস্থ্যের তারতম্যের প্রধান কারণ তাহা সকল দেশের সব মনীষীগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এই শাশ্বত সত্য পূর্ব্বোক্ত আধুনিক খাদ্য পরীক্ষকগণ একেবারে বিচারের আমলে আনেন নাই। বাঙ্গালার অধিকাংশ লোক ম্যালেরিয়াদি মারাত্মক রোগের প্রবল প্রকোপে এবং তজ্জন্য স্বাস্থ্য ও অর্থের অভাবে প্রপীড়িত। তাঁহাদের প্রায় সকলের অধিক পরিমাণ আমিষ খাদ্য পরিপাক করিবার কিম্বা সংগ্রহ করিবার সামর্থ নাই। সুতরাং উঁহাদিগকে উক্ত খাদ্য অধিক পরিমাণ সেবনের অযাচিত সস্তা উপদেশ দান বিড়ম্বনা মাত্র।

জলবায়ুর বিভিন্ন প্রভাব সম্বন্ধে ডাঃ বেনেট লিখিয়াছেন যে অধিক শীতে শরীরের তাপ যখন স্বাভাবিক ৯৮° এর নীচে নামে তখন দেহমধ্যস্থ তাপ বহির্বিকিরিত হয়। বাহিরের বাতাস যত অধিক শীতল হয়, দেহের তাপও তত অধিক বাড়ে এবং ততোধিক তাপ জননকারী খাদ্য সেবন প্রয়োজন হয়, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধাও পরিপাকশক্তি বর্দ্ধিত হয়। সেইরূপ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে যখন দেহের তাপ অধিক বিকির্ণ না হইয়া ভিতরে অধিক পরিমাণে সংরক্ষিত হয় তখন লোকের পাচকাগ্নি শীতকালের মত তত প্রখর হয় না বলিয়া আমিষাদি অধিক তাপজনক খাদ্য গ্রহণ করিবার প্রয়োজন থাকে না।

উপরোক্ত কারণে উত্তর মেরু প্রদেশের ল্যাপল্যাণ্ড দ্বীপবাসী এসকুইম্যাক্সগণ তৈলবহুল শিল মাছ খাইয়া তাপজনক খাদ্যের অভাব মিটায়

এবং তদ্দারা তাহাদের দেহ রক্ষিত হয়। এই কারণেই অন্য সভ্য শীতপ্রধান দেশবাসীগণ মদ ও মাংস সেবন করে, তাঁহাতে তাহারা সাধারণতঃ অসুস্থ হয় না।

অতি গ্রীষ্মে তাপাধিক্যের জন্য কর্ম্মশক্তি কমিয়া যায়, পুষ্টির ও ক্ষয়পূরণের ব্যাঘাত হয়, ফলে যকৃতের বিকৃতি বা পিত্তাধিক্য, অন্ত্রের ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, স্নায়ুদৌর্ব্বলতা ইত্যাদি জন্মে।

প্রতিকূল জলবায়ু ইত্যাদির অনিষ্টকারিতার কথা ছাড়িয়া দিলেও কতটুকু আমিষ উপাদান দেহধারণার্থ প্রয়োজন তাহার সত্যজ্ঞান অনেকেরই নাই। অনেক আধুনিক পুষ্টিতত্ত্ববিদ দেহরক্ষার্থে অধিক আমিষবহুল খাদ্য সেবন যে প্রয়োজন তাহা মানেন না। "ডেনমার্কের আধুনিক প্রসিদ্ধ আহারতত্ত্ববিদ হাইণ্ডহাইড সাহেব দীর্ঘ পরীক্ষান্তে স্থির করিয়াছেন যে অতি অল্প প্রোটিন খাদ্য সর্ব্বপ্রকার লোকের পক্ষে উপযোগী। জর্ম্মণদেশের পুষ্টিতত্ত্ববিদগণ প্রথমে প্রচার করেন যে দৈনিক খাদ্যে অন্ততঃ ১২০ গ্রেন প্রোটিন থাকা প্রয়োজন। পরে কয়েকজন ইংরাজ পুষ্টিতত্ত্ববিদ উহা ৮০ গ্রাম স্থির করেন। পরিশেষে হাইণ্ডহাইড সাহেব ২৭ গ্রামই যথেষ্ট বলিয়াছেন। ইহা এখন অনেকে মানিতেছে।"

তিনি নিজে লাল আটার পাঁউরুটি, মার্গারিণ (উদ্ভিজ্জ ঘৃত), ওটশস্য, খোসাসুদ্ধ আলু, বাঁধাকপি ও দুধ সর্ব্বসমেত প্রতিদিন মাত্র ২২ গ্রাম প্রোটিন সেবন করিয়া ৭০ বৎসর বয়সে প্রত্যহ বাইকে ৭০ মাইল ভ্রমণ এবং নিজ উদ্যানে স্বহস্তে তরিতরকারি ও ফলমূলের চাষ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন যথেষ্ট পরিমাণ সাধারণ খাদ্য গ্রহণ কর তন্মধ্যে যেন খানিকটা মাখম ও প্রচুর আলু থাকে। আলুর শ্বেতসার

ভাত রুটির ঐ উপাদান অপেক্ষা সহজপাচ্য। প্রতিদিন অন্য খাদ্যের সহিত ১ পোয়া আলু খাইলে স্বাস্থ্যের উন্নতি শীঘ্রই সুস্পষ্ট হইবে।

স্বল্প প্রোটিনবাদের মূলে যে সত্য রহিয়াছে তাহা দুগ্ধ বা ফল যাহা পূর্ণাহার শ্রেণী ভুক্ত এবং ঘাস যাহা জন্তুদের প্রধান আহারীয় দ্রব্য সেইগুলিতে কত অল্প থাকে তুলনা করিলে তাহা উপলব্ধি হইবে।

ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ফ্লেচার ও হাইণ্ডহাইড সাহেব যুগ্ম পরীক্ষায় স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সকলেরই এমন কি যাহারা কঠিন কায়িক বা মানসিক পরিশ্রম করে তাহাদেরও অল্প প্রোটিন সেবনে দেহ রক্ষিত হইতে পারে, অর্থাৎ অতিরিক্ত পরিশ্রমে অতিরিক্ত আমিষ সেবন প্রয়োজন নাই। শ্বেতসার ও স্নেহজাতীয় আহার্য্যের মাত্রা বর্দ্ধিত করিলে, উপযুক্ত পরিমাণ তাপ সঞ্চিত হয় এবং দেহ পুষ্ট হইতে পারে।

কিন্তু আমিষ খাদ্য সামান্য মাত্র অধিক সেবনে দেহে ইউরিক অ্যাসিড জন্মে এবং রক্তের চাপ বর্দ্ধিত হইয়া দেহযন্ত্র সমূহের উপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিবেচনার বিষয় উহাতে স্নায়ুশক্তির অপচয় হয়।

ডাক্তার রোজ তাহার একখানি স্বাস্থ্য পুস্তকে (Feeding the family) উপরোক্ত সিদ্ধান্ত এবং সকলেরই দৈনিক আমিষ খাদ্যের পরিমাণ ৪ আউন্স যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াছেন।

ডাক্তার সিসিল ওয়েব জনসন লিখিয়াছেন যে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প আমিষ আহার গ্রহণ করিয়া তাঁহার দীর্ঘকাল স্থায়ী কঠিন অম্ল ও অজীর্ণ রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে যে অজীর্ণ-জনিত শিরঃপীড়া হইত তাহা আর হয় না। তাহার পরিশ্রম করিবার যোগ্যতা কমে নাই বরং বাড়িয়াছে।

প্রাণীজ আমিষ আহারের দোষ মাংসাহার অধ্যায়ে আরো বিশদ-ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের আহার ও পুষ্টিতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৩৫ বৎসরেরও অধিক নানা গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বাঙ্গালীদের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ আঁকাড়া চালের ভাত, ডাল, শাক, চচ্চড়ি, মাছ বা দুধ এবং ফল আদর্শ খাদ্য। অবশ্য ঐ সঙ্গে স্বাস্থ্য ও আহার বিধিগুলি পালন করিতে হইবে। ইহা বড় আশার বাণী।

তিনি আমাদের দেশের অতি গরিবের দেহধারণোপযোগী এক বেলার খাদ্যের একটী তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন যাহার মূল্য মাত্র ৪।৫ পয়সা। যথা, ১ পোয়াকে বাটি ভাত, ১ বাটি ডাল, একটু লেবুর রস বা তেঁতুল, ১ মুঠা চিংড়ী মাছ বা উহার অম্বল ও কিছু তরকারি। জলখাবার—অঙ্কুরিত ছোলা বা ভিজে ছোলা, মুড়ি বা মূলা মুড়ি।

ডাল সকলের সহ্য হয় না, সে স্থলে প্রথম প্রথম পাতলা ডালের যুস অল্প পরিমাণে সেবন অভ্যাস করিলে এবং সহ্যমত বাড়াইলে ক্রমে উহা সহ্য হইবে। রোগীগণ আরোগ্যের পর পুষ্টি ও শক্তিলাভার্থে কিরূপে মসুর বা মুগের যুস পরিপাক করে? যাহার যে ডাল সহ্য হয় তাহাই গ্রহণ করা সমীচীন। ডাল রন্ধনের হিতকর প্রস্তুত প্রণালী ডাল অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

দেশের সর্ব্বত্র যে রব উঠিয়াছে যে আমরা পুষ্টিকর খাদ্য অধিক পরিমাণে খাইতে পাই না, তাহা অনেক স্থলে বৃথা আত্মাভিমান বা ভ্রান্ত ধারণা।

নিবারণ বাবু আরো বলিয়াছেন যে বাঙ্গালী জাতি পুষ্টি ও আহার বিজ্ঞানের জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে তাহাদের জাতীয় আহার আবিষ্কার

করিয়াছিল। তাহারা সভ্যতার সংঘর্ষে ঐ খাদ্য হইতে যত দূরে আসিয়া পড়িয়াছে ততই তাহাদের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। আচার্য্য সুবোধ চন্দ্র মহলানবিশ মহাশয় পুষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক দীর্ঘ ৩৪ বৎসরাধিক অভিজ্ঞতার ফলে নিঃসংশয় হইয়াছেন যে, দেশজাত খাদ্য হইতেই বাঙ্গালীর সম্যক পুষ্টিলাভ হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত খাদ্যপ্রাণে ভরপুর পুষ্টিকর নারিকেল নাড়ু, ভিজান ছোলা ও মুগ, গুড়, মুড়ি, মুড়কি, খই প্রভৃতি ভিখারী ভোজন বলিয়া বর্জ্জন করিয়া আমরা ম্লেচ্ছ হস্ত ও পদদলিত, সময়ে সময়ে হয়ত ঘৃণিত ঘর্ম্মাদি মিশ্রিত লবণ ও খাদ্যপ্রাণহীন অপদার্থ সাদা ময়দার রুটি, পাউরুটি, কেক, বিস্কুট, কলের চাল প্রভৃতি ভোজন করিয়া স্বাস্থ্যের দফারফা করিতেছি।

আমাদের খাদ্য নির্ব্বাচন, রন্ধন, সেবন ইত্যাদি ব্যাপারে আর যে সব গলদ আছে, যদ্দ্বারা পুষ্টির ব্যাঘাত ও দোষের মাত্রা বিলাতী পুষ্টিবিদগণের অজ্ঞাত তাহার কতকগুলি নিম্নে বিবৃত হইল। অন্যগুলি যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে।

(১) আমাদের খাদ্যে যে শ্বেতসারজাতীয় উপাদান প্রয়োজনের অধিক থাকে যাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন তাহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। উহার একটী কারণ আমরা সাধারণতঃ অনেক প্রকার ব্যঞ্জন আহার করি। সেইজন্য সময় সময় অধিক ভাত খাইতে প্ররোচিত হই, ইহা অমিতাহার পর্য্যায়ে পড়ে।

(২) ভাত যাহা জলে ভরপুর তাহার সহিত নানা তরিতরকারির ঝোল সেবন তাহার উপর আবার তাড়াতাড়ি আহার করিবার

দোষ নিবারণার্থে ঢোকে ঢোকে জলপান আর একটী অনিষ্টকর প্রথা। উহাতে মোট খাদ্যের জলীয়মাত্রা অত্যধিক বর্দ্ধিত হয়। তজ্জন্য খাদ্য সুচারুরূপে মুখের লালার সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না এবং পাকাশয়ে পাচক রস অধিক তরলিত হয়, ফলে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। সকল প্রকার খাদ্যে অল্প বিস্তর জল আছে। খাদ্য ভাল করিয়া চর্ব্বিত হইলে জলপান নিষ্প্রয়োজন।

(৩) তরকারির খোসা ছাড়ান এবং ফেন গালান ভাত খাওয়া। ইহাতে উক্ত খাদ্যের অনেক মূল্যবান লবণজাতীয় উপাদানের অপচয় হয়। যদি আধুনিক সভ্যযুগে ফেন-ভাত বা খোসা শুদ্ধ তরকারি খাইতে একান্ত রুচি না হয় তাহা হইলে ফেন স্বতন্ত্র সেবনে এবং তরকারির খোসাগুলি ব্যঞ্জনে দিয়া পরে ফেলিয়া দিলে উক্ত অপচয় নিবারিত হইতে পারে।

(৪) আমাদের অনেককে, বিশেষতঃ যাহারা সহরবাসী, ঘড়ি ধরিয়া কর্ম্মস্থলে হুজুরে হাজির দিতে হয় নচেৎ মনিবের ভৎর্সনা বা তাড়না খাইতে হয় অথবা হাজরে খাতায় দেরী দাগ (Late mark) পড়ে এবং সময়ে সময়ে জরিমানা দিতে হয়। এইজন্য তাড়াতাড়ি আহার করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে কর্ম্মস্থলে পৌঁছিতে হয়। শুধু তাহাই নয়, সেখানে গিয়া গ্রীষ্মে বরফ জল ও শীতে চা সেবনে পিপাসা বা ক্লান্তি দূর করিতে হয়। ইহাতে পরিপাকের বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটে। প্রকৃতির দপ্তরখানায়ও তাহাদের নামে কাল চিহ্ন (Black mark) পড়ে তজ্জন্য কড়ায় গণ্ডায় জরিমানা উসুল দিতে হয় অর্থাৎ শাস্তি ভোগ করিতে হয়। এই অনিষ্টকর অভ্যাস অপরিহার্য্য নয়, অর্থাৎ নিবারণ-যোগ্য, ইহা অন্যত্র বলা হইয়াছে।

(৫) ছুটীর দিন অনেক চাকরে অন্য দিন অপেক্ষা অধিক বেলায় অধিক পরিমাণে আহার করিয়া দীর্ঘ নিদ্রা সেবা করে, ইহাতেও

—২৬

বিশেষ অনিষ্ট হয়। কেহ হয়ত বলিতে পারেন একদিনের অত্যাচারে কি আসিয়া যায়? কিন্তু পরিপাক যন্ত্র একবার বিগড়াইলে তাহা প্রকৃতিস্থ করা কষ্টসাধ্য। অনেক সময় উহার পরিণাম অশুভ হয়।

(৬) কর্ম্মস্থলে গিয়া কেহ কেহ (তাহাদের সংখ্যা বিরল নয়), মাংসের চপ, কাটলেট, ডিম, আপত্তিকর ময়রার দোকানের খাবার ইত্যাদি অতি অম্লজনক খাদ্য টিফিনের সময় আহার করে। এক্ষেত্রে লবণঘটিত উপাদান বর্জ্জিত ভাত খাইয়া শরীরে অম্লাধিক্য হয় তাহার উপর উক্ত বিষম অম্লজনক খাদ্য ভোজনে দোষের মাত্রা অধিক বর্দ্ধিত হয়। এইজন্য ঐ সময়ে ক্ষারবহুল খাদ্য যথা ডাব বা অন্য ফল এবং উহার সহিত ভাল সন্দেশ ও রসগোল্লা আহারই প্রশস্ত।

(৭) বাঙ্গালী ছেলে মেয়েরা এবং অনেক বয়স্কগণও মুখচার স্বরূপ বদ তেলে বা ঘৃতে ভাজা, ময়লা হাতে ও ময়লা পাত্রে প্রস্তুত নকল দানা, সখের জলপান, চিনের বাদাম, পকৌড়ি, ডিমের বা মাংসের ঘুগনি, দূষিত দুগ্ধে প্রস্তুত কুলপি বরফ, ময়রার দোকানের আপত্তিকর খাবার ইত্যাদি আহার করে। ইহাদের অপকারিতা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। এই সকল পদার্থ যদি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত হয় তাহা হইলেও যখন তখন উহা খাইলে অনর্থ ঘটে কারণ আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময় অতি অল্প মাত্র অতিরিক্ত আহার গ্রহণ পুষ্টির পরিপন্থী, উহাতে পূর্ব্বভুক্ত খাদ্যের পরিপাকে অনিষ্ট ঘটে, ফলে রোগ অনিবার্য্য। শুধু তাহাই নয়, উক্ত বদভ্যাস বশতঃ আমাদের সন্তানগণ তাহাদের পরবর্ত্তী জীবনে আহার বিষয়ে উত্তরোত্তর অধিক স্বেচ্ছাচারী হয়।

মানব দেহমন্দিরের বনিয়াদ খারাপ মসলা দিয়া গঠিত হইলে অকালে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সেইরূপ যাহারা গৃহের, সমাজের ও দেশের ভাবী আশা ও ভরসাস্থল তাহাদের বাল্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিভাবকদের ঔদাসিন্য প্রকাশ বা অযথা প্রশ্রয় দান গুরুতর অপরাধ। পুষ্টিতত্ত্ববিদ

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথামত বলিতে ইচ্ছা হয় যে যদি হিটলার হইতাম উক্ত খাবার-ফিরিওয়ালা এবং বিক্রেতাদের যাবজ্জীবন দীপান্তরের এবং ফল বিক্রেতাগণের লাইসেন্স মাপ করিবার ব্যবস্থা করিতাম।

আমাদের মেয়েদের নোঙরা, শুদ্ধ বা সকড়ি বিচার অনেক সময় সীমার বাহিরে যায়। উহাতে তাহারা নিজেরাও বিব্রত হয় এবং অপর সকলকে অতিষ্ঠ করে। কেহ কেহ ছুঁচিবাই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। রুটি সকড়ি নয় কিন্তু ভাত এবং তৎসংসর্গে যাহা কিছু থাকিবে তাহা সকড়ি হয় কি কারণে তাহা বুদ্ধির অগম্য। সকড়ির অর্থ যদি নোঙরা বা অশুদ্ধ হয় তাহা হইলে আমাদের উদর ও অন্ত্রের অভ্যন্তরে কত মল, মূত্র এবং বাহিরে দেহের ঘর্ম্ম ও ময়লাদি রহিয়াছে, তাহাতে দেহ এবং তৎসংলগ্ন কাপড় ও অন্য পোষক অশুদ্ধ হইবার কথা। তাহা হয় না কেন? সকড়ি যখন মনে আঁকড়াইয়া বসে তখন উহা একটী মানসিক ব্যাধিতে পরিণত হয়।

আহারবিধি লঙ্ঘনকারী এবং বিকৃত জীবন যাপনে অভ্যস্ত সহরবাসী-গণ শতকরা ৯০ জন অল্পাধিক স্নায়ুদৌর্ব্বল্য ও অজীর্ণ (Dyspepsia) রোগে ভুগিতেছে। উহাতে শুধু যে বাঙ্গালীরা স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছে তাহা নয়, অন্য বিদেশী সহরবাসীগণও ঐ দলভুক্ত। একজন মার্কিণদেশীয় স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ লিখিয়াছেন যে তাহাদের দেশের সহর-গুলিতে ডিসপেপসিয়া (অজীর্ণ রোগ) অতি প্রবল। তাহার প্রধান কারণ অত্যধিক (নিকৃষ্ট) শ্বেতসার বহুল খাদ্য ও কফি সেবন এবং প্রচুর বরফ জল পান যাহা পাকস্থলীকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে। অতএব একা বাঙ্গালীদের ঘাড়ে সব দোষ চালাইলে চলিবে না।

বিংশ অধ্যায়।

আহার বিলাস।

(ভূরিভোজন বা আনন্দ ভোজ)

বর্ত্তমান কালে আমাদের বিবাহাদি উৎসবে সাধারণতঃ এত প্রকার আহার্য্যের সমাবেশ করা হয় যে তাহা নানা কারণে স্বাস্থ্যকর হয় না। দেশী খানা লুচি, মণ্ডা, মাছ, "দধি, ক্ষীর" বা রাবড়ি ইত্যাদির সহিত ইংরাজী খানা চপ, কাটলেট, মামলেট, ফ্রাই, পুডিং, আইসক্রিম ইত্যাদি এবং মুসলমানী খানা পোলাও, মাংসের কালিয়া বা কোর্ম্মা, কোপ্তা, কাবাব ইত্যাদির একত্র মিলনে অভ্যাগতদের জঠরে দাবানল জ্বালাইবার এবং তদ্দ্বারা তাহাদের শরীর নষ্ট করিবার পরম ও চরম ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

প্রচুর লঙ্কা ও পিঁয়াজ বা রসুন লাঞ্ছিত ব্যঞ্জন যাহার কাছে মদের চাটও হার মানে, তাহা সকলকে বিশেষতঃ বালক বালিকাগণকে বাধ্য হইয়া ভোজন করিতে হয়। গৃহস্থগণ ইহার জন্য হয়ত সম্পূর্ণ দায়ী নয় কারণ পেশাদার পাচকগণ যাহারা সাধারণতঃ তেল, ঘি, লঙ্কা, পিঁয়াজ ও রসুনের শ্রাদ্ধবিশারদ তাহারা বারণ মানে না। রাঁধিতে জানিলে পরিমিত পরিমাণ মসলায় ব্যঞ্জন অধিক সুস্বাদু হয়।

স্থানাভাব বা অগ্র পশ্চাৎ ভেদে লোক খাওয়ান, এই দুইটি কারণে অনেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ক্ষুধার সময় খাইতে পায় না। ইহাতে পিত্ত পড়ে এবং অজীর্ণ রোগ সূচিত হয়। কন্যাযাত্রীগণ অনেক স্থলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া বসিয়া আক্রান্ত হয়। যেন তারা দানবাড়ীর

ংখারী। কিন্তু হোতা একথা ভুলিয়া যান, যে একদিন বরযাত্রী সে
ন্য দিন কন্যাযাত্রীর রূপ পরিগ্রহ করে। অন্য ক্ষেত্রে, সময়ে সময়ে
িমন্ত্রণ খাইতে গিয়া কি ভীষণ দুর্গতি ঘটে তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই
ানে। ইহা আমাদের একটী বিষম সামাজিক কলঙ্ক।

আবার অনেক স্থলে, সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় না বলিয়া
াদ্যদ্রব্য বিলম্বে প্রস্তুত হয়। কর্ম্মকর্ত্তার সময়ের মূল্যজ্ঞানের শোচনীয়
ভাব বশতঃ ঐরূপ ঘটে। ঠিক সময়ে খাওয়ান প্রবল পুরুষত্ব
রিচায়ক। অক্ষম ও আলস্যপরায়ণ লোক বিলম্বের নানা অছিলা
রে। যেখানে স্থানাভাব সেখানে অধিক লোক আমন্ত্রণ করা অনুচিত।
বিষয়ে আমাদের সাহেবদের অনুকরণ করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত
্যবস্থা অবলম্বনে যথা দ্রুত পরিবেশণ ও পাতা পরিষ্কার করণ,
ন্ধ্যার পূর্ব্বে আহার প্রস্তুত করণ ইত্যাদির দ্বারা অল্প স্থানে, অল্প সময়ে,
ধিক লোক খাওয়ান যাইতে পারে। অথবা মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে
ইবার ভোজের ব্যবস্থা করিলে স্থানাভাব সমস্যা মিটিতে পারে।

এ বিষয়ে কলিকাতা কায়স্থ সভা ও সমাজের সভ্যবৃন্দকে প্রবুদ্ধ
রিবার জন্য গত ২রা আগষ্ট ১৯৩৬ সালে সন্তোষের মহারাজা
স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে, টি, এবং লেফটেনাণ্ট সত্যেন্দ্র চন্দ্র
াষ মৌলিক মহোদয়দ্বয়ের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে একটী আদর্শ মধ্যাহ্ন
ীতি ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। ইহাতে ১০১ প্রকার স্বাস্থ্যকর
ির্দ্দোষ আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এই মহানসের আয়োজনের
তত্ত্বাবধানের সকল ভার গ্রন্থকারের উপর অর্পিত হইয়াছিল।
াগত প্রায় ৪০০ শত সভ্য সনাতন প্রথা মত মধ্যাহ্নে নির্দ্দেশিত সময়ে
াসনে বসিয়া পাতায় ও মৃৎপাত্রে আহার গ্রহণ করিয়া পরিতোষ লাভ
রিয়াছিলেন। মোট ব্যয় ৪১৪৲। প্রায় ১০০ জনের আহার উৎবৃত্ত
ওয়ায় তাহা অন্ধ ও মূক বিদ্যালয়ে পাঠান হইয়াছিল।

উক্ত আহার তালিকা (মেনু) পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। আহার্য্য দ্রব্যাদির সঠিক তালিকার অভাবে, লোকজনের হাতে বাজার করিতে দিবার ফলে এবং খাদ্য পরিবেশকের দোষে প্রায়ই আহার্য্যের বিস্তর অপচয় ঘটে। এ সকল বিষয়ে কর্ম্মকর্ত্তা কিম্বা তাঁর একজন বিশ্বাসী উপযুক্ত ব্যক্তি জিনিষপত্র নিজে ক্রয় ও রীতিমত তত্ত্বাবধান করিলে উক্ত অনর্থ দূর হইতে পারে। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়।

পরিশিষ্টে ১০০ জনের প্রত্যেক প্রকার সাধারণ আহার্য্যের আবশ্যকীয় পরিমাণের মোটামুটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। ইহা বহু অভিজ্ঞতার ফল সুতরাং সাধারণতঃ নির্ভরযোগ্য। তবে যে ক্ষেত্রে ব্যঞ্জন বা মিষ্টান্নের ৩।৪ প্রকারের অধিক পদ থাকে, সেখানে বিবেচনা করিয়া প্রত্যেকটী শতকরা অন্ততঃ ২৫ ভাগ কম ধরিতে হইবে। এক পাড়ায় অন্য গৃহে একদিনে ভোজের আয়োজন হইলে কিম্বা দুর্য্যোগের দিনে, আরো কম করিয়া আয়োজন করা কর্ত্তব্য। নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা গণনা ঠিক না হইলে, পরিবেশনের দোষে এবং উপরোক্ত কারণে অপচয় অবশ্যম্ভাবী।

যদি অনিবার্য্য কারণে অতিরিক্ত আহুত, অনাহুত বা রবাহুত ব্যক্তির সমাগম হয়, তাহার প্রতিবিধানকল্পে প্রত্যেক গৃহস্থের পূর্ব্ব হইতে তালিকার অতিরিক্ত কিছু ময়দা, ঘৃত, মাছ, আলু, মিষ্টান্ন ইত্যাদি গোপনে রক্ষিত করা কর্ত্তব্য।

সহর অপেক্ষা পল্লীবাসীগণের জন্য অধিক আয়োজন অনিবার্য্য হয়। একটী কারণ, শেষোক্তদের ছাঁদাবন্ধন, দ্বিতীয় কারণ ম্যালেরিয়ার সময় ব্যতীত তাহারা বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর লোকে অধিক আহার করিতে সক্ষম। এইজন্য অবস্থা বিশেষে মিষ্টান্ন, দধি ও লুচির পরিমাণ সহরবাসীদের অপেক্ষা দ্বিগুণ পর্য্যন্ত করা প্রয়োজন।

লগনসার দিন সন্দেশাদি প্রস্তুত না করিয়া তাহার ২।১ দিন আগে করিলে অর্থের সাশ্রয় হইবে। যদি একশত লোকের অধিক আয়োজন করিতে হয় তাহা হইলে কতকগুলি দ্রব্যের খরচ, যথা কাঠ, কয়লা, মসলা ইত্যাদি, শতকরা কম পরিমাণে ধরিতে হইবে। যথা প্রতি শত জনের জন্য /।৵০ লঙ্কা প্রয়োজন কিন্তু ২০০ জনের জন্য /॥/০ এবং ৩ হইতে ৪ শত জনের /১ সেরই যথেষ্ঠ। বড় কড়ার এক কড়া মাছ বা মাংসের তরকারিতে ২০০ লোক খাইবে। নিরামিষ হইলে ½ কড়া যথেষ্ঠ। প্রতি ১০০ জনের জন্য প্রত্যেক প্রকার ব্যঞ্জনের কাঁচা তরকারি ।০ দশ সের প্রয়োজন।

ভোজের আর একটী আনুসঙ্গিক ব্যাপার, নিমন্ত্রিত মহিলাদের গাড়ী বা মোটরকারের বন্দবস্ত করা, ইহাতে বিশেষ অসুবিধা ঘটে। আমন্ত্রিত রমণীগণের গাড়ী বা পাথেয় খরচ তাহাদের পুরুষদের বহন করা ভদ্রোচিত কার্য্য। ইহাতে উভয় পক্ষেরই সুবিধা। নিমন্ত্রণ পত্রে আজকাল উপঢৌকন প্রত্যাহার করা হয়, উহাতে গাড়ীভাড়ার টাকা ও গাড়ীর বন্দোবস্তের ভার গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করাও বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের উপস্থিত প্রথা নিন্দনীয়।

ভিখারী ভোজন বা দরিদ্রনারায়ণ সেবা।

অনেকে ভিখারীকে নারায়ণ জ্ঞানে ভোজন করাইয়া কৃতার্থ জ্ঞান করে। কিন্তু একদিন একবেলা আহার গ্রহণে তাহাদের চির আহারাভাব কতটুকু নিবারিত হইতে পারে? এই সেবার বাস্তবিক কিছু মূল্য নাই বলিলে চলে। ইহা একটী আধুনিক নূতন ঢেউ বা হুজুগ। বরঞ্চ উক্তরূপ ক্ষণিক সেবায় যে অর্থ ব্যয় হয় সেই মূল্যে যদি অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক দরিদ্রকে জনপিছু দুইখানি বস্ত্র ও

একখানি কম্বল দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাদের বস্ত্রাদির কষ্ট অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য ঘুচিতে পারে।

হিন্দুধর্ম্মে অন্নদান একটী অতি পুণ্য কার্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা প্রকৃত দরিদ্র নয়, যথা কুলি, মজুর প্রভৃতি অন্য বহু বাজে লোক ভিখারীর দলে ভিড়ে। সুতরাং অন্নদানের প্রকৃত মর্য্যাদা অনেক স্থলে রক্ষিত হয় না।

আহার বিলাস।

(প্রাচীন হিন্দু প্রথা)

অতি প্রাচীন কালেও ভূরিভোজন প্রচলিত ছিল। কিন্তু উহা সাধারণতঃ এখনকার অপেক্ষা নির্দ্দোষ উপাদান দ্বারা প্রস্তুত হইত। নিম্নে শ্রী কৃষ্ণপদ দাস বাবাজীর লীলামৃত গ্রন্থোক্ত কতকগুলি উপাদেয় মিষ্টান্ন ও পানীয় যাহা শ্রীরাধিকা এক সময় শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহার মিষ্টাস্বাদ ভাব এই পুস্তকের তিক্ত স্বাস্থ্যোপদেশ চর্ব্বণনিরত পাঠক পাঠিকাগণকে গ্রহণ করাইবার জন্য নিম্নে বিবৃত হইল।

পঞ্চামৃত—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি মিশ্রিত পানীয়।

রসালা—ঘন দুধ, দধি, ঘৃত, মধু, গোলমরিচ ও কর্পূর সহযোগে প্রস্তুত সুমিষ্ট পানীয়।

মতান্তরে ইহা ঘোল, দধি, চিনি, কর্পূর, জাফ্রাণাদি সহযোগে প্রস্তুত উপাদেয় পানীয় বা পুরাকালের ঘোলের সরবত। ইহার গুণ বলকারক, রুচিবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, মধুর, শীতল, পিপাসা ও দাহ নাশক। ইহার উদ্ভাবন কর্ত্তা ভীম। উহা ভীমের ও শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় পানীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

শিখরিণী—ঘন দধির সহিত তৎসমান কাঁচা দুধ ও পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি মিশ্রিত পানীয়।

যাড়ব—দুই ভাগ দুধ ও ১ ভাগ পাতলা দধির সহিত উক্ত দ্রব্যাদি মিলিত গোলাপ জলে বাসিত পানীয়।

অমৃতকেলি বটক—ইহা শ্রীকৃষ্ণের অতি স্পৃহনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নারিকেল শাঁস, মাষকলাই, জায়ফল ও এলাচ চূর্ণ বাটিয়া খাঁড় চিনির সহিত মিলাইয়া ঘৃতে বড়ার আকৃতি করিয়া ভাজা।

অনঙ্গ বটিকা—নারিকেল, ক্ষীর, সর, শালি ধান চূর্ণ, কর্পূর, মরিচ, জায়ফল, লবঙ্গ ও চিনি পিষিয়া কলা ও এলাচ সহ মিলাইয়া বোন্দের মত ঘৃতপক্ক করণ। স্বরূপ দাস বাবাজীর মতে ইহাও শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় আহার।

চন্দ্রকান্তি ও গঙ্গাজল—চিনি, লবঙ্গ, এলাচ, গোলমরিচ ও কর্পূর অর্দ্ধশুষ্ক সরের সহিত পিষিয়া গৃহে প্রস্তুত অপূর্ব্ব লাড্ডু।

৪০০ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান যুগের হিন্দুদের ভোজন তালিকা কবি ভারত চন্দ্রের মানসিংহ কাব্য গ্রন্থে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য। স্থানাভাব প্রযুক্ত উহা উদ্ধৃত করিতে পারা গেল না। উক্ত যুগের কিছু পূর্ব্ব হইতে মাংসাহার, ভোজ তালিকাভুক্ত হইয়াছিল।

সাহেবি খানা।

আজকাল ভোজের সময় সাহেবি খানার নকল করিয়া যে চেয়ার টেবিলে কাঁটা চামচ হীন খাওয়াইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা নানা কারণে অসুবিধাজনক এবং আপত্তিকর। প্রায়ই ভাড়া করা নোঙরা, নড়নড়ে, ফজবেনে, দেবদারু কাঠের সরু লম্বা চৌপায়া যাহা টেবিলের অপভ্রংশ, তাহার সহিত চেয়ার বেঞ্চির অপভ্রংশ কাষ্ঠাসনের

সঙ্গতি স্থাপন করিয়া সকলকে অতি সন্তর্পণে আহার গ্রহণ করিতে হয়। ঐ প্রকার টেবিল অনেক সময় আবশ্যকের অধিক বা কম উঁচু হয়, তাহাতে ভোজনকারীর বিশেষতঃ অল্পবয়স্কগণের অবস্থা সঙ্গীন হয়।

আবার দেখা যায় যে ঐ অসমতল টেবিলের উপর স্থাপিত জলের গ্লাস পড়িয়া গিয়া খাদ্যদ্রব্য ও ভোক্তাদের বস্ত্রাদি নষ্ট হইবার ফলে তারা নাস্তানাবুদ হয় এবং একটী নূতন আহারবিভ্রাট সৃষ্ট হয়। ইহার উপর দেখা যায় কেহ কেহ আহার করিতে করিতে উচ্ছিষ্ট খাদ্য পার্শ্বে বা কাষ্ঠাসনের নিম্নে ফেলিতে থাকে, তাহা প্রায়ই পরিষ্কার করা হয় না। উহা দ্বিতীয় বা পরবর্ত্তী পঙক্তির লোকদের অসোয়াস্তি জনক হয়। সর্ব্বোপরি সাহেবিয়ানা চালে টেবিলের উপর কাপড়ের পরিবর্ত্তে পাতলা কাগজ পাতিয়া দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে তজ্জন্য টেবিল বা তক্তা ব্যঞ্জনাদির রসে সিক্ত হয়। যদিও পূর্ব্বের কাগজ ফেলিয়া দিয়া পর পংক্তিতে নূতন কাগজ পাতা হয় তথাপি উহা আপত্তিকর।

তবে কাঁটা ও চামচে সাহায্যে আহার গ্রহণ প্রথা স্বাস্থ্যজনক ও অনুকরণ যোগ্য। আমাদের শুধু হাতে আহার করা অভ্যাস বাস্তবিক নিন্দনীয়। উহাতে হাতের ও নখের ময়লা আহারের সহিত গ্রহণ করিতে হয়।

পা মুড়িয়া আহারাভ্যাস প্রাচ্যের আবহমান কাল প্রচলিত রীতি। সভ্য চেয়ার, টেবিল, সোফা ও কৌচের প্রচলন সত্ত্বেও আমাদের সনাতন অসভ্য আসন, মাদুর, ফরাস ও তাকিয়া অতি কষ্টে এখনও বাঁচিয়া আছে। উহাই আমাদের দেশোপযোগী ও স্বাস্থ্যোপযোগী আসবাব। তবে টেবিলে আহার গ্রহণে হয়ত একটী উপকার লাভ হইতেছে। আমাদের অনেক রমণী উহাতে অভ্যস্ত হইতেছে সুতরাং তাদের মধ্যে যারা পূর্ব্বে সকড়ি বাদ বিচার করিয়া আহার করিত

কিম্বা ছুঁচিবাইগ্রস্ত তাহাদের ঐ রোগে অব্যাহতি লাভ করিবার পরম সুযোগ ঘটিয়াছে।

আর এক প্রকার আহার বিলাস, সহজগম্য দেশী ও বিদেশী হোটেল বা রেস্তোরাঁয় নানাবিধ রসনাপ্রিয় আপত্তিকর অখাদ্য বা কুখাদ্য গ্রহণ। ইহা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার অপকারিতা সকলেই অল্প বিস্তর জানে। পণিক বা হোটেলের খাদ্য সাধারণতঃ ত্রিবিধ দোষে দুষ্ট হয় যথা—

(১) **জাতি দুষ্ট**—চর্ব্বি, সির্কা প্রভৃতি বিজাতীয় বা আপত্তিকর পদার্থের মিশ্রণ জনিত।

(২) **নিমিত্ত দুষ্ট**—বাসি বা পচা জিনিষের পুনঃসংস্কৃত খাদ্য যাহা অনেক হোটেলে প্রস্তুত হয় বলিয়া শোনা যায়। ময়রার দোকানের মাছি আস্বাদিত ও ধূলি সমাকূল খাবার, সর্ব্বোপরি ভেজাল ঘৃতাদি সংযোগে প্রস্তুত খাবার।

(৩) **আশ্রয় দুষ্ট**—রোগী ও অসৎ লোক প্রভৃতির দ্বারা স্পৃষ্ট এবং অনাবৃত পাত্রে রক্ষিত আহার্য্যাদি। হোটেলের ব্যবহৃত পাত্রাদি ভাল পরিষ্কার করা হয় না। ফলে সংক্রামক রোগযুক্ত ব্যক্তির মুখ বা দেহ নিঃসৃত রোগবীজাণু অন্য সুস্থজনের দেহে সহজেই সংক্রমিত হয়।

আধুনিক অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদের মতে উক্ত কারণে সহরে দিন দিন যক্ষ্মা রোগের অতিবিস্তার ঘটিতেছে। রাস্তা, ঘাটে, যেখানে, সেখানে, কাঁচের গেলাসে সরবৎ এবং ডিস পেয়ালায় চা পানেও উক্ত দোষ জন্মিতেছে।

গেলাস প্রতীচ্য সভ্যতার দান। আমাদের দেশে পূর্ব্বে যখন লোটা বা ঘটির প্রচলন ছিল তখন লোকে প্রায় সকলে আলগোচে চুমুক দিয়া খাইত। কিন্তু এখন অধিকাংশ লোক গেলাসাদি অন্য পাত্র চুম্বন

করিয়া পানীয় গ্রহণ করে নচেৎ তৃপ্তি হয় না। পুষ্টিতত্ত্ববিদ শ্রী নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন "আমি যদি হিটলার হইতাম নিয়ম করিতাম, কেহ গ্লাসে চুমুক দিয়া জল বা অন্য পানীয় গ্রহণ করিতে পারিবে না।"

যদি কখনও গৃহের বাহিরে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া চা বা সরবৎ একান্তই খাইতেই হয় তাহা হইলে উহা মাটির ভাঁড়ে খাওয়া বরং ভাল। বাজারের সরবতও নির্দ্দোষ নয় তৎপরিবর্ত্তে ডাবের জল পান নিরাপদ এবং অধিকতর স্বাস্থ্যকর। ময়রার দোকানের খাবার যদি খাইতেই হয় তবে বিশ্বস্ত দোকানের সন্দেশ বা রসগোল্লা দোষনীয় নয়।

হোটেলে আহারের পূর্ব্বকথিত দোষগুলি ব্যতীত অন্য অনেক দোষ জন্মে যথা অহিত ও অমিত ভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন ইত্যাদি। চা পানের পর মাংস ভক্ষণ ঘোর অনিষ্টকর।

উৎকট ঔদরিকতা বা ভ্রষ্ট আহার বিলাস।

সেণ্ট নেহাল সিং বিলাতের ষ্ট্র্যাণ্ড পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে হাইদ্রাবাদের নিজামের মত ভোজন বিলাসী রাজা পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। প্রতিদিন তাঁহার জন্য কত শত প্রকার আহার্য্য প্রস্তুত হয় তাহার সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা অসম্ভব। ফল এবং নোস্তা, মিষ্টি, ঝাল ও টকের ব্যঞ্জন, পোলাও, খিচুড়ী, মাছ, মাংস, শাকসব্জি, যত প্রকার সম্ভব তাঁহার আহারার্থে প্রতিদিন প্রস্তুত হয়। এইজন্য অনেক ওস্তাদ পাচক নিযুক্ত আছে। তিনি অবশ্য সব খাবার খান না। অসংখ্য সোনার পাত্রে (কতকগুলি রত্নখচিত) রক্ষিত প্রত্যেক প্রকার খাদ্য তাঁহার সম্মুখে রাখা হয়। পরিবেশকগণ তার মর্জ্জি মত নির্ব্বাচিত খাবার চামচে করিয়া পরিবেশন করে। তিনি কোন প্রকার খাদ্য

সাধারণতঃ এক চামচের অধিক গ্রহণ করেন না। অধিকাংশ খাদ্য ভৃত্যেরা উপভোগ করে।

আবার পাত্র বিশেষে রুচিবিকার প্রযুক্ত অতি ঘৃণিত খাদ্যও আহার বিলাস বলিয়া গণ্য হয়। পূর্ব্বকালে গ্রীক সম্রাট নিরো, নাইটিনগেল (বুলবুল জাতীয় সুকণ্ঠ পক্ষী বিশেষ) পক্ষীর জিহ্বা ভোজন করিতেন (অবশ্য রন্ধন করিয়া)। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তদ্দ্বারা তাঁহার কণ্ঠস্বর উহার মত মিষ্ট হইবে। ঐ দেশের আর একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ভল্লুকের কলিজা, মহিষের যকৃৎ ইত্যাদি ভোজন করিত এই বিশ্বাসে, যে উক্ত প্রকার দ্রব্য আহারে ঐ সব জন্তুর শক্তি ও সাহস তাহাতে বর্ত্তিবে।

অ্যামেরিকার প্রাচীন অধিবাসী মেয়রি যোদ্ধাগণ যুদ্ধে শত্রু জয় করিয়া তাহার তেজ বা শক্তি লাভের জন্য তাহাকে ভক্ষণ করিত।

ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশের আদিম অধিবাসীগণের ফড়িং অতি প্রিয় খাদ্য। কোন কোন বন্য জাতি পিঁপড়া খায়। ভারতবর্ষের সাঁওতাল পরগণার লোক সাপ, ব্যাঙ ও ইঁদুর খায়।

চীনেম্যান আবহমানকাল হইতে ইঁদুর, আরসোলা ও ব্যাঙের মাংসের মহাভক্ত। লেখক কয়েকজন পরিচিত বাঙ্গালী যুবকদের চীনা হোটেলে তদ্দেশীয় উক্ত অপূর্ব্ব আহার গ্রহণে জন্ম সার্থক করিতে দেখিয়াছে, ইহা আপরুচি খানার বা 'বিকৃত জীবন চলনার' চরম অবস্থা, অতি অশুভ যুগ লক্ষণ।

শ্রী কুমার চিদানন্দ তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য সাধন পুস্তকে লিখিয়াছেন—"আমরা খেচরের মধ্যে ঘুঁড়ী, জলচরের মধ্যে কুমীর ও হাঙ্গর এবং স্থলচর চতুষ্পদের মধ্যে চৌকি বাদ দিয়া বাকি সমস্ত উদরস্থ করিয়া বাঙ্গলা দেশটাকে ভগবানের হাঁসপাতালে পরিণত করিতেছি।"

এক এক জাতি আপন আপন জাতীয় আহার গ্রহণ করে। আমাদের অনেকেই এখন সর্ব্বভুক। আবার আমাদের জাতীয় ও বিজাতীয় মিশ্রিত বেশ, আপরুচি পরণার শোচনীয় পরিণাম। যদি আমাদের দেশ চীন সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, ইহা একেবারে অসম্ভব নয়, তাহা হইলে হয়ত কেহ কেহ ইঁদুর, আরসোলা ও ব্যাঙ জাতীয় খাদ্য আহার করিয়া জঘন্য অনুকরণপ্রিয়তা ও রাজভক্তির পরকাষ্ঠা দেখাইবে। ইহার নাজর স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে আমাদের অনেকে মুসলমান রাজত্বের কাল হইতে পোলাও, মাংসের কালিয়া, কোপ্তা, কোর্ম্মা, কাবাব এবং চপ, কাটলেট, মামলেট ইত্যাদি দুষ্পাচ্য ইংরাজী খানা খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে। কোন কোন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক হ্যাম ও বেকন (শূকর মাংস) পর্য্যন্ত খাইতে অতিশয় অনুরাগ প্রদর্শন করেন।

১৩২১ সালের কার্ত্তিক মাসের কৃষি সম্পদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল যে মার্কিণদেশে প্রতি বৎসর খাদ্যের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাঙের কারবার হইতেছে। মার্কিণ দেশে ও ইউরোপের অনেক স্থানে ব্যাঙের মাংসে বহুবিধ ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। হোটেলে ব্যাঙের ঠ্যাং না হইলে চলে না। নিউইয়র্কের একটী বড় হোটেলে প্রত্যহ শতাধিক ডজনের অধিক ব্যাঙের ঠ্যাঙে খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহা টিনে ও কাঁচের পাত্রে সংরক্ষিত হইয়া দেশ বিদেশে চালান যায়। উপরন্তু ব্যাঙের চর্ম্মে হাতের দস্তানা প্রভৃতি সৌখিন দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

এই জন্য মার্কিণদেশে বৎসরে প্রায় ১ কোটী ভেকের প্রাণ নাশ করা হয় এবং উহার রীতিমত চাষ করা হয়। ঐ দেশে কেহ কেহ ভেকের চাষে অর্থ কুবের হইয়াছে। যত উপাদেয় হউক না কেন ব্যাঙ খাইতে আমাদের কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না তবে উহার চর্ম্মের ব্যবসা লাভজনক হইতে পারে। অর্থাৎ ভেক নাশন দ্বারা বেকার নাশনের সমস্যা হয়ত কতকাংশে সম্ভবপর। ইতি—

পরিশিষ্ট (ক)

১০০ জনের বিবিধ আহার্য্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে প্রত্যেক কাঁচা দ্রব্যের পরিমাণ তালিকা।

মুদি

পোলাউয়ের চাল	।৫	সরিষার তেল	/৬॥৽
		লবণ	/২॥৽
ভাতের জন্য চাল বা লুচির জন্য ময়দা	/॥৽	ছোলা বা মুগের ডাল	/১
		মটর বা ছোলা (ধোঁকা হইলে)	/১॥
চিনি	/২॥৽	ঘৃত সর্ব্বসমেত	/।৽
আখের গুড়	/১	পাঁপড়	/১।৽

রাঁধিবার মসলা

ভাল হিং	১ ভরি	দালচিনি	/৽
লঙ্কা	/।৵৽	কালজিরা	৵৽
হলুদ	/॥৽	জিরা	/৽
ধনে	।৽	ছোট এলাচ	/৽
সরিষা	/৽	রং	(দাম) ৻১৽
পাঁচফোড়ন	৵৽	কিচমিচ	/॥

তেজপাতা ৻৫ দাম

পোলাউয়ের মসলা

ভাল জাফ্রাণ	১ ভরি	সা মরিচ	/
কিচমিচ	/॥৽	খোয়াক্ষীর	/।৵
জায়ফল	দাম ৻১৽	কাবাব চিনি	দাম ৻১
জৈত্রি	দাম ৻১৽	পেস্তা	৵
সাজিরা	/৽	বাদাম	/॥

গোলাপ নির্য্যাস ২ শিশি ॥৽

গরম মসলা, তেজপাত ইত্যাদি পরিমাণ মত।

পানের মসলা

খয়ের	৵৹	ধনের চাল	দাম ৶৹
সুপারি	৴।৹	ছোট এলাচ	৴৹
লবঙ্গ	৴৹	জৈত্রি	৶৹ দাম
বড় এলাচ	৵৹	পান	১ কোণা
মৌরি	দাম ৶৹	উৎকৃষ্ট কেওড়া	১ পাইট

মিষ্টান্ন

দধি মিষ্ট	।৭॥৹	পান্তুয়া	।৹
দধি টক	৴২॥৹	দরবেশ বা মিহিদানা	৴৬
সন্দেশ	৴৭॥৹	ছানার পায়েস	৴৭॥৹
রাবড়ি	৴৬॥৹	খোয়া ক্ষীর (তরকারির জন্য)	৴॥৹

বাজার

আলু	।৫	কড়াইশুঁটি বা মটর কড়াই	৴৫
বাঁধা বা ফুলকপি	৴৭॥৹	ছোলা	৴১॥৹
কুমড়া	২টা ।৹	আদা	৴৷৹
বড় বেগুন	৬০টা	পুঁইশাক	৴১
বা বড় পটল	।২	বড় ঝুনা নারিকেল	২টা
কাঁচকলা	৫টা	কলাপাতা	১৫০
পিঁয়াজ	॥৹	আঁব আদা	৶৹
তেঁতুল	৴১	এঁচোড়	৴৭।৹
শাক	দাম ৵৹	বেসম (কোপ্তা হইলে)	৴॥৹

(চাটনির জন্য)

আনারস	৴৭॥৹	বা লাউ	।৹
বা পেঁপে	৴৭॥৹	বা জলপাই	৴৫

আঁব আদা ।৹

কুমোর সাজ

খুরী ছোট	১২০	গামলা	২টা
খুরী মাঝারী	১২০	মালসা	২টা
গেলাস	১৩০	ভাঁড়	৪টা

বিবিধ

কুশাসন	১০০	কাঠ	৩ মণ
রসুইকার	৩ জন	বা কয়লা	২ মণ

চপ, ফ্রাই ও রাধাবল্লভী হইলে অতিরিক্ত সুপকার।

আমিষ

পোনা মাছ বা মাংস	৸০	চিংড়ী (মালাইকারীর জন্য)	⁄৭॥০

পোনা মাছ ও মাংস দুই হইলে প্রত্যেকটার পরিমাণ তিন বা চার ভাগের ১ ভাগ কমিবে। মাছের ফ্রাই হইলে ভেটকি বা অন্য মাছ ⁄৭॥০ ও বেসম ⁄১।০ কিন্তু ইহা আহারের প্রথমে দিলে কুলাইবে না। শেষের দিকে দিলে সংকুলান হইবে।

কতকগুলি সৌখিন বা সখের আহার্য্য।

১। চপ

হাঁসের ডিম	৮টা	পুদিনা	দাম ৴১০
কিসমিস	৶০	পিঁয়াজ ও মসলা,	পরিমাণ মত।
আলু	⁄৫	কড়া বিস্কুটের গুঁড়া	⁄॥০
চীনাবাদাম ভাজা	৶০	বিলাতী বেগুন	⁄।০
নারিকেল কুরা	৶০	কাঁচা লঙ্কা	দাম ৴৫
কড়াইশুঁটি দানা	⁄॥০	মাছ বা থোড়া মাংস	⁄৩
ধনে পাতা	দাম ৴১০	ঘৃত বা তেল	⁄২॥০

(নিরামিষ হইলে)

হিং ও মসলা,	পরিমাণ মত	ডাল বা কড়াইশুঁটি দানা	⁄॥০
পোস্ত	৶০	অভাবে মোচা	⁄৫
বড় ফুলকপি	২টা	এরারুট	⁄।৶০
আলু	⁄৫	টোম্যাটো	⁄।০

অন্যান্য পূর্ব্ব তালিকা মত।

২। ঘুগনি

বরবটী বা কাবলে ছোলা বা কড়াইশুঁটি দানা	/৩॥০	আলু	/২॥০
		চিনেবাদাম ছাড়ান	/১

(পিঁয়াজ বা হিং, নারিকেল কোরা, তেল ও অন্য মসলা, উপযুক্ত পরিমাণ)

৩। চাটনি

কিসমিস	/১	আলুবখরা	/১॥০
খেজুর	/২	এপ্রিকট	/১।০

(মসলা, চিনি ও তেঁতুল আবশ্যকমত)

৪। পোলাও

জাফ্রাণ	৮ রতি	কিসমিস	।॥০
বাদাম	/॥০	পেস্তা	/।০
জৈত্রি	দাম ৵১০	লবঙ্গ	দাম ৵১০
সাজিরে	দাম /০	গোলমরিচ	দাম /০
কাবাব চিনি	দাম ৵১০	খোয়া ক্ষীর	/।৵০
চাল	।২ হইতে ।৫ সের		

(চিনি ও অন্যান্য মসলা উপযুক্ত পরিমাণ)

৫। মোগলাই ডাল

(মুড়ী ঘণ্ট)

মাছের মুড়া বড়	৩টা	ছোলা বা মুগের ডাল	/১॥০
কিসমিস	/।০	কড়াইশুঁটি ছাড়ান	/।০
আলু ছোট ২ করিয়া ভাজা	/॥০	আদার কুচি	/০
পাপড় (ছোট কুচি ভাজা)	/০		

(মসলা ও নারিকেল বাটা উপযুক্ত পরিমাণ)

আলু, আদা ও পাপড় পাকশেষে দিবে।

৬। রাধাবল্লভী

কড়াই ডাল বাটা /১॥০ কিম্বা কড়াইশুঁটি বাটা—/২॥০

ফর্দ্দের মোট ঘৃত ও মসলা হইতে ইহার ঘৃত ও মসলা সংকুলান হইবে।

পরিশিষ্ট (খ)

(মিষ্টান্ন প্রকরণ)

প্রতি ১০ সের ওজন মালের বিভিন্ন উপাদান :—

ছানার পিটে—শুষ্ক ছানা /৪, চিঁড়ে /১॥০, সবেদা /॥০, খোয়া ক্ষীর /১, কিসমিস /।০, সন্দেশ /১, বড় এলাচ ৵০, ঘৃত /৸, চিনি /৫।

বিরিকান্তি বা রসবড়া—কড়াই ডাল বাটা /২, চিনি /৫ বা খেজুরে গুড় (নোলেন) /২॥০, সরিষার তেল /১।০।

রাঙা বা লাল আলুর পিটে—রাঙা আলু /৬, সবেদা /॥০, বড় এলাচ ৵০, সন্দেশ /১।০, কিসমিস /।০, ঘৃত বা সরিষার তেল /১।, চিনি /৫।

বোঁদে বা মিহিদানা—বেশম /২॥০, সবেদা /৸০, ঘৃত /২॥০, চিনি /৫। বোঁদের পায়েস করিতে হইলে ।২ সের দুধ প্রয়োজন।

সীতাভোগ—শুষ্ক ছানা /৩॥০, ঘৃত /১।০, সবেদা /৸৵০, ক্ষীর /॥০।

পান্তুয়া, ছানার জিলেপি, লেডিকেনি, চিত্রকূট, কালজাম বা **ছানার মালপো**—শুষ্ক ছানা /৫, চিনি /৭॥০, ঘৃত /৸০, ময়দা বা সবেদা /১।০, ক্ষীর /৸০, এলাচ দানা ও কিসমিস প্রত্যেকটী /।০।

রসগোল্লা, রাজভোগ, রসমুণ্ডি বা **ছানার গজা**—চিনি /৭॥০ হইতে /।০, শুষ্ক ছানা /৭॥০। কিছু ক্ষীর ও কিসমিস (রাজভোগের জন্য।)

সন্দেশ—শুষ্ক ছানা /।০ ও চিনি /২॥০ হইতে /৩।

ছানার পায়েস—দুধ ।০, শুকনা ছানা /৭॥০, চিনি /২॥৵০, কিছু গোলাপ জল বা শুষ্ক পাতা, কিসমিস. বাদাম ও পেস্তা।

চন্দ্রপুলী—নারিকেল বাটা /৬, শুষ্ক ছানা /১।০, চিনি /২॥০, ক্ষীর /১।০।

গোকুল পিটে—সুজি /১, দুধ /৫, জলছানা /২॥০, খোয়াক্ষীর /১।০, চিনি /২॥০, ঘৃত /২॥০।

সরবর রস মাধুরি—সর /১, জল ছানা /২॥০, খোয়াক্ষীর /১, খাসা ময়দা /॥০, চিনি /৭॥০, ঘৃত /২॥০।

পরিশিষ্ট (গ)

আধুনিক প্রীতি-ভোজের মেনু।

(৪০৫ পৃষ্ঠা দেখ)

"ভোজ্যের তালিকা দেখে বেড়ে যায় ক্ষুধা,
জনার্দ্দন স্মরণেতে ভোজ্যে ক্ষরে সুধা"।

—প্রসাদ কবি।

কাঁচা জলপান।

১। মাখম ২। মিছ্‌রী ৩। ছানা
৪। শর্করা ৫। কাঁচামুগ ৬। শ্রী-ভোগ

পলান্ন।

৭। জনার্দ্দন-ভোগ ৮। আনারানন্দ-ভোগ ৯। রোহিতানন্দ-ভোগ

লুচি।

১০। শ্বেত-টেক্কা ১১। তাল-টেক্কা ১২। জিরা-টেক্কা
১৩। বিশ্বামিত্র-টেক্কা

ভাজা।

১৪। আলু-রেঁাটে ১৫। মুগ্-রেঁাটে ১৬। সাগু-রেঁাটে
১৭। কুসুম-ঝুরি ১৮। পোস্ত-ছাঁচি ১৯। কটুক-পত্রিকা
২০। পকৌড়িকা ২১। করৌলিকা ২২। নারিকেলি
২৩। পকালী ২৪। ললনাঙ্গুলিকা ২৫। বৈতাড়ুকা
২৬। চিচিঙ্গিয়া ২৭। পটলিয়া ২৮। ছোলা-গোলা
২৯। ঘুঘ্‌নি-মণি

দাউল।

৩০। মুগ-ডেনিয়া ৩১। মুসুরিয়া ৩২। চণকিয়া
৩৩। খেঁসারিয়া ৩৪। রহড়িয়া ৩৫। কলাইয়া

নিরামিষ।

৩৬। পোস্তালু　৩৭। দধ্যালু　৩৮। মোচকা
৩৯। বিধবা-চচ্চড়ী　৪০। ছানা ছানিত-কোপ্তা　৪১। তিক্তকী
৪২। মূলিকা　৪৩। বিরিঞ্চি-বিলাস　৪৪। নির্ঘণ্ট

আমিষ।

৪৫। মীন-সাগর　৪৬। ফ্রাই-ড্রাই　৪৭। গুলি-কাবাব
৪৮। মালাই-কালাই　৪৯। রাই-রোষ্ট　৫০। দম্-পোক্তা
৫১। দোলমা　৫২। গোলাম-ঘণ্ট　৫৩। পারস্য-প্রসূন
৫৪। চপ　৫৫। কোন্দন কালিয়া

চাট্‌নি।

৫৬। রসালিকা　৫৭। পপিতা　৫৮। চুক্রিকা
৫৯। মাধুরী　৬০। তিন্তিড়ীকা　৬১। চালোটিনা
৬২। তম-সাম্‌ড়া　৬৩। অ্যাপ্রিকট্　৬৪। মৎস্য-ডিম্বিকা

পিষ্টক।

৬৫। গোকুল-চাঁচি　৬৬। বিরিকান্তি　৬৭। রাং-রাঙ্গিয়া
৬৮। রস-মাধুরী　৬৯। অমৃত-রসাল　৭০। মালপুজারী
৭১। রম্ভা-বর্তুল

পরমান্ন।

৭২। ভারমিসিলি　৭৩। আতামৃত

মিষ্টান্ন।

৭৪। বৃন্দাবনী　৭৫। দুধ-কমলা　৭৬। সন্তোষ-ভোগ
৭৭। সত্যেন্দ্র-লাড্ডু　৭৮। বাদামিকা

ফলার।

৭৯। চৈতন্য-ভোগ　৮০। শরদিন্দু-ভোগ

ফল।

১৯শ প্রকার, ৮১। হইতে ৯৮।

সরবৎ।

৯৯। শিখরিণী　১০০। নিম্বুকা　১০১। মুখশুদ্ধি পত্রিকা

পরিশিষ্ট (ঘ)

গ্রন্থবিবরণী

Food	Sir Robert Mac Carrison
Health Bulletin No. 23	Nutrition Research, Coonoor
Matriculation Hygene	Dr. R. C. Ray
Physical Education	Cassels
Eating for perfect health	Mrs. Milton Powell
Dietetics in Warm Climates—Leitch	
Fletcherism, what it is how I became young at 60	Horace Fletcher
Nutrition in Health & disease—Dr. J. H. Bennet	
Our digestion or my Jolly friend's secret—	Dr. Dio Lewis A. M.
Eating for Health	Dr. H. C. Menkel
খাদ্য পরিচয়	ডাক্তার গোষ্ঠবিহারী দাস এম্ ডি ।
শরীর পালন ৩য় ভাগ	বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
খাদ্য বিজ্ঞান	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস
প্রবেশিকা স্বাস্থ্যবিধি	ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র
বামা ক্ষেপা	শ্রী যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শক্তি তত্ত্বামৃত	শ্রী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
খাদ্য	৺ রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়
অজীর্ণতা	শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ মৈত্র
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ	শ্রী যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র
বাঙ্গালীর খাদ্য	কবিরাজ শ্রী ইন্দুভূষণ সেন
কৃষিসম্পদ পত্রিকা	
ভারত ভৈষজ্যতত্ত্ব	ডাঃ প্রমদাপ্রসন্ন বিশ্বাস
স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও পথ্যতত্ত্ব	শ্রী গিরিজানাথ রায় কবিরত্ন
পল্লীমঙ্গল গ্রন্থাবলী	শ্রী অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়
যোগবল রহস্য	শ্রী শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ

খাদ্যদ্রব্যের সূচী

দ্রব্য		পৃষ্ঠা	দ্রব্য		পৃষ্ঠা
অড়হর ডাল	...	২৯২	কৎবেল	...	২৭৫
অলিভ অয়েল	...	৯৭	কপি	...	৩৩৫
অম্লজনক খাদ্য	...	৮০	ক্যারট	...	৩৩৬
আখ	...	৬৭, ২৭২	কলমি শাক	...	৩৩৯
আখরোট	...	২২৩	কলা	...	২৩৫
আঙ্গুর	...	২২১	কলাই ডাল	...	২৯১
আটা, ময়দা	...	২৮৪	কলাই শাক	...	৩৪০
আতা	...	২২৪	করোলা	...	৩০২
আদা	...	১০১	কাঁকরোল	...	৩৩৬
আনারস	...	২২৬	কাঁকুড়	...	২৭২
আপেল	...	২২৫	কাঁটানটে	...	৩৪০
আম	...	২২৮-২৩৫	কাঁঠাল	...	২৪১
আমআদা	...	১০৫	কালজাম	...	২৩৯
আমড়া	...	২৯৮	কালজীরা	...	১০৭
আমরুল শাক	...	৩৩৯	কুল	...	২৪৩
আলু	...	২৯৮	কুলপি বরফ	...	১৯৭
ইক্ষু	...	৬৭, ২৭২	কুষ্মাণ্ড	...	৩০৬
উচ্ছে	...	৩০১	খই	...	২৭৬
উদ্ভিজ্জ ঘৃত	...	৯৫	খরমুজ	...	২৪৫
এলাচ (বড় ও ছোট)		১১৭	খিচুড়ি	...	২৮৮
ওল	...	৩০২	খেজুর	...	২৭০
কচু	...	৩০২	খেঁসারি ডাল	...	২৯২
কড লিভার তেল	...	৩৪৯	গম	...	২৮৩
কড়াইশুঁটি	...	৩৩৬	গাজর	...	৩৩৭

দ্রব্য	পৃষ্ঠা	দ্রব্য	পৃষ্ঠা
গাঁদাল শাক ...	৩৪০	টোম্যাটো ...	৩২৫
গিমে শাক ...	৩৪০	ডাল ...	২৮৭
গুগলি ...	৩৪৮	ডালচিনি ...	১২৫
গুড় ...	৬৭	ডালপুরি ...	২৯৩
গোল মরিচ ...	১১৫	ডালিম ...	২৫৭
গোলাপ জাম ...	২৩৯	ডুমুর ...	৩১০
ঘুগ্নিদানা ...	২৯৩	ঢেঁড়স ...	৩১১
ঘৃত ...	১৮৮-১৯২	তরকারি বা সব্জি ...	২৯৪
ঘৃত উদ্ভিজ্জ ...	৯৫	তরমুজ ...	২৪৪
ঘৃতপক্ক দ্রব্য ...	১৯২	তেজপাতা ...	১২৫
ঘৃত (পুরাতন) ...	৮০	তেঁতুল ...	[illegible]
চাল ...	২৪৪, ২৮৫	থানকুনি বা থুলকুড়ি শাক	৩৪০
চিচিঙ্গে ...	৩৩৬	দুগ্ধ ...	১৬৬-২১২
চিঁড়া ...	২৭৬	দুগ্ধ পেটেন্ট (শিশুখাদ্য)	১৭৬
চিনি ...	৬৫, ৬৭, ৬৮	দধি ...	১৭৯-১৮
চিনি কৃত্রিম (Sacherine)	৬৮	ধান ...	২৭
চীনাবাদাম ...	৩০৭	ধানের কুঁড়া ...	২৭
চৈ ...	৩১৬	ধনে ...	১১২
ছানা ...	১৮৬	ধুঁধুল ...	৩৩
ছানার জল (whey)	১৮৩	নারিকেল ...	২৪[illegible]
ছোলা ...	৮৮, ২৯১	নালিতা বা পাটপাতা	৩৪
ছোলা শাক ...	৩৪০	নিমপাতা ...	৩৪
জলপাই তেল ...	৯৭	নুনে শাক	৩৪
জাফরাণ ...	১২০	নোনা ...	২৭
জায়ফল ...	১২২	পটোল ...	৩১
জীরা ...	১০৫	পাটপাতা বা নালিতা শাক	৩৪
জৈত্রি ...	১২২	পানিফল ...	২৭
ঝিঙ্গা ...	৩০৯	পায়েস বা পরমান্ন	২৭
ঝিনুক ...	৩৪৮	পালম শাক ...	৩৩

দ্রব্য		পৃষ্ঠা	দ্রব্য		পৃষ্ঠা
পালম শাক চুকো	...	৩৩৯	ভাত	...	২৮০
• পাউরুটি	...	২৮৪	ভাত-পোরের	...	২৮২
পিচফল	...	২৭৩	ভাতের মণ্ড	...	২৭৮
পিঁয়াজ	...	৩১৬	ভিনিগার (সির্কা)	...	১০০
• পিষ্টক বা পিটে	...	২৭৮	ভূরিভোজন	...	৪০৪
পুঁই শাক	...	৩৪১	মটর ডাল	...	২৯১
পুদিনা শাক	...	৩৪২	মটর শাক	...	৩৪১
পেঁপে	...	২৫০	মৎস্য	...	৩৪৪-৩৫৭
পেয়ারা	...	২৫৪	মধু	...	৬৮
পোলাও	...	২৭৮	ময়দা	...	২৮৪
ফল	...	২১৩—২৭৪	মরিচ	...	১১৫
ফলসা	...	২৫৫	মসলা	...	৯৮
ফেন (ভাতের)	...	২৮২	মসুর	...	২৯০
বাদাম	...	২৫৫	মাখম	...	১৮৭
বার্লি (যব)	...	২৮৬	মানকচু	...	৩০৫
বাঁশের কোঁড়	...	৩৩৭	মাংস	...	৩৫৮-৩৭৬
বিট পালম	...	৩৩৬	মিষ্টান্ন	...	৬৬
বিস্কুট	...	২৭৬	মুগ	...	২৯০
বেগুণ দেশী	...	৩২৩	মুড়ি	...	২৭৬
বেগুণ বিলাতী	...	৩২৫	মুলা	...	৩২৮
বেতের আগা	...	৩৩৭	মুলা শাক	...	৩৪১
বেতো শাক	...	৩৪১	মৌরি	...	১২৪
বেদানা ও ডালিম	...	২৫৭	যব (বার্লি)	...	২৮৬
বেল	...	২৬৫	রন্ধন, স্নেহ দ্রব্য	...	৯৫

দ্রব্য		পৃষ্ঠা
রন্ধন মসলা	...	৯৮
রসুন	...	৩১৭, ৩১৯
রাঁধুনি	...	১২৫
রুটি	...	২৮৩
লঙ্কা		৫৫, ১০০, ১০১, ১০৯,
লবঙ্গ	...	১১৮
লবণ	...	২৯, ৬০
লাউ	...	৩৩১
লাল মাছ	...	৩৭৬
লাল শাক	...	৩৪১
লিচু	...	২৭৪
লুচি	...	২৮৩-২৮৫
লেটুস	...	৩৩৬
লেবু	...	২৬১
শটি	...	১৭৭
শসা	...	২৭১
শাকবর্গ	...	৩৩৮
শাজীরা	...	১০৬
শালগম	...	৩৩৬

দ্রব্য		পৃষ্ঠা
শুঁঠ	...	১০২
শুলফা শাক	...	৩৪১
সজিনা ডাঁটা	...	৩৩৭
সজিনা ফুল	...	৩৩৭
সজ্জি	...	২৯৪
সবেদা	...	২৭২
সয়াবিন	...	৩৩২
সরিষার তেল	...	৯৫
সরিষা শাক	...	৩৪১
সাঞ্চে শাক	...	৩৪১
সামুক	...	৩৪৮
সিম	...	৩৩২
সির্কা (ভিনিগার)	...	১০০
সুপারী গাছের মাথা		৩৩৭
সুষনি শাক	...	৩৪২
হরিদ্রা	...	১১০
হিঞ্চে শাক	...	৩৩৯
হিং	...	১১৪
ক্ষারবহুল খাদ্য	...	৮০
ক্ষীর	...	১৮৭

স্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন ও চিরযৌবন-তত্ত্ব।

(পৃঃ ২৬০)

লেখক—রায় সাহেব বিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।

প্রকাশক—শ্রীবিমানচন্দ্র ঘোষ, ৬৭।১, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা।

Many thanks for the copy of your book you have kindly sent me. I have already had a cursory glance through it. The book appears to be very interesting and instructive. I propose to go through it very thoroughly as I find time for the purpose.

(Sd.) T. KHAN,
(Minister, Public Health—Govt. of Bengal.)
4-11-39.

আপনার "স্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন ও চিরযৌবন তত্ত্ব" নামক পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। ইহাতে আপনি সরল ভাষায় সহজ কথায় অনেক সুন্দর উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এই পুস্তকের প্রতি আকৃষ্ট হইলে ইহা বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে পরিগণিত হইবে মনে করি।

(স্বাঃ) সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়।
২৬-১১-৩৯।

উদয়াচল—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬।

'যাহাতে দেশে সকলের মনে স্বাস্থ্য বিষয়ে জাগরণ আসে' সেই প্রেরণায় রায় সাহেব ঘোষ মহাশয় যে কঠিন বিষয়টীতে হস্তক্ষেপ

করিয়াছেন, বর্ণনার নৈপুণ্যে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু ও কালোপযোগী কল্যাণকর। ভাষার গতি সাবলীল ও মনোরম। ইংরাজী ও সংস্কৃত উদ্ধৃতিগুলির অনুবাদ থাকায় পাঠে কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। বর্ত্তমানে সামাজিক বিপর্য্যয়ের দিনে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু বাঙ্গালীদিগের যে সমস্যার সমাধান সর্ব্ব প্রথম প্রয়োজন, সেই স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন সম্বন্ধে প্রামাণ্য ও অসংখ্য জ্ঞাতব্য-বিষয়ে-পরিপূর্ণ এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। সমাজ ও স্বাস্থ্য সংগঠনে এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। স্বাস্থ্য বিষয়ক এরূপ বিজ্ঞানসম্মত, সুচিন্তিত, মন্তব্যপূর্ণ এবং বিস্তৃতভাবে আলোচিত পুস্তক বাঙ্গলা সাহিত্যে বিরল। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে পুস্তকটি পাঠকসাধারণের বহু উপকারে-লাগিবে। আমরা ইহার দ্বিতীয় খণ্ডটীর অপেক্ষায় রহিলাম।

(স্বাঃ) ডাঃ শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-বি।
(স্বাঃ) শ্রীকিশোরীমোহন রায়, বি-এ।

কায়স্থ সমাজ পত্রিকা—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬।

গ্রন্থকার বহু অধ্যবসায় ও ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থে স্বাস্থ্য-সংরক্ষণে যে সকল বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে পরমায়ু-তত্ত্ব, জীবনীশক্তি, বংশ প্রভাব, পরমায়ু ক্ষয়, সংসর্গ দোষ, শ্রম ও ব্যায়াম, হাস্য ও ক্রন্দন, ইন্দ্রিয়-পরিচালনা, প্রাণায়াম, বিশ্রাম-তত্ত্ব, নিদ্রা ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি প্রভৃতি অতি সুনিপুণ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রকার গ্রন্থ সর্ব্বথা বহুশঃ প্রচার বাঞ্ছনীয়। আমরা গ্রন্থখানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি, আশা করি গ্রন্থখানি পড়িয়া পাঠক সাধারণ সবিশেষ উপকৃত হইবেন।

স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিরযৌবন তত্ত্ব।

প্রথম পর্য্যায়, পৃঃ ২৬০। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

লেখক—**রায় সাহেব বিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ,**

এফ্-আর্-এইচ্-এস্ (লণ্ডন)।

(ভূতপূর্ব্ব সহকারী ট্র্যাফিক ম্যানেজার, ই-বি-রেলওয়ে।)

প্রকাশক—শ্রীবিমানচন্দ্র ঘোষ, ৬৭।১, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড,

কলিকাতা।

আপনার প্রণীত 'স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিরযৌবন তত্ত্ব' পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। বাংলা দেশে এইরূপ পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন। স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আপনি যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। আপনার গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

রমেশচন্দ্র মজুমদার।

ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পুস্তকখানি অতি প্রয়োজনীয় তথ্যে পূর্ণ অথচ সুখপাঠ্য। এই শ্রেণীর পুস্তক সাধারণতঃ 'নিরেট' উপদেশে পূর্ণ হয় বলিয়া পড়িতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু আলোচ্য বইখানিতে উপদেশের ফাঁকে ফাঁকে, রসাল গল্প ও আলাপ সন্নিবিষ্ট থাকায়, লোকে ইহা আগ্রহ সহকারে পড়িবে। আমি দুইবার পড়িয়াছি এবং যথেষ্ট আনন্দ পাইয়াছি।

যেরূপ পরিশ্রম সহকারে এই গ্রন্থের তথ্যগুলি আহরিত হইয়াছে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনব্যাপারগুলি যেরূপ ব্যাপক ও বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহাতে ইহা সকলেরই বিশেষ উপকারে আসিবে—গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হইবে।

যে সকল পাঠক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আরও অধিক জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছুক, গ্রন্থের পরিশিষ্টে গ্রন্থ বিবরণীটী তাহাদের বিশেষ সাহায্য করিবে। গ্রন্থের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল এবং উদ্ধৃত ইংরাজী অংশগুলির তর্জ্জমা অতি মনোজ্ঞ হইয়াছে। ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ পাঠক ঐ তর্জ্জমা হইতে মূল ইংরাজীর রসোপলব্ধি করিতে পারিবেন।

গ্রন্থকার বিংশ শতাব্দীর এই অতি-বৈজ্ঞানিক (Ultra Scientific) যুগের মধ্যে থাকিয়া যে খৃষ্টজন্মপূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত পুরাতন আচার সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিয়া তাহাদের অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুমোদন করিয়াছেন এবং উহাদিগকে কুসংস্কার না বলিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন—ইহা দুঃসাহসিক কার্য্য বলিয়াই মনে হয়, কারণ ইহাতে তাঁহাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া নিন্দিত হইবার আশঙ্কা ছিল।

আর একটী বিষয়ে তিনি অপূর্ব্ব চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি জানেন যে নেশা মানুষের অতি প্রিয় এবং উহার নিন্দা করিলে অতি আপন জনও বিরূপ হইয়া উঠে; সেইজন্য রোগীকে কটু ঔষধ খাওয়ানোর পর যেমন দুই চারিটী আঙ্গুর অথবা অন্য কোন সুস্বাদু দ্রব্য দিয়া মুখের 'তার' ফিরাইয়া আনা হয়, তেমনি তিনি নেশার তীব্র নিন্দা করিয়া দু'চারিটী মিষ্ট কথায় নেশাখোরের বিরূপ মনের 'তার' ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মনে হয় এই প্রক্রিয়ার দ্বারা তিনি তাঁহার উপদেশগুলিকে 'মাঠে মারা যাইবার' হাত হইতে বাঁচাইতে পারিবেন। আশা করি এরূপ প্রয়োজনীয় পুস্তক ঘরে ঘরে স্থান পাইবে। দেশের স্বাস্থ্যের

দুর্দ্দিনে এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের জন্য লোকে আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করিবে।

ডাঃ মন্মথনাথ সরকার এম-বি,
এল-আর-সি-পি, এল-আর-এফ-পি-এস।
ডিষ্ট্রীক্ট মেডিকেল অফিসার, বিলাসপুর,
বি, এন, রেলওয়ে।

গ্রন্থকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু মনীষীর লিখিত গ্রন্থাবলী আলোচনা ও গভীর গবেষণা করিয়া গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। এই শ্রেণীর গ্রন্থ যত অধিক প্রচার হয়, দেশের ও সমাজের ততই মঙ্গল। গ্রন্থকার স্বয়ং একজন শাস্ত্রবিশ্বাসী ও ভগবদ্ভক্ত, তাই আমাদের দেশের প্রাচীন মহাপুরুষগণের নির্দ্দেশে যে সকল সদাচার ও শাস্ত্রের নানারূপ অনুশীলন সমাজ মানিয়া চলিত তাহারই ফলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া নিরাবিল শান্তিতে ও সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন; তাহার প্রমাণ পাঠকগণ এই গ্রন্থে পাইবেন। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

—সত্যপ্রদীপ।

এই পুস্তকখানি লেখকের জীবনব্যাপী গবেষণার ফল! এই সকল পুস্তকের সম্বন্ধে ডাক্তারের মন্তব্যের মূল্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। একজন বিখ্যাত ডাক্তার লিখিয়াছেন—"সমাজ ও স্বাস্থ্য সংগঠনে এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। স্বাস্থ্য বিষয়ে এরূপ বিজ্ঞান-সম্মত সুচিন্তিত মন্তব্যপূর্ণ ও বিস্তৃতভাবে আলোচিত পুস্তক বাংলা সাহিত্যে বিরল।"

আমরাও ডাক্তারবাবুর মন্তব্যই পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

কালিদাস রায়। (কবিবর)

The Teachers' Journal (শিক্ষা ও সাহিত্য)

স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গলায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত ভাল বহির সংখ্যা খুবই কম। অথচ বাঙ্গালীর ন্যায় 'স্বাস্থ্যহীন' জাতির পক্ষে এরূপ গ্রন্থের পঠন পাঠন একান্ত আবশ্যক। শ্রীযুক্ত বিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ "স্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন ও চিরযৌবন তত্ত্ব" গ্রন্থ লিখিয়া সেই অভাব কতকটা পূর্ণ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে পরমায়ু তত্ত্ব, পরমায়ু ক্ষয়ের কারণ এবং স্বাস্থ্য রক্ষা ও দীর্ঘজীবন লাভের উপায় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালী যুবক ও প্রৌঢ়দের এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। বিদ্যালয়েও এইরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা।

সাধারণের জন্য সহজ ভাষায় লেখা ইহা সুখপাঠ্য স্বাস্থ্য বিষয়ক গ্রন্থ। ইহা ঠিক বৈজ্ঞানিক পুস্তক হিসাবে লিখিত নহে, কিন্তু স্বাস্থ্য বিষয়ে যাহারা বাংলা ভাষায় পুস্তকাদি পড়িতে চান তাঁহারা এই বইখানিতে নানা প্রকারের তথ্য জানিতে পারিবেন। প্রাচীন শাস্ত্রাদি ও কিম্বদন্তী হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বিজ্ঞান পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে অনেক কথাই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। মানুষের দৈনিক আহার-বিহার বিষয়ে যে সকল অভ্যাস জন্মায় তাহার দোষ গুণ বিচার, স্বাস্থ্যকে অটুট রাখিতে হইলে ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে কি কি নিয়ম পালন করা উচিত, ও কি কি বর্জ্জন করা উচিত, মোটামুটি তাহা লইয়াই এই পুস্তক লিখিত

হইয়াছে। লেখক এই পুস্তক প্রণয়নে অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন এবং বহু দেশী ও বিলাতী গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থের বিবরণীও ইহার শেষে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব সাধারণে এই পুস্তক হইতে অনেক জ্ঞানসঞ্চয় করিতে পারিবে। স্বাস্থ্য বিষয়ে অজ্ঞ আমাদের বাংলা দেশে এই ধরণের পুস্তকের বহুল প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পশুপতি ভট্টাচার্য্য।

(প্রবাসী)

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যজী কোনও সাধু কর্ত্তৃক কায়কল্প চিকিৎসা দ্বারা পুনর্যৌবন লাভ করিয়াছেন। যদিও সে চিকিৎসা সাধারণলভ্য নয় তবে উহা দ্বারা নষ্ট যৌবন পুনরুদ্ধার সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু কি করিয়া চিরযৌবন লাভ হয় ইহা মীমাংসিত হইতে স্থির যৌবনলাভের প্রচেষ্টাই যুক্তিযুক্ত।

রায় সাহেবের গ্রন্থখানির নাম শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম হয়ত তিনি কোথাও কোনও গোপন কৌশল বা ঔষধের সন্ধান পাইয়াছেন যদ্দ্বারা চিরযৌবন লাভ সম্ভব হইতে পারে। আমার মত অনেকেই বিষয়টাকে এইরূপ কোন সহজলভ্য উপায়ে পাইতে উৎসুক আছেন—কিন্তু পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহারা আপাতবিচারে নিরাশ হইবেন। যে গাছটীর সমগ্র জীবন রসাভাবে কাটিল, কীটদষ্ট হইয়া জর্জ্জরিত হইল, স্বাভাবিক বৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইল তাহাকে যেমন কোনও যাদু প্রভাবে সহসা রূপান্তরিত করা সহজ নয়—উপযুক্ত প্রাণপ্রদ বস্তুর অভাবে অপুষ্ট ও অমিত অত্যাচারে পীড়িত মানবতনু কোনও প্রক্রিয়া বলে সহসা যৌবনশ্রী লাভ করে না। চিরযৌবন অব্যাহত রাখিতে গেলে চিরদিন তাহার জন্য সজাগ চেষ্টা ও

সর্ব্ববিধ সংযম ও নিয়মনিষ্ঠতা প্রয়োজন—এই কথাই লেখক বহুল বিচারে সুপ্রমাণিত করিয়াছেন।

তিনি বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় সরল করিয়াছেন, সর্ব্বোপরি তাঁহার ভাষা মাধুর্য্যে ও প্রকাশব্যঞ্জনায় বিষয়গুলি মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। কুসংসর্গ, পাণ, চা, কোকো, কফি, তামাক, মদিরা, অহিফেন, কোকেন, গাঁজা, সিদ্ধি, বিলাসদ্রব্য, মুদ্রাদোষ, শুক্রপাত, প্রভৃতি যে যে কারণে আমাদের পরমায়ু ক্ষয় হয় সে সকলের তিনি বিশদ আলোচনা করিয়াছেন এবং অনেক গোপন বিষয়েরও নির্ভীক ও সংযত সমালোচনা করিয়াছেন। শ্রম ও ব্যায়ামতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি নানা বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। তন্মধ্যে নারীদের ব্যায়াম বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমরা মহিলাদিগকে বিলাসী করিয়া তুলিতেছি কিন্তু কিসে তাহাদের শারীরিক কল্যাণ হইবে তাহা চিন্তনীয়। এ বিষয়ে লেখকের মতবাদের বিশেষ মূল্য আছে।

পরিশেষে বক্তব্য, দেশবিদেশের মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া পশু পক্ষী গাছপালার পর্য্যন্ত আয়ুক্রম সম্বন্ধে তিনি যে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন তাহা যেরূপ কৌতুহলোদ্দীপক তেমনি শিক্ষাপ্রদ। দরিদ্র বাঙ্গালী, স্বল্পায়ু বাঙ্গালী যদি সত্য, ন্যায় ও স্বাস্থ্যের পথে চলিয়া পুনরায় তাহার পূর্ব্বগৌরব ও দীর্ঘজীবনের অধিকারী হইতে চেষ্টিত হয় তবেই লেখকের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

আমরা এই প্রয়োজনীয় পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বাস্থ্য-সমাচার।

সম্পাদক—ডাঃ **কার্ত্তিকচন্দ্র বসু।**

আমরা এই বইখানি পড়িয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। ইহা স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন তত্ত্বের একখানি অমূল্য গ্রন্থ। স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে

হইলে দৈনন্দিন জীবনের আহারনিদ্রাদি সমস্ত বিষয়ে যে ভাবে চলা উচিত এবং যে যে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য সেই সকল এই গ্রন্থে অভিনবভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ যে সকল সারবান গ্রন্থ লেখা হইয়াছে সেইগুলি বিশেষভাবে অধ্যয়নপূর্ব্বক তাহাদের সারাংশ ও উদাহরণাদি এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় বইখানি অতীব চিত্তাকর্ষক ও সুপাঠ্য হইয়াছে। উক্ত বিষয়ক ৪২ খানি ইংরাজি গ্রন্থের এবং ৩০ খানি বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থের তালিকা গ্রন্থশেষে সংযোজিত হইয়াছে। পুস্তকখানি এত সুললিত যে, ইহা পড়িতে পড়িতে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের আকাঙ্খা স্বতঃই মনে জাগ্রত হয়। বাঙ্গালীর সাধারণ স্বাস্থ্য এত মন্দ এবং জীবন এত অদীর্ঘ যে, প্রত্যেক বাঙ্গালীর এই পুস্তক পাঠ্যপুস্তক বা ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় পড়া উচিত। বইখানি নয়টী অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে তৃতীয় ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যথাক্রমে ১৪টী ও ১৩টী পরিচ্ছেদ আছে। পরমায়ুতত্ত্ব, পরমায়ুক্ষয়ের বিভিন্ন কারণ, চা, কফি, মদ, আফিং ও গাজা প্রভৃতির অপকারিতা, পরিচ্ছদ ও পাদুকা ব্যবহার বিধি, বিশ্রাম ও ব্যায়াম তত্ত্ব, সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি, নিদ্রা ও শ্বাসপ্রশ্বাসতত্ত্বাদি বহু আবশ্যকীয় বিষয় সুন্দরভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। বইখানি পড়িলে পাঠক যে শুধু স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ-জীবন লাভের সহজ কৌশল অবগত হইবেন তাহা নহে, প্রত্যেকে যে অল্প আয়াসে এই সম্পদ অর্জ্জন করিতে পারেন সেই আত্মবিশ্বাসও আসিবে। গ্রন্থকার এই পুস্তকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের আশ্বাস দিয়াছেন। আশা করি, এইগুলি শীঘ্রই হস্তগত হইবে। বইখানি প্রতি বাঙ্গালী গৃহে রক্ষিত হউক, এই কামনা।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ।
(উদ্বোধন)

মহামায়া প্রেস
২০-বি, হাজরা বাগান, ইটালী, কলিকাতা।

Amrita Bazar Patrika—31st December, 1939.

It is perhaps for the first time that the entire subject of developing the mind and body is thoroughly covered in Bengali in a manner which is bound to attract the attention of the reading public. The volume tells you of many things that make the essentials of health. It is the easiest reading on scientific topics and the reader will apprehend them immediately. The whole thing is a gist of experiences on the subecct of the occident as well as the orient. It tells you how to guide yourself and balance your existence. The book seems to be an outstanding success in the acquisition of health, strength, beauty and enduring body not through medicine and mysterious feats but through an ordinary course of life only tactfully conducted. It is one of the finest volumes on its subject.

সৎসঙ্গী—৫ই মাঘ, ১৩৪৬।

বইখানি আদ্যোপান্ত পড়িলাম। লেখকের গভীর গবেষণা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম—প্রাচ্য ও প্রতীচীর প্রাচীন ও নবীন স্বাস্থ্যশাস্ত্র মন্থন করিয়া তিনি যে অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন তজ্জন্য দেশবাসী তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। অনেক শাস্ত্রীয় সদাচার বিধিকে আমরা সঙ্কীর্ণতা, কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর পরিচায়ক বলিয়া মনে করি কিন্তু লেখক সে সকলের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উদ্‌ঘাটন করিয়া আমাদের চোখ খুলিয়া দিয়াছেন এবং শাস্ত্রকারদের মনীষা ও বহুদর্শিতা আমাদের উপলব্ধিযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাপক ও গভীর; মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য যে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধ—সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ

করিতে তিনি আদৌ ত্রুটী করেন নাই। অটুট স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ পরমায়ু-সম্পন্ন বহু ব্যক্তির জীবন প্রণালী সম্বন্ধে তিনি নানা তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। বিধিমত চলিলে যে প্রত্যেকেই দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে—এই বই পড়িয়া সে বিষয় নিঃসংশয় হওয়া যায়। সংস্পর্শদোষ শীর্ষক অধ্যায়টিতে বহু গূঢ় তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। পান, তামাক, চা, কোকো, কফি ইত্যাদির গুণাগুণ সম্বন্ধে লেখক বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালীন অস্বাভাবিক, বিকৃত জীবনচলনা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে কত হানিকর তাহা এই পুস্তক পাঠে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কর্ম্মময়, সহজ, সরল, সংযত, অনাড়ম্বর জীবনধারাই যে স্বাস্থ্য লাভের অমোঘ পন্থা তাহা তিনি নানা ভাবে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পালনীয় প্রত্যেকটী বাস্তব বিধি, নির্দ্দেশ ও নিষেধ তন্ন তন্ন বিচারপূর্ব্বক বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহকারে প্রদর্শিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে পঞ্চভূত-তত্ত্ব, আহার-তত্ত্ব, চিরযৌবন-তত্ত্ব, স্বাস্থ্য ও জ্যোতিষ, রত্ন-তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, রিপু-তত্ত্ব, রোগ-তত্ত্ব, আরোগ্য-তত্ত্ব, জরা ও বার্দ্ধক্য-তত্ত্ব, মৃত্যু-তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইবে—সুতরাং বইখানি বর্ত্তমানে অসম্পূর্ণ—আমরা আগ্রহসহকারে দ্বিতীয় ভাগের প্রতীক্ষায় রহিলাম। বইখানির ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গি বেশ সহজ, সরস ও সরল—পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠিতে ইচ্ছা করে না। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ ভাল। জাতি হিসাবে আমরা সর্ব্ববিষয় নিশ্চেষ্ট, অলস, অদৃষ্টবাদী ও নিরাশাবাদী—আমাদের দেশে এমনতর পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

মহামায়া প্রেস—হাজরা বাগান, ইটালী।